

প্রকাশক :

অরুণকুমার মাহিন্দার

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ :

অমিয় ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণ :

অগস্ট, ১৯৫৯

মুদ্রাকর :

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ

বি শিবভূগী প্রিন্টার্স

৩২ বিজন রো

কলকাতা ৬

## সূচীপত্র

সম্পাদকের নিবেদন	...	...	পাঁচ
প্রথম পর্ষায়	...	...	১—১৪২
স্থচনা	...	...	১
আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা ( প্রথম স্তবক )	...	...	১০
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা	...	...	৭৮
আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা ( দ্বিতীয় স্তবক )	...	...	৯৩
পরিশিষ্ট	...	...	১২৩
নাকে খৎ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১২৭
দ্বিতীয় পর্ষায়	...	...	১৪৩—২৭৫
উমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথা	..	...	১৪৩
ব্রহ্মমোহন মল্লিকের স্মৃতিকথা	.	...	১৭৪
অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা	..	...	১৮৩
রাধামাধব করের স্মৃতিকথা	..	...	২৩১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা		...	২৫৮
তৃতীয় পর্ষায়	...	...	২৭৬—৩০১
আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা ( তৃতীয় স্তবক )	.	...	২৭৬
ঋবদর্শন	...	...	৩০২
সংযোজন ও সংশোধন	...	...	৩২৩
পুস্তকে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির জীবনী	...	...	৩৩৫
রচনাপঞ্জী	...	...	৩৬২
নির্ঘণ্ট	...	...	৩৬৪—৩৯৮
ব্যক্তি	...	...	৩৬৪
বিবিধ	...	...	৩৮০
ইংরেজী	...	...	৩৯৪





মহাতারত-অনুবাদক পতিতদিগের সভা

## প্রথম পর্যায়

### সূচনা

প্রথম যৌবনে স্মৃতির কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে যে মায়াজাগ রচনা করে, উত্তরকালে তাহা স্বরণ করিয়া হয়ত সকলেই দার্ঘ্য-নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, তাই হয়ত ইংরাজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন লিখিয়াছেন, 'Imagination is perhaps holier than memory', 'কল্পনা বোধ হয় স্মৃতি অপেক্ষা পবিত্রতর'। কল্পনা নবীন-নবীনার, স্মৃতি প্রবীণ-প্রবণার। কিন্তু যখন এমন একটি বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হই, যখন যৌবনে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, সংসারের কঠিন সত্যগুলি কল্পনার অকণরাগকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দেয়, অথচ নিজেই প্রবীণ বলিয়া পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, তখন বোধ হয় বয়োবৃদ্ধের মুখে তাঁহার পূর্বস্মৃতির বিবৃতি শুনিবাব জন্ত একটা ঔৎসুক্য হয়। ছেনেবেলাকার রূপকথা শুনিবার প্রবৃত্তি কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া এইকপে প্রকাশ পায় কিনা, বাল্যে পারি না। পুরাণের কথায় আলোচনায় যে মাদকতা আছে তাহাতে আমাদের হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পুরাণের কথার মধ্যে আমাদের সমাজের যে স্তরটি লুপ্ত হইয়া আছে, সেইটিকে যদি লোক-সমক্ষে উন্মেষিত করা যায়, তাহা হইলে হয়ত ঐতিহাসিকেরও কতকটা সাহায্য হইতে পাবে।

আজ এই শরতের সায়াহ্নে বীডন উজানের মধ্যে সহস্র বালকের কলকণ্ঠে আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অল্পভূতি অনেক পরিমাণে প্রতিহত হইয়া যাইতেছে। জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না,—

আজ নীরবে ভুঞ্জন

এই সন্ধ্যাকিরণের স্বর্ণ মদিরা,

যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা

লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,

যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে

চেতনা বেদনাবন্ধ।

হঠাৎ শুনিতে পাই, আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজন সপ্ততিবর্ষীয় যুবক—

ক্ষমা করিবেন। সন্তর বৎসরের যুবক এবং পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বৃদ্ধ দেখেন নাই কি? অনীতিপন্ন বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্র্যাকিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—আপনি

যে, এই ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান, আপনার বয়স কত? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, 'I am eighty years young', 'আমি অশীতিবর্ষীয় যুবক।' তাই বলিতেছিলাম, কয়েকজন সপ্ততিবর্ষীয় যুবক পুরানো কথা আলাচনা করিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে সেই স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর শরতের আকাশ, সেই বিচিত্র জনকোলাহলপূর্ণ উত্তান যেন এক মায়ামন্ত্রবলে আমার চক্ষুর অন্তরাল হইয়া যায়, এবং চল্লিশ বৎসরের পূর্বের কলিকাতার একটি চিত্র আমার মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। যে বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কলিকাতার হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা কি সমাজের উপর একটিও রেখাপাত করে নাই? তাহাদের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত আজ বিলুপ্তপ্রায়।

তখন বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় নাই, ইল্‌বার্ট বিল সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; আমাদের জমিদার সভার সহিত ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় একযোগে পরামর্শ করিয়া সরকারী বিধিব্যবস্থার সমর্থন ও প্রতিবাদ করিত; তখনও বাঙ্গালী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নাই; তখনও বাঙ্গালীর ছেলে ইংরেজের ফুটবল খেলায় ইংরাজকে পরাভূত করিয়া জয়ধ্বনি করে নাই। কলিকাতার বাঙ্গালী ধনকুবেরগণ ইংরাজের অহুকরণে স্ব স্ব ভবনের প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে আগুতোষ দেব (ছাত্তাবাবু), কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইংরাজের অহুকরণে থিয়েটারের টেজ বাঁধা হইল বটে, কিন্তু যে নাটকগুলি অভিনীত হইত, তাহার প্রায় সকলগুলিই সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন ও রামনারায়ণ পণ্ডিত তখনকার নাটককার, মাইকেল অল্প হিসাবে সাহিত্যে অমর হইয়াছেন, কিন্তু এখনকার দিনে রামনারায়ণ পণ্ডিতের নাম কয়জন জানে?

ইংরাজের দেখাদেখি বাঙ্গালীরাও তখন আলাদা Race course করিয়াছিল। ঘোড়দৌড় হইত কলিকাতার উত্তরাংশে রাজা নরসিংহের বাগানে। অহুতানের ক্রটি ছিল না,—starter ছিল, jockey ছিল, book-maker ছিল, betting ছিল। ছাত্তাবাবুর দৌড় শরৎবাবু, লাটুবাবুর (ছাত্তাবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পোষাপুত্র ময়ধবাবু, ও হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনিতে। শরৎবাবু নিজেই jockey হইতেন। প্রতি বৎসরে শীতকালে ঘোড়দৌড় হইত।

সখের থিয়েটার, সখের ঘোড়দৌড় বিদেশীর অহুকরণ হইতে পারে, কিন্তু প্রতি বৎসরে শীতকালে ছাত্তাবাবুর মাঠে যে বুলবুলির লড়াই হইত, তাহা আমাদের দেশীয় নবাবী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যেখানে অনাধবাবুর বাজার, গ্রেট ব্রাশনাল থিয়েটার প্রভৃতি হইয়াছে, সেখানে কেবলমাত্র একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে খুব ধুমধামের সহিত বুলবুলির লড়াই হইত। অনেক তাঁবু পড়িত। পোস্তার রাজা নরসিংহ দেড়শত

শিক্ষিত বুলবুলি লইয়া আসিতেন, ছাত্তুবাবুও দেড়শত বুলবুলি আনিতেন। উত্তর দলের মাঝখানে কিছু খাত্তবাবু ছড়াইয়া দেওয়া হইত ; সেই খাবার লইয়া তাহাদের লড়াই বাধিয়া যাইত। লড়ায়ে হারিয়া গেলেই পাখী উড়িয়া যাইত, অমনি অস্ত্রদলের লোকেরা উল্লাসে চাৎকার করিয়া উঠিত “বো মারা”। বেলা এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এই লড়াই চলিত।

এই সকল দেশী-বিদেশী আমোদপ্রমোদের দিনেও বান্ধালী ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার সনাতন ফলাহারের ব্যবস্থা বিস্মরণ করেন নাই। ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের রচয়িতা বৈদিক ব্রাহ্মণকুলভিলক পণ্ডিত রামনারায়ণ ফলাহারের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অব্রাহ্মণেরও বসনায় বসনঞ্চার হয়। ৮শারদীয় পূজার প্রাকালে একবার সেই ফলাহারের কথা স্মরণ করিলে ক্ষতি কি ?

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি  
দুচারি আদার কুচি,  
কচুরি তাহাতে খান দুই  
ছোকা আর শাকভাজা  
মতিচূর, বোদে, খাজা,  
ফলারের যোগাড বড়ই।  
নিখুঁতি, জিলিপি, গজা,  
ছানাবড়া বড় মজা,  
শুনে শব্দ শব্দ করে নোলা,  
হরেক রকম মণ্ডা  
যদি দেয় গুণ্ডা গুণ্ডা,  
যত খাই তত হয় তোলা।  
খুরি পুরি ক্ষার তায়,  
চাহিলে অধিক পায়,  
কাতারি কাটিয়া শুখো দই,  
অনন্তর বাম হাতে,  
দক্ষিণা পানের সাথে,  
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

এতো গেল উত্তম ফলার। মধ্যম ফলার কিরূপ ?  
সরু চিড়ে শুকো দই,  
মর্ন্তমান ফাকা খই,  
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়,  
বৈদিক ব্রাহ্মণে তবে  
মধ্যম ফলার কবে,  
দক্ষিণাটা ইহাতেও বয়।

ইহার পরে অধম ফলায় । সে, কিরূপ ।  
 গুমো চিড়ে, জলো দই,  
 তেতো গুড়, ধেনো খই,  
 পেট ভরা যদি নাহি হয়,  
 বন্ধুরেতে মাথা ফাটে,  
 হাত দিয়ে পাটা চাটে,  
 অধম ফলার তারে কয় ।

১৮৫৪ সালের ‘কৃপান কুলসর্বস্ব’ নাটকের অভিনয়ের পর প্রায় ষাট বৎসর চলিয়া গিয়াছে কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণের এই কলাহারের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে মত পরিবর্তন হইয়াছে।ক ?

পাণ্ডিত রামনারায়ণের সহিত ভিখারী কবিচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না বটে, কিন্তু ছাত্তাবুর আসরে কবিচন্দ্র ছাগশিশু সম্বন্ধে যে গানটি গাহিতেন, বোধ হয় সেটি কলাহার-প্রদক্ষে খাপ খাইতে পারে । গানের প্রথমংশ এই—

ওরে শঙ্কর',  
 তোরা এই পাটা কি শিরুখরা ?  
 কেটে কুটে মোটে মাটে  
 মাংস হোল এক সরা ?

আমরা চার ইয়ারে খেতে ব'সে  
 হোলো না কো পেটভরা ।

সপরাংশে শঙ্কর উত্তর দিতেছে,—

দাম বুঝে দাও,  
 পাটা নাও,  
 মিছে কেন চোক রান্ধাও ?  
 তোমার সবে রেস্তু এটি টাকা,  
 মস্ত পাটা কোথায় পাও ?  
 এ কি লক্ষ টাকার মহাভারত  
 পাঁচ সিকেতে সার্বতে চাও ?

অত্যাধিক কবিচন্দ্রকে সকলেই ভালবাসিত । ছাত্তাবু তাকে গাড়িতে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার পেনেটির বাগানবাড়ীতে লইয়া যাইতেন । একদিন উভয়ে বাগানে যাইবার সময় পথে একটা পলায়নতৎপর বলদ্বের পশ্চাতে ধাবমান গোপবৃদ্ধকে দেখিলেন, অমনি ছাত্তাবু কবিচন্দ্রকে বলিলেন, কবিচন্দ্র, যা দেখ্লে, এটি গান কর্ত্তে পার ? কবিচন্দ্র বলিলেন, পারব না কেন বাবু ! তবে শুনুন—

গোয়ালের আগড় ভেঙ্গে  
 দামড়া গরু পালিয়ে গেল ;  
 পাছে কার গায়ে পড়ে  
 গয়লা বুড়ো তাই দৌড়াল ।  
 বাহিরে এক ছাগল দেখে,  
 গুতোতে গেল তাকে,  
 ভাঙলো তার পায়ে ঠেকে  
 ঘোলের হাঁড়ি, বাহিরে ছিল ।  
 ভাঙলো যেই ঘোলের হাঁড়ি,  
 রাগলো তার গয়লা বুড়ী,  
 নিয়ে এক খ্যাংরা মুড়ি  
 বুড়োর পিঠে মারতে গেল !

তখন বাচ্‌খেলার বড় ধুম ছিল । এই বাচ্‌খেলা উপলক্ষে হয়ত আজকালকার হিসাবে অনেক রুচিবিশিষ্ট ব্যাপার সংঘটিত হইত ; বোধ হয় এই বকম কোনও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার ‘ছতোম পাঁচার নক্সা’র তীব্র কবাবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু ছাতুবাবুর পেনটির বাগানবাড়িতে যে বাচ্‌খেলা হইত, তাহা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের বাচ্‌খেলার স্তায় বিস্তৃত sport ছিল । প্রধান পাণ্ডা ছিলেন প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্ন মিত্র । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এডিন্‌ব্রাউনহনিবাসী, পূর্‌ভবিভাবে কর্ম করিতেন ; ইডেন উত্থান তাঁহারই তত্ত্বাবধানে করা হয় । মিত্র মহাশয় ছিলেন ছাতুবাবুর নাভ-জামাই । উভয়ে নিজ নিজ নৌকায় বাছাই করা দাঁড়ি মাঝি লইতেন ; প্রত্যেক নৌকায় ছয় জন করিয়া দাঁড়ি থাকিত । যে নৌকা জিতিত, তাহার মাঝি এক ছোড়া শাল বক্‌শিশ পাইত !

উত্থানের বেঞ্চার উপর উপবেশন করিয়া ষাঁহাদের মুখ হইতে কলিকাতার এই পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলাম, হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আমাদের প্রথম যৌবনের এই সকল আমোদ-প্রমোদের কথা তোমার হয়ত ভাল লাগিতেছে না । কিন্তু আমরা কয়জন যে কয়দিন আছি, মাঝে মাঝে আমাদের সেকালের কলিকাতার কথা আবৃত্তি করিয়া তোমাদের কর্ণকূহর বাধিত করিব । তাহার পরে সমস্তই মুছিয়া যাইবে । এখনই তো এক প্রকার মুছিয়া গিয়াছে । যাহা চলিয়া যাইতেছে, তোমরা তাহার স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছ ; মন্দির উঠাইতেছ, পদক দিতেছ, tablet বসাইতেছ, মূর্তি গড়িতেছ । দেখিয়া বড় আনন্দ হয় । বাকালীর ছেলে, পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও । আপনার স্বয়ংরাজ্যের বিজন কক্ষে পুরাতনের প্রাঙ্কোৎসব করিলে আনন্দ পাইবে, স্বয়ংরাজ্য পাইবে, বাহুতে বল পাইবে, আপনার পক্ষে ভয় করিতে শিখিবে, ধর্ম‌ভীরু হইবে, কর্ণে উৎসাহ বাড়িবে । কথাটা

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিও। যখন চাকরিগত-প্রাণ বাঙ্গালীর ছেলে চাকরি করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, যদি তাহার মধ্যে মহত্ত্ব আছে বলিয়া তোমার ধারণা হয়, যদি তাহার এই দৃষ্ট বৃথা আশ্বাসন বলিয়া তোমার মনে না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রামগোপাল ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দিও। বলিও যে স্বয়ং লাট সাহেব,—মনে রাখিতে হইবে তখনকার দিনে ছোট লাট বাঙ্গালীর মননে ছিলেন না,—রামগোপাল ঘোষকে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিবার জন্য অমরোধ করিয়াছিলেন। রামগোপাল উত্তর করিল, ‘চাকরি করিব না।’—গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিব না।’ লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তবে তুমি কি করিবে?’ উত্তর হইল, ‘আর কিছু না পারি কলিকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিয়া জীবিকা অর্জন করিব।’ বিদ্যাসাগর যখন সন্তুষ্ট কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলেন, সম্পাদক বিস্মিত হইয়া জনৈক বন্ধুকে বলিলেন, ‘ঈশ্বর তো চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খাবে কি করে?’ কথাটি বিদ্যাসাগরের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, ‘বোলো, মুদির দোকান ক’রে খাবে।’ বলা একটু থামলেন। আমি মনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার ক্রুশ, গৌর, সরল দেহখানি যেন হোমায়ি-শিখার মত দীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ‘তোমরা পুরাতনের অনুকরণ করিতেছ, অথচ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হও যে, অনুকরণ করিতেছ? তোমরা সভা করিয়া কাগজে ছেলের স্বাক্ষর লইতেছ, তাহাদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেছ যেন তাহারা পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ না করে এবং বোড়শী পাণিগ্রহণ করে। তোমাদের বহু পূর্বে প্যারিচরণ সরকার এই রকম সভাসমিতি করিয়া বালক, যুবক, বৃদ্ধের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়াছিলেন, যেন তাঁহারা মৃত্যুপান না করেন; তাহাতে সমাজের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। তোমরা ত সেই পথ অনুসরণ করিয়া, সেই রকম সভাসমিতি করিয়া (তোমরা league কথাটা পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছ) সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে এইরূপ বন্ধপরিকর হইয়াছ। যে এগারজন বাঙ্গালী হিন্দুস্তান দলে দলে সমাগত গোরা খেলোয়াড়দিগকে ফুটবলে পরাস্ত করিয়া এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দিলেন, তাঁহারা কি পঞ্চবিংশতি-বোড়শী পরিণয়ের সন্তান? তুমি হাসিতেছ? কি বলিতেছ? exception? accident? বোড়শী চাই; আচ্ছা, তাহাই হউক। কিন্তু সমাজে যে ভূকম্প উপস্থিত হইবে, তাহার আভাস কিছু পাইতেছ কি? সে ভূকম্পে পুরাতনের একটি বৃহৎ অট্টালিকা তাহার ইট, কাঠ, চুন, স্বরকি সমেত ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে! জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও স্তম্ভ ভিত্তির উপর তাহার বিরাট বিপুল কায়া বিরাজিত। সেই একাদমবর্তী পরিবার ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। কি বলিলে? তাহাতে ক্ষতি কি? আবার নূতন করিয়া ইট, কাঠ, চুন, স্বরকি লইয়া নূতন হৃদয় গড়িয়া তুলিবে? তোমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তোমরা কি এতই শক্তিশালী? বেশ, ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারিলে তো ভালই হইতে পারে। তোমরা পাণ্ডিত্যের অভিমান কর, কিন্তু looking before and after কাজ কর কি?

পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত 'অশ্রদ্ধা' তোমাদের হইয়াছে, তাই বোধ হয় looking before-টা ভাল রকম হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—*and after ?* অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান "এম্পায়ার" পত্রিকা হিন্দুর এই বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, শুন :—

Another sign of the times is the suggestion put forward for the need of a Divorce Law for Hindus. It will come, we are convinced, with the passage of time.\*

"অনেক দেখিলাম, কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে। তোমাদের কল্যাণে তাহাও দেখিতে হইবে। চলিতে হইবে চল; কিন্তু ধীরে ধীরে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একবার বক্তৃতার মুখে বলিয়াছিলেন, আমরা মার্কিনবাসী নক্ষত্রলোকের দিকে আমাদের মন্তক উন্নত করিয়া চলি বটে, কিন্তু আমাদের পা থাকে নিরেট পৃথিবীর উপর।"

ভ্রলোক চূপ করিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু তখন দেখিলাম যে সেই বেষ্ট উপবিষ্ট আমরা কয়জন ছাড়া আর সে বাগানে কেহ উপস্থিত নাই। হঠাৎ বাক্যের শ্রোত বন্ধ হইলে সেই চন্দ্রালোকিত উদ্যানের বিজনতা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। আমি একটু নড়িয়া বসিলাম। ভ্রলোকটি এবার একটু নয়ন সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—“পুরাতন কথা কহিতে গিয়া নিজে কে সামলাইতে পারি নাই, বয়সোচিত গাভীরা রক্ষা করিতে পারি নাই; কিছু মনে করিও না। তোমরা পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছ বৈ কি, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? খাল বিল পুকুরিণী হইতে প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছ; পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথি বাহির করিয়া মুদ্রিত করিবার ভার লইতেছ, হিন্দুর পুরাণগুলিকে যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতেছ। বেশ ভাল কাজই করিতেছ। কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এক একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি? হারানোর মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার স্ট্রীটের যে একতলা বাড়িতে বিভাগাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকুমার বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতি স্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিভাগাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাসা করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি কি বিভাগাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের লম্বন্ধে যে মাটি তিনি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মন্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে তো, না, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাথরবৎ লানবীধান হইয়াছে? সেই মাটি মাথো, মাটি মাথো। গ্রীকপুরাণের



অহরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান হইবে, মাটি মাখো, মাটি মাখো। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই, অথচ মনে বড় দম্ভ ছিল যে, তাঁহাকে চিনিতে আমার বাকি নাই। কিন্তু এখন যেন তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কোথাও অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেছি না। তাঁহাকে হারাইয়াই কি ভাল করিয়া পাইলাম? কলিকাতা পর্য্যটন করিয়া তাঁহার পুণাতন বাসস্থানগুলি দেখিয়া আসিবার সামর্থ্য আমার নাই। বিশ বৎসর পূর্বে সমস্ত কলিকাতাবাসী ছোট বড় লোক শশানঘাটে যে স্থানে তাঁহার চিতা সাজাইয়াছিল, আমি এক-একদিন প্রত্যুষে সেই তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া সেই পবিত্র চিতাভস্মের অন্বেষণ করি। হায়, তখন যদি কমণ্ডলু ভরিয়া সেই ভস্ম আনিতে পারিতাম। অনেক দিন তোমার মত অবহিতাচিত্ত শ্রোতা পাই নাই, তাই আজ আমার মুখে এত কথা ফুটিয়াছে। আমি বক্তা নহি, আমি বোধ করি এতাবৎ সংসারে কোন উপকারে আসি নাই; কিন্তু আজ যদি আমার এই কথাগুলি তোমার মনোমধ্যে একটুও চাক্ষু্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে ধন্য হইয়া যাইব। যদি কোনও বিজ্ঞান সন্ধ্যায় সেকালের ছাত্রা তোমার মনের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। পুণাতনকে শ্রদ্ধা করিও, মনে বল পাইবে, আনন্দ পাইবে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ইন্দ্রানন্তন বাক্সালার জাতীয় জাবনের ইতিহাসে যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমাদের স্পষ্টকার সামগ্রী, গৌরবের জিনিষ।

“বিজ্ঞানাগরের কথা বলিতেছিলাম, উজ্জল-মধুরে ওরূপ সংমিশ্রণ আর কুগ্রাপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ মহারথিগণের সহিত যখন তিনি একাকা শাস্ত্রসমূহ মনন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই যৌদ্ধবেশ আমার মনে পড়ে, আবার যখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী খিয়েটারের ট্রেজ বাঁধা হইল, সেখানে তিনি মাইকেল মধুকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহার সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়। বিজ্ঞানাগরের উন্মিস্কুল, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, বাতাবিস্কুল প্রবাহে একটি স্বচ্ছললিলা কলসনা শ্রোতস্বিনী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। নিকলস স্বাধিকল্প রামতনুর কথা স্মরণ করিও। কেমন করিয়া রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, রাজনারায়ণের সমসাময়িক রামতনু লাহিড়ী প্রথম ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যস্বার্থী দোষগুলি এড়াইয়া গিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিয়া দেখিও। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিও। কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা মনে পড়ে। তোমাদের সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে তাঁহার যে স্মরণ প্রতিষ্ঠিতখানি বন্ধিমবাবুর প্রতিষ্ঠতির পার্শ্বে বসাইয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার মনে বড় আশ্লাদ হয়। বিচিত্র বিলাস-ব্যসনের মধ্যে লালিত ও পারবর্ধিত হইয়াও তিনি যেরূপে আপনার মহত্ত্ব রাখিয়া মহীয়ান হইয়াছিলেন, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে ঘরটিতে কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ কয়েকজন বন্ধু লইয়া ‘বিজ্ঞানসাহিনী সভা’ গঠিত করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি মনে পড়ে। যে ঘরটিতে

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী অষ্টাদশশতাব্দী মহাভারত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই বইটি মনে পড়ে। যে প্রাক্কণে রামনারায়ণ পণ্ডিতের ‘বেণীসংহার নাটক’ অভিনীত হইয়াছিল, সেই প্রাক্কণে সেই রাত্রের কথা একটিও ভুলি নাই। যে দিন রেভারেণ্ড লং সাহেবের হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল, সে দিন কালাপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ সেই টাকা আদালতে জমা করিয়া দিলেন, সে কথা তোমরা জান কি ?

“আজ পুরাতনের মোহ আমাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের যে গোপন কক্ষ গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উল্কাটিত হয় নাই, কি জানি আজ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের দিগন্ত হইতে একটা দম্কা বাতাস আসিয়া তোমার সমক্ষে সেই অর্গলবদ্ধ কক্ষবার মুক্ত করিয়া দিল। আমার সমস্ত সঞ্চিত বেদনা আজ এই নিশীথের বায়ুস্তরে মিশাইয়া গেল। আমার এই অফুবাণ কথা কত শুনিবে ? ভাষায় কি আমি মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতোঁছ ? বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত কোকিলকে সাধোখন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘যে কথাটি বলি বলি মনে করি বলিতে পারি না, পাখী তুই সেই কথাটি বল্ দেখি রে !’ আমিও অনেক বকিলাম, কিন্তু আমি যেটি বলিতে চাহি, সে কথাটি কি গুছাইয়া বলিতে পারিলাম ?

শুধু, কথার উপরে কথা,

নক্ষত্র ব্যাধুলতা !

বৃষ্টিতে বুঝতে দিন চলে যায়,

বাধা থেকে যায় বাধা।

মমবেদন আপন আবেগে

স্বপ্ন হস্মে কেন ফোটে না ?

দীর্ঘ হৃদয় আপনি কেন ‘রে

বাশা হস্মে বেজে ওঠে না ?”

## এক

২৪শে আশ্বিন, ১৩১৭

তখনও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে নাই, সূর্যাস্তের বক্তিম আভা পশ্চিমাকাশের লঘু ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের তিতর দিয়া তখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল; অদূরে সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিতেছিল।

বীড়ন উত্তানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি সন্মুখে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “বোসো”। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম।

হু<sup>১</sup> একটি কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কখনও কোন বিষয়ে Controversy হইয়াছিল কি?” তিনি বলিলেন—“হাঁ, হইয়াছিল। এ কথা আজ কেন জিজ্ঞাসা করিলে বল দেখি?” আমি বলিলাম—“আমাদের রিপন কলেজের অধ্যাপকদিগের বিশ্রামাগারে আজ এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। আলোচনা করিতেছিলাম আমরা তিন জন—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি। জিতেনবাবু প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। একটু কারণ ছিল। সম্প্রতি ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি পুরাতন চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ৮রাজনারায়ণ বহুরূপে লেখা হইয়াছিল। একটি পত্রের একাংশে লেখা আছে,— ‘কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight and he can slight all things divine!’<sup>২</sup> আমরা কিন্তু আপনার এরূপ কোনও বাদানুবাদের বিষয় অবগত নহি; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, “শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার একবার Controversy হইয়াছিল বটে; সে আজ অনেক দিনের কথা। ‘ভারতী’ পত্রিকার পুরাতন ফাইল নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে আমার প্রবন্ধগুলি দেখিতে পাইবে। যতদূর স্মরণ হয় প্রত্যেক প্রবন্ধের নিয়ে আমার নাম দেওয়া আছে। তর্ক উত্থিরাছিল, কৌতের ধ্রুবদর্শন (Positivism) লইয়া। ‘সুপ্রভাতের’ যে সংখ্যায় উক্ত বাদানুবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবুর পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাখানি আমাকে দেখাইও। আমি তখন কলেজে অধ্যাপনা করিতাম না; ওকালতি করিতাম। রাজনারায়ণবাবু তখন কর্ম হইতে অবসর লইয়াছেন।

“সম্প্রতি জনু টুয়ার্ট মিলের সমস্ত চিঠিপত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

<sup>১</sup> “কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.” ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ‘কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য’।—সঃ

সেগুলি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অহুভব করিয়াছি। অনেকদিন পূর্বে যখন কৌতের চিঠিপত্রগুলি ফরাসী ভাষায় পড়িয়াছিলাম, তখন মনে একটা বড় আকাজ্ঞা হইত যে, ষ্টুয়ার্ট মিলের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তিনি কৌতের চিঠিগুলির উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করা যাইত। কিন্তু এই পত্রগুলির মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছু পাইলাম না। উক্ত দার্শনিক-দ্বয়ের সম্বন্ধ কেমন রহস্যময় ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যিনি কৌতের Synthetic Philosophy-র আলোচনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই, তিনিই আবার সেই প্রবন্ধেই কঠোর সমালোচক হইয়া কৌৎকে বিদ্রূপ করিয়াছেন! কৌতের শিষ্য কঙ্গদ্রীভ্ মিলকে একখানি পত্র লিখেন। তিনি জানিতে চাহেন, কেন ষ্টুয়ার্ট মিল কৌতের এমন কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিতেছেন। তত্বত্তরে মিল লিখেন—আমি কৌৎকে খুব শ্রদ্ধা করি; আমার ভয় হয় পাছে তাঁহার মন্দ ও ভ্রান্ত ভাবগুলি তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ভাল অংশটিকে বা নষ্ট করিয়া ফেলে; অথবা তিনি যে সুন্দর সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা মানবচক্ষুকে এমন করিয়া ধূশীয়া দিবে যে, লোকে তাঁহার ভ্রমগুলির প্রতি একবারও দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিবে না। সত্য-মিথ্যা সকলগুলিই তাহারো নির্বিশেষে গ্রহণ করিতে পারে।

“তোমরা জান, ঐ ঝগড়ার সূত্রপাত কি লইয়া। ষ্টুয়ার্ট মিল চাহেন Representative Government এবং Enfranchisement of Women; কৌৎ ঠিক বিরুদ্ধ মতের পরিপোষক—তাঁহার মতে শুধু ঠা. ফাঁকা অসার বস্তু। উভয়ে অনেক চিঠি লেখানিধি করিলেন; উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। কৌৎ হতাশ হইয়া বলিলেন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, মিল তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ধ্রুবদর্শন শাস্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা হইতে পারিবেন, এখন দেখিতেছেন, তাহা হইল না। কিন্তু যখন তাঁহার দর্শনশাস্ত্র কৌতের জীবিকার্কসনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার মাষ্টারি চাকরিটি গেল, তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইল না, তাঁহার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইল, তখন ষ্টুয়ার্ট মিল স্বতঃপ্ররোচিত হইয়া মোলসওয়ার্থ ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট্ এবং অগ্রান্ত বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কৌতের সাহায্যার্থ টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর তাঁহাকে অর্থসাহায্য করা হইলে পর কৌতের স্বদেশবাসীরা দরিদ্র দার্শনিককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

“কৌতের অর্থকষ্টজনিত দারিদ্র্যের জন্ত তিনি নিজে অনেকটা দায়ী। যখন তিনি তাঁহার পুস্তকের এক এক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক খণ্ডের মূখবন্ধে তিনি Polytechnic School-এর কর্তৃপক্ষীয় কোনও না কোনও ব্যক্তির তীব্র সমালোচনা করিতেন। একবার তাহা লইয়া তাঁহাকে আদালতে মোকদ্দমা করিতে হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের মধ্যে অ্যারাগো নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা, বেশী মাহিনার একটি পদ খালি হইলে কৌৎকে তাহা না দিয়া অল্প এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কৌৎ তাঁহার পুস্তকের মূখবন্ধে এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ

করেন। সেই প্রতিবাদ মুদ্রণকালে মুদ্রাকর প্রমাদ গণিল; সে দেখিল যে, একজন দয়িত্ব ইঙ্গুল মাষ্টার আরাগোর তায় একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির যে কড়া সমালোচনা করিতেছে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে মুদ্রাকরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ভয়ে ভয়ে সে প্রতিবাদের কথা আরাগোকে জ্ঞাপন করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা মুদ্রিত হইলে তিন মুদ্রাকরের উপর বিরক্ত হইবেন কি? আরাগো বলিলেন, ‘আমি বিব্রত হইব কেন? অঙ্কশাস্ত্রে যাহার কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই,—না সামান্য, না বিশিষ্ট, কেনও প্রকার ব্যুৎপত্তি নাই—এমন একটা লোককে ঐ পদে উন্নত না করিয়া যদে গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন একজনকে গণিতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি, তজ্জন্ত লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না। দর্শনকার মহাশয় আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তুমি স্বত্বেন্দ্রে মুদ্রিত করিতে পার।’ মুদ্রাকর ও প্রকাশক কৌৎকে না জানাইয়া তাঁহার পুস্তকের গোড়ায় আরাগোর চিঠিখানি সন্নিবেশিত করিয়া দিল। কৌৎ তাহা দেখিয়া তেলেবেগুনে জলিয়া গেলেন। তিনি মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়া আদালত হইতে খেদারং পাইলেন।

‘এই সব ঝগড়া বিবাদের জগ্গ জ্বার সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। জী প্রায়ই তাঁহাকে এই দম্বকলহ হইতে বিরত হইতে বালতেন। কাপ্তেনের সহিত কৌতের জ্বার পলায়ন-বাপারটির যাবার্থা সম্বন্ধে আমি সঠিক অবগত নহি, তবে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে কৌৎ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু ১৮৪৪ সালে চিরন্তন বিবাদ-কলহ উপলক্ষে জী-পূর্বে আপোষে পৃথক হইলেন। সেই অবধি জ্বার গ্রাসা-চ্ছাদনের জগ্গ তিনি নিজের আয় হইতে বাৎসরিক দুই হাজার ফ্রাঙ্ক তাঁহার স্বাকে দিতেন। তাঁহার যতই অর্থকষ্ট হউক, ঠিক নিয়মত এই দুই হাজার ফ্রাঙ্ক জ্বাকে বরাবর দিতেন।

‘এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটি বিয়াদ্টিচি (Beatrice) দেখা দিয়াছিল। যুবতীর নাম ক্লোটিল্ড (Clotilde)। তাঁহার স্বামী কোন গুরুতর অপরাধের জগ্গ যাবজ্জীবনস্থায়ী নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যুবতী বিশেষ গুণবতী ছিলেন, দার্শনিক কৌৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া বলিলেন, ‘এস আমরা বিবাহ করি। আমাদের উভয়ের সামান্যিক জীবনে যে দাক্ষণ tragedy হইয়া গিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পর এ বিবাহে কোনও দোষ আছে কিনা।’ ক্লোটিল্ড তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ এই বিবাহে সম্মত হইলেন না। অতি অল্পদিন পরেই ক্লোটিল্ড ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, কৌৎ তাঁহার Positive Politics বা ধ্রুবরাজনীতি নামক প্রকাণ্ড পুস্তকখানি ক্লোটিল্ডের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ক্লোটিল্ডের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার জীবন কেবল দর্শনশাস্ত্রমুষ্টি কাণ্ডেই পর্যাবসিত হইত। তিনি যে এক নূতন ধর্মের প্রচারক হইতে পারিয়াছেন তাহা শুধু এক বৎসর কাল ক্লোটিল্ডের সহিত আলাপ পরিচয় কথাবার্তার ফলে।

“বোধ হয় এ প্রসঙ্গে আমার একটি নিজের কথা বলিয়া লইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্লোটিল্ড-কোং-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া ক্লোটিল্ডের বিরচিত Lucie নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দৃষ্টে আমি একটি গল্প রচনা করিয়াছিলাম। আমার প্রথম আত্মীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আমাকে বলিয়াছিলেন—‘আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি ইহা মুদ্রিত করিয়া-প্রকাশ পব।’ পুস্তকের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইলে আমার মতের পারবর্তন হইল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার নাম দিয়া এই গল্প প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে। তখন আমার জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমার স্বাক্ষরিত গল্পটি প্রকাশিত হইলে লোকে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিবে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া ছাপাখানায় উপস্থিত হইলাম, সমস্ত টাইপ-গুলি ও লোটেপানোট কাঁচিয়া দিয়া গল্পটি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। পরে বিহারীর নিকট আমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। আর কখনও একপে আমার লেখা নষ্ট হয় নাই। ফরাসী ভাষা হইত ‘পল-বল্জিনয়া’ বাঙ্গালী ভাষায় অন্তবাদ করলাম। বোনাপার্টের জীবন-চরিত অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় পোড়ার যুদ্ধ পর্যন্ত। কবিতাও লিখিতাম।

“ষ্টুয়ার্ট মিল ও মিসেস্ টেলরের প্রণয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয় জানা আছে, এই যে মিলের চঠিপত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী টেলরও মিলের ত্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নাস্তিক-হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, পূজারিণীর ত্রায় মিলের চরণে ঢালিয়া দিয়া-ছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন, মাত্র যে কতদূর perfection-এ পৌঁছিতে পারে তাহা জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়ের ভাব আমার নিকট গোপন করেন নাই। সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতেন। স্বামী বলিলেন,—‘তাই ত, ইহার একটা বহান করিতে পারা যায় না কি? ব্যাপারটা ত ভাল নয়! একটা কাজ করা যাক,—তুমি এখন প্যারিসে গিয়া থাক না কেন? দিনকতক ছাড়াছাড়া হইলে এ নেশা কাটিয়া যাইতে পারে।’ অনেক বিবেচনা করিয়া প্যারিসে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীমতী টেলর তাঁহার স্বামীকে লিখিলেন—‘আমার পক্ষে এখানে থাকা নিরর্থক, ইহাতে কোনও ফল দর্শিবে না, অল্পমতি কর ত ফিরিয়া যাই।’ তাহাই হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সামাজিক হিসাবে এই অবৈধ সম্বন্ধ লইয়া কোনও scandal, কোনও লোকাপবাদ হইবার কোনও কথাই ছিল না। তবে মিলের পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, পরজীবী প্রতি এই আসক্তি অতীব গর্হিত।”

পণ্ডিত মহাশয় একটু খামিলেন। আমি বলিলাম, “এ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ platonic ছিল বোধ হয়?”

“হাঁ, তাহাই বটে; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এ সম্বন্ধে পাশবতা ছিল কিনা সন্দেহ;

intellectual fascination অত্যন্ত প্রবল ছিল। ফ্লোটিন্‌ড ও কৌৎ ঠিক ঐ রকম ভাবেই কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মিষ্টার টেলর উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার জাকে দান করিয়া যান। বিধবা হইবার প্রায় আড়াই বৎসর পরে মিসেস্ টেলর মিল্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিবাহের পর বেশি দিন মিসেস্ টেলর জীবিতা ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা হেলেন টেলর মিলের মৃত্যু পর্যন্ত কল্লার গ্রামে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। হেলেন সেই জন্ত আজীবন কুমারীত্বত পালন করিলেন। অ্যাভিনিয়নের (Avignon) নিকটবর্তী যে স্থানে মিসেস্ টেলরের সমাধি হইয়াছিল, মিল্ তাহারই অতি নিকটে একটি বাগানবাডিতে শেব জীবন অতি-বাহিত করিলেন। যেখানে বসিয়া তিনি চিঠিপত্র লেখা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেন ঠিক সেস্থান হইতে তাঁহার স্ত্রীর গোর দেখা যাইত। হেলেনও বিদূষী ছিলেন, মিলের অনেক চিঠিপত্র তিনি সিখিয়া দিতেন, মিল কেবল দেখিয়া দিতেন এবং স্বহস্তে নকল করিয়া স্বাক্ষর করিতেন।

“এক একবার আমার সন্দেহ হয় যে, পিতাপুত্রের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক জেমস্ মিলের না জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের? কেমন করিয়া যে তিনি তিন বৎসরের শিশুকে গ্রীক শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। তুমি যে অক্সফোর্ডে গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন polite education-এর প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিতেছ, তাহার সহিত জেমস্ মিলের এ শিশু পুত্রের অধ্যাপনার কোনও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতেছি না। বিশেষতঃ জেমস্ মিল নিজে একজন মুচির ছেলে। সেই মুচি কিন্তু নিজের ছেলেটিকে নিজের ব্যবসায় হইতে দূরে রাখিয়া তত্ত্বলোকের ছেলের মত তাহার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও জেমস্‌কে অনেক দিন অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বেছামের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পয়সা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তবুও তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। পরে যখন তাঁহার ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি হইল, সেই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন বুঝা গেল।

“এত কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের দুইটি বড় কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন;—ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা শেষ করিলেন। দেখ, আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল, আমার বিশ্বাস ছিল যে জেমস্ মিল ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করার পর তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র দেখিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। এখন আমার সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে, এখন দেখিতেছি যে, ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাঁহার ইতিহাস-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ছেলেটিকে লইয়া যখন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, তখন মুখে মুখে তাহাকে অর্থশাস্ত্র (Economics) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। বাড়িতে কিরিয়া আসিলে বালক পিতার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিতাকে দেখাইত; মনের মত না হইলে

বালকের উপর আবার লিখিবার আদেশ হইত। এমনই করিয়া তিনি পুত্রকে মাছুষ করিয়া তুলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জেমস্ মিলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্রকে ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ পর্য্যন্ত মিল্ চাকরি করিয়া বাৎসরিক পনের শত পাউণ্ড পেঙ্গন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

“পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য যখন মিলকে অনুরোধ করা হয়, তিনি বলিলেন, আমি candidate হইতে রাজি আছি, কিন্তু এক পরমাণু খরচ করিব না। কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। একবার তিনি মেম্বর হইয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারের সময় লোকে সন্দেহ করিল যে, তিনি ব্র্যাডলকে পার্লামেন্টে প্রবেশ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। মিল্ কিন্তু নিজে বলিতেন যে, ব্র্যাডল ঘটিত ব্যাপারে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের Organisation ভাল ছিল না। তাই তিনি হটিয়া গেলেন।

“কার্লাইলের সম্বন্ধে মিলের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তবুও তিনি লিখিয়াছেন যে মানবের মনোবিকাশের খানিক দূর পর্য্যন্ত কার্লাইলকে পাঠ করিলে উপকার হইতে পারে, একটু উপরে উঠিলে আর চলিবে না। তবে তখনও কার্লাইলের রচনা পাঠে অনেক আনন্দ অনুভব করা যায়। তিনি কার্লাইলের হস্তলিখিত পুঁথি French Revolution-খানি হারাইয়া ফেলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অন্তঃপন্থ হইয়া কার্লাইলকে পুনশ্চ ঐ গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কার্লাইলের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে জোর করিয়া টাকা দিলেন। কার্লাইল তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

“ম্যাড্রষ্টোন সম্বন্ধে মিল্ একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি তিনি যথার্থই বড় লোক হইতেন তাহা হইলে কখনই Franco-Prussian যুদ্ধ হইতে দিতেন না। তিনি যদি বলিতেন যে, ফরাগি ও প্রুসিয়ার মধ্যে যে প্রথমে লেণ্ড-চালনা পূর্বক বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে, তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সমস্ত নৌবাহিনীর অভিযান হইবে, তাহা হইলে কি ঐ যুদ্ধ বাধিতে পারিত ?

“দেখ, কার্লাইলের স্ত্রীর সহিত যে মতের অনৈক্য ও বিরোধের কথা ফ্রুড প্রচার করিয়াছেন, সেটা না কি ঠিক নয়। সম্প্রতীর মধ্যে না কি প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। মিলের পক্ষে কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

“তাঁহার কয়েকখানা পত্রে হার্বার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক মত লইয়া অনেক তীব্র সমালোচনা আছে, পাঠ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। স্পেন্সরের Relativity ও Conservation of Energy—এ দুটীর কোনটিই তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার Universal Postulate মিলের একেবারেই অসহ্য।

“বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদপ্রার্থী Dr Martineau তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, ‘আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আপনার পক্ষ সমর্থন করিলে আর এক জনকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি অনেকটা আশার



দার্শনিক মতের পরিপোষক। আমার মতাবলম্বী লোক অল্প; আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।”

বীভন্ উত্তানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া যিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পূজাপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে লক্ষ্য করি নাই যে, একে একে প্রায় সকল ভক্তলোকই উদ্ভ্রাণ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান পণ্ডিত মহাশয়কে সেলাম করিয়া বলিল, “বাবুজ, বহুৎ রাৎ হয়।”

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। একটু দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন— “যে পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সে পত্রিকাখানা আমাদের একবার দেখাইও। আমার মনে হয়, ভগবানকে লইয়া তর্ক হইয়াছিল; আমি বোধ হয় বলিয়াছিলাম, যিনি সর্বশক্তিমান (omnipotent) ও সর্বজ্ঞ (omniscient) তাহাকে all-merciful বলা কিছুতেই যায় না। এই কথাতেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রবাবু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমার ঐকমত্য দেখিতে পাইবে। মিল্ বলিতেন, ঐ তিনটি attributes একত্র করিয়া এক পরমপুরুষ বসনা করা যাইতে পারে না; জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা ভাবের দিকে ঝোঁক—*a tendency towards the good*—কল্পনা করা যাইতে পারে; তেমনি একটা মন্দের দিকে ঝোঁকও কি কল্পনা করা যাইতে পারে না? কোং বলেন যে, ভগবানকে একেবারে বাদ দিতে হইবে; যাহা বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় তাহাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া জ্ঞানের পথ রোধ করিও না। অবশ্যই *theology* জগতে কতকটা উপকার সাধন করিয়াছে,—সমাজের কল্যাণকার্য্যে অনেকটা পুলিশ প্রহরার মত কাজ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু *theology*-র দিন চলিয়া গিয়াছে।”

গৃহে ফিরিবার সময় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রের একটি ছত্র আমার মনে হইতে লাগিল—“*he can write, and he can fight, and he can slight all things divine!*”

## দুই

৪ঠা কান্তিক, ১৩১৭

আজ পূজাপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম, “রামেন্দ্রবাবু বিশেষ অল্পরোধে যে, আমি আপনার পুরাতন কাহিনী শুনিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি। আপনি স্বয়ং লিখিতে পারিবেন না; আপনার নিকট শুনিয়া আমি আপনার কথাগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাকে শুনাইব, পরে আপনার কথামত আবশ্যক পরিবর্তন করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিব। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় Men I have seen প্রবন্ধে বিত্তাঙ্গর মহাশয় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতেছেন, আপনার বিত্তাঙ্গর মহাশয়ের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা ছিল, আমরা মনে করি, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিতে পারিবেন যাহা অল্প কেহ পারিবেন না। ৬জুলাই দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি; আজ সেইগুলি ভাল করিয়া শুনিয়া কাগজে প্রকাশ করিয়া আরও দশ জনকে শুনাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “আমি ঠিক ধারাবাহিক একটানা বলিতে পারিব কি? কথাবর্তার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে দু’টো কথা বলিয়া যাই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিত্তাঙ্গর মহাশয়ের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কিরূপে হয়?”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “তখন আমার বয়স আনু্য ৬।৭ বৎসর, বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার<sup>১</sup> সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিত্তাঙ্গর মহাশয় আমাকে বলিলেন, ‘আর তোকে ইহুলে ভর্তি করে দি।’ তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাজেই ইহুলে ভর্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।

“তখনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই; একটা Council of Education ছিল। সেই কাউন্সিলের অধীনতায় সংস্কৃত কলেজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন,— তাঁহার নাম রসময় দত্ত। রসময় বাবু Small Cause Court-এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও বস্তুতঃ অনেক সব কাগজে-পত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিত্তাঙ্গর মহাশয়<sup>২</sup>, তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময় বাবুর মাসিক বেতন ছিল একশত টাকা; বিত্তাঙ্গর মহাশয় পাইন্ডেন পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

“ইহুলে ভর্তি হইয়াই আমার ‘মুদ্রবোধ’ পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর

১ রায়কমল ভট্টাচার্য্য।—সং

২ ১৮৪৬, ৬ই এপ্রিল হইতে ১৮৪৭, ১৬ই জুলাই পর্যন্ত।—সং

৬ প্রাণকৃষ্ণ বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ পণ্ডিতের শিষ্য। তৃতীয় বৎসর ৬ গোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৬ দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের কাছে ‘মুদ্রবোধ’ অধ্যয়ন করিলাম। বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ‘সোমপ্রকাশ’ কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই চারি বৎসরে ‘মুদ্রবোধ’ পড়া শেষ হইল। ইন্সুলে যাইবার সময় ও ইন্সুল হইতে আসিবার সময় পথে দাঁড়ার কাছে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতাম।

“ইতিমধ্যে বিজ্ঞানাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন। রসময় বাবু সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেক দিন পরে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়াছিলাম। রসময়বাবু যখন শুনিলেন যে, তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন, তখন না কি বলিয়াছিলেন—‘ঈশ্বর ত চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খাব কি করে?’ কথাটা যখন বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন—‘বোলো, মুদির দোকান কোরে খাবে!’

“সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জগৎ একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হওয়ায় বিজ্ঞানাগর মহাশয় সেই চাকরি পাইলেন। মাসিক বেতন আশী টাকা। এই সময়ে তিনি ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ বহিখানা লিখেন। এই বহি তাঁহার প্রথম রচনা।

“কিছুদিনের মধ্যে বাটন (J. Drinkwater Bethune) সাহেবের সঙ্গে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের পরিচয় হইল। বাটন সাহেব তখন কাউন্সিল অফ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিচালনের নূতন ব্যবস্থা করিলেন; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরিবর্তে একজন প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করাই স্থির হইল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হইলেন<sup>১</sup>; মাসিক বেতন তিনশত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও পাঁচ ছয় বৎসর আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলাম।

“এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। মোটামুটি এই কয়টা কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে :—

১। ব্রাহ্মণ ও বৈজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন, বর্ণনির্বিশেষে হিন্দু ছেলেমাত্রই কলেজে পাড়িতে পারিবে।

২। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।

৩। ব্যাকরণ পড়ানর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল; ‘মুদ্রবোধ’ উঠাইয়া দিয়া ‘উপক্রমণিকা’ পড়ান আরম্ভ হইল।

৪। অধিক ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এত দিন ছাত্রেরা ইংরাজি মাষ্টারের কাছে ইচ্ছামত অধ্যয়ন করিত। দুইজন ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন; ছেলের

ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের কাছে অধ্যয়ন করিত। এখন হইতে ইংরাজি পড়া কয়েক ক্লাস উপর হইতে Compulsory হইল।

৫। সংস্কৃত গণিত—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল। ইংরাজিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়া আরম্ভ হইল। অঙ্কের অধ্যাপক হইলেন ত্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।

“এই সকল পরিবর্তন যে বিভাগাগর মহাশয় স্বয়ং করিলেন, ইহাতে তাঁহার উপর ওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহা আমরা বেশ বুঝতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্তন হইতে পারিত না।

“নূতন নিয়মে পড়ান হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch-এর কলে, গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের ভাঙ্গাগড়া হইল। শিক্ষাবিভাগের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অনেক বাঙ্গালা ইন্সকুল স্থাপিত হইল, ইন্সকুলের ইনস্পেক্টরও নিযুক্ত হইলেন। বিভাগাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপাল রহিলেন এবং ইন্সকুলের পরিদর্শক হইলেন।<sup>১</sup> এখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল পাঁচ শত টাকা। সেই সময় সংস্কৃত কলেজে একজন সহকারী প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন।

“এই সময়ে ধারে ধারে বাঙ্গালার মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্নবাবু বাঙ্গালার পাটিগণিত লিখিলেন। আমার দাদা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র পড়া ছিল না, তাই তাঁহার পাটিগণিতের সমস্ত terminology (যথা—বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, করণী, ত্রৈাশিক, ভগ্নাংশ, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ইত্যাদি) আমার দাদা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাটিগণিতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্যের নাম এই লগ্ন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালার ভূগোল লিখিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই terminology প্রচলিত। সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন বিভাগাগর মহাশয়,—

(১) জীবন চরিত—Chamber's Biography-র অনুবাদ ;

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—Marshman-এর অনুবাদ ;

(৩) মহাভারতের উপক্রমণিকা ;

(৪) বোধোদয় ;

(৫) ব্যাকরণ কৌমুদী ;

(৬) স্বভূপাঠ ;

(৭) Expurgated রঘু, কুমার, ভারবী, মাঘ।

“১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই আমি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যালয়গর মহাশয় শুনিলেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইতেছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—‘তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা’চ্ছ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক’রে দেবো।’ আমার কেমন দুর্ভিক্ষ, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্তি হইলাম। এই রকম একগু’য়েপনা আমার বরাবর রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে এমন অনেকবার আমি শুধু যে তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছি তাহাই নহে, তাঁহার উপর অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া তাঁহাকে অনেক কড়া কথা লিখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার ‘বিচিত্রবীৰ্য্য’-এর প্রশংসা করিয়াছিলেন; তাই আমি বিদ্যালয়গর মহাশয়কে আমার বইখানি পাড়িতে অনুরোধ করি। মাস তিনেক পরে বইখানি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—‘ওরে আমার এমন সময় হচ্ছে না যে, তাঁর বইখানি পড়ি।’ আমার বড় রাগ হইল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া একেবারে Byron-এর English Bards and Scotch Reviewers-এর মত চারি পাঁচ শত লাইন পয়ার লিখিয়া ফেলিলাম। রাগ হইল বিদ্যালয়গর মহাশয়ের উপর, কিন্তু আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেককে জড়াইয়া ফেলিলাম। একটু একটু এখনও মনে আছে। ষোলো-সতের বৎসর বয়সে ‘দুর্য্যাকাজ্ঞের বৃথা ভ্রমণ’<sup>১</sup> নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম; সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন করিলাম।

যৌবনের রক্তজ্বরে হইয়া উদ্ভাম,  
লিখেছিলাম গল্প এক “দুর্য্যাকাজ্ঞ” নাম।  
পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি,  
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি,  
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ,  
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।  
এইরূপে সবে তার নিন্দা একটি করে,  
পয়সা দিয়া কিনিল না কেহই সাদরে।  
তা’ বোলে কি ছেড়ে দিব লেখা একেবারে,  
যখন বোকার দল ঘেরিল সংসারে ?  
ক অক্ষর গোমাংস যাহাদের পেটে,  
বানান করিতে যারা মরে দম ফেটে,  
যা’দিকে দেখিলে মোরে দংশে যেন অছি,  
এরূপ লোকের সব বিকাইছে বহি !

“কবিতার মধ্যে বাস্তবিক কথার আসিয়া পড়িল,—

নরমুণ্ড জমা করি যে করিত ভূপ,  
যে ছিল জঙ্গলা পথে ডাকাইত ভূপ,

\* \* \*

সে বাস্তবিক বহুকাল করিয়া কঠোর,  
সামান্যে করে মোহ-রজনীর ভোর ।

“কালিদাসের কথাও পাড়িলাম,—

যখন যে ডালে বসে কাটে সেই ডাল  
কালিদাস তপোবলে হোলো স্বকপাল ।

“সকলেরই কপাল খুলিল, আমারই কেবল কপাল খুলিল না! ছাম্লেটের  
কথাগুলি আমার মস্তিককে যেন নাড়াচাড়া দিতে লাগিল । আমিও আবৃত্তি করিয়া  
লইলাম,—

স্বথদুঃখবলিত এই যে জীবন,  
যাহারে সকলে কহে অমূল্য রতন,  
অশেষ যন্ত্রণাজ্বাল যাহে ঘেরিয়াছে,  
দণ্ডধারী যম যার ধাইতেছে পাছে,  
কষ্টলিঙ্কুতরঙ্গে যা হয় বিলোড়ন,  
দৈব যত্নপরি করে বিশিষ্ট বর্ষণ,  
লোকে কেন এরে ইচ্ছা করি নাহি ছাড়ে,  
কেন নাহি ফেলে দেয় মরণের গাড়ে ?  
মরণ নিদ্রায় স্বেদে হইয়া শয়ান  
বিস্মৃতিবুহরে লীন হইবেক প্রাণ ।  
সে নিদ্রার ভিতরেতে আছে কি স্বপন ?  
আর কি চেতনা হয় প্রাণের তখন ?  
এই ভাবি লোকে নাহি হয় আত্মঘাতী,  
এই ভাবি বর্জমান লয় মাথা পাতি ।  
নতুবা কে বল দেখি ঠাচিতে চাহিত,  
জীবন দুর্বল তার বল কে বহিত,—  
যখন খুলিয়া এক নিশিত কপাল  
সমুদয় দুঃখবহি হইতে নির্কাল ।

“পরদর্শনেই বায়রণকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—

তাদৃশ ক্ষমতাবল যদিও না ধরি,  
তথাপি, রাজেন্দ্র, তুমি মম যোগ্য অরি ।

কখনও মাছেয়\* মত মারহ চৌকর  
 দু' এক খ'নি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ।  
 গাধারে পিটিলে কতু হয় নাকি ঘোড়া ?  
 লুই কি ধোয়ালে হয় গঙ্গাজলে জোড়া ?  
 হাজার সাধনা কিম্বা করিলে প্রয়াস  
 মূর্খ কতু নাহি পায় নিখিয়া সাবাস ॥

“ঐ পয়রাটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আরও কড়া কথ শুনাইয়া দিয়াছিলাম ।  
 ‘অবোধবন্ধু’ পত্রিকায় কিন্তু প্রকাশ করি নাই ।

“আমি সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার বৎসর খানেক পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি  
 ত্যাগ করিলেন ।<sup>১</sup> শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর গার্ডন ইংল সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও  
 হইল না । কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন ।

“এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম । পরে ১৮৫২-৬০  
 খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ দিলাম । ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্ভকনে আত্ম-  
 হত্যা করেন ।<sup>২</sup> স্মরণ্য আমাকে চাকরি করিতে হইল । ইন্সুলর ডেপুটী ইন্স্পেক্টর  
 হইলাম । ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন । তাঁহার জীও বিদ্রমী  
 ছিলেন । ফরাসী ভাষায় লেখা বহি আমি তাঁহাকে পাড়িয়া শুনাইয়াছিলাম । তিনি  
 আমার উচ্চারণের বড় প্রশংসা করিতেন । কিন্তু তাঁহাদের কাছে কখনই মাথ হেঁট  
 করিতাম না । সেটা যে চাকরির পক্ষে ভাল, তাহা বলিতেছি ন’ । অনেক সময়  
 ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম । এই যে ভাব, এটা আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত  
 নিবিড় ভাবে ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হইয়াছিল । এখন অনেক বয়স  
 হইয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে তৎকালে আমার যে এই প্রকার বৃত্তি ছিল, তাহা  
 কেবল মূর্খতা মূলক এবং অনভিজ্ঞতাজনিত । এখন আমি ভাবিয়া লজ্জিত হই যে, সেই  
 মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমার হিতৈষী অনেক ব্যক্তির প্রাতি যে প্রকার কৃতজ্ঞতা-  
 প্রদর্শন করা উচিত ছিল তাহা আমার করা হয় নাই । ইংরাজিতে যে একটা কথা  
 আছে Might have been আমার তাত্‌কালিক পূর্বোক্ত আচরণ সেই কথারই একটি  
 উদাহরণস্বরূপ । উড্রো সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন,—‘এস, আমার গাড়াতে  
 এস । তোমার বাড়ি অনেক দূর, তোমাকে নামিয়ে দিবে আমি যাব ।’ আমি  
 বলিলাম,—‘No, thank you, I shall walk home.’ তিনি আমাকে তাঁহার নিজের  
 খরচে বিলেত পাঠাইবার মতলব করিয়াছিলেন । তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি সিন্ডিক

\* বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক পত্রিকাতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম  
 Roach & Dace বিলাতে দুই প্রকার মাছ ।

১ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে—সং

২ ‘প্রকৃতপক্ষে রাবকরণ ভট্টাচার্য ১১ই জুলাই আত্মহত্যা করেন ।’ ডঃ ব্রজেননাথ  
 বন্দ্যোপাধ্যায়—সং

সার্বিক পরীক্ষা পাশ করিয়া আসি। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ হিসাব করিয়া দেখা গেল, তখন সিভিল সার্বিক পরীক্ষা দেওয়ার বয়সের যে নিয়ম ছিল, আমার পরীক্ষা দিবার সময় তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

“১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের Junior Professor of Vernacular পদে নিযুক্ত হইলাম। ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিভাগাগর মহাশয় ছোটলটি Sir Cecil Beadon-কে বলিয়া আমাকে Senior Professor পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন, আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে Junior Professor করাইয়া দিলেন। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কান্দীদাস ও রুস্তিলাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অগ্রগত পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ষড়দর্শন’, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিন্তাতত্ত্বজিগী’, ‘মেঘনাদবধ’ প্রভৃতি ধরাইলাম।

“কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিচেল সাহেব হিন্দুদর্শনের উপর স্বতন্ত্র দুইটি Prize Essay লিখিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্দর্ভের নাম Dialogues on Hindu Philosophy. মিচেল সাহেবই প্রাইজ পাইলেন। কৃষ্ণমোহন নিজের সেই dialogue-গুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়া নানা খণ্ডে ষড়দর্শন সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সন্দর্ভ, চিন্তাতত্ত্বজিগী, মেঘনাদবধ, বেকনের সন্দর্ভ ও লালমোহনের অলঙ্কারনিগম আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করিয়াছিলাম। তখন পাঠ্যানির্বাচন সমিতি (Text-book Committee) ছিল না।

“হেমবাবুকে জনসাধারণের কাছে বোধ হয় আমিই পরিচিত করি। হাওড়ার হিতকারী পত্রিকায় আমি ‘চিন্তাতত্ত্বজিগী’র সমালোচনা করিয়া তাহার ভালমন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম। Byron-এর Don Juan হইতে যে অংশ তিনি ছাঁকা তর্জমা করিয়াছেন, অনুবাদ হিসাবে তাহা মন্দ হয় নাই। আমার দাদার ‘বেকনের সন্দর্ভ’ও কলেজে পড়ান হইত। রাসবিহারী (Dr Ghosh) শুধু এই বইখান পড়িয়া বি. এ. পাশ হইয়াছিলেন। অনেক দিন পরে একদিন রাসবিহারী আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, ‘আমি বাংলা কিছুই জানিনা, অথচ বাংলার paper-এ আমি ফাঁকি দিয়া আপনার নিকট হইতে full number লইয়াছি।’ আমি কহিলাম—‘এখন তুমি ও কথা বলিতেছ, কিন্তু তখন পরীক্ষা পাশ হ’বার গরজে বেকনের সন্দর্ভখানি খুব ভালরূপই আয়ত্ত করিয়াছিলে তাই full number পাইয়াছ। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে যদি কোন বিষয়ে মন দিয়া লাগে তাহা হইলে কি তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে?’

“শুধু বাঙ্গালা পড়াইয়া আমার ভূষ্টি হইত না। কাউয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটু একটু সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল একেবারেই ‘কাদম্বরী’ আরম্ভ করি। সাহেব বলিলেন, ‘ওটা too ambitious’।



কাজেই ‘খড়পাঠ’ তৃতীয় ভাগ লইয়া সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ হইল। ক্রমে ‘হুমার’, ‘বৌসংহার’ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত হইল।

‘বাক্সালা পড়ুয়ার শেষ দলের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারী ; সংস্কৃত পড়ুয়ার প্রথম দলের মধ্যে ছিলেন সারদাচরণ মিত্র।

‘রাসবিহারীর এক বৎসর পূর্বে গুরুদাস পড়িয়াছিলেন। মেঘনাদবধ পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। গুরুদাস বিশেষ যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইলে আমি গ্রন্থের কোন স্থান কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করাইয়া দেন। আমি অবশ্য সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি ; কিন্তু অত বড় এক ব্যক্তি তাঁহার বাল্যকালে,—একপ্রকার কথ শিখিবার সময়ে বলিলেই হয়, আমার নিকট কখন কি শুনিয়া যে মনে রাখিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমার অবশ্যই বিশেষ প্রীতিলাভ হয়।

‘সারদা খুব ভাল সংস্কৃত শিখিয়াছিল ; ৬তারানাথ তর্কবাচস্পতির ‘আত্ববোধ ব্যাকরণ’ একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেই প্রায় পলাইত ; সারদার পড়ার আগ্রহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম,—যেমন ইংরাজী সাহিত্যে, তেমনই সংস্কৃতে।

‘আমার ছাত্রদিগের আমি পরীক্ষক হই, এটা ভাল নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি স্বেচ্ছায় পরীক্ষক হইলাম না। সেইবার হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ত্রায়বর্ষ পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমার ছাত্রেরা খুব উচ্চহান অধিকার করিত ; সারদা সকলের অপেক্ষা ভাল ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা পারিয়া উঠিত না।

‘কেহ কেহ মনে করেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদত্যাগ করিয়াছিলাম কারণ তৎকালে Principal Sutcliffe সাহেবের সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও হয় নাই। লোকের এই ধারণাটি নিতান্ত অমূলক। আমি মুক্তকণ্ঠে অগ্নিবদনে বলিতে পারি যে, যে দশ বৎসর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি করিয়াছিলাম বরাবরই সাহেব আমাকে যথেষ্ট অহুগ্রহ করিয়াছিলেন ; একদিনের তরেও কখনও কথান্তর হয় নাই। যদিও আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করি নাই, তথাপি তিনি জানিতেন আমি তাঁহার ছাত্রদিগের সমসাময়িক ও সমকক্ষ, এবং চিরকালই আমার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেন। যখন আমি পদত্যাগ করি, তাহার পূর্বেই আমি সে বিষয়ের অগ্রসংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলাম ; কিন্তু ইতিমধ্যে আমার পরিবারে এক ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল। একথা শুনিয়াও সাহেব লোক পাঠাইলেন ; পুনঃ পুনঃ আমাকে এরূপ অতিপ্রায় জানাইয়াছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে আমি আবার আসিয়া চাকরি রক্ষা করি। কিন্তু আমি আর তাহা করিলাম না।”

## ভিন্ন

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আজ প্রথমেই বিভাঙ্গাগরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলাম, “দেখুন, তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে সমস্তই তাঁহার দৃষ্ণের উদ্বারতা দেখাইবার জন্ত। বিভাঙ্গাগর ত দ্বয়ার সাগর বটেই; কিন্তু তাঁহার intellect-এর দিক হইতে তিনি আপনার নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, আজ সেই কথা আপনি অন্বেষণ করিয়া বলুন। তাঁহার সাধারণ কথাবার্তা কিরূপ ছিল?”

তিনি বলিলেন—“কথাবার্তা সম্বন্ধে বিভাঙ্গাগরের সঙ্গে ভাষ্ণার জন্শনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ভ: জনলন্ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্গমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্তার একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিভাঙ্গাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তার সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্জলিলে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—‘ফাপাতুড়ো খাওয়া’ (to be confounded), ‘দহরম মহরম’, ‘বনিবনাও’, ‘বিধষুটে’, ‘বাহবা লওয়া’—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই ঝাইতেন না। ‘সাতার বনবাস’ প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণত: ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিভাঙ্গাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিভাঙ্গাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি এই বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। ‘মহাসমারোহে’ এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে তিনিও সেই অর্থে সর্কদাই ব্যবহার করিতেন; অথচ সংস্কৃত ভাষার কুত্রাপি সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না; উহা একেবারে ভুল।

“একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি ‘ব্রহ্মযোগ্যতা।’ এই শব্দটি শাস্ত্র-শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিতোষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—*Fitness per se*। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই:—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় দায়বান আলিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি ছিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন ‘প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমরা এক দেশের লোক, এক জাত, এই গাঁয়ের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা করলেই পারতেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত ঘাওয়া

উচিত মনে করি ; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই ।”—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই ।

“আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না । একদিন এক জন হিন্দুস্তানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিভাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন । আমি কাছে বসিয়া ছিলাম । আগন্তকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট । বিভাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—‘এ দিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্ছে, তবুও হিন্দি বলা হবে না ।’ এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে নীলাধরের<sup>১</sup> বাড়িতে বিভাসাগর মহাশয়কে এই হিন্দুস্তানী পণ্ডিতটির কথা আমি শ্রবণ করাইয়া দিলে তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন ।

“তিনি বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লেখা অসম্ভব, যাহা লেখা যায় সবই গোঁজামিল । কিন্তু আমার মনে হয় যে ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিভাসাগরের রচনাই সর্বোৎকৃষ্ট ; তিনি ‘উত্তরচরিত’, ‘শকুন্তলা’ ও ‘ঋজুপাঠ’ তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন । তাহা অতি সুলভ, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের গায় বোধ হয় ।

“একদিন কালিদাস ও লক্ষণায়র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম । বিভাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন এ কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না । আমি হেম বাবুর ‘ভারতের কালিদাস জগতের তুমি’ এই কথা তাঁহাকে শ্রবণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, ‘হেম বাবুর এ কথা বলিবার অধিকার নাই । সে ত সংস্কৃত জানে না ।’ আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে হেমবাবুর অভিজ্ঞায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই উহাদের জাতগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে । কথাটা তাঁর মনে লাগিল । আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—‘বটেই ত, খেতে, বসতে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ ।’

“বিভাসাগরের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাক্যলা-সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজত্বের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না । তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । দেখ, আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎ-সংসারে তেমনই ভাষায় মধ্যেও একটা natural selection আছে ; নহিলে শ্রামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাপ্রসাদ, দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ, হরিনাথ শর্মা, ধীহার্য প্রত্যেকেই সাহিত্যের,—আমাদের যে নূতন বাক্যলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের,—এক একটি দিক্‌পালকপে

<sup>১</sup> কান্নীরের দেওয়ান ও বিচারপতি নীলাধর মুখোপাধ্যায় ।

গণ্য হইবার উপযুক্ত, তাঁহার কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন ; একা বিত্তাঙ্গের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল !

“শ্রামাচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; ল্যাটিন ও গ্রীক জানিতেন । পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিজ্ঞপ করিতেন ; সংস্কৃত ‘সাহিত্যদর্পণ’কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাব্যবসায়িনী ভূজঙ্গ : (the fancyman of eighteen courtézans of languages) । শ্রামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন । শ্রামাচরণ বাবু খাঁটি বিত্তবান বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন । এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিত্তাঙ্গের সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিত্তাঙ্গের সহিত যোগ দিলাম । শ্রামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারলেন না । ইহার পরে Hindu Law সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জগ্গ হাইকোর্টের জজরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন । কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জগ্গ হারা হইল ।

“কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী ‘তর্জম’ লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন । Encyclopaedia-তে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাশাপাশি ছাপা হইয়াছিল । ইংরাজি তাঁহার নিজের রচনা ছিল না । বামপৃষ্ঠে কোনও ইংরাজি গ্রন্থ, দক্ষিণ পৃষ্ঠে তাঁহার রচিত বাঙ্গালা অনুবাদ, এই প্রণালাতে ঐ পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছিল । বিত্তাঙ্গের কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না ; কেবল বলিতেন, ‘লোকটার রকম দেখছ ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে ।’

“বাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিত্তাঙ্গের বলিতেন, ‘ও লোকটা ইংরাজিতে এবজন ধনুর্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখিতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি ; যদি কিছু আমার জানা শুনা থাকে তা’ সংস্কৃতশাস্ত্রে । ইহাতে সাহেবেরা মনে ভাবেন—বাস্ রে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিত্তাকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিত্তে আছে !’ এইরূপ কোনও এক আসরে বিত্তাঙ্গের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, ‘তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্দোষও নেই ; তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য ; তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দিকে দেদীপমান ; কিন্তু তোমাদিগকে নির্দোষ এই জ্ঞান বলি যে, আমাদের দেশের অকর্ণণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ প্রশংসা করিয়া লইয়াছে ; আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই ।’ বাজেন্দ্রলালের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ কোথায় ভাসিয়া গেল !

“ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত । বিত্তাঙ্গের মহাশয় ভাবিতেন সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই

সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি স্থখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার স্থখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—‘অক্ষয় লিখতে টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।’ কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিভাগস্বরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু’জনের Style, ভাব, সিদ্ধিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

“মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনগ্রসরসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিভাগস্বরের ভাবাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চাও ছাড়িলেন। যিনি ‘বাসবদত্তা’র প্রণেতা তাঁহারই ‘শিশুশিক্ষা’ এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার ‘পাখী সব করে রব’ কবিতাটি কোন্ শিশু না স্মর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে? তিনি ‘সর্বসত্তাকরী’ নামী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

“রুক্ষণে মদনমোহন বীটন সাহেবের মেয়ে স্কুলে (Bethune College) নিজের মেয়েকে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে এই প্রথম ইংরাজী বিভাগে পাঠান হইল দেখিয়া সাহেবেরা অত্যন্ত খুসী হইলেন। মদনমোহন স্কুল ছাড়িয়া ‘জজের পণ্ডিত’ হইলেন, মাসিক বেতন দেড়শত টাকা। তখনকার এই ‘জজের পণ্ডিত’ একজন Law Officer, জজদিগকে Hindu Law ব্যাখ্যা করিয়া দিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। কিছুকাল পরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর তাঁহার অগ্রসর হইল না। সাহিত্যচর্চা হইতে তিনি তফাৎ হইয়া পড়িলেন।

“মদনমোহন প্রবাস হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিলে সংস্কৃত কলেজে বেড়াইতে আসিতেন। বহরমপুর হইতে আসিয়া একদিন তিনি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তখন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ক্লাসে পড়ি। তর্কবাগীশ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ও দেশের লোকজন কেমন? উষ্ট্র নোকের মতন বটে?’ মদনমোহন উত্তর করিলেন, ‘মহাশয়, সে কথা বলিবেন না; অধিকাংশ লোক এরূপ যে, লাঠা, লাম্পাটা, কাপটা, ব্যাতিরেকে পদবিজ্ঞাসাটীয়াই নাই।’ ফলতঃ সংস্কৃত স্বর্গীর্ষশব্দটা যেন মদনমোহনের তুণ্যগ্রে সর্বদা বিস্তমান ছিল। তিনি যেন সে বিষয়ে এক জন স্বভাববিশিষ্ট বাগ্মী ছিলেন।

“আমার মনে আছে, তিনি একবার সর্বসত্তাকরী পত্রিকাতে ‘অলাসান্তপেশুসীম্পর’ এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় বিভাগস্বরেরও শৈল্পী (আন্তিমার্গিক)

শব্দ=বুদ্ধি) শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। সর্বসম্ভবকরী পত্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই অদর্শন হইল। পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহনই আবার তাঁহার ‘বাসবদত্তা’ নামক পঞ্চগ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকটি নিঃসন্দেহ বিশ্ববলিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন।

“বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার ‘সোমপ্রকাশ’ বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার একুণ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।”

“এই সময়ে তারানাথর ‘কাদম্বরী’র এবং হরিনাথ শর্মা ‘মুদ্রারাক্ষস’-এর বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠান্য করিয়াছিলেন।”

## চার

১৫ কাস্তিক, ১৩১৭

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, “৮দ্বারকানাথ মিত্রের কথা আমার নিকট হইতে শুনিতে চাহ ; সে ত আর এক ঘণ্টার কৰ্ম নহে। এতাবৎ আমার যত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৮দ্বারকানাথ মিত্রের মত সমুজ্জ্বল দীক্ষা-সম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect, আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন ; বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হইলেন। অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতি না করিলে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায় না, এই নিয়ম না থাকিলে তিনি যে আরও পূর্বে জজ হইতেন না, এমন কথা বলা যায় না। গ্রে সাহেব তখন বাঙ্গালার ছোটলাট, সার বার্নস্ পাক্ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। যখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইবেন, তখন হঠাৎ একদিন লাট সাহেব দ্বারিবাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনার হাইকোর্টের জজ হইতে আপাত আছে কি?’ দ্বারিবাবু উত্তর করিলেন, ‘না।’ লাট সাহেব বলিলেন, ‘Did you apply for the post?’ উত্তর হইল, ‘No, I thought that these appointments did not go by application.’ কয়েক দিবস পরেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপাত হইলেন।

“তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়, আমার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ী। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগেন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। দ্বারিবাবু শুনিয়াছিলেন যে আমি কিছু কিছু কৌৎ পড়িতাম ; তাই আমার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় ; দ্বারিবাবু তৎকালে কৌতের পাকা শিষ্য হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৮৬৫ সালে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। ওকালতিতে তখন দ্বারিবাবুর খুব প্রতীপত্তি। রাইয়ৎদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে বিরাট মোকদ্দমা তিনি চালাইয়াছিলেন, সেটা The Great Rent Case নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রধান বিচারপতি পীক্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। দ্বারিবাবু দশ বৎসর ওকালতি করিলেন ; কিন্তু একদিনের জন্তও কার্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যহ রাজি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত মোকদ্দমার কার্য্য করিতেন, তাহার পরে কৌতের এক chapter না পড়িলে তিনি কিছুতেই ঘুমাতে পারিতেন না। বেলা আটটা নয়টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিতেন। বেড়ান কি অস্ত্র কোন রূপ ব্যায়াম তাঁহার ছিল না ; আদালতে যাওয়া আসা গাড়ীতেই হইত। তিনি পাশা খেলিতে খুব ভাল বসিতেন, দাবাও খুব ভাল খেলিতে পারিতেন, কিন্তু পাশাই খুব বেশী খেলিতেন।

“জজ হইয়া প্রথম প্রথম তিনি প্রধান বিচারপতির সহিত বসিতেন। তিনি

বলিতেন, ‘দেখুন, আমি চিফ্‌এর সঙ্গে বোসে অনেক শিখ্‌টি।’ সার বার্ণস্‌ও প্রত্যহ রাত্রি দুইটা পর্যন্ত আইন অধ্যয়ন করিতেন। দ্বারিবাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। যে দিন একটা ইংরাজী পত্রে জনৈক ষেতাঙ্গ দ্বারিবাবুর তথ্য হাইকোর্টের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া একথানা চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেই রাত্রিতে সার বার্ণস্‌ দ্বারিবাবুকে ডাকাইয়া সেই অপরাধীর নামে এক পরোয়ানা জারি করিলেন। সাহেবকে ধরিয়া আনা হইলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

‘সার বার্ণস্‌’ কার্য্য হইতে অবসর লইলে একবার হাইকোর্টের অধ্যাক্ষ বিচারপতিদিগের সহিত দ্বারিবাবুর মনোবাদ হয়। তিনি আমায় বলিতেন, দেখুন, Resignation (পদত্যাগপত্র) আমার পকেটে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছে দোবো।’ আদালতের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিচারপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বাবস্থা করিয়া থাকেন। একবার তর্কস্থলে সার লুইস্‌ জ্যাক্সন ‘But my dear fellow’ বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘I protest against being addressed in that way.’ জ্যাক্সন্ সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দ্বারিবাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোক প্রকাশ করেন, এই জ্যাক্সন্ সাহেব জজদিগের তরফ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই। প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড কাউচ আইনসম্পর্কীয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বড় একটা বেশী কথাবার্তা কহিতে পারিতেন না; তাই শোক-প্রকাশ করিবার ভার জ্যাক্সন্ সাহেবের উপর পড়িয়াছিল। আমি সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিলাম। এখনও জ্যাক্সন সাহেবের কথাগুলি আমার বেশ মনে পড়ে।

‘ইংরাজী সাহিত্যে ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তখনকার দিনে লাইব্রেরি পরীক্ষা দিতে পারা বড় সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি হুগলি কলেজ হইতে হিন্দুকলেজে আসিয়া কিছুদিন পরে লাইব্রেরি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষা দিবার জন্ত তিনি Alison’s Europe-এর আট তলুম আট দিনে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন যে, একেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন; অত্যা করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইল। তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন যে, হলে একজন পরীক্ষক উক্ত ছাত্রের খাতায় অঙ্ক কসিয়া দিলেন। এখন তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া এ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

‘কৌত্তের দর্শনশাস্ত্রে যে দ্বারিবাবুর জীবনে কিরূপ আবিষ্কার বিস্তার করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক কৌৎ দ্বারিবাবুর ধর্মোপদেশী গুরু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবলই বলিতেন যে, হয় আমরা কৌৎকে সমগ্র মানব-সমাজের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিব, নহে ত মানব-সমাজ উৎসর্গ হইয়া যাইবে। ইয়াট’ মিলও এক দিন এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমগ্র মানবসমষ্টির পূজা একটি অত্যন্ত সুন্দর ideal। দ্বারিবাবুকে মিলের মত নাস্তিক



না বলিয়া আমি তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলিতে চাহি। তিনি ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না।

“কৌতের পুস্তক যখন তিনি পড়েন নাই, তখন প্রথম নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল ; কিন্তু পড়িয়াই তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। কৌৎ নেপোলিয়ানকে যেরূপ গালি দিয়াছেন, বোধ হয় আর কেহই সেরূপ দেয় নাই। দ্বারিবাবুও শেষাশেষি নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। Franco-Prussian War-এর সময় যে দিন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, সেডান ক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট দেড়লক্ষ ফৌজের সহিত বিপক্ষহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে দিন দ্বারিবাবুর প্রাণে যেন একটা ছটকটানির মত দেখিলাম ; তিনি ঘৃণার কসিকার ও কসিকার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করিয়া চৌদ্দ পুরুষান্ত করিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার ক্রোধের তীব্রতা মনে করিলে এখনও আমার হাসি আসে।

“কৌৎ তিন প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—প্রথমতঃ Civil marriage, এ স্থলে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র ; সম্পত্তির অমিল হইলে এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ Religious marriage, এ সম্বন্ধ ধর্মের সম্বন্ধ, ইহা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন ; বিপত্নীক কিম্বা বিধবা কেহই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। আর এক প্রকার বিবাহকে তিনি Chaste marriage আখ্যা দিয়াছিলেন, এ বিবাহে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ হইয়াও কোন কারণ বশতঃ সহবাস করিবে না ;—হয় ত শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি এমন কিছু আছে যাহা সন্তানের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

“কৌতের ভক্ত শিষ্য দ্বারিবাবু স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় বার দ্বারপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যতঃ কৌতের আজ্ঞা এক প্রকার উলঙ্ঘন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহা কর্তৃক করা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে তিনি কেবল এইমাত্র দোষ-প্রকাশন স্বরূপ বলিতেন, ‘কি করি ? প্রতিদিন আহারের সময় মা নিকটে আলিয়া চোখের জল ফেলেন ; আর কত দিন মা’র এই ভাব দেখিতে পারি ? কিন্তু আমার দোষ হইয়াছে বলিয়া আমার গুরুদেবের উপর দোষসম্পর্ক হওয়া ত উচিত নয়।’ তদন্তরে আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম, ‘লোকে বোলবে কি জানেন ?—যে doctrine লোকের conduct inspire করিতে না পারে তা’র value কি ?’

“প্যাট্রিস্টের’ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু কিছু পান-দোষ ছিল। সেই দেখাদেখি go-ahead যুবকের দলের অনেক মন খাইতে শিখিয়াছিলেন ; বোধ হয় দ্বারিবাবুও প্রথম তাহাদেরই দলের একজন হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌতের পুস্তক পাঠ করার পর তিনি মন একেবারে ত্যাগ করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি মন

স্পর্শ কবেন নাই ; কিন্তু শেষাংশে তিনি পুনরায় মদ ধরিয়াছিলেন । কৌতের নিষেধ যে তিনি এতদিন মানিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে ।

“Distinction of function অর্থাৎ অধিকারভেদ কৌতের একটি প্রধান কথা । Temporal Power ও Spiritual Power স্বতন্ত্র হওয়া চাহি, ইহা তাঁহার দর্শনের Cardinal Point । দ্বারিবাবুও বোধ হয় সকল বিষয়েই এই মতের অম্লবস্তা হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন । কারণ, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, Legislator এবং Judge দুইজনের কার্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । উভয়ের মধ্যে একজন অন্নের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না । একবার লার্ড সাহেবের ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটা আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টের মত জ্ঞানিতে চাওয়া হয় । দ্বারিবাবু মত দেন নাই । তিনি লিখিলেন, ‘It is not my function ;—my function is to interpret the law ; not to make the law.’ সকলেই বুঝিলেন তিনি কেমন করিয়া Jus dicere হইতে Jus facere পৃথক রাখিতেন ।

“দ্বারিবাবু সংস্কৃত জ্ঞানিতেন না, কিন্তু Hindu Law সম্বন্ধে যে কয়টি নজির রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সারগ্রাহিতার পরিচায়ক । দায়ভাগসম্বন্ধে উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা Law of Inheritance and Succession তিনি যেকণ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, আমার বোধ হয় যে, আমাদেরই কোনও অধ্যাপকের দ্বারা তাদৃশ অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা সম্পাদিত হইতে পারিত না । তাঁহার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, হিন্দু বিধবা যদি স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে সে সেই বিষয় ভোগ করিতে পারিবে না, এই রকম কিছু করা যায় কি না । ফুলবেড়ে চৌদজন জজের মধ্যে এই বিষয় মীমাংসিত হয় ; দ্বারিবাবুর পক্ষে মাত্র দুইজন জজ—Justices Kemp and Golver—মত দিয়াছিলেন ।

“পিতার মৃত্যুর পর দ্বারিবাবু পিতৃশ্রদ্ধ করেন নাই । তিনি বলিতেন, ‘আমার যখন কিছুতেই বিশ্বাস নাই ; আত্মা, ভগবান, পরকাল কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তখন আমি লোক-দেখানো কেনই বা পিতৃশ্রদ্ধ করিতে যাই ?’ কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তৎকালে যদি তাঁহার কৌতের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সামাজিক নিয়মে পিতৃশ্রদ্ধ করিতে পরাখুঁচ হইতেন না । কারণ, কৌতের আর এক প্রধান কথা এই—To destroy, you must replace, অর্থাৎ যতক্ষণ সাবেকের বদলে নূতন কিছু জুটাইতে পারিতেছ না, ততক্ষণ সাবেক বজায় রাখাই কর্তব্য । অত্যাশ্চর্য্যপ্রবর্তকদিগের মত কৌৎ নূতন ধর্ম্মপ্রচারকালে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীগুলির প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ বা কটাক্ষপাত করেন নাই । তিনি অনেক বার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে চাঁদাশ্বরূপ টাকা দিয়াছেন । তিনি বলিতেন, ‘কেন দিব না ? ক্যাথলিক ধর্ম্ম এক সময়ে জগতের অনেক উপকার করিয়াছে, এখনও করিতেছে, আমি সেই জন্ত তাহাকে শ্রদ্ধা করি ।’ তিনি তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন—

Positivism regards all the past creeds as so many preparations for the demonstrated faith। কোনও ধর্মসম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা যায় না। তবে হিন্দু সমাজকে এরূপভাবে আঘাত করা কি উচিত?

“আর একটি কথা। শ্রীকৃষ্ণের উৎসবের অল্পরূপ একটি অল্পষ্ঠান কৌতের পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে; তফাতের মধ্যে এই যে, শুধু আমার পিতৃপুরুষের\* শ্রীকৃষ্ণের একটি দিন তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত না করিয়া সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ হইতে যাবতীয় পূর্বতন মৃত ব্যক্তিবিশিষ্ট নামকীর্তনস্বরূপ একটি অল্পষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। একটি পরিচায়ক করিয়া কথাটা বলি। অক্ষয়কালবশতঃ মাসের নামকরণ দেবতাদের নামে করা হইয়াছে; তাই তিনি সমগ্র মানবসমাজের মধ্য হইতে তেরজন লোকের নামে তেরটি মাসের নাম করিয়াছেন; তাঁহার বৎসরে তেরমাস; যথা: Moses, Homer, Aristotle, Archimedes, Cæsar, St. Paul, Charlemagne, Dante, Guttenburg, Descartes, Shakespeare, Frederick the Great, Bichat। প্রত্যেক মাসে ২৮ দিন; সেই দিনগুলির নামকরণও এক একজন মহাপুরুষের নামে হইয়াছে;—মহু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন, কলম্বাস, বেকন ইত্যাদি। এই হিসাবে ৩৬৪ দিন পাওয়া গেল। বাকি এক দিন যাহা রহিল, সেইটাই শ্রীকৃষ্ণের দিন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, Feast of all the dead। চারি বৎসর অন্তর আর একটা শ্রীকৃষ্ণের দিন ধার্য করা হইয়াছে—Festival of Virtuous Women।”

“কৌৎ এই ব্যবস্থার নাম Positivist Calendar দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, এই পঞ্জিকাতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতাবলম্বী এমন ব্যক্তিবিশিষ্ট নাম একত্র সংযোজিত করা হইয়াছে, যাহারা জীবিতাবস্থায় পরস্পর একত্র দেখা হইলে গলা কাটাকাটি করিতে প্রস্তুত হইতেন। ফলতঃ মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে বিশেষ গুণপনা ও অপক্ষপাতিতা ও সর্বসংগ্রাহিতা (catholicity) প্রদর্শিত হইয়াছে।

“কৌৎ যেমন একটি পঞ্জিকা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তিনি একটি লাইব্রেরি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, শরীরের সুস্থতারক্ষার্থে আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ জ্ঞান আবশ্যক হওয়া উচিত, যাহা-তাহা না থাইয়া বিশেষ পরীক্ষা পূর্বক আহার্য্য দ্রব্য বাছিয়া লওয়া যেমন কর্তব্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য তদনুরূপ একটি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। যাহা-তাহা পড়া অভ্যাস থাকিলে মস্তিষ্ক কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন এবং আধুনিক ইংরাজী, ফরাসী স্পেনীয়, ইটালীয়, ও জার্মান এই লগ্ন ভাষার মধ্য হইতে যত সর্বোত্তম গ্রন্থ আছে, তাহা বাছিয়া লইয়া Positive Library বলিয়া একটি পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পুস্তকের সংখ্যা আশ্চর্য আড়াই শত হইবে। সেগুলি চারি

\* তবে পরার শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কীয় ব্যতীত জ্ঞাত অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তিবিশিষ্ট নাম উল্লেখ করা হয় বটে।

১ এইখানে “Positivism” বা “প্রতিপত্তি প্রসঙ্গ” জটিল।—স

শ্রেণীতে বিভক্ত,—যথা, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এক Synthesis। অত্যন্তই পদ্ধতিগত কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায় যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষার কাব্য কথাটি ইংরাজি Poetry শব্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কারণ ছন্দ ব্যতীত Poetry হয়না, কিন্তু কাব্য বলিলে যশুবংশও বুঝায় কাদম্বরীও বুঝায়। এই লাইব্রেরির কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলে ইহা যে কতদূর সর্বলংগ্রাহিতাসহকারে সজ্জিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে,—Homer, Virgil, Shakespeare, Dante, দ্ব্যুটের উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা, গোল্ডস্মিথের ভিকার, ফিল্ডিংয়ের টম জোনস, বায়রণের বাছা বাছা কাব্য, পলবার্জিনিয়া, ইত্যাদি কি ছোট, কি বড়, বোধ হয় কোনও ভাল গ্রন্থ তিনি তুলিয়া যান নাই। সেই লাইব্রেরি সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বারিবাবুর কতকটা চেষ্টা ছিল; কতক সংগ্রহও করিয়াছিলেন।

“এই লাইব্রেরি সম্বন্ধে মিল কিন্তু বিলম্ব করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইবে না, এই কথা তিনি Alexandria-র লাইব্রেরি দগ্ধ করার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা এক প্রকার sweeping holocaust of books। কিন্তু আমার বোধ হয় এম্বলে কৌতের অভিপ্রায়ের মিল বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কৌতের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, তিনি জানিতেন যে, সাধারণ লোকে বড় একটা বোঝে না কোন্ বহি পড়া ভাল আর কোন্ বহি পড়া ভাল নহে, সেই জন্য যখন যাহা পায় তাহা পড়ে। সেই কুসৃত্যসবারণের নিমিত্ত যেরূপ পুস্তক পাঠ করা আবশ্যিক তাহারই একটি পরামর্শবাক্য তিনি দিয়া গিয়াছেন।

“কৌৎ ভালরূপে পড়িবার নিমিত্ত শেষোক্ত দ্বারিবাবু ফরাসী ভাষা কতকটা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন পরিপাট্য জন্মিয়াছিল যে, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, ফরাসী ভাষায় লিখিত Positive Philosophy বহি খানি হাতে লইয়া তিনি এরূপ অম্ববাদ করিয়া যাইতে পারিতেন যে লোকে মনে করিত যে তিনি একখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া যাইতেছেন; কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি ফরাসী হইতে ইংরাজী অম্ববাদ করিতেছেন। কিছু দিন পরে তিনি কৌৎ প্রণীত Analytical Geometry-খানি ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অম্ববাদ করিয়াছিলেন।

“কৌতের দর্শনশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া মিল একখানি পুস্তক লিখিলেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি কতকটা ‘খ’ হইয়া গিয়াছিলাম। আমার সেই ভাব দেখিয়া দ্বারিবাবু একদিন বলিলেন, ‘আপনি অত চঞ্চল হইবেন না। আমি মিলের বহি তুলিয়া প্রত্যেক ছত্র ধরিয়া দেখাইয়া দিব যে, তাঁহার গ্রন্থের ভিত্তর কতকটা ‘আইনের চালাকির মত বদম্যারেসি আছে।’ কিন্তু দেখাইয়া দেওয়া আর বলিয়া উঠিল না; ইহার পরেই তিনি জীবনান্তকারী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যে Cancer ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় সর্বপ্রথম স্প্রেসিক ডাক্তার মহাশয়

চন্দ্রকুমার ঘো—যিনি দ্বারিবাবুর খুড়খণ্ডর ছিলেন—তিনিই বৃষ্টিতে পারেন। এই ডাক্তার একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারি বিদ্যার অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি জর্মান ভাষা হইতে ডাক্তারি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; ফরাসী ভাষাও বেশ জানিতেন। ডাক্তারির পেশাদারি চালচলন তিনি বড় একটা জানিতেন না।

“Cancer-এর কথা শুনিয়া দ্বারিবাবু একপ্রকার হতাশাস হইয়া পড়িলেন, কারণ আলোপ্যাথি মতে Cancer সঙ্গন্ধে ডাক্তাররা একপ্রকার কবুল জবাব দিয়া বলিয়াছেন; তাঁহারা নিজেই বলেন যে, এ রোগের ঔষধ নাই। দ্বারিবাবুর চিকিৎসা নানা মতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে গ্রনালী-সঙ্গতরূপে হয় নাই। আমার মনে হয় যে হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজী ধারাবাহিকরূপে ক্রমাগত চালান হইলে, রোগমুক্ত না হউন, তিনি এতাবৎকাল এক প্রকার জীবিতানন্দায় থাকিতে পারিতেন। উক্ত পীড়ায় তাঁহার মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ বক্রতা আসিয়াছিল; সেইটি উপলক্ষ করিয়া আমার একজন পরমাত্মীয় গোঁড়া ব্রাহ্ম বন্ধু সময়ে সময়ে একটা কথা বলিতেন যাহা আমি silly না বলিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলিতেন, ‘দেখেছো কুককমল, আমি এইটি লক্ষ্য করেছি যে, দ্বারিবাবু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি দৈব বিশ্ব লব্ধে যে রকম মুখভঙ্গী করে তুচ্ছতাচ্ছিলোর কথাবার্তা উচ্চারণ করেন, রোগে ঈশ্বর ঠিক সেই বিকৃত মুখভঙ্গী করে দিয়েছে; এতে আমার মনে লাগে যে, সাক্ষাৎ জগদান তাঁর এই শাস্তি দিয়েছেন।’ তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক হইয়া যাইতাম; এবং বিভাবৃদ্ধিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনও ব্যক্তির মুখ হইতে এরূপ অসংযত প্রলাপ কখনও নির্গত হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারিতাম না। ইহা আমি কেবল তাঁহার গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নাই।

“দ্বারিবাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপথে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আমৃত্যুর নিকটবর্তী আগুনুসি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে ক্রিয়ৎক্ষণের জন্য কেটিন গাড়ীতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি বাস্তবসম্মত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ীর নিকটে গেলাম; আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত-সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা।

“প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারিবাবুর personality আমার চিস্তক্ষেত্রে একদা প্রগাঢ়রূপে অধিকার করিয়া আছে যে, এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দোখতে পাই। কেবল আর একটি ব্যক্তি আমাকে বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার স্বপ্নে দেখা দিয়া থাকেন,—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।”

## পাঁচ

১৫ই পৌষ, ১৩১৭

পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—“বন্ধিমবাবু কি কখনও আপনার Law lectures শুনিতে আসিতেন?” তিনি বলিলেন—“আমার Law lectures? বন্ধিমবাবু?” আমি বলিলাম—“আজ্ঞা হাঁ; আপনার।” তিনি বলিলেন—“না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?” আমি বলিলাম—“একজন প্রবীণ সাহিত্য-সেবা স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বন্ধিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেকচার শুনিতে।”<sup>\*</sup> তিনি বলিলেন—“দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমি Law lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বন্ধিমবাবু ও আমি একত্র Law class-এ লেকচার শুনিতে যাইতাম। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটা analogous ঘটনা আমি বলিতে পারি। তারাপ্রসাদবাবু বন্ধিমবাবুর সমসাময়িক নোক। তিনি যখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, গুরুদাসবাবু তখন তথায় ওকালতি করেন ও কলেজে Law lecturer। তারাবাবু গুরুদাসবাবুর Law class-এ উপস্থিত হইয়া লেকচার শুনিতে। এ কথা আমি গুরুদাসবাবুর মুখে শুনিয়াছি।”

আমি বলিলাম—“আপনার বন্ধিমবাবুর সহিত intercourse বরাবর ছিল কি?”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“ছিল বৈ কি? তিনি যখন আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন হাবডায়<sup>১</sup> কখনও কখনও আমার বাড়ীতে আসিতেন; যখন হাবডায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। এখনও বেশ মনে পড়ে, একদিন হাবডা হইতে এক গাড়িতেই আমরা দু’জনে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলাম। পথে কোঁৎ সন্ধ্যা একটু আলোচনা করিলাম। আমি বলিলাম, ‘দেখুন, আমার মনে হয়, কোঁতের দর্শন-শাস্ত্র সন্ধ্যা আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it.’ অবশ্যই বন্ধিমবাবু বলিলেন, ‘কেন? যেটা Truth তা’র আবার সময় অসময় কি?’ অবশ্যই বন্ধিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন তিনি বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।

“হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ বোধ হয় ইংরাজী ১৮৬০ সাল

\* প্রায়টি অবপ্রমাণবশতঃ করা হইয়াছিল।

১ বর্তমান হাওড়া। সঃ

হইতে। আমার বাল্যবন্ধু যোগেশ্বরের বাড়ী খিদিরপুরে, হেমচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় সেই স্থানেই হইয়াছিল। যখন তিনি ৮৩রাশ্রমাদ রায়ের ছেলে দু'টির শিক্ষকতা করেন, তখন বৃত্তিতে পারা যায় নাই যে তিনি একজন বড় দ্বয়ের কবি হইতে পারিবেন। বাল্যকাল হইতে তিনি কবিতা রচনা করিতেন, কিন্তু তখন ভবিষ্যতের সূচনা পাওয়া যায় নাই। তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষকতা করিলেন, বৎসর খানেক মুন্সিফি করিলেন। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে টাকা দিয়া Norton's Law of Evidence বাঙ্গালায় অনূবাদ করাইয়া লয়েন। ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্ত তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ উকিলের জুনিয়রি করিয়া দুটা-একটা মোকদ্দম্য পাইয়াছিলেন। একটা মোকদ্দম্য একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং হেমবাবুকেই argue করিতে হইল। তিনি মোকদ্দম্য জিতিলেন। সক্ষে সক্ষে হাইকোর্টে পসারের সূত্রপাত হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অল্পশ্রম পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন, মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন সময়ে কি কারণে তাঁহার কাব্য রচনার দিকে বৌক গেল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় গাইকেল মধুসূদনের সহিত ভালরূপ আলাপ হওয়াতে—তিনি 'মেঘনাদবধ'-এর preface লিখিয়া দেন— তাঁহারও কাব্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

“কিন্তু হেমবাবুর ‘চিন্তাতরঙ্গিনী’ ইহার বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল। এটা তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ঘটনাটা কি? কবে ঘটয়াছিল?”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“আত্মহত্যা, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। আমার দাদার মৃত্যুর ঠিক মাস খানেকের ভিতর এই ঘটনাটি ঘটে, বোধ হয় তাঁহার দেখাদেখি। দাদার মত intellect সে সময় ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে, তিনি বোধ হয় প্ৰকৃত হইতে বসিয়াছেন। অন্ধ হইয়া আজীবন পরাধীনতার কষ্ট হইতে মুক্তির বাসনায় তিনি বোধ হয় ঐ tragic ব্যাপারের সংঘটন করিয়া বসিলেন। গ্রীক দর্শন শাস্ত্র তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল; নিশ্চয়ই তিনি Epictetus-এর কথায় নিজের পছন্দ ঠিক করিয়া লইলেন। Epictetus বলিতেন—বাঁচিয়া থাকা যখন কষ্টকর, তখন মনে রাখিও যে, there is a door always open। রোমান বীরের স্তায় বোধ হয় তিনি Epictetus-এর কথা মানিয়া লইয়াছিলেন।

১ এ প্রসঙ্গে ৪ঠা জুন, ১৮৬২ তারিখে দাদানার্য্য বহুকে লেখা মধুসূদনের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য : “Meghanad is going through a second edition with notes, and a real B.A. has written a long critical preface.....” (অঃ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত ‘হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’)—সং

“আত্মহত্যাও সাক্ষ্যমক। দ্বিতীয় ঘটনাটি উপলব্ধ করিয়া হেমবাবু কবিতাটি লিখিলেন। আমিই প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর ‘কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান’ ইত্যাদি, বায়রণের

‘Man’s love of man’s life is a thing apart’ (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুরূপ। অনুরূপ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসেবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।

“মাসিক পত্রিকায় হেমবাবুর ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইত। বোধ হয়, ‘অবোধবন্ধু’ পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। ‘বৃহৎসংহার’ শুরু হইলে তাঁহার ওকালতিতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুত্র লইয়া যাইবার জন্য মঞ্চের আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না; হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন লতা, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছি কি, তাঁহার মাসিক ভ্রম সঙ্কচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষেপ নাই।

“হেমবাবু অত্যন্ত sensitive ছিলেন। কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারি উকিল অন্নদাবাবু\* অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, ‘হেমবাবু বলেন কি জান? Other people’s poetry survives them; but I shall survive my poetry.’ হেমবাবুকে ভুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেমবাবু অস্থির হইয়া উঠিতেন। ড্রাইডেনের একটি কবিতা হেমবাবু বাঙালায় অনুরূপ করিয়াছেন; আমাদের স্থলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় ‘পদ্মপাঠ’ তৃতীয়ভাগে আছে। ঐ যে Third Number Poetical Reader-এ কবিতাটি আছে, এই উপলব্ধ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন সুকবি) বলেন, ‘হেমবাবুর poetry ত কেবল third number poetry দেখতে পাই।’ আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

“আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাননাথ ঠাকুরের ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। তাব সকল যেন luscious। যদি কেহ বাঙালী সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আশ্বাদ পাইতে চায় তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে—Somehow or other it never came to the surface।

“এইখানে আর একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘হিতবাদী’ নামটি বিজ্ঞানবাবুই সৃষ্টি, এবং ‘হিতঃ মনোহারি চ দুর্লভঃ বচঃ’



এই Motto-টিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বলিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অত্যাশঙ্কিত করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ব্যস্ততা ছিল। হিতবাদীর সম্পাদকতা সম্বন্ধে কবি নবীন চন্দ্র সেনের একটি কথা আমার মনে আছে। তিনি হিতবাদী পত্রের গ্রাহক হইবার জন্য আমাকে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে আমাকে “দেব” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। নবীন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন বটে; তাঁর তাত্‌কালিক কোনও এক কবিতা রচনা পাঠ করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম এবং ভাবী উন্নতিরও কিছু কিছু পূর্বসূচনা আমার মুখ হইতে বোধ হয় বাহির হইয়াছিল। নবীনের অবস্থা আমার প্রতি অন্ধা-ভক্ত প্রদর্শন করিবার অধিকার আছে; কিন্তু তা বলিয়া আমাকে “দেব” সম্বোধন যেন আমার কিছু বাড়াবাড়ি বোধ হইয়াছিল। এই সম্বোধনটি পাইয়া আমার একটু হাসি পাইল; আমি বুঝিলাম যে নবীন বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিতে “দেব” এই সম্বোধনটা তাহার কলমে কিছু রপ্ত হইয়াছে; সেই বোঁকে আমাকে সে ঐরূপ সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে।

“হেমবাবুকে আমি ‘স্বপ্নপ্রয়াণের’ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, ‘আমার ভাল লাগে না।’ কিন্তু এ বিষয়ে সারদাচরণ মিত্রের মতও ঠিক আমার অজ্ঞপ্ত। আমি সারদাকে ভাল-মন্দ পূর্বে কিছুই বলি নাই; এমন কথা তুমি বলিতে পারিবে না যে, আমার কথায় তিনি সায় দিয়া গেলেন। দেখিলাম সারদা গ্রন্থখানিকে বিশেষরূপে admire করেন।

“যখন রব উঠিল যে, জগদানন্দবাবু হেমবাবুর নামে নালিশ করিবেন, এবং গভর্নমেন্ট জগদানন্দবাবুকে সাহায্য করিবেন, তখন হেমবাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। কথাটি নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কথাটার কোনও বিনিয়াদ আছে।”

“মাইকেল হেমবাবুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; মাইকেলের

১ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসাবে ভারত দর্শনে আসেন, সে সময়ে কলিকাতার থাকাকালীন তাঁহার সম্রাট বাঙ্গালীর ‘জেনারেল’ দেখিবার ইচ্ছা হয়। তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং হাইকোর্টের জুনিয়র গভর্নমেন্ট স্ট্রীটার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর যুবরাজের অভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিয়া যুবরাজকে ভবানীপুরস্থ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন (৩রা জানুয়ারি ১৮৭৬) এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারের মহিলার যুবরাজকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপারে লইয়া সে সময়ে সম্বন্ধে কথা আলোড়ন হয়। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাজিমাং’ নামে এক ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন (৭ই মার্চ, ১৮৭৬) —সং

প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। ষাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিদ্ধি মনন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিন্ময়ের সৌমা থাকে না। কিন্তু আমি একটি বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালীর flexibility of intellect অসাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।

“বিভাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি Caricature করিতেন,—

‘তিলোত্তমা বলে ওহে গুন দেবরাজ,

তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।’

“তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করতেন না; কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature, যে revolution-এর চূড়ান্ত হইল Wordsworth-এ। Edinburgh Review Wordsworth-কে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—‘This will never do’. কিন্তু কবি বিচলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিভাসাগরের ‘সীতার বনবাস’কে বলিতেন ‘কাল্লার জোলাপ’।

“বিভাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না। আমার দাদার বেকনও তখন পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট ছোট সাধারণ বাঙ্গালী কথা ছিল। আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, বিভাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁহার bigotry, তাঁহার একান্ত ‘বামুন পণ্ডিত’ ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে তাঁহার অনবরতবিগলিতবাস্পা-কুললগোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়গ-হস্ত।

পরগুণপরমাণু পর্বতীকৃত্য নিত্য

নিজহৃদাবিকশম্ভ: সন্তি সন্ত: কিমন্ত:।

“এই দুই ছন্দে ‘ভামিনীবিলাস’-এর কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে উদ্বারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিভাসাগরের সে উদ্বারতা কোথায়? পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলি ত দুয়ের কথা, তিনি ইংরাজীশিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

“বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালী সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম

আমাকে বলিলেন, ‘বিভাগসগর বড় বড় সংকৃত কথা প্রয়োগ কোরে বাঙ্গালা ভাষার খাতটা পোড়ায় খারাপ করে গেছেন।’ আমারও অনেকটা ঐ স্বকম মত।

“কিন্তু আমিই সর্বপ্রথম বিভাগসগরের ভাষাকে সাধারণ্যে সমর্থন করি। এ কথা আমার জোর করিয়া বলার কারণ আছে। যখন আমি বিপণ্য কলেজে কাজ করি, একদিন আমার একটি পুৰাতন ছাত্র—৮কার্তিকচন্দ্র মিত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেন্ট—আমার সহিত কলেজে দেখা করিতে আসিলেন। তখন আমি বিভাগসগরের ভাষার একটু তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম। কার্তিকচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ‘সে কি মশাই? আমরা যখন আপনার কাছে প্রেসিডেন্স কলেজে বাঙ্গালা পড়িতাম, তখন ত আপনিই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিভাগসগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতার চলিত কথায় লিখিলে গ্রামের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।’ আমি হাসিয়া বলিলাম, ‘বটে? তা সে কথাও ত ঠিক।’”

\* \* \* \* \*

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। তখন বেলা দুটো। শীতকালে এই সময়ে তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হন। তিনি বেশ পরিবর্তন করিতেছেন দেখিয়া আমিও উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার দাঁদার কোনও প্রতিকৃতি আছে কি?”

তিনি বলিলেন—“না। তবে বহুদিন পূর্বে আমি একদিন মেট্রাক হলে Moor’s Life of Lord Byron পড়িতেছিলাম। তাহাতে বায়রণের যে চেহারা অঙ্কিত ছিল, তাহা অবিকল আমার দাঁদার। এমন আশ্চর্য্য Similarity of features দেখা যায় না;—লগাট, নাসিকা, চক্ষু, গুঁঠাধরের ভঙ্গি, কেশবিন্যাস, এমন কি বসিবার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত, সমস্তই মিলিয়া গেল।”

## ছয়

আজ প্রথমেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“রামেন্দ্রবাবুর ‘বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা’ গ্রন্থ পড়িয়াছি। লেখা আমার ভালই বোধ হইল। বিজ্ঞানান্তর মহাশয় কিন্তু এরকম ভাষা পছন্দ করিতেন না। গভীর প্রবন্ধের মধ্যে ‘গেনা দেনা’ ও এরকম চলিত কথা তিনি ক্ষমা করিতেন না।

“দেখ, ব্যাকরণ-দুষ্টে ভুল শব্দ ভাষার মধ্যে কেমন স্থান পায় সে বিষয় চিন্তা করিলে বেশ আনন্দ অনুভব করা যায়। এই ‘পৌত্তলিকতা’ শব্দটাই দেখ না কেন। সংস্কৃত ভাষায় ‘পুত্তলিকা’ নাই, ‘পুত্রিকা’ আছে। প্রাকৃত ‘পুত্তলিকা’ সংস্কৃত ব্যাকরণের দোলেতে রূপান্তরিত হইয়া ‘পৌত্তলিকতা’ প্রাপ্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রবাবুর বহুপূর্বে এই শব্দ ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। রামমোহন রায়ের ‘পৌত্তলিক প্রবোধ’ গ্রন্থই এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

“আমার মনে হয়, সংস্কৃত শব্দের মধ্যে phonetic decay-র চিহ্ন যেন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। একটা শব্দ দেখ না,—‘কালিন্দী’। আমার যতদূর স্মরণ হয়, যমুনার একটি নাম ‘কালিন্দী’ অমরকোষেও আছে। আমি ‘স্মরণ’ করি যে, ঐ শব্দটি ‘কালী নদী’ এই দুইটি শব্দের একীকরণে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যমুনার কালো জল দেখিয়া উহাকে কালী নদী বলা বিচিত্র নহে। এই কালী নদী কালক্রমে phonetic decay-র দরুণ কালিন্দী রূপ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে লোকে ভুলিয়া গেল যে, কালিন্দী কালী নদীর অপভ্রংশমাত্র। শব্দটির জন্মকথা নুতন করিয়া কল্পিত হইল; গঙ্গার ত্রায় তাহাকে গিরিন্দুতা কল্পনা করাষ্ট সঙ্গত বোধ হইল। কালিন্দী দাঁড়াইল ‘কলিন্দ-গিরিনন্দিনী’। আবার দেখ, বাঙ্গালা ‘অপরূপ’ সংস্কৃত ‘অপূর্ণ’ হইতে প্রাকৃত ‘অপূরবেয়’র (বিক্রমোর্বশী নাটকে দেখিতে পাইবে) ভিতর দিয়া পাওয়া গিয়াছে।

“আবার অনেক সময়ে ছাপার ভুল চিরস্থায়ী হইয়া যায়। সাহিত্যদর্পণকার এই কবিতাটি তুলিয়াছেন,—

দিবি বা ভূবি বা মমাস্ত বাসো

নরকে বা নরকাস্তক প্রকামং ।

অবধীরিত শারদারবিন্দৌ

চরণৌ তে ময়শেহপি চিত্তম্যামি ॥

“গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ‘যথা মুন্দমালায়াং,’ অর্থাৎ কবিতাটি ‘মুন্দমালা’ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু হেবার্লিন (Hæberlin) কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ পুস্তকের (Sanskrit anthology) মধ্যে মুন্দমালা নামক একখানি ছয় কবিতা-পুস্তক মূলিত আছে। ইহাৎ একদিন আমি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুন্দমালার মধ্যে সাহিত্যদর্পণের ঐ স্লোকটি দেখিলাম। তাহাতে বুঝিলাম ‘মুন্দমালা’ কথাটি ছাপার ভুল। সাহিত্যদর্পণকার ‘মুন্দমালা’ নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন। পুস্তকাক্রমে এই ছাপার

ভুলটি বন্ধমূল হইয়া আছে। অত্যাঁপি কেহ ইহা জানেনও না, সংশোধনও করেন নাই।

“মদনমোহন তর্কালঙ্কার আপনার এক কন্ঠার নাম ‘কুন্দমালা’ রাখিয়াছিলেন। এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে তিনিও সাহিত্যদর্পণের ছাপার ভুল হইতে কন্ঠার নামের আভাস পাইয়াছিলেন। তবে কুন্দমালা নামটিও অর্থশূন্য নহে; এমনও হইতে পারে যে তর্কালঙ্কার সাহিত্যদর্পণ হইতে আভাস না পাইয়াও নিজের পছন্দমত মেয়ের নাম দিয়াছিলেন।

“ভধু নামের গোলমাল নহে, সংস্কৃত মুদ্রিত পুস্তকে প্রেক্ষাবান সংস্কর্তার (editor of a critical acumen) অভাব নাই। প্রাক্কৃতির শ্লোক পর্য্যন্ত গত্তের আকাবে ছাপা হইয়া আসিতেছে। মুদ্রারাক্ষসে চন্দনদাস যখন প্রথম দেখা দিলেন, তখন তিনি যাহা মনে মনে কহিতেছেন তাহার প্রথম অংশটি নিশ্চয়ই প্রাক্কৃত আখ্যা; কিন্তু বরাবর গত্তের আকারে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে; যথা,—

চাণক্যমি অঅকণে

সহসা সন্দাবিদস্, লোঅস্।

বি দোসস্ বি সঙ্কা

কিং উণ মম জাদ দোসস্ ॥

“পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ৮কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চ। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৮কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলেমানুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা সম্যক্ জদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড় লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঞ্চালায়। আমি ছেলেমানুষ বলিয়াই হোক বা আর কোনও কারণেই হোক, প্রবন্ধগুলির জন্ত আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, ‘ছেলেমানুষের প্রশংসা ক’রে রাত কাটান যাবে নাকি?’ কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন ‘বিত্তোৎসাহিনী সভা; দুই লোকে তাহার নামকরণ করিল ‘মত্তোৎসাহিনী সভা’। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন। কখনও কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কি না মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যদের ভোজনাবির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও ‘আহারাবিহিত্তে যোগদান করি নাই।

“বিভাগাগর মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিভাগাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিভাগাগর এই কার্যে ত্রুতী করিয়াছিলেন। যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিভাগাগরের লোক। লোকালে সমস্ত বড়লোক বিভাগাগরের অন্তর্গত ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন বসিতেন; তাঁহার কথায়, কোনও security না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা ধরিয়া দিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিভাগাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন,—‘আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, একথা পূর্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে কিছু রাখিতাম। নগদ টাকা সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।’ সাহিত্যের দিক দিয়া যদি দেখে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে এই পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদনের প্রথম ও প্রধান patron ছিলেন। তাঁহাদের রাজবাটীতে ‘শান্তি’র প্রথম অভিনয় হয়।’

“বিভাগাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অজ্ঞাত কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়বে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত ‘সাহেবদেব’ কাছে বিভাগাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খ্যাতির পাইয়াছিলেন। ‘সাহেবদেব’ নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিষের মূল্য হয় না।

“আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিভাগাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীয় ‘সাহেবদেব’ কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্বে আমি যে তাঁহার literary jealousy-র কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে যে এইরূপ একট কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দোঁরসলা ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। ‘সাহেবদেব’ নিকট পন্থার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিভাগাগরবে ‘সাহেব’ সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

“কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে\* দাঁও। Mrs Besant ইহুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজস্ববর্গ টাকা ঢালিয়া দিল; প্রকাণ্ড কলেজ

স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা অপরিহার্য প্রসব।

“যৌবনেই কালীপ্রসঙ্গের মৃত্যু হয়; বোধ হয় আরি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে হইতেই তাঁহার কতকটা নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার খেয়ালের অন্ত ছিল না। বোধ হয়, তিনি purse-proud ভাব কতকটা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার purse-এর লম্বাবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না। যেদিন Rev. Mr Long-এর মোকদ্দমার দ্বায় প্রকাশ হইবার কথা ছিল, সে দিন কালীপ্রসঙ্গ আদালতে উপস্থিত ছিলেন; হাজার টাকার জরিমানা হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে, তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

“মহাভারত তাঁহার কান্তিস্তম্ভ। রাধাকান্তের ‘শব্দকল্পদ্রুম’-এর পার্শ্বে কালীপ্রসঙ্গের মহাভারতের স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি, তিনি বিভাগাগরের কথায় এই বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজেরও higher, nobler sympathies যথেষ্ট ছিল; লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক, লেখাপড়ার প্রচারের একটা প্রবল বাসনা ছিল।

“তাঁহার ‘হতোম প্যাচার নক্সা’র অবশ্যই প্রতিভার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গ্রন্থখানির মূল্য আছে। রচনা সম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। বিভাগাগর মহাশয়ের সংকৃত-বহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয় ১৮৫৪।৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার ‘মাসিক পত্রিকা’ নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। একটা প্রবন্ধের মধ্যে ‘Xenophon থেকে ভাঙ্গা’ এই শব্দযোজনা ছিল। বিভাগাগর হাসিতেন। ‘মাসিক পত্রিকা’র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এ সেই tendency-র চূড়ান্ত করিয়া যান। তাহার পরে যখন এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য সম্ভাটিত হইল, বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন বল সঞ্চয় করিল। সাহিত্যরথী বহুমুখ হইতে সাহিত্যরথী স্ববীজনাথ পর্যন্ত সকলেই আমাদের সাহিত্যের ভাবার সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন।

“‘হতোম প্যাচার’ মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাখুরিয়াবাটার কোনও খনৌ প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্গালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসঙ্গের বিজ্ঞপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল; ‘নক্সা’র পাখুরিয়াবাটা ‘হুড়িবাটা’র রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়েমানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন।

ইংরাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে বাহাকে 'Arry বলে অর্থাৎ যে সকল সামান্ত লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইজ্যার হইয়া নানা প্রকার বীড়রাসি করিয়া থাকে, সত্যার আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নজ্জার লেই প্রকৃতির লোকহিণের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

"Satire হিসাবে 'হুতোম প্যাচা' যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten ; এবং রুচি হিসাবে 'হুতোম' ঈশ্বর গুপ্তের ও 'গুড় গুড়ে তটুচারিয়ার' লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। 'প্রভাকরে'র সম্পাদক এবং 'ভানুরে'র সম্পাদক নির্ভাজ খেউড গাহিডেন, ধাপার মাঠে ছাড়া আর কুজাপি ঐ সকল লেখার জায়গা হইতে পারে না। গোবীন্দর তটুচারিয়ার গুরুত্ব গুড় গুড়ে তটুচারিয়ার 'দসরাজ' রচিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অপার্য। কিন্তু সে সময়ে ধনীরা আসরে, বিবরী লোকের বৈঠকখানায় এই সকল রচনা পঠিত হইত। বিকৃতরুচি সমাজের মধ্যে এই সকল রচনা উপভোগ্য হইয়াছিল।

"বিভাগাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তিনি এই একটানা কুরুটির শ্রোতের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারেন ? নব্যজনের মধ্যে তাঁহার পলায় প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন বুনিয়াদি বড়লোকের আসরে তিনি কি করিতে পারেন ? তথায় কুরুটির দোহাই দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইত।

"কিন্তু unconsciously সাহিত্যে উৎকট কুরুচি হইতে কুরুটির দিকে যে transition আরম্ভ হইয়াছিল, বিভাগাগর তাহাতে কতকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। সচেষ্ট ভাবে একটা reform movement যে করিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। এই transition-এর ইতিহাস চাহ ? ঠিক ইতিহাস দিতে পারিব না, তবে কয়েকটি কথা বলিতে পারি।

"বিভাগাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতির হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন ; সমাজের কুরুচি ব্যাধি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মার্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। অতঃপর কাজ কি, স্বভাবকবি ধীরাজ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিভাগাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল, সে গানটি এত রুচি-বিগর্হিত ও অনীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিভাগাগর ধীরাজকে নিজের বাড়ীতে ডাকাইয়া বলিডেন, 'ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত। সেই যে, 'বিভাগাগরের বিচ্ছেদে বোকা গিয়েছে ;' ধীরাজ অমনি সত্যার মধ্যে গান ধরিত,—

‘বিভাগাগরের বিচ্ছেদে বোকা গিয়েছে,

পরানরের \* \* \* \* \* দিয়েছে।’



“গানের অগ্রাঙ্ক চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অপ্রাচ্য। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সে সময়ে সমাজের বায়ু ক্লিষ্ট দূষিত ছিল। কৌৎ যে intellectual sanitation-এর কথা বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সে দিকে কাহারও দৃষ্টিপাত ছিল না।

“কিন্তু বিদ্যালয়গণের সময় যে নব্য-যুবক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা সর্ব ও পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছিল। কেশব সেন যখন আসিলেন, তখন transition হইয়া গিয়াছে।

“মহারাজী ভিক্টোরিয়ার গভর্নেন্ট যখন আরক্ত হইল, তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে মুগ্ধ। সভায়, debating club-এ, বৈঠকস্থানার আসরে রাজনীতির চর্চা হইতে লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন Presidency College-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের একটা debating club ছিল। তখন আমাদের কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ৩০রামকমল সেনের বাড়ীর (এখনকার এলবার্ট কলেজের) এক অংশে বাসিত। ক্লাবের সম্মেলনও সেই স্থানে হইত। সেই ক্লাবে কেশব সেনের বক্তৃতা আমি প্রথম শ্রবণ করি। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল Heroism of the ancient Hindus; ভায়, দ্রোণ ইত্যাদি মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র লইয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। কেশববাবু আশ্চর্য্য কাল বক্তৃতা করেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি ‘exonerate’ কথাটি চার বার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার বোল ফোটে নাই। কিন্তু যুববর্গ তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতায় চমৎকৃত হইয়াছিল। সকলের মনে seriousness ও religious fervour জাগাইয়া তুলিয়া তিনি যে সাহিত্যে ও সমাজে স্বরুচির পথ সূচয় করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেশববাবু ক্রমশঃ দেশে বিদেশে খ্রীষ্টান্ অখ্রীষ্টান্ সকলের নিকট আদর পাইলেন। খ্রীষ্টান্ তাঁহার eclecticism-এর আদরণ ভেদ করিতে প্রথম প্রথম পারেন নাই। তাঁহার ভাবিয়াছিলেন যে কেশব সেন শীঘ্রই খ্রীষ্টান্ হইবেন; এমন কি, Lord Lawrence-এর মনেও এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

“কিন্তু সর্বোপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছিল ‘সোমপ্রকাশ’। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সকল বিষয়েই বাঙ্গালীবাদ, তর্কবিভর্ক সোমপ্রকাশ পত্রে হইতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই প্রথমে দেখাইলেন যে বাঙ্গালার সর্বোচ্চশ্রেণীর কাগজ হইতে পারে। সাহিত্যে ও সমাজে সোমপ্রকাশ যুগান্তর আনয়ন করিল। কুসুচি ও অঙ্গীলতা আর কতদিন টিকিতে পারে? হিন্দু কলেজের এক শিক্ষকের সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে যখন ছেলেদের জলপান করিবার ছুটি হইত সেই সময়ে সেই শিক্ষকটি সংস্কৃত কলেজে আসিতেন এবং তাঁহাকে ইংরাজি শিখাইতেন। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া এইরূপ বিদ্যাভ্যাস হইত। তাঁহার ইংরাজি

ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে, Schmitz রচিত রোমের ইতিহাস তিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন।

“৮দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণের কথাপ্রসঙ্গে আমার নিজের একটা কথা মনে পড়িতেছে। তিনি একবার একজন phrenologist-কে আমার মস্তক পরীক্ষা করিতে বলেন। আমি তখন বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের ক্লাশে অধ্যয়ন করি। Phrenologist-এর নাম কালীকুমার দাস। কালীবাবু সুপণ্ডিত ছিলেন। Dr Duff-এর সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া দুই শত পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করিয়া ফেলেন। তিনি কি কাজ করিতেন ঠিক আমার স্মরণ নাই। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল, কালীবাবু কাষ-কর্ম ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, ‘খবরের কাগজে পড়িতে হইবে, কাজ না ছাড়িলে সময় হইবে না।’ তৎকালীন আমার মাথা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আমার রাগ এত ভয়ানক যে আমি মানুষ খুন করিতে পারি। কথাটা নেহাৎ অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বরাবর আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া সামলাইয়া চলিতে হইয়াছে।

“সমাজে ও সাহিত্যে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। নূতন দল পুরাতনের বিরুদ্ধে কোমর বাধিয়া দাঁড়াইল, পুরাতন নিজের সর্দীর গণ্ডির মধ্যে সমাজকে ও সাহিত্যকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। এই ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ ও সাহিত্য সংস্কৃত হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহের গোলমাল চুকিয়া গেল, কিন্তু কৌলীন্যপ্রথার উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল।

“তখন আমার প্রথম যৌবন; ১৪১৫ বৎসরমাত্র বয়স। শিবতলায় বলাকদিগের বাড়ীতে ‘কুলীন কুলসর্কষ’ নাটক অভিনীত হইল।<sup>১</sup> আমি সেই অভিনয় দেখিতে গেলাম। কেমন করিয়া তোমার বুঝাইব যে, শিক্ষিত বঙ্গসমাজ কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। The play came out as a surprise upon the Bengali-reading public, বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে। রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ বিজ্ঞানরত্ন,<sup>২</sup> আমার শিক্ষক ৮প্রাণকৃষ্ণ বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের ‘রত্নাবলী’ শিক্ষিত বঙ্গসমাজের আদরের বস্তু। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেদূর প্রায় দেখা যায় না। ‘কুলীন-কুলসর্কষ’ নাটকে ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটি শ্লোক আছে যাহা মাধব কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই :—

অতিরক্তবপুঃ ঋণদগতি  
বহুহীনো বিগতান্বয়ো রবিঃ ।  
পততি প্রাভবাণি বাক্যগী-  
বহুলেবাক্যলমেতদেব হি ॥

<sup>১</sup> নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রামনারায়ণ ভট্টরায়ের “কুলীন কুলসর্কষ” (১৮৪৪) নাটক অভিনীত হয়।—সং।

“এই শ্লোকটির মধ্যে যে double entendre, যে pun রহিয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর।

“প্রথম অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হ’য়ে মন্দগতি হ’য়ে, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক’রে জলে বাঁপ দিচ্ছেন। পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল।

“দ্বিতীয় অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হ’য়ে উঠেছে, সে চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা থেকে খ’লে পড়ছে, সে জলে বাঁপ দিচ্ছে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।

“এই মত্তপান-প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্যারিচরণ সরকারের নাম স্মরণ করা উচিত। একটি Temperance movement গঠিত করিয়া তিনি অনেক দিন তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। চারদিকে মত্তপানের বিরুদ্ধে crusade চলিতে লাগিল। তাঁহার এই Temperance movement শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মত্তপান-নিবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মাতালদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। আমি কয়েক জনের কথা জানি, যাহারা সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই। তাঁহার চরিত্র নির্মল ছিল; কিন্তু একটা কথা প্রচারিত হইল, তিনি গঞ্জিকা সেবন করেন! আমার মনে হয়, it was a calumny propagated by drunkards। ধীরাজ কিন্তু গান ধরিল—

মধুপান আর কোরো না,  
Young Bengal বাঁচবে না,—

\* \* \*

কিন্তু ড্যা-জা প-খে নাইকো মানা।

“ঐ ‘ড্যা-জা প-খে নাইকো মানা’ চরণটি গাহিবার সময় ধীরাজ হেলিয়া ছলিয়া pantomime-এর মত স্বহস্তে গঞ্জিকামর্দনের অঙ্ককরণ করিয়া, হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত। ধীরাজ মদ খাইত।”

## সাত

৩রা বৈশাখ, ১৩১৮

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“সম্প্রাণ্ট একটি হিন্দু মহিলা\* ‘সৃষ্টি-বহন’ নামক একখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাইয়া আমি যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। রচনা একটি অল্প-বয়স্ক বঙ্গমহিলার। ইহাতে যে সকল প্রতিপাত্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের। আত্মানন্দ, ত্রিতন্ত্র, সচ্চিদানন্দ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইত্যাদি দূরবগাহ বিষয় লইয়া গ্রন্থকর্ত্রী শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের আলোচনা কারতে গেলে সাধারণ ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়া যায়, বুদ্ধি পক্ষাঘাতপ্রাপ্তবৎ হইয়া উঠে, সেই সমস্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। রচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, লেখিকা বিশেষ রসাত্মকন করিতে করিতে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমি পূর্বে জানিতাম যে, যদি চ অষ্ট-শতাব্দী কাল হইল এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এক প্রকার প্রবর্তিত হইয়াছে, তথাপি এখন পর্যন্ত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা গল্পের বহি বা নাটক অথবা বড় ছোট দু’দশখানি কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকেন। তাঁহাদিগের বিত্তা-চর্চা ইহার উপর বড় বেশী উঠে না। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার সেই ভ্রম অপসারিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহারাজচক্রবর্তী দার্শনিকগণ যে সকল বিষয়ের অতুলীলন করিয়া যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং ভূমণ্ডলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, রচয়িত্রী সেই সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে পরাজুঁম্ব নহেন। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমি এ সকল বিষয়ের আন্দোলনে নিতান্ত অপটু, একেবারেই অক্ষম, এবং ইহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে খুটত মাত্র—”

পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম—“সে কি মহাশয়? আপনার এ কথা শুনিয়া লোকে নাথা নাড়িবে; বলিবে, স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া আপনি সমালোচনা করিতে বিরত হইলেন।”

তিনি বলিলেন—“না। আমাকে ভুল বুঝিও না; আমি যে বেদান্তে পারদর্শী এ ধারণা লোকের হইতে পারে না।”

আমি বলিলাম—“অবশ্যই আমাদের সকলেরই পক্ষে ইহা একটি বিষয়ের বিষয় যে আপনি সংস্কৃতশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত হইয়া আপনার spiritual consolation পাশ্চাত্য positivism-এ কেমন করিয়া পাইলেন। না হয়, আপনি এই পুস্তকখানি উপলক্ষ করিয়া ঐকদর্শনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বলিয়া ঘাটন।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“সেটা উচিত নহে। আর আমার পাণ্ডিত্যের কথা যখন তুমি তুলিলে, তখন কয়েকটি কথা আজ বলিব; প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হইও না।

আমি একটা বিষয়ে আপনাকে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি। আমার যে সকল গুণ অথবা বিদ্যাবুদ্ধিসংক্রান্ত যোগ্যতা অথবা বিশেষ পারদর্শিতা নাই, অনেক সময়ে আমি লোকের নিকট সেই সকল বিষয়ে প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা এক প্রকার আমার যশোভাগ্য বলিতে হইবে। আমার একটি বন্ধু ছিলেন, ভাত্যার হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র। লোকটি খুব ‘মহশ্ব’ ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সময়টা কাটান যাইত, বড়ই হাসি খুসিতে কাটিত। তিনি একদিন আমাকে আধু তাম্রালায় ছলে বলিলেন, ‘আরে কৃষ্ণকমল, জান কি বলত? কেবল ভোগা দিয়ে খাও বৈ ত নয়।’ কথাটা বেশ আমার মিতে লাগিল; এবং কতকটা মনে বদ্ধমূল হইল। ভাবিলাম, বলেছে মন্দ নহে। সেই হরিশ্চন্দ্র আবার আর একদিন আর একটা ব্যাপার দেখিয়া কিছু তাক হইয়া গিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন ‘শব্দভোম মহানিধি’ নামক স্কৃত সংস্কৃত অভিধানখানি—ইহা ‘বাচস্পতি’ অপেক্ষা অনেক ছোট—মুদ্রিত করিতেছিলেন তখন আমাকে একটা প্রফ দেখিতে বলিতেন। আমিও দেখিয়া দিতাম; এবং যদিও তাঁহার লেখার উপর আমার কলম চালান এক প্রকার ধুষ্টতামাত্র, তথাপি সময়ে সময়ে আমি একটু বদল করিয়া দিতাম। সে সমস্ত এই ভাবের পরিবর্তন যে, তিনি হয় ত বড় কঠিন সংস্কৃত লিখিয়াছেন, আমি একটু সহজ করিয়া দিলাম। তিনি হয় ত লিখিয়াছেন, ‘কোকিলস্ত পরপুষ্পাং,’ আমি হয় ত করিয়া দিলাম ‘কোকিলো হি পরপুষ্পঃ’। তিনিও বুঝিতেন যে ছেলেদের জ্ঞান অভিধান হইতেছে, যত সহজ হয় ততই ভাল, অতএব তিনি আমার এ প্রকার পরিবর্তন গ্রাহ্য করিয়া লইতেন। একদিন হরিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন, ‘অ্যা! তুমি কাটিয়া দিয়াছ; আর তারানাথ তাহা মজুর পর্য্যন্ত করিয়াছেন! তাই ত, তুমি বড় কম লোক নও।’ এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিতে পারি। কায়স্থদিগের একটা চিরস্থায়ী মানি তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার অভিধানে ‘কায়স্থ’ এই শব্দ উপলক্ষ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের একটা উদ্ভট অনুরূত্ শ্লোক কায়স্থজাতির লোভ ও অর্থকাপণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাঁহার অভিধানে এই শ্লোকটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া উঠাইয়া দিতে কাহিলাম। প্রথমে তিনি রাজি হইলেন না, পরে অনেক করিয়া বলাতে শেষ কালে রাজি হইলেন। আমার বোধ হয়, সেই সময়ে বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। শ্রামাচরণ বিশাল বিভাগাগরের ভক্ত ছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত শ্রাম বিশালের কিছু তীব্র ভাবে সেই ঊপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর চট্টা গিয়াছিলেন, এবং কায়স্থ শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে বলিয়া রাগ সামলাইতে পারেন নাই। এটি কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞানবোধ।

‘বাহা হউক, হরিশ আমাকে যে ভোগা দিয়া খাইবার দোষারোপ করিয়াছিল সে কথাটি আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে, এবং আমি আপনা আপনি হাসি। আমি মনে মনে

বেশ জানি যে, সাধারণতঃ লোকে আমাকে সংস্কৃতশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী ও পণ্ডিত মনে করে, আমি তাহার কিছুই নহি। কলতঃ আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমার সংস্কৃত জ্ঞান কতকটা পল্লবগ্রাহিতা বাহাকে বলে তদ্রূপমাত্র। হুগভীর পাণ্ডিত্য কোনও বিষয়েই আমার নাই, এটি আমার আন্তরিক অমায়িক বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের বিষয় আমি আমার পূর্বতন ছাত্র অবিনাশচন্দ্র বোষের নিকট বলিবার উপক্রম করিয়া ছিলাম। অবিনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., এখন গভর্নমেন্টের পেন্সন ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পিতা ৮গিরিশচন্দ্র বোষ ‘বেঙ্গলি’ নামক সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র সংস্থাপিত করিয়া যান, এবং আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এই পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের কথা বলার অবিনাশ অত্যন্ত চট্টিয়া গেলেন এবং আমার মুখের উপরে বলিলেন—‘এটা কি হচ্ছে? এটা affectation নাকি?’ আমি খামিয়া গেলাম। আমি জানি যে, অবিনাশ আমার খুব ভক্ত, আমার বিদ্যাবুদ্ধি লব্ধে তাঁহার বিশেষ ঞ্জ্ঞা। আমি কোন কালে সংস্কৃত কোন কোন পাঠ্য গ্রন্থ অধ্যাপনার সময় উহার কি ইংরাজি অনুবাদ তাঁহাদিগকে বসিয়া দিতাম, এখনও পর্য্যন্ত অবিনাশ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহার তারিক করিতে ছাড়েন না। অবিনাশের মত সুবিদ্বান ব্যক্তির মুখে ঐ সকল প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আমিও মনে মনে খুশী হই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমার নিজের সংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে আমার যাহা মত আছে, আমি জানি যে সেইটাই ঠিক।

‘অধিক দিন নহে, আমি ও মহেশ ত্রায়রত্ন ও নীলমণি ত্রায়ালঙ্কার, আমরা তিন জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত প্রবেশিকা গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলাম। জানি না, কি গতিকে by some irony of fate তাহাতে এত ভুল বাহির হইয়াছিল, যে আমাদের তিন জনকে লঙ্কায় অধোবদন হইতে হয়। এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রগুলারায় দিন কতক খুব আয়োদ করিয়াছিল। একজন লিখিয়াছিল—‘এককমপানার্থ্য কিমু তত্র চতুষ্ঠয়ম’ আর একজন আমার নাম করিয়া লিখিয়াছিল—‘নামে তাল পুতুর ঘটি ডোবে না।’ যাহা হউক, প্রবেশিকার সেই সংস্করণে যতদূর মূর্খতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ততদূর মূর্খ নহি বটে; কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা বলিতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকমলের প্রকৃতপক্ষে ছিল। আমার তাহা কিছুই নাই। তিনি সংস্কৃত কলেজে যে ১০।১১ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই কয় বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রের এমন কোনও অংশই নাই যাহা তিনি প্রগাঢ়রূপে এবং হুগভীর আলোচনার সহিত অহুশীলন করেন নাই,—কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার কি দর্শন যখন যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাতেই একপ পারিপাট্য ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাহার অধ্যাপকগণ উত্তরকালের ছাত্র-মিগের নিকট তাঁহাকে দৃষ্টান্তের স্বরূপ উপস্থাপিত করিতেন। আমার বেশ মনে আছে আমি যখন প্রেসমর্চাও তর্কবাসীশ মহাশয়ের শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ করি তখন আমাদের পাঠশৈথিল্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিতেন, ‘যথার্থ শিখিবার উত্তম কেবল রামকমলের দেখিয়াছি।’

“বাহারা নিজে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা আমার বিষয়ে ভাবেন যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের কোনও অঙ্গই আমার অবিদিত নাই ; দর্শন, শ্রুতি, সকল বিষয়েই যেন আমার স্রোতস্বত দ্বিবার ক্ষমতা আছে। আমি অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি ; কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় ওরূপ করিতে গেলে লোকে বিপরীত বুঝিবে, আমাকে অহঙ্কারী বিবেচনা করিবে।

“আমার এই প্রকার যশোভাগ্যের যে কারণ কি তাহাও আমি এক প্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এন্ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি. এ. পাস দিয়াছিলাম, সেই জন্ত আমার একটা নাম বাহির হইয়াছিল, এবং আমি উপযাচক না হইয়াও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের লোকের একটা অভ্যাস এই যে, যিনি গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি দেশের লোকের নিকটও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন ; এই কথা জনগোষ্ঠীনাথ ঘোষ তাঁহার রচিত কৃষ্ণদাস পালের জীবনীতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি অল্প বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের মিনিয়র প্রফেসর হওয়াতে সাধারণে ভাবিলেন যে, আমি না জানি কত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

“তবে বিভাগসাগর মহাশয় যেন কতকটা ভিতরের ব্যাপার বুঝিয়া রাখিয়া ছিলেন, কারণ তিনি একদিন আমাকে স্পষ্ট বলিলেন, ‘তোরা দুইয়েই বায় হয়ে রইলি, না ইংরাজিও তেমন লিখতে পারিস, না সংস্কৃততেও পণ্ডিত হাল।’ তিনি তখন ‘বিধবা বিবাহ’ বাদানুবাদে মগ্নপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে তাঁহার যুক্তি-বিশ্লেষণগুলি ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে একরূপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।

“প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথা অনেক বলিলাম, বোধ হয় এখন সংস্কৃতজ্ঞান সম্বন্ধে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একটু মোড় ফিরাইয়া লওয়া যাউক,—বাল্লালা সাহিত্যের কথা একটু আলোচনা করিলে ক্ষতি কি ?

“বোধ হয় ভোমরা জান না যে, তারানাথ ভর্তুবাচস্পতি বাল্লালায় ‘বাক্যমঞ্জরী’ নামী একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া ছিলেন। It is an excellent work on syntax,—আমার মনে হয় সে ধরণের পুস্তক আমাদের আর নাই। প্রেমচাঁদ ভর্তুবাঙ্গীশ মহাশয়ও বাল্লালা লিখিতেন ; ঈশ্বর গুপ্তের ‘প্রভাকরে’ নাকি তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রভাকরের motto দু দফা তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রথম দফা :—

সত্যং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ

সদৈব সর্কেষু সমপ্রভাকরঃ ।<sup>১</sup>

ইত্যাদি।

১ ক্রোড়টির দ্বিতীয় পঙ্ক্তি : ‘উদ্বৈতি ভাবসংকলা প্রভাকরঃ

সদৈবসর্বোদয়প্রভাকরঃ ।’—সং

ষিতীয় দৃশ্য :—

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেখিন্দীবরেষু কচিং  
 ভ্রামং ভ্রামমতস্ত্রমীষদযুতং পীত্বা কুধাকাতরাঃ ।  
 অজোজ্ঞাদ্ বিমল প্রভাকরকরপ্রোত্তিগ্নপদ্মোদরে  
 স্বচ্ছন্দং দিবসে বিবক্ত চতুরস্রান্তধিরেকা রগং ॥

“আবার তিনি ‘ভাকরে’র” motto-ও লিখিয়া দিয়াছিলেন ।—

ভ্রাতরৌধসরোজ কিং চিরয়সে । মৌনস্ত্র নায়াং ক্ষণঃ ।  
 দোষধ্বাস্ত্র দিগন্তরং ব্রজ ন তেহবহ্নানমত্রোচিৎ ।  
 ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎ কৃত্যমত্যাদরাৎ,  
 গৌরীশঙ্কর পূর্ব পর্বতমুখাৎ উজ্জ্বলন্তে ভাস্করঃ ॥

“দৈবর গুপ্তের ‘প্রভাকর’ দৈনিক পত্র ; কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি প্রাতি  
 মাসে একখানি মাসিক সংস্করণ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে বিবিধ গল্প  
 থাকিত এবং যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছিল । ইহা ব্যতীত কবির গান ইত্যাদি  
 রচনা করিবার শক্তি তাঁহার সামান্য ছিল না । তাঁহার সময়ে ‘কবির লড়াই’ বলক্ষণ  
 প্রচলিত ছিল, এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট বাঁধনকার বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন । তিনি  
 নিজে কোথাও গান বড় একটা গাহিতেন না, তাঁহার গনাটাও ভাক্রা ভাক্রা গোছ ছিল ।  
 কিন্তু সেকালে তাঁহার গান বাজলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত । একটি গান তোমাকে  
 বলিতেছি, এই গানটি এখনও আমার দেহে পুলক সঞ্চার করাইয়া দেয়, জানি না এ  
 গানটি মুদ্রিত হইয়াছে কি না । গানটি এই :—

পুরবাসী বলে, রাণী, তোর তারাহারা এলো ঐ ।

অমনি পাগলিনী প্রায়, এলোকেশে ধায়,

বলে, কই আমার উমা কই ।

স্নেহে রাণী বণে, আমার উমা কি এলে,

একবার আয়, মা, আয় গো করি কোলে ।

অমনি ছুবাছ পসারি, মায়েরে গলা ধরি,

অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে,

ছাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বোলে আনতে গিয়েছিলি,

পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে, মা, মায়া কি পালয়িলি,

কৈলাসেতে সবাই বলে, উমা তোর কি মা নাই,

অমনি সরমে মরে যাই ।

আমি বলি আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,

শিবের ঘোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ।

তুমি গেলে না কো নিতে, জেনে এলেম আপনা হ’তে,

র’ব না কো ঘাষ ছু দিন গেলে ।



“গানটি বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ নাই, কিন্তু ইহার রচনার লালিত্য ও চমৎকারিতা চিন্তা করিয়া মোহিত হইতে হয়। আজিকার কালে এরূপ রচনা কাহারও লেখনী হইতে বাহির হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যেকালে অ্যাডিসনের চমৎকার গল্প লিখিয়াছেন যে, অ্যাডিসনের রচনা দ্বিতীয় চার্লসের আমলের আধা-ফরাসি রচনা হইতে যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনই এখনকার আধা-জর্মান রীতি হইতেও স্বতন্ত্র। যথার্থ ইংরাজি রীতি যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে অ্যাডিসনের গল্পেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বোক্ত গানটির বিষয়েও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। উহাতে বামুন পণ্ডিত সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি নাই, এবং এখনকার ইংরাজি তর্জমা বাঙ্গালার ভঙ্গিও নাই। ফলতঃ যদি প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার রীতির নমুনা দেখিতে হয় তাহা হইলে দু-পাঁচ জন পুরাতন গ্রন্থকারের রচনা ভিন্ন আর কুড়াপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একজন দান্তরায়, একজন ভারতচন্দ্র, আর এ কালের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত।

“উত্তরকালে অনেকগুলি লেখকের ওস্তাদ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। বঙ্কিমবাবু আপনাকে তাঁহার একজন শাক্ষরেদ্ বলিয়া জানিতেন, এবং অক্ষয় দত্তের বাঙ্গালা রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হাতে খড়ি হয়। তবে অক্ষয় দত্ত যে বরাবর গুরু রচনাপদ্ধতি নকল করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেকটা বিদ্যাসাগরি রীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বিদ্যাসাগরেরও মাছিমারা গোছেয় নকল করেন নাই। অক্ষয় দত্ত যেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি যে কাহারও নকলে চলিবেন, ইহা কোনও মতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রচনার ঔদার্য ও জ্ঞানিতা, অকপট আন্তরিকতা এবং মনের ভাব অকাতরে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার অতি অল্প লেখকেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত ‘বাহুবল্লব’র প্রথম ভাগের শেষে আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধকল্পে এক সতেজ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশে সুরাপানের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজি লেখক অ্যাডিসনের মত মদিরার বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা-মৌর্খল্য লইয়া জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন; উভয়েরই পেটে একটু পড়িলে মাথাটা খুলিত ভাল। এই কারণেই বোধ হয় ঈশ্বর গুপ্ত সুরাপান লব্ধে শিষ্ট অক্ষয় কুমারের কটাক্ষপাত দর্শন করিয়া কিছু দিন পরে বিলম্ব ‘দাদ তুলিবার’ অবসর পাইয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত এই—

‘বাহুবল্লব’র রচনার কয়েক বৎসর পরে অক্ষয়কুমারের মস্তিষ্ক বোধ হয় অতিরিক্ত চালনা-হোবে এত নিস্তেজ ও নিৰ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে সর্বপ্রকার লেখা পড়ার ব্যাপার ত্যাগ করিয়া বালিগ্রামে যাইয়া একটি নিষ্কৃত স্থানে গাছপালা ঘোপণে অন্তরমগ্ন হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ক্ষেপণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি পাই তিনি মাংসও খরিয়াছিলেন, port wine-ও খরিয়াছিলেন। তাঁহার এই

শেখাবেন। উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত পরিহাসগর্ভ একটি পত্ন লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ছত্রটি ছিল :—

‘মাখামুহু ঘুরে গেল মাখামুহু লিখে ।’

“বাক্সালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণ-কীর্তন করা আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্বোচ্চশ্রেণীতে কীৰ্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন যে তাহা হয় না, কেন যে তাহার স্মরণার্থ একখানি ছবি পর্য্যন্ত সর্বসাধারণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও উদ্যোগ কখনও প্রকাশ্যরূপে হয় নাই, ইহা শুদ্ধ যে অনাকলনীয় (inconceivable, unaccountable) তাহা নহে, ইহাতে বাক্সালা জাতির কৃতজ্ঞতাবৃত্তি যে নিতান্ত ক্ষুদ্রকলেবর তাহাও প্রকাশ পায়। সে বিষয়ে আজ্ঞাপ্রাপ্ত দৃষ্টান্ত দিতে গেলে অধিক দূর যাইতে হয় না, লর্ড রিপণের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। রিপণের স্মৃতিরক্ষাবিষয়ে আমরা যে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বসিয়া আছি, তাহাতে বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তাপ্রবণতা থাকিলে প্রত্যেক বাক্সালীর অধোবদন হইয়া থাকা উচিত। ঈশ্বর গুপ্ত আর লর্ড রিপণ এই দুইজনের নাম এক প্রস্তাবে উল্লেখ করিতে কুষ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। একজন যেমন রাজনৈতিক বিষয়ে অভ্যুদারমতি ছিলেন, আর একজন তেমনই একটি অল্পবয়স্ক সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে আপনার জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে এতদেশীয় লোকের যে ঔদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি গভর্নমেন্টের নিকট বড় একটা জ্ঞানিত ছিলেন না। আর আমরা বাক্সালী যতই আশ্চর্য্য করি না কেন, গভর্নমেন্ট আজুল না বাড়াইলে আমরা কে ভাল কে মন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

“প্রকৃত বাক্সালাভাষার বীতি-বিশুদ্ধ (idiomatic) রচনা-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের যে প্রকার পারিপাট্য ছিল, তাহাতে দাস্ত্রায়ের ততোধিক ক্ষমতা দেখা যায়। দাস্ত্রায়ের রচিত একটি গান আমার মুখস্থ আছে, সেটি হাতে বাজারে ভিখারীরা গাহিয়া দু’এক পয়সা উপার্জন করে। সেই ১০।১২ পংক্তির মধ্যে প্রকৃত বাক্সালা বীতির এত নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার তর্জমা করা আধা ইংরেজী লেখা বাহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাদের সর্বদা সেই ১০-১২ পংক্তি চক্ষুর সম্মুখে রাখা মন্দ নহে। গানটি এই :—

কি আনন্দের কথা, উমে, ও মা লোকমুখে শুনি  
সত্য বল শিবানি, অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে।  
অপর্ণা এখন তোরে অর্পণ করি,  
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টিকের ভিখারী,  
আজ কি আনন্দের কথা বল্লি, ততক্ষণি,  
বিশেষরী না কি বিশেষরের বাসে।

খাপা, খাপা সবে বলত দিগন্তে,  
 গঙ্গনা পেয়েছি কত ঘরে পরে,  
 আজ ছারি নাকি আছে বিশ্বের ঘরে,  
 দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে ।  
 হিমালয়ে বাস হয় করিয়াছে,  
 কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে,  
 ফলেছে কি ফল তোমার কপালক্রমে ।  
 বিষয় বুদ্ধি বটে বিশ্বাস হয় যে মনে,  
 তা না হলে গৌরার এত গৌরব কেনে,  
 চেয়ে দেখ না আপন সন্তানে,  
 মুখ বাঁকাও কেন দাশরথি নামে ।

এমন সরল ভক্ত খাটি বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন? বহুদিন ধরিয়া আমরা পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছি, সমস্ত বিষয়েই পশ্চিম হইতে inspiration লইয়া আপনাদিগকে সার্থক মনে করিয়াছি। আপনাদের শব্দসম্পদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিদেশী কথা তর্জমা করিয়া বিদেশী সুরে গান গাহিয়াছি, নহিলে ভিত্তিহীন, বিশেষত, সহানুভূতি শব্দ বাঙ্গালী সাহিত্যের ও বাঙ্গালী ভাষার অঙ্গীভূত হইল কেন? এইগুলির কি খাটি দেশী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই? আমাদের এই নবজাগ্রত স্বদেশ-ভক্তি যদি বাস্তবিকই আমাদের দেশের দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী সাহিত্যে ভক্ত দাস্ত্রায়ের স্থান নির্দেশ করিতে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না।

“ভনিয়াছি মাস্ত্র মূলার যখন ঋষেদের মূদ্রাবন সংস্করণরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তখন পানিনির প্রায় চারি হাজার সূত্র সর্বদাই চক্র সম্মুখে রাখিবার জন্য, সূত্রগুলি আগাগোড়া ঘরের দেওয়ালে এমন করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে যখনই যে সূত্রের আবশ্যক হয় তখনই তাহা দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। আমার মনে হয় আমাদের সাহিত্যের পূর্বকূটীর হইতে বৈদেশিক ‘ভিত্তিহীন’ প্রভৃতি শব্দ বহিষ্কৃত করিয়া খাটি দেশী কথা সাহিত্যের চর্চা করিতে হইলে হয়ত প্রথম প্রথম কূটীরগায়ে খাটি বাঙ্গালী শব্দগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। হয় ত তখন আবার দ্বিতীয় গুপ্ত দাস্ত্রায়ের মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক খাটি বাঙ্গালার মনের ভাব প্রকাশ করিতে লক্ষ্য হইবে।

“ইংরাজী ভাষা বাঙ্গালী ভাষার প্রতি যে কটাক্ষপাত করা হইল তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, বর্তমান অবস্থায় বাঙ্গালী ভাষাকে ইংরাজী ভাষা কিংবা তাদৃশ সম্পূর্ণ-বিকাশপ্রাপ্ত অস্ত্র কোন দুরোপীয় ভাষা হইতে শব্দ, ভাব ও ‘ধ্বনিতা’ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য লইতে হইবে না, বা অম্লকরণ করিতে হইবে না। ইহাতে ভাষা দৌরাশলা হইয়া আসে বটে কিন্তু ভাষা দৌরাশলা হইলে যে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ

কোনও ব্যাঘাত ঘটে এ প্রকার বোধ হয় না। ইংরাজীর মত দৌরাশলা ভাষা আর নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার ( ডি ফো ) কোনও স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—‘আমরা ইংরাজ জাতি বর্ণসঙ্কর-বিষয়ে নাক তুলি কেন? আমাদের মত সঙ্কর জাতি—mongrel race—আর কোথায় আছে? দিনেমার, জার্মান, কেণ্ট, টিউটন প্রভৃতি কত জাতির রক্ত আমাদের শরায় বহিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা ভার।’ ডি ফো ইংরেজ জাতির বিষয়ে যে সঙ্করের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাদের ভাষাতেও সেরূপ দোষ—দোষই বল আর গুণই বল—আরোপ করা যাইতে পারে। তথাপি কিন্তু ইংরাজি অপেক্ষা সর্বাধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কোন ভাষা পৃথিবীতে বিद्यমান আছে?

‘মেকলে আপনার ইতিহাসের একস্থলে সাহস্বরে বলিয়াছেন,—আর সে অহঙ্কার অমূলক নহে,—যে কবির কার্য্যই বল, গণ্য লেখকের কার্য্যই বল, বক্তৃতার ব্যাপার বল, পরিহাসরসিকতা, ইতিহাস রচনা ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে ভাষার উপযোগিতা আছে, তাহার কোনটিতেই পূর্ণতা লাভ করিতে ইংরাজি ভাষা অক্ষম বা অসুপযুক্ত নহে, এবং পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার নিকট এ সম্বন্ধে ইংরাজিকে হানতাত্মকীয় করিতে হইবে না; তবে যদি হয়, বোধ হয় প্রাচীন গ্রীক ভাষার নিকট চাই কি হানতা স্বীকার করিতে হইলেও হইতে পারে।

‘অতএব দেখা যাইতেছে যে ‘আশ’—hybridism, mongrel character—বৈশা সংখ্যায় থাকিলে যে ভাষাকে হীন ধানিতে হয়, একথা ঠিক নহে। তবে আমার বোধ হয়, বাঙ্গালার ভবিষ্যতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্বন্ধে একটা ব্যাঘাত রহিয়াছে,—সেটা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখ, বহুকাল পরাধীন কোনও জাতিব ভাষা কল্পনিকালে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই। এশিয়া মাইনর সেইরূপ একটি দেশ; ইহার কোনও ভাষা কখনও গা তুলিতে পারে নাই। ইটালির ভাষাকে এ বিষয়ের বিকল্প প্রমাণ বলা যায় না; কারণ, ইটালির মধ্যে কেবল সিসিলি ও নেপল্‌স্ অनेক দিন স্পেনের অধীন ছিল, এবং উক্তরে লম্বাভি কিছুকাল অষ্ট্রিয়ার অধীন থাকে। কিন্তু অন্যান্য অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সে সফল রাষ্ট্রে স্বদেশীয় লোকেরই প্রাধান্য। তাহাদের অনেকেই অত্যাচারী ও উৎপীড়ক ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাহারা ইটালির লোক। অতএব ভাট্টে, টাসো, আরিয়ষ্টো, পেট্রিক ইহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, এরূপ অবস্থা ভাষা বিকাশের গুরুতর বিঘ্ন নহে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে,—প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও আধুনিক রোমেক (Romaic) ভাষা। কই, রোমেক ভাষাতে কে কোথায় বড় গ্রন্থকার জন্মিয়াছে? যে অবধি গ্রীসের স্বাধীনতা গেল, সেই অবধি তাহার সাহিত্যও গিয়াছে। অতএব আমার ত বোধ হয়, উন্নতি সম্বন্ধে যতই চেষ্টা কর, বাঙ্গালা ‘আধেক’ গোছ হইয়া থাকিবে। তবে আমি এ কথা বলি না যে, বাঙ্গালার ৪৫ কোটি লোকের বিজ্ঞা শিক্ষার জন্য ভাষাটাকে কতকটা গড়িয়া তুলিতে হইবে না। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা না হউক, মধ্য অঙ্গের শিক্ষা পর্য্যন্ত সাধন করিতে তৎপর হওয়াই

হউক, স্বাধীন রচনার দ্বারা হউই, গ্রন্থাদি রচনা চলিতে থাকিবে। কিন্তু মাথার উপরে ইংরাজির যে দাপট আছে সেটা ঘুচিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। অধিকাংশ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী ইংরাজীর দিকেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেন। যদি কখনও তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন, সেটা যেন তাঁহারা ভাবিবেন বাঙ্গালাকে অতগ্রহ করিতেছেন।”

## আট

৩১শে বৈশাখ, ১৩১৮

অনেক দিন পরে আজ আবার সন্ধ্যার সময় বাডন উদ্যানে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার অবসর পাইলাম।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“আজ তোমার সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, তথায় গেলে না কেন?” আমি বলিলাম,—“শরীর ভাল নহে।” জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় কি?” আমি উত্তর করিলাম—“হয় বৈকি? আজ সম্রাট কনিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিবার কথা আছে।” তিনি বলিলেন,—“দেখ, কালিদাসের পুস্তকে যে ‘নিক’ কথাটি পাওয়া যায়, আমার মনে হয় উহা আর কিছুই নহে, ঐ কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা। ‘নিক’ কথাটির অর্থ কি জ্ঞান? ছেলেদের গলায় অলঙ্কার-স্বরূপ যে লোণার ধুকধুকি পরাইয়া দেওয়া হয়, সেই অলঙ্কারবিশেষকে নিক বলে। এখনকার ছেলেপিলের গলায় যেমন নবাবি আমলের মোহর কিম্বা ইংরাজের গিনি খুলাইয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ হয় ত সীথিয় শকরাজের মোহর কালিদাসের সময়ে ব্যবহৃত হইত।”

আমি বলিলাম,—“আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ যদি এ কথা ঠিকই হয় যে, কনিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, এবং মহাকবি কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“দেখ, গ্রীক মুদ্রা আমাদের দেশে এত প্রচলিত ছিল যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া শ্ৰুতিনি নহে। সংস্কৃত ‘দ্রম্য’ নিশ্চয়ই যাবনিক Drachma। অমরকোষে তাসের একটি নাম ‘স্নেচ্চমুখ’। হইতে পারে, স্নেচ্চমুখের বর্ণের মত হইবার বর্ণ, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বাস্তবিকই এই মুদ্রায় স্নেচ্চরাজার মুখ অঙ্কিত ছিল।”

আমাদের এই কথোপকথনের মাঝখানে একজন ভদ্রলোক বলিলেন—“শুনিয়াছেন মহাশয়, অনারেবল্ মোহিনীমোহন রায়ের এক পুত্র নোট জাল করার অপরাধে ধৃত হইয়াছে?” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“মোহিনীবাবু was the architect of his own fortune। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন, আমি তখন তাঁহার ছাত্র। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল তখন আমরা দুজনেই প্রথম বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। বঙ্কিমবাবুও আমাদের সহিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর আমি বি. এ. পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলাম; মোহিনীবাবু কমিটি পরীক্ষা দিয়া উকিল হইলেন; রাজসাহী জিলার ওকালতি আরম্ভ করিলেন। জিলার জজ লুইস জ্যাক্সন তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; বলিতেন, মোহিনীর বালকের মত কচি মুখ ও কৌকড়ান

চুল আমার বড় ভাল লাগে। পরে লুইস জ্যাক্সন যখন হাইকোর্টে আসিলেন, মোহিনী-বাবুকে কলিকাতার আসিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমে মোহিনীবাবুর কপাল কিরিয়া গেল। লুইস জ্যাক্সনের আদালতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। সে কালের সেই কমিটি পাল করা উকিলদিগের মধ্যে তিনি বেশ গুছাইয়া ইংরাজি বলিতে পারিতেন, জ্যাক্সনও তাহাই পছন্দ করিতেন। আবার তিনি মোকদ্দমা এমন করিয়া আরম্ভ করিতে পারিতেন যে, প্রথম হুইতে জজের কাণ খাড়া হইয়া উঠিত। একবার এক আপিলের মুখবন্ধে তিনি বলিলেন—‘My Lord, analysis of evidence may be of two kinds,—the one a commonsense view of the evidence, the other a learned analysis of it. Mr Field has here given us a very learned analysis; but your Lordships will, I trust, analyse the evidence in the other way, i.e. will confine yourselves to a commonsense view of the case’. আমার বেশ মনে পড়ে, জজ প্রথম হুইতেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। লুইস জ্যাক্সনের আদালতে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উকিলেরা তাঁহাকে ভয় করিতেন। পাচা খাস আপিল দাখিল করিবার জন্ত প্রসিদ্ধ কোনও উকিল আপিলের সওয়াল জবাব করিতে না করিতেই তিনি আপিলের কাগজ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিতেন। তিনি আপনার স্থখ্যাতি পর্য্যন্ত শুনিতে ভালবাসিতেন না, বরং যে তাঁহাকে স্থখ্যাতি করিত তাহাকেই কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তোমাকে পূর্বে কিছু বলিয়াছি; কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে। একদিন একটা মোকদ্দমার argument এর সময় তিনি লুইস জ্যাক্সনকে একটু compliment দিলেন, অমনি জজ বলিয়া উঠিলেন, ‘You must not expect to win your case by flattering me; হেমবাবুও অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন—‘Then I withdraw the remarks my lord.’ হেমবাবুর ঐ একটা অসাধারণ গুণ ছিল; তিনি সদাই প্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন। একদিন দ্বারিবাবু তাঁহাকে বলিলেন, ‘আখ্ হেম, তোর ব্যাপারখানা কি বল দেখি? এই যে জজদের কাছে এত লাখি ঝাঁটা খাস, তবুও তুই সর্বদা হাসিস্! তোর মুখ ত কখনও ভায় দেখলুম না।’ দ্বারিবাবুর কথায় হেমবাবু হাসিতে লাগিলেন। হেমবাবুর এই লহাস্ত ভাব আমার বড় ভাল লাগিত। একবার তিনি আমাকে উপলক্ষ করিয়া একখানা গোটা নাটকই\* রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং খান পঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। আমার নিকট সে নাটকের একখণ্ডও নাই। দেখি যদি উমাকালীর নিকট থাকে।

“কিন্তু মোহিনীবাবুর কথা বলিতেছিলাম। একটা বড় জমিদারি কিনিবার সময় লুইস জ্যাক্সন তাঁহাকে টাকা ধার দিয়াছিলেন। আজ সেই বিষয়-সম্পত্তি তিন নয় ছয় হইয়া গেল!

“তখনকার দিনে জজরা যে উকিলের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহার কারণ ছিল। কমিটি পাশ করা অনেক উকিল ভাল করিয়া শুছাইয়া ইংরাজি বলিতে ত পারিতেনই না, পরন্তু যাহা বলিতে যাইতেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত রকম দাঁড়াইত। একজন উকিল একবার একটা right of way-র মোকদ্দমা উপলক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিচারপতিকে বুঝাইতে চাহেন যে, যে পথ লইয়া বিবাদ হইতেছে, সে পথে সদাসর্বদাই সকলের গতিবিধি ছিল। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন—It is a case of promiscuous intercourse, my Lord. জজ ম্যাকফার্সন্ উকিলের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—You are a born idiot, Babu.

“বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই মোহিনীবাবুর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম। ডভ্‌টন্ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার জর্জ শ্বিথ,—হৃন্দর, সরল, হৃদয়ী দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্য কান্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ; তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করিত। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্যার উইলিয়ম হ্যামিলটনের ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার গুরু হ্যামিলটন পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত অবস্থাতেই অধ্যাপনা করিতেন। মিষ্টার শ্বিথ দুইখানা বড় বড় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন,—ডাক্তার ডফের জীবন-চরিত ও বিশপ কটনের জীবন-চরিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দার্শনিক জর্জ পেনের একখানি পুস্তক আমি এমন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম যে, তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া লাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমার সহাধ্যায়ীরা সকলেই ল্যাটিন জানিত, আমি উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে তাঁহার নিজ কক্ষে বসাইয়া ল্যাটিন শিখাইতেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন অধ্যাপনা করিলেন না। কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি শ্রীরামপুরে গেলেন ; সেখানে ‘ফ্রেণ্ড অন্ড ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। সম্পাদক হইয়া তিনি কিছু গোল করিয়া বসিলেন। আমি জানিতাম, তিনি একটু গোড়া খ্রীষ্টান। সেই জন্যই গোল বাধিল। তখনও সিপাহীবিদ্রোহবহি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই। ‘ফ্রেণ্ড অন্ড ইণ্ডিয়া’ এমন উৎকট খ্রীষ্টান স্বরে লিখিতে আরম্ভ করিল যে, গভর্নমেন্ট পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান না হইলে ইংরেজের আর রক্ষা নাই, এই কথাই উক্ত পত্রিকা বারবার বলিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং দেখিলেন, এ এক নূতন বিপদ ; এইরূপ উদ্ব্যস্ত প্রলাপে আবার অশান্তির তুফান উঠিতে পারে। সবিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি মুদ্রাষকের একটি আইন করিলেন, এবং উহার ফলে পত্রিকাখানা বন্ধ হইয়া গেল।

“বহুদিন পরে আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি, একদিন শ্রীরামপুর রেল ষ্টেশনে মিষ্টার শ্বিথকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই,—সেই হৃদয়ী দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্যকান্তি। তিনিও আমার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন ; আমার কিন্তু ভয়লা হইল না যে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি।



“হিন্দু কলেজের কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্র মিটার শ্বিথ যশস্বী হইতে পারেন নাই। আমি কাপ্তেনের কাছে কখনও অধ্যয়ন করি নাই; কিন্তু যখন আমি সংস্কৃত কলেজে পড়ি তখন তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, লর্ড মেকলে রিচার্ডসনের মুখে সেক্সপীয়রের কিয়দংশের আবৃত্তি শুনিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। পরে কিন্তু মিটার বাটনের (Drinkwater Bethune) সঙ্গে তাঁহার মনোমালিগ হয়; তিনি কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার এই কর্মত্যাগেব একটা নিগূঢ় কারণ ছিল; কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা এখন নিম্নয়োজন।

“কাপ্তেন রিচার্ডসনের চাকরিটি গেল। অল্পকাল পরেই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন উদ্বলোক সিঁহুরিয়া-পটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে মেট্রোপলিটান কলেজ নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। এখন হারিসন রোডে সে বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নাই, তাহার উপর দিয়া উক্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীতে ‘বিধবা-বিবাহ’ নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কলেজটি কিন্তু বেশি দিন টিকিল না। আমি যখন বি. এ. পাস করিয়াছি, তখন শুনিলাম যে, কাপ্তেন রিচার্ডসন কয়েক মাস প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। আমি তাঁহার মুখে রিচার্ডসনের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি।

“কাপ্তেন রিচার্ডসন ‘Selections from English Poets’, ‘Literary Leaves’, প্রভৃতি যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন সেই কয়খানা পুস্তকেই তিনি যে গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ইংরাজ ও স্কট্ কবিদ্বিগকে যথোচিত সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি সেক্সপীয়রের যে সনেটটি পাঠ করিলে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়ে ও লজ্জায় অধোবদন করেন,—*Master mistress of my passion*’ ইত্যাদি, রিচার্ডসন সেই সনেটটিরও একটি স্বকৃতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার নিম্মল প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠেন, ‘*I wish Shakespeare had never written a sonnet like this.*’ মেকলে একবার হিন্দুকলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্রদের পরীক্ষা লইলেন। ঘটনাচক্রে যে কবিতাটি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, সেটি মিটারের একটি সনেট—যে কবিতায় তিনি তর প্রকাশ করিতেছেন যে, একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া দিবে। তিনি কাপ্তেন, কর্ণেল ইত্যাদি সেনানায়ক-দ্বিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার যেমন পিণ্ডারের বাড়ীটি ভয় করেন নাই সেইরূপ তাঁহারও যেন ইংরাজ কবির বাড়ীটি না ভাঙেন। কবিতাটির প্রথম ছত্র *captain or colonel* বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে; পাঠ করিবার সময় কলোনেল উচ্চারণ না করিলে ছন্দপড়ন হয়। একজন ছাত্র প্রথমেই কবিতাটি পড়িবার সময়

কলোনেল পড়িয়া গেল। মেকলে আনন্দিত হইয়া যুবকটির নিকটে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

“সম্প্রতি না কি রমেশচন্দ্র দস্তের এক ভাগ্যনেশ্বর সতীদাহ হইয়াছে? কাগজ-ওয়ালারা না কি খুব বাহবা দিতেছে? দেখ, হরেন্দ্র হেম্যান্ উইলসন্ আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইয়া দিতে না কি নারাজ ছিলেন। একজন ইংরাজ এই প্রথার বিরোধী হইলেন ইহা কিরূপে ঘটিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন বটে এমন কি সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জোর এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেন যে, সতীদাহরোধ করিলে হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগে। এই বিশ্বাসেই বোধ হয় তিনি আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইতে চাহেন নাই।

“সিন্ধুদেশ জয় করিয়া যখন স্যার চার্লস্ নেপিয়র উক্ত প্রদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখনই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তথায় আর সতীদাহ চলিবে না; কারণ সিন্ধুজয়ের দশ বৎসর পূর্বেই লর্ড বেল্টকের আমলে ইংরাজ রাজ্য হইতে সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বের বিশিষ্ট গৌরব এই যে উহার মধ্যে সতীদাহ প্রথা অথবা ক্রীতদাস আদৌ থাকিতে পারিবে না। যখন ঘোষণা প্রচারিত হইল, তখন তথাকার কয়েকজন প্রাচীন ধর্মান্ধমানী চাই-গোছ হিন্দু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—হজুর, সতীদাহ উঠাইয়া দিলে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি অগ্নানবদনে উত্তর দিলেন—সতীদাহ তোমাদের ধর্মে অন্তর্মোদিত হইতে পারে; কিন্তু আমি যে ধর্ম মানি, এ প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব জানিয়া রাখিও, যিনি ইহাতে লিপ্ত হইবেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ফাঁসি দিব—It may be your religion to burn your widows, but remember, it is my religion to hang those who will be concerned in it.—এই কথায় ভট্টিকাব্যের দুইটি শ্লোক আমার মনে পড়ে। রাক্ষস মারিচ বলিতেছেন—আমাদের ধর্ম এই যে, বিজ্ঞ ও বেদযজ্ঞীদিগকে হত্যা করা, নগরকে প্রেতের আবাস ভূমি করা—

অগ্নো দ্বিজান্ বেদযজ্ঞীন্ নিহন্যঃ

কুর্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং

ইত্যাদি,

রামচন্দ্রও উত্তর দিলেন ‘তোমাদের যদি ঐ ধর্ম হয়, আমারও এক ধর্ম আছে—যাহারা ঐ রূপ করিবে, তাহাদিগকে নিধন করা—

ধর্মোহস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়ঃ

অন্তো ব্যক্তিস্তে তু মমাপি ধর্মঃ।

ব্রহ্মবিবশ্তে প্রণিহস্মি যেন

রাজন্তবুত্তিষ্ঠন্ততাস্বরাজঃ।

“ইহাতে দেখিতেছি যে, যে স্থানে যত উচ্চ অঙ্গের কর্মবীর (men of action) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমান অবস্থায় সংস্থাপিত হইলে সকলেরই একমুখে ‘রা’ বাহির হয়। কোথায় ত্রৈতাযুগের রামচন্দ্র, কোথায় স্তর চার্ল’স নেপিয়র! কিন্তু দেখ যেন দুজনে পরামর্শ করিয়া কথা কহিতেছেন।

“যখন লর্ড বেটিকের আমলে সতীদাহ উঠাইবার হুকুম প্রচারিত হইল, তখন না কি হিন্দুসমাজের চাইগণ ইংলণ্ডে সে বিষয়ের প্রতিবাদের জন্য আন্দোলন করিবার উত্তোগ করিয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে তথায় একজন কৌন্সিলি নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। সেই কৌন্সিলি আর কেহ নহেন, আমাদিগের পরিচিত মিষ্টার বাটন (John Drinkwater Bethune), যিনি প্রায় ২২।২৩ বৎসর পরে এখানে আইনের সদস্য (Law Member) হইয়া আসেন। তিনি না কি যখন সতীদাহের স্বপক্ষে কৌন্সিল হইলেন, তখন এই প্রকার বিশেষ বিবরণ, ইহার ঘোরতর অত্যাচারপূর্ণতা, ইহার লোমহর্ষণ নৃশংসতা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পরে এ দেশে আসিয়া এবং এস্থানের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া তিনি সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তখন উহার স্বপক্ষে এক সময় কৌন্সিলি হইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ দুর্বিসহ অহুতাপযজ্ঞণা তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে দেশের নারীজাতির প্রতি এই প্রকার অত্যাচারপাতকে আমি লিপ্ত হইয়াছি, উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সেই দেশের নারীজাতির কিঞ্চিৎ উপকারার্থ আমি আমার সর্বস্ব দিয়া যাইব। তদনুসারেই তিনি বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন।

“আমি দোঁথতেছি যে এখনও প্রাচীন ধর্ম্মাহুয়গী কোনও কোনও মহাত্মা ব্যক্তি সতীদাহ-প্রথার প্রতি কিছু কিছু অনুরাগ প্রদর্শন করেন, এবং গায়ের জোরে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার এখন পর্য্যন্ত যেন কিছু মনঃস্থ হয়েন। ইহাতে ততদূর আশ্চর্য্যাম্বিত হইবার কারণ নাই। Lecky's History of Rationalism পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ-পোড়ান যুরোপেও বড় অধিক দিন উঠিয়া যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপার এবং যুরোপের ইতিহাসে জুসেড নামক যুদ্ধ এবং ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্টদিগের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর রক্তারক্তি ব্যাপার, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনোমধ্যে একটা বিষমভাব আসিয়া পড়ে এবং মনে হয়, How melancholy is the history of mankind when contemplated in connection with events like these! উন্নতি, উন্নতি বলিয়া আমরা যে বড়াই করিয়া থাকি তাহা কত সামান্য! এবং কি প্রকার অত্যাচার-পরম্পরার মধ্যে সেই যৎসামান্য উন্নতি লাভ করা গিয়াছে তাহা এক প্রকার হতাশার হইতে হয়।

“এই প্রসঙ্গে বিভাগায় মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা যায়। আমি দেখিতেছি, এক্ষণে উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যেও সনাতন ধর্ম্মের দিকে যে একটা reaction আসিয়া জুটিয়াছে তাহার প্রভাবে বিধবা বিবাহের প্রতিও

বিত্ত্বক্সা জন্মিয়াছে। আরও এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৌতের দলও সেই বিত্ত্বক্সা প্রদর্শন করেন। এ স্থলে বক্তব্য যে কৌতের বিবিধ apercu-র মধ্যে একটি apercu \* আছে তাহার নাম তিনি দিয়াছেন বিত্ত্বক্স বিবাহ—chaste marriage। তিনি বলেন যে, যদিও পুরাকালে প্রথম উত্তম বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সম্ভান উৎপাদন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে শারীরিক বৃত্তি চরিতার্থ করা, চরমাবস্থায় কিন্তু বিবাহের সেই উদ্দেশ্য স্বীকার করা যায় না। স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির স্বভাবগত অনেকগুলি বৈলক্ষণ্য আছে। এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রকর্ষ (Perfection) স্ত্রীজাতিতে আছে, যথা, স্নেহ, পরাত্তগ্রহ, কোমলতা, সম্ভানপ্রতিপালনতৎপরতা, পরতুঃখকাতরতা, প্রভৃতি যেগুলি সেই পারমাণে সাধারণতঃ পুরুষজাতিতে স্বাভাবিক বিद्यমান দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পুরুষজাতিরও এইরূপ কতকগুলি প্রকর্ষ আছে, যথা, সাহস, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, নাছোড়বান্দা এই বৃত্তি, যেগুলি সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির নাই। জনু ষ্টুয়ার্ট মিল হয় ত বলিবেন যে, স্ত্রীপুরুষজাতির এই স্বভাবগত বিভিন্নতা উভয়ের চিরন্তন প্রচলিত শিক্ষার ও অভ্যাসের বিভিন্নতা-বশতঃ ঘটিয়াছে এবং অভ্যাসের কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া দিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে সেই বৈশাদৃশ্য উঠিয়া যাইবে। কৌতের মত কিন্তু তাহা নহে। যেমন স্ত্রীজাতির শর শ্র উদ্ভেদ হয় না, চুল বড় হয়, স্তনদ্বয় বিবৃদ্ধ হয়, শরীরে লোম অল্প হয়, অস্থি কোমল থাকে, অধিকাংশই cartilage, স্বভাবের বিভিন্নতাও সেইরূপ Physiological। পুরুষেরও উজ্জ্বল। এখন কোং বলেন যে, যখন বিবাহ দ্বারা দুই জাতি পরস্পর সর্বদা কাছাকাছি থাকে, তখন একের দেখিয়া অস্ত্রের হীনতাগুলি কতকদূর অপনাত হইতে থাকে। পুরুষের স্নেহবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, নারীর অধ্যবসায় প্রবল হয়, ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্তন অপ্রার্থনীয় নহে। ইহাতে সমাজের উপকারই আছে, এবং বিবাহ দ্বারা সেই অভিপ্রায়টি কিয়ৎংশে সিদ্ধ হয়। অতএব যদি বিবাহের প্রধান অভিপ্রায় ইহাই হইল, তবে রিপূর চরিতার্থতার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ এরূপ অনেক রুগ্ন, লীর্ণ, জাঁর্ণ ব্যক্তি আছেন যাহাদিগের পক্ষে সম্ভানের উদ্ভব উচিত নহে। আজিকার কালে একথা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রোগ যে পুরুষাত্মকরূপে সংক্রামিত হয়, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বভাবের দোষও উজ্জ্বল। কেবল আমরা অজ্ঞানি চিন্তাকৌর্বল্য বশতঃ এই গুরুতর শারীরতত্ত্বানুসারে চলিতে পারি না। কিন্তু

\* কিছুকাল হইল ফরাসি ভাষার দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এই একটি নূতন কথা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজিতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার অনুরূপ কোনও শব্দ বাহির হয় নাই। মোটামুটি apercu শব্দের অর্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন কোনও চিন্তারি তা কোনও একটা গুরুতর এবং নানাবিধপ্রসংগ (prolific) idea উদ্ভাবিত করেন বাহার আন্দোলন দ্বারা অনেক অভিনব তথ্যকথা মনোমধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা idea-কেই apercu করে। কৌতের প্রস্তাবলীর মধ্যে এই প্রকার বিস্তারিত apercu লক্ষিত হয়, তাহার এক একটি অবলম্বন করিয়া এক একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কোং কিন্তু দৃষ্টিগরি কথার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই সার্থিয়া থিরা পিরাটেন

ইহা আমাদের বড়ই লজ্জার ও ঘৃণার কথা। আমি স্বয়ং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা কুসীরোগগ্রস্ত, অথচ আরও অনেক সেই সেই রোগগ্রস্ত জীবকে পৃথিবীতে আনিবার উভোগ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা জঘন্য কাণ্ড আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই ইহা ভাবিয়া থাকেন। বাপ-মা ছেলেপুলের বিবাহ দিবার সময়ে একটু ভাবেন বটে, কিন্তু বিবাহ একবার হইয়া গেলে দম্পতি আদৌ এদিকে লক্ষ্য করে না। আবার যুরোপে এতদ্বিবার্ণার্থ যে সকল প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ও হইতেছে, যাহাদিগের অন্তঃকরণে ভব্যতার লেশ আছে, তাঁহারা কেহই বোধ হয় সেইগুলির অনুমোদন করিবেন না। কেহ কেহ এই উপলক্ষে ভ্রূণহত্যাপ্রথাও চালাইতে চাহে। তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা ভ্রূণলোকের নিকটে নিতান্ত কুশিক্ষিত ব্যাপার। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া কোং বিমুক্ত বিবাহ নামে এক নূতন কাণ্ড চালাইতে চাহেন। তিনি বলেন—বিবাহ কর, কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিও না। ইহার নাম chaste marriage। এই কথা শুনিবামাত্র বোধ হয় পনেব আনা তিন পাই লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবেন এবং কোংকে বন্ধ পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, যদিচ কাম-রিপুর তুল্য প্রবল বৃত্তি আর নাহ, তথাপি কোংয়ের নূতন কাণ্ডটা একেবারে হাসিয়া উড়িয়া দিবার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তর ভণ্ডামি প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাই বলিয়া উহা একেবারে অতোপাল ভণ্ডামি বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে এতদিন সমাজ কখনই উহা সহ্য করিত না।

“এখন বলিতে চাহি যে, যেমন কোংয়ের মতে বিমুক্ত বিবাহ এক নূতন কাণ্ড, সেরূপ ধর্মবিবাহ (religious marriage) আর একটি নূতন কাণ্ড। তিনি বলেন, ধর্ম বিবাহসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে এ জন্মে আর বিবাহ করা চলিবে না। পতিই মরুন, আর পত্নীই মরুন, উভয়কেই এ জন্মের মত মৃত পতি বা পত্নীর ধ্যানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। যদি একবার পতির বা পত্নীর স্বভাবের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অবশ্যমানে তাঁহার স্বভাবের ধ্যান করিয়াই বিশেষ আনন্দ লভ্যকারে জীবন নির্বাহ করা হইতে পারে। কোং এই নিয়ম কি জ্ঞী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষেই একেবারে জারি করিতে চাহেন, এবং এখানকার কোংয়ের দলও এই জন্ত বোধ হয় বিধবাবিবাহের প্রতি বিরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বোধ হয় বলেন যে পরিশ্রমে যখন বিধবা-বিবাহ উঠাইয়া দিতে হইবে, তখন উহা আর চালান কেন?

“কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, এখন যে অবস্থা আছে, তাহাতে জী-জাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার হইতেছে এবং পুরুষজাতির ঘোর স্বার্থপরতা প্রকটিত হইতেছে। পুরুষ বাট বৎসরের বুড়ো হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু” শব্দটিও করে না, কিন্তু নারী ১২।১৩ বৎসরে বিধবা হইলেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক লম্বা আহার করুন, সর্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করুন, ভ্রাতার জন্মারে আধা দাসী হইয়া কাল যাপন করুন, তাইপো তাইকিদিগকে মাছুষ করুন, ইহাই

তাঁহার প্রতি আদেশ। এখনকার সর্বসাধারণ ‘এজু’র (Educated শব্দের এই সংক্ষেপ ব্যবহার করিলাম) দলও এই ব্যবহার পক্ষপাতী। আজকাল আধ্যাত্মিকতা বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়াছে। ‘এজু’রা বলেন, বিধবাবিবাহ চালাইলে নারীর আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হইবে। এরূপ ব্যবস্থা মন্দ নহে বটে! আমরা পুরুষ, মেঠাই-মণ্ডার ভাগটা আমরাই সমস্ত গ্রহণ করি, আধ্যাত্মিকতা ওরফে কঠোর ব্রত পালন নারীর ক্ষেত্রেই চাপাইয়া দেওয়া যাউক। হাম্লেটের ওফেলিয়া ভ্রাতা লেয়ারটিকে বলিতেছেন—‘হাছা কণ্টকার্শ পথে বিচরণ করিবার পরামর্শ আমাকে ত খুব দিলেন, কিন্তু নিজে যেন কেবল মেঠাই-মণ্ডা লইয়াই কাল যাপন করিবেন না, তাহাতে আপনারও চরিত্র-জংশ হইবার সম্ভাবনা আছে।’ মিল্টন বলিয়াছেন—Spare Fast that with the gods doth diet;—মিল্টনের এই উক্তি অকপট বটে। ইহার মধ্যে তাঁহার মনে একখানা মুখে একখানা ছিল না। কিন্তু ‘মাইভানহো’তে বনবাসী সন্ন্যাসী (Monk) যখন রিচার্ড রাজাকে বলিতেছেন—আমার ঘরে ছোলা ভাজা ছাড়া অন্য কোনও ভাল খাদ্য জ্বাষ নাই—তখন রিচার্ড অনেক পীড়াপীড়ি করাতে পরিশেষে তাঁহার ভাড়ারের মধ্য হইতে কালিয়া, কাবাব, পুরি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার বাহির হইতে লাগিল। নারীর প্রতি আমাদের পুরুষজাতির উপদেশটা কিয়দংশে তজ্রপ। পুরুষ বিধবাবিগকে বলেন—ওগো শ্রীমতাগণ, একাদশী কর, একলক্ষ্য খাও, চুল মুড়াইয়া ফেল, গোষ্ঠীন খাওয়া হাওয়া এককালে ত্যাগ কর, শরীর খুব ভাল থাকিবে, দীর্ঘকাল নীরোগ জীবন কাটাইবে। পুরুষ নিজে কিন্তু চর্ব্যা চোস্ত লেহু পেয় ছাড়িবেন না। ইহারই নাম আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিবার জন্য আমরা পুরুষ রোজবুজিতে ছাতা মাথার দ্বি, স্ত্রীলোক কিন্তু দিতে পারিবে না। শীতকালে জামাজুতা পরিব, নারী কিন্তু শীতে হি হি করুক আর ঠাণ্ডা মাটিতে চলিয়া বেড়াক। আমরা অগ্রে আহাৰ করিব, নারী আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া প্রাণধারণ করিবে।

“আমি এই সকল কথা বলাতে অনেকেই চটিয়া উঠিবেন, কিন্তু হক্ কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। আজকাল অনেক পরিবারের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু হিন্দুর ঘরে গার্হস্থ্য জীবনের spirit (ভাবভঙ্গি) এইরূপ কিনা তাহা অপক্ষপাতী লোক মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাই অহরোধ।”

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“তোমার মুখে আমি শুনিতেছি যে, কেহ কেহ বলিতেছেন, বিভাগের প্রতি আমার কিছু আন্তরিক আকোশ আছে, সেই কারণেই আমি তাঁহার সম্বন্ধে ২১টি কথা এরূপ বলিয়াছি যাহাতে তাঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ reflection হয়। আমি আশা করি ত বুঝিতে পারি না, এমন কি কি কথা বলিয়াছি। আমি মনে মনে জানি যে, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত, এবং তাঁহার চরিত্রের মহত্ব ও গুণাবলী সর্বদা বলিয়া স্বীকার করি। তবে হয় ত দুই একবার তোমাকে বলিয়াছি যে, He could not bear a brother near the throne. কিন্তু এই সামান্য দুর্বলতাকে পৃথিবীর বিস্তার বড় লোকের চরিত্রে দেখা যায়। বড় লোকের স্বভাবে, বিশেষতঃ শাহারা বিশিষ্ট বড়লোক তাঁহাদের স্বভাবে এ দুর্বলতাকে হইতে বাতায় যেন বিধিনির্বন্ধ আছে। শাহারা বিশিষ্ট বড় লোক, তাঁহারা নিজের ভাবভঙ্গি নইয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, অন্য ধরনের ভাবভঙ্গি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা appreciate করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না। এই নিমিত্তই বোধ হয় মেকলে স্বলবিশেষে বলিয়াছেন যে, শাহারা অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহারা পরের লেখা বিষয়ে ভাল সমালোচক হয়েন না—‘Great authors are seldom good critics’। মাঝামাঝি গোছের বুদ্ধির লোক হইলে সমালোচক ভাল হয়। ইহা যেন হইবারই কথা। সুতরাং বিভাগের মহাশয় একটা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম যে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আর আকোশের কথা যে বলিতেছি, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে নিবৃত্তিতাবশতঃ আমি বিভাগের মহাশয়ের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই বিপ্রকৃষ্ট ভাব (distance) নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াও ঘুচাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তুমি জান, তোমাকেই আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, আমার জীবনের পূর্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমারই সম্পূর্ণ ভুল এবং তিনি সম্পূর্ণ ঠিক, ইহা আমি ঘটনার দুই এক বৎসর পরেই কথা উঠিলেই সকলের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম এবং এখনও করি। আমি কায়মনোবাক্যে বুঝি যে, তিনি আমার ভালই করিয়াছিলেন। সুতরাং সে আকোশের লেশমাত্র এক্ষণে আমার মনে নাই এবং তৎপ্রবর্তিত হইয়া কিছুমাত্র মালিন্য মনে ধারণ করিও না এবং কোনও বিরুদ্ধ কথাও আমার মুখে আসে না।”

কথাটা অল্প দিকে ফিরাইবার জন্য আমি বলিলাম, “দেখুন, বৈশাখ মাসের ‘ভারতী’তে ক্রীষ্ণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-পয়ার ছন্দে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বহুকাল পরে মাসিক পত্রিকায় সাবেক ধরনের পয়ার পাইয়া আমার বড়ই ভাল

লাগিল। আমার মনে হয় আবার কিছুদিন খাঁটি নির্ভাজ পয়ার যদি আমাদের কবিতা চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আর কিছু না হউক, মুখ বদলান হয়।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“তোমার কথায় বিদ্যাসাগরকে মনে পড়িল। বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দস্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগপূর্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলের’ কবিতা গদ্যদ্বায়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি ‘হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া’ ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—‘দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার স্বরুয়ে ভাষা।’

“আমার বিশ্বাস মদনমোহনের ‘বাসবদত্তা’ তাঁহার পঠদশায় বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ‘রসতরঙ্গিনী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পড়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পণ্ড ও গুণ লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল। আমি তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি,’ এবং এখনও বলিতেছি যে, আমার মনে হয়, তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসাপুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অশুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোলতা হইতে পারিল না।

“বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিভাবুদ্ধি সযত্নে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসুমান জমিন প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয় ত Vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হইবেন কি না সন্দেহ।

“বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে লিবিগিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে ‘বিদ্যাসুন্দর’ পড়াইতে হইত। ‘বিদ্যাসুন্দরের’ খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লক্ষিত ও বুদ্ধিতত্তাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন স্বরূপীয়া তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, ‘কেন তুমি কাভুভাভু



করিতেছে? আমাদের ভাষাতে কি লেক্সপীয়ারের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকার তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লঙ্কার বিষয় কি?’ এই কথা আমি বিভাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।

“বিভাসাগর এ দিকে পাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সাংসারিক লোকজ্ঞতা এবং সাধারণ বিষয়বুদ্ধি বড় কম ছিল না। একসময়ে ত্রিহট্ট জিলা নিবাসী কোনও এক ব্যক্তি চাকরির প্রার্থনায় তাঁহার শরণাগত হয়। অন্ততঃ তিনি সুপারিস দিয়া তাহাকে কোথাও একটা চাকরি করিয়া দেন, সে এ প্রকার বাস্তব প্রকাশ করিয়াছিল। বিভাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের বড় চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন। নিজের চাকরি দিবার ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না, আর সুপারিসের দ্বারা যে চাকরি দিতে পারিবেন এ ভরসাও তিনি বড় করিতেন না। উমেদারটি নিজের কার্যসিদ্ধি ও বিভাসাগরের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট সিলেটী পাটি উপহার দিল। বিভাসাগর প্রথমে কিন্তু উহা লইতে চাহেন নাই; উমেদারের পীড়াপীড়িতে শেষে লইলেন। আমার নিকট এই গল্প করিবার সময় বিভাসাগর কাহলেন, ‘আমি বেশ বুঝলুম যে, চাকরি না হোলে উমেদার পাটির দাম চা’বে। এই ভেবে আমি সে পাটি ব্যবহার করলুম না, তুলে রাখলুম। ফলে আমি যা ভেবেছিলুম তাই ঘটল। উমেদার যখন কিছুদিন ইঁটাঁটাঁ করে চাকরির বিষয়ে হতাশাস হোল, তখন বিদায় নেবার সময় বল্লেন, ‘মশাই পাটির দামটা পেলে ভাল হয়।’ আমি বল্লুম, ‘বাপু তোমার পাটি একদিনের জন্তে ব্যবহার করি নি; ঐ দেখ, তোলা রয়েছে; তুমি ফেরত নিয়ে যাও।’ উমেদার কতকটা ভাবাচাকা খেয়ে পাটি নিয়ে বিদেয় হোলো।

“সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি শেখাশেখি, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর বিভাসাগরের বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছিল। আমি বড় বড় দিগ্‌গজ অধ্যাপকদিগের বিষয় বলিতেছি না; তাঁহাদিগকে তিনি যাবজ্জীবন পূজনীয় জ্ঞান করিতেন, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং অকাতরে অর্থদানও করিতেন। কিন্তু ঈহারা হু’ দশ পাতা সংস্কৃত পড়িয়া ডে’পোমি করিয়া বেড়ান, এবং বিদায়ের লোভে চারিদিকে ইঁটাঁটাঁ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ইহানীং ‘ল্যাজকাটা’ বা ‘টিকিলাস’ এ ছাড়া অন্য নাম দিতেন না। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে—‘পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বৈ মুখ্যে দোষাহি কেবলঃ’; এই শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিয়া একটি পরিহাসের ব্যাখ্যা লালমোহন নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়াছিলেন। লালমোহন প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ভাস্করের ভ্রাতা ছিলেন, মহোদয় কিনা ঠিক বলিতে পারি না। অর্থটা হইল এই—পণ্ডিভের সবই গুণ, দোষের মধ্যে খালি মুখ। বিভাসাগর এই পরিহাসের ব্যাখ্যাটি লইয়া সর্বদাই আমোদ করিতেন এবং বলিতেন যে, লালমোহন শ্লোকের অর্থটা ঠিকই

করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর অজ্ঞান হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমে অনেকে তাঁহার পক্ষে সায় দিয়া শেষে অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে বিপক্ষের দলে যিশিলা গেল। ইহাতে তিনি ঐ পণ্ডিত-জাতির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।

“প্রথম বয়সে বিদ্যাসাগরের দেহটি বেশ মজবুত ছিল। আকার খর্ব বটে, কিন্তু এ দিকে খুব গ্যাট্টাগোঁট্টা, যাহাকে সংস্কৃতে ‘অবষ্টক’ বলে, সেই গোছের ছিল। তিনি শারীরিক পরিশ্রমও খুব করিতে পারিতেন, এবং খুব পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে; কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রাতঃ-কালে যাত্রা করিয়া সত্ৰই হাঁটাপথে বাড়ি পৌঁছিতেন। পায়ে কেবল এক চটি জুতো; হয় ত বার আনা পথ শুধু পায়েই যাইতেন, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নরোদ্রেও ভ্রমণ করিতেন না। এই হাঁটাপথে ঘাইবার সময়ে এক দিনের একটি বৃত্তান্তের গল্প অতি করুণভাবে তিনি বলিতেন। তিনি বলিতেন, ‘আমি এক দিন বাড়ি যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্তে একটি খোড়ো বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে বোসে আছি, এমন সময়ে বাড়ীর ভেতরে থেকে গুটি দুই তিন ছেলে নাচতে নাচতে আর গানের স্বরে চৈচাতে চৈচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে, আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি ত দেখে শুনে অবাক। ভাবলুম যে, এদের এত দুঃখবস্থা যে বছরের মধ্যে পাল পার্কণের মত দু’ এক দিন ডাল রান্না খেতে পায়! আর বোধ হয় এমন অনেকেই আছে।’ এই গল্প করিতে করিতে কখনও কখনও তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত।

“তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রকার গ্যাট্টাগোঁট্টা শরীরের জন্য তাঁহার উহাকে ‘টিপলে’ বলিয়া ডাকিতেন; এবং বিদ্যাসাগর যখন কোনও একটা শাস্ত্রের—বিশেষতঃ স্মৃতি-শাস্ত্রের ভালরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তখন তাঁহার বলিতেন ‘আমাদের টিপলে না হোলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।’

“বিদ্যাসাগর যখন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, ‘শূদ্রস্ত ভার্য্যা শূদ্রেব সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে’ এই মন্তব্যচনের বিদ্যাসাগর যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,<sup>১</sup> তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সম্পূর্ণ সম্মত। শেষে কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহের সমর্থনপক্ষে লেখনী ধারণ করিলেন, এবং বিদ্যাসাগরের সহিত বাদান্তবাদে (controversy) প্রবৃত্ত হইলেন।

“পদদ্বয়ে পথপর্য্যটনে বিদ্যাসাগর কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেখাবস্থায় যখন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না, তখন ডাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতো তাঁহার কহিলেন, ‘খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন।’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব?’ ডাক্তার বলিলেন, ‘যতক্ষণ না ক্লান্তি

বোধ করেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, 'তাহ'লে ত রাজি দিন হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।'

"কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার পর তিনি কিছুদিন কলেজের ইমারতেই বাসা করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মালির ঘরের দিকে মাটি ফেলিয়া মস্ত একটা কুস্তির আখড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। জীবহিংসা পরিহারের জন্ত তিনি কিছুকাল মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বাছুরকে কষ্ট দিতে হয় বলিয়া দুগ্ধ পর্যন্ত বোধ হয় ছাড়িয়া ছিলেন। যাহা হউক এ বাতিক বোধ হয় অধিক দিন চলে নাই, নচেৎ বান্ধালা ভাষাকে তাঁহার লেখনীপ্রসূত অনেক অত্যাংকুষ্ট গ্রন্থ হইতে হয় ত বঞ্চিত হইতে হইত; তিনি কখনই বৈশীদিন বাঁচিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে কৌৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, সৃষ্টিক্রমে ইহা একটি অসম্পূর্ণতা (imperfection) এবং সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণাময়ত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধযুক্তি যে, জীবহিংসা ব্যতীত মানুষের মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হইবার যো নাই। অতএব পশুদিগকে যত কম হয় কষ্ট দিতে হইবে; যাবজ্জীবন তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করা উচিত; এবং সেই যে চরম মুহূর্ত্ত—যখন আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে যাইতেছি, তখন যেন তাহারা মৃত্যুর বিভীষিকা আদৌ না টের পায়; এই চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য; এবং প্রাণসংহার ব্যাপারও এরূপ অনিষ্টের ও যন্ত্রণাপূর্ণ রীতিতে সম্পাদন করা উচিত যে, তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্রেশ না হয়। আমি জানি যে, এখনকার উদ্ভিদভোজ্যের দল কৌতের এই সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু এখনও শরীরবিধান শাস্ত্র (Physiology) দ্বারা উদ্ভিদভোজনের সর্বোত্তমপ্রায়সাধনতা সর্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

"এই প্রসঙ্গে সুরাপান সম্বন্ধে কৌতের মত প্রকটন করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলেন, alcohol-এর এমনই একটি ধর্ম আছে, যে পেটে পড়িলেই পেট ও মস্তক উভয় সংযোজক ganglionic nerve-কে তৎক্ষণাৎ বিকৃত করিয়া দেয়, এবং সেই বিকার মস্তিষ্কে নীত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ alcohol সংযোগ ঘটিলে উহা স্থায়িতাবে বিকৃত হইয়া যায়। এই জন্ত মহম্মদ সুরাপান তাঁহার ধর্মাবলম্বীদিগের পক্ষে ঐকান্তিক নিষিদ্ধ কার্য বলিয়া ব্যবস্থা করাতে কৌৎ মহম্মদকে আকাশে তুলিয়া দিয়াছেন, এবং কথায় কথায় বলেন The incomparable Mohammad অর্থাৎ মহম্মদের জুড়ি নাই।

"আজকাল শুনিতেছি যে, ভক্তার চুনিলাল বহু নাকি সবিস্তারে সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাঁহার মতে মস্তিষ্ক ও যকৃৎ এই উভয় করণই (organs) alcohol-এর দ্বারা উচ্ছন্ন যায়। এতদ্দেশে নব্য যুবকের দল কিন্তু আজও একথা বুঝিতেছেন না। যুরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকেই ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, পরিমিতমাত্রায় alcohol সেবার দ্বারা উপকার বৈ অপকার নাই। তাঁহাদের মতে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক সম্বন্ধও তদ্রূপ আবশ্যিক। আমি কিন্তু এই দুইটি মতই ঘোরতর অপসিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞান করি। শেষোক্তটি পরিহার করিলে যে শরীর ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষই সাধিত হইবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেই আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের

শ্রমতক ব্রাহ্মণদিগের আচার। ইদানীন্তনকালে শ্রম আইজাক্ নিউটনের মত মস্তিষ্কচালনা কে কবে করিয়াছেন? তিনি ৮৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, বিবাহ করেন নাই। যতদূর জানা আছে তাঁহার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল।

“কৌতের মতও ইহাই ছিল। ঐ শারীরিক সম্বন্ধ যাহাতে এককালেই উঠিয়া যায় ইহা বিজ্ঞানচর্চাকারী ব্যক্তিমাত্রেয় visionary idea স্বরূপ মনে ধারণ করিয়া রাখা উচিত, তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; এবং সেই জ্ঞান বিড়ম্বরসিকদিগের বিজ্ঞপের পাত্র হইয়াছিলেন। এমন কি জনু ষ্টয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রতি একটু ঠাট্টার বারি বর্ণন করিয়াছেন। মিল বলেন, ‘এবিষয়ে কোং একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে যে কি তাহা আমি বলিতে চাহি না।’ কোং বলেন, রোমান ক্যাথলিকদিগের কুমারী জননী (Virgin Mother) একটা Theological Conception বটে, কিন্তু জিনিষটা কি তাহা আমি Physiologist-দিগকে অনুসন্ধান করিতে বলি। নিষ্কলঙ্কচরিত্র কুমারীর সম্ভান উৎপন্ন হয়, এ বিশ্বাসটি যুরোপে ত এক্ষণে হাঙ্গাম্পদ হইয়াছে এবং বিস্তর লোক এই কারণেই খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অশ্রদ্ধা আমি এই ভাবে বলিতেছি যে, খ্রীষ্টান ধর্মের ধর্মনীতির উপর কাহারও বিরাগ, ঘৃণা বা অবজ্ঞা হয় নাই, কিন্তু ঐ ধরণের মূলভূত বিশ্বাসগুলির উপর—যথা কুমারীর সম্ভান উৎপত্তি, একখানি কটীতে বিস্তর লোক খাওয়ান, কথার দ্বারা উৎকট রোগ আরাম করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্রমেই লোকের অশ্রদ্ধা হইয়া আসিতেছে। হিউম এই অশ্রদ্ধা প্রথম তাঁহার রচনায় প্রকাশ করেন। তখন গোড়া খ্রীষ্টানদিগের তবফ হইতে তাঁহার উপর বিস্তর গালিগালাজ বর্ণন হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখিতেছি যে, তাঁহার কথাই সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। আমেরিকার কোনও এক মণ্ডলীতে বক্তৃতা দিবার সময় একজন পাণ্ডি বলিয়া উঠিলেন, আজ ১৮০০ বৎসর হইল কেহ মরিয়া জয়ন্ত হয় নাই। সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে আকাশবাণীর স্রাব একজন আওয়াজ দিলেন, ‘কখনও কেহ হয় নাই।’ যান্ত্রিকের গোর হইতে উত্থান—ইহার প্রতি লোকের ত এইরূপ শ্রদ্ধা। আমাদের দেশে কিন্তু একরূপ সম্ভান উৎপত্তির idea-টি ততদূর হাঙ্গাম্পদ হয় নাই। তাহার শাস্ত্রাভিধানের জন্মবৃত্তান্ত, শাস্ত্রাতার জন্মবৃত্তান্ত, আর কাদম্বরী আখ্যানিকাতে পুণ্ডরীকের জন্ম। ইহা ব্যতীত পুরাণের মধ্যে মানসপুত্র ত কথায় কথায় দেখা যায়।

“কৌতের কথা এক্ষণকার দ্বিগুণ শারীরবিধানবেত্তাদিগের নিকট কতদূর অনুমোদিত তাহা আমি জানি না, এবং সে মীমাংসা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। মানুষের দেহযন্ত্র (বা organism) একটি নানাব্যাপারসম্বল অতি জটিল (complex) কাণ্ড; বহু সংখ্যক factor একত্র হইয়া ইহা চালিত হইতেছে। একটি factor বদল করিয়া দাও অমনি ইহার চলন ক্রিয়া বদলিয়া যাইবে। এইরূপ জটিল কাণ্ডের মধ্যে চেষ্টা স্বয়িলে অনেক প্রকারের অঙ্গল-বদল আনয়ন করা যাইতে পারে। আজ কাল surgery দ্বারা যে সকল অজ্ঞাতব্যাপার সাধিত হইতেছে, সে গুলিই এ বিষয়ে শাস্ত্রা-

দিবে। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া কৌৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, কুমারীর সম্ভান উৎপত্তি কেনই বা একেবারে ঐকান্তিক নিরবচ্ছিন্ন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইবে! যদি বল, সে চেষ্টার দরকার কি? উত্তর—দেহের ও মস্তিষ্কের ক্ষয় নিবারণ করা উচিত নহে কি? একজন ফরাসি ডাক্তার এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আর এক উত্তর এই যে, সম্ভান উৎপত্তি যদি আমাদের ইচ্ছার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে ম্যালথুসের Population difficulty অনেকটা ঘুচাইয়া দিতে পারা যায়। কৌৎ কিন্তু ম্যালথুসকে মানিতেন না। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, ম্যালথুসের সিদ্ধান্তে (Theory) গণনার ভুল (arithmetical mistake) আছে। এই অংশে অদ্যপি আমি কৌৎকে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; এবং কোন স্থানে যে ম্যালথুসের গণনার ভুল আছে তাহাও ঠিক করতে পারি নাই। ফলতঃ ম্যালথুসের রচনার সহিত প্রথম পরিচয় হওয়া অবধি আমি যেন একটা নূতন আলো পাইয়াছি মনে হইয়াছে; এবং তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। যাবৎ সাধারণে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছে, তাবৎ পৃথিবীর বিস্তর লোককে অর্দ্ধাশনের যন্ত্রণা ও দুর্গতি ভোগ করিতেই হইবে। হয় ত শতকরা ১০ জন পেট ভরিয়া খাইতে পায়, আর ৯০ জন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করে; এই যে বর্তমান অবস্থা, ইহা ঘুচাইবার উপায়ান্তর নাই। অনেকে ভাবেন, বড় মাহুঘরা ঘরের টাকার খলি বাহির করিয়া দিলে এ যন্ত্রণা ঘুচিতে পারে, শুদ্ধ বড় মাহুঘদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ এ অবস্থা বন্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু এটা কাজের কথা নহে। বড় মাহুঘরা আপনাদের সমস্ত টাকা বাহির করিয়া দিলে হয় ত ৫।৭ বৎসর একটু সচ্ছল দেখা যাইবে। কিন্তু তাহার পরেই আবার যে কে সেই। এত সম্ভান জন্মিবে, অল্প বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে, যে আবার খাণ্ডভবোর পূর্ববৎ টানাটানি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে ভালরূপ না খাইতে পাওয়ার দরুণ বিস্তর শিশু এবং বিস্তর বয়স্ক ব্যক্তি পর্য্যন্ত কালগ্রাসে পতিত হয়। দিন কতক যদি এই অবস্থা বন্ধ হয়, তবে সেই সকল বয়স্ক ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিয়া আবার টান ধরাইবে এবং বড় মাহুঘদিগের টাকা অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। এ কথা ম্যালথুস এবং তাঁহার পরে টুয়াট মিল অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব বড়মাহুঘদিগের উপর স্বার্থপরতাদোষ আরোপ করা বুঝা।

“তবে কৌৎ এ কথা বলেন বটে যে, পৃথিবীতে এখনও বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া জমি বাহির করা যাইতে পারে। সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিকে উর্বর করা যাইতে পারে। সমুদ্রকে হটাইয়া দিয়া আবাদের জমি বাহির করা যাইতে পারে। মৎস্ত-মাংসাদি খাণ্ডের পরিমাণও অপরিমীমরূপে বাড়াইবার উপায় আছে। এই সমস্ত কার্য সমাধা করিবার জন্য বড় মাহুঘদিগের স্বার্থপরতা ত্যাগ করা আবশ্যিক। হয় ত এখন হইতে দশ হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর সমস্ত resource নিঃশেষিত হইবে এবং তখন এই জনসংখ্যার সমস্ত

মালুম হইতে আরম্ভ হইবে। উপস্থিত কালে আমাদের কাছে ও বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইতেছে না।

“অতএব সাধারণ ধর্ম্মনৈতির উন্নতি এখন আবশ্যক। কৌত্তের অভিপ্রায় বোধ হয় এই প্রকার ছিল। আর সংযমের জন্য তিনি এক উপায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, আহােরের খর্ব্বতা করিলেই রিপূর দমন হয়; যে পরিমাণ থাইতেছে, তাহার অর্দ্ধেক কর, না হয় শিকি কর, গায়ের জোরটুকু যাহাতে বজায় থাকে তাহার অতিরিক্ত থাইবে না এই নিয়ম কর, তাহা হইলে নিশ্চয় রিপূর দমন হইবে। এ কথা তাঁহার নিজের নহে। তিনি একখানি গ্রন্থ পড়িতে বড়ই ভালবালিতেন, নাম *Imitation of Christ*, ভাষা Latin, গ্রন্থকার Thomas a' Kempis—লোকটা ভগবান লইয়া বিভোর হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ হইতে কৌৎ আহা-লাঘবের উপদেশটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে লেখা আছে, বৃহৎক্ষায়ন্তিকে দমন কর, তাহা হইলে আর সকল দুর্দান্ত রিপূরই দমন হইয়া আসিবে।

“এই উপলক্ষে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে Thomas a' Kempis গ্রন্থের যে স্থানে ভগবানের নাম করিয়াছেন, কৌৎ সেই সেই স্থানে Humanity এই শব্দটি বসাইতে বলেন। তাহা হইলেই গ্রন্থের পূর্বতন উপদেশপূর্ণতা বজায় থাকিবে। কৌৎ এই ভাবেই গ্রন্থখানি লইয়া উন্নত হইয়া থাকিতেন। Kempis যেমন ভগবানে বিভোর, কৌৎ তেমনি Humanity লইয়া বিভোর। ভগবন্তরূপ যেমন ভগবানের হস্তচিহ্ন সর্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পান, কৌৎ তেমনি আহা, আচ্ছাদন, বাড়ী, ঘর, আইন, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি সর্বত্র Humanity-র হস্তচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া গদগদ হইয়া যাইতেন এবং আনন্দপরিপ্লুতভাবে তাহা কীৰ্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। সুইডেনবর্গকে লোকে বলিত God-intoxicated man—ভগবান লইয়া মাতোয়ারা। কৌৎকে তজ্জপ বলা যাইতে পারে, Humanity-intoxicated man—humanity লইয়া মাতোয়ারা।

৪ঠা আবার, ১৩১৮

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়\* মহাশয় গিয়াগুর্সের বাড়ী একশত ত্রিশ টাকা মাহিনায় কর্ম করিতেন। অনেক দিন হইল তিনি কর্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, এবং উক্ত হোর্স হইতে মাসিক ১৩০ টাকা পেন্সন পাইতেছেন। এখন তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি বলিলাম—“অনেকবার আপনার মুখে কলিকাতায় পুরাতন থিয়েটারের গল্প শুনিয়াছি। আজ সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন, বোধ হয় আপনার সম-সাময়িক অভিনেতা আর কেহ জীবিত নাই।”

তিনি বলিলেন, “হাঁ, ঠিক বটে; যাহাদের সহিত আমি ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম, তাঁহারা কেহই জীবিত নাই।

“তখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। চড়কভাঙ্গা রোডে (বর্তমান টেগোর কাসল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেন্টের অফিসের বড় বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্বল্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের দোতলায় আমাদের Rehearsal হইত, তালিম রাজেন্দ্রবাবুই আমাদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের এই Rehearsal প্রত্যাহ হইত না শুধু শনিবার ও বুধবার রাজিতে হইত। নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ কখনও তথায় আসিতেন না; একদিনমাত্র কেবল নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

“আমাদের সেই ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক অভিনয়ের পূর্বে একটিবার মাত্র শ্রাম-বাজারে থিয়েটার হইয়াছিল। লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একজন ধনকুবের ‘বিজ্ঞানন্দর’ অভিনয় করাইয়াছিলেন।<sup>১</sup> কিন্তু তখন আমি জন্মগ্রহণ করি নাই।

“‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্বল্লভবাবু দ্বিয্য ভূঁড়ি লইয়া মাধ্যম লম্বা টিকি বিলম্বিত করিয়া ত্রাঙ্কণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্তাধার। তাঁহার দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। একটি লখের দল বাজাইত। আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম। আমার বক্তৃতা ছিল—‘তাহার পর সেই আপনি অতীষ্টদেবাত্মিনিবিষ্ট আদিশ্বর—’ (ও কি ও, তুমি আমার বক্তৃতাটাও লিখিয়া লইতেছ যে? ছাপাইবে না কি?—আমি বলিলাম, “আজ্ঞা হাঁ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া যাউন।”)

\* ২১ এপ্রিল, ১৯২০ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১ নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে ১৯০৫ সালের ৬ই অক্টোবর অভিনীত হয়।—সং

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—“তাহার পর সেই আপন অভীষ্টদেবাভিনিষিট আদিশ্বর রাজ্যে কান্তকূজ হইতে সান্নিক বেদবিজ্ঞপঞ্চ বিপ্রকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। পরে তাঁহার সঙ্গত লইয়া সমাগমন পূর্বক যজ্ঞশীল আদিশ্বর মহারাজের আদেশানুসারে গোঁড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হওয়ায়, বজ্রাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন। যথা শান্তিল্য ভট্টনারায়ণ-বংশজাত আদি বরাহ বন্দ্য। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশপ্রসূত হুলোচন ভট্ট, ভরদ্বাজগোত্রে ত্রিহর্ষবংশোৎপন্ন ধূরন্ধর মুখোটি, সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গুলী ও স্বর্ধীর কুন্দ, বাৎসগোত্রে ছান্দডবংশপ্রসূত সুরভি ঘোষাল ও কবি কাঞ্চিলাল।’

“বক্তৃতাটা আর কত লিখিবে? আমি তখন অল্পবয়স্ক, কিন্তু অভিনয় করিয়া স্থখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলাম।

“থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্ব ছাতুবাবু (৮ আশুতোষ দেব) বাড়ীতে। ‘শকুন্তলা’র\* অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন Stage-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণীবেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল। পাইকপাড়ার রাজারা—প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের নিজ বাটীতে একটি রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ পণ্ডিতের ‘রত্নাবলী’<sup>১</sup> ও মাইকেল মধুর ‘শমিষ্ঠা’<sup>২</sup> অভিনীত হইল। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

“শকুন্তলা সাজিলেন শরৎবাবু। দৃশ্যস্ত—প্রিয়মাধব মাল্লক। ইনি রাণিমেলোজ্ঞানির

\* নাটকখানি, পুরাতন প্রসঙ্গ’ রচয়িতার স্বামীমহা ৮নন্দকুমার রায় প্রণীত। ১২৮০ সালে দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন :—

“১২৬২ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাবা নাটক রচয়িতাদের পক্ষেও আশংক্য বর্ণন হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্বপ্রথমে কলিকাতা নিবাসী ৮ আশুতোষ বাবুর বাটীতে তৎপরে জনাইনিবাসী জামিয়ার মুখোপাধ্যায়দ্বিগের ভবনে অভিনীত হয়।

“ইহানীচ পরম সম্মানভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনরল লিটন সাহেব বাহাদুর ও তৎপারিষদবৃন্দ বঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয়। অভিনয় কালে তাঁহার উপস্থিত থাকিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সে দিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।”

১ “.....শ্রীহর্ষের ‘রত্নাবলী’ নাটক অবলম্বনে স্বামিনারায়ণ তর্করত্ন উহা প্রণয়ন করেন।...এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৮৮ সনের, ৩১শে জুলাই, শনিবার।” (ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ‘খণ্ডীর নাট্যালয়ের ইতিহাস’)—সঃ

২ ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। (ঐ)—সঃ



বাড়ী কর্ষ করিতেন, Cashier ছিলেন। দুর্বাসা—গ্রে স্ট্রিটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ পরে, পুলিশের ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। অনন্থা—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের Interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়দর্শা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্থল মাঠার। আমি হইতাম কথমুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) Stage-manager ছিলেন। তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কাজ ছিল whistle দেওয়া, পটক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি।

“একটি কোঁতুককর ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভক্তলোকগণ যখন টিকিট দেখাইয়া উঠানে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের পোষাক দেখিয়া, ‘মহাশয়, Front seat’, ‘মহাশয় Side seat’ বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। অবশুই বাড়ীর কর্তৃপক্ষীদেরা এই ব্যাপারের জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না।

“একব্যক্তি ‘শকুন্তলা’র গান বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম। ভাল নামটি কি, তাহা আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। ঐ রকম দেখ, ধীরাজের সঙ্গে অনেকদিন একত্র নিমজ্ঞপাটিতে ও বড়লোকদিগের আসরে ফুটি করিয়াছি ও গান গাহিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের আসল নামটা কি তাহা জানি না; কখনও জানিতাম কি না, তাহা বলিতে পারি না।

“কবিচন্দ্র ছাত্তাবাবুর নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন—‘দেখ কবিচন্দ্র, গানগুলি যেন সুন্দর স্বরচিন্তিত হয়।’ কবিচন্দ্র বলিল—‘জয় জয় রাম সীতারাম’, (এই বুলি তাহার মুখে চকিষ ঘটাই ছিল) ‘আমি কি জানি না যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন? এমন গান গাহিব যে মেয়েরা উঠিয়া যাইবেন?’

“৩১৪ বৎসর পরে ছাত্তাবাবুর বাড়ী আমরা ‘মহাশেতা’ অভিনয় করি।<sup>১</sup> অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক এবং ক্ষেত্রমোহন সিংহ নায়িকা হইয়াছিলেন।

“থিয়েটারের তৃতীয় পর্ব—পাইকপাড়ার বাড়ীতে। ‘রত্নাবলী’ ও ‘শশিষ্ঠা’ অভিনীত হইল। আমি দর্শক হিসাবে গিয়াছিলাম। দৈত্য শাজিয়াছিলেন তারার্টাদ গুহ, শিবচন্দ্র গুহের পুত্র। বাগুবাজারের যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় যযাতি শাজিয়াছিলেন। গায়ক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে কুচবিহার-রাজ্যে একটা চাকরি পাইয়াছিলেন, শাজিয়াছিলেন শশিষ্ঠা। মাইকেল মধুর নাম তখন খুব জাহির হইয়াছিল।

“চতুর্থ পর্ব—কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিমোহন সরকার ওরফে ‘মণিলাভ’ অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। রামনারায়ণ পণ্ডিতের ‘বৌগংহার’ নাটক অভিনীত হয়।<sup>২</sup> আমি কর্ণ শাজিয়া ছিলাম। দুর্বোধনের স্ত্রী ভাহ্মতীর রূপ যেন Stage-এর উপর ঝলমল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভাহ্মতীকে দণ্ডায়মান দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী

১ মণিমোহন সরকার রচিত এই নাটকটি ১৮৮৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। (ঐ)—সং

২ ১৮৮৬ সনের ১১ই এপ্রিল অভিনীত হয়।—সং

আনন্দে হাততালি দিরা দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, জানি না।

“এইখানে একটি কথা, মজার কথা বলি শুন। কালীসিংহ একটি ভক্তলোকের ছেলেকে এমন স্নেহ করিতেন যে, তাহাতে সাধারণ মোসাহেবের দল ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য ঝাল ঝাড়িবার ব্যবস্থা করা হইল এই অভিনয়ের দিনে। যখন নিমন্ত্রিত ভক্তলোকগণ টিকিট দিয়া একে একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হইল। তাহাতে লেখা ছিল—

‘আর না পাইব যেতে,  
না পাব Lemon খেতে,  
তুমি ত এ সব সাধে  
বিসম্বাদ ঘটালে।

পেয়েছ ইংরাজি জুতো,  
মনোমত মজবুত,  
আমার রূপালে জুতো  
আর নাহি ঘটালে ॥

বিলাতি এসেন্স নানা,  
দেখেনি তোর নানী নানা,  
আপনি মেথছ কত,  
আমারে না মাথালে।

পুয়াতন মদ যত  
সব তব বাসগত,  
আপনি খেয়েছ দাঙ্গা,  
আমারে না খাওয়ালে ॥

“কে লিখিয়াছে এবং কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা কাগজও জানিতে পারি রহিল না।

“পঞ্চম পর্ব—সিঁদুরিয়া পটিতে মেট্রোপলিটান কলেজে ‘বিধবা বিবাহ’ নাটক অভিনীত হইল।<sup>১</sup> বিহারী চট্টোপাধ্যায় নায়িকা হইয়াছিলেন। পরে বিহারীবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে খুব যশস্বী হইয়াছিলেন।

“ষষ্ঠ পর্ব—ঠাকুরবাড়ী।

(ক) “প্রথম গোপীমোহন ঠাকুরের পুয়াতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে (তখনও

<sup>১</sup> উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত এই নাটকটি কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলীর যুবকদের উৎসাহে ১৮৭৯ সনের ২৩শে এপ্রিল মেট্রোপলিটান থিয়েটারে অভিনীত হয়। (ডঃ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘বঙ্গীয় নাট্যশালা’।) —সং

তিনি মহারাজা হয়েন নাই) বলিলেন—“আমি আপনাকে ঠিক “রত্নাবলী”র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।” তাঁহার রচিত ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম।<sup>১</sup> ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র Stage-এ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অল্পবোধে তিনি ‘কঞ্চুকী’ সাজিয়াছিলেন; দোড়িয়া Stage-এ আসিয়া করষোড়ে তিনি বলিলেন—“মহারাজ, মহারাজ, বড় বিপদ! ছোটরাণী নীলবীন্দর দেখে মুচ্ছা গিয়াছেন, আপনি গীত্র অন্তঃপুরে আসুন।”

“আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম, শরৎবাবু ছিলেন আমার Understudy। আমার অভিনয় দেখিয়া রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ এত প্রীত হইলেন যে, তিনি গ্রান্ রুমে আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া লইয়াছিলেন। বড় রাজাও খুসী হইয়া আমাকে বলিলেন—“Mohendra Babu, you are the second best বিদূষক I have seen.” কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, ফিনান্স আপিসের কর্মচারী, বড় রাজার বিশিষ্ট বন্ধু, তখনকার দিনে সব চেয়ে সেরা বিদূষক ছিলেন। পাইকপাড়ায় ‘শশিষ্ঠা’ ও ‘রত্নাবলী’র অভিনয়ে তিনি বিদূষক হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন,—Motion, স্বগতঃ, চমকে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিতেন।

“ফিনান্স আপিসের দীননাথ ঘোষ ছিলেন Stage Manager; শরৎ বাবু Prompter। তিনি Stage-এর ভিতর হইতে বাঁয়াতবলা বাজাইতেন। এইখানে বলিয়া রাখি যে, শরৎবাবুর মত পাখোয়াজ বাজাইতে সে সময়ে খুব কম লোক পারিত; বরোদা হইতে আগত পাখোয়াজের ওস্তাদ মৌলা বক্স ঠাকুরবাড়ীতে শরৎবাবুর বাজনা শুনিয়া তারিফ করিয়াছিলেন।

“ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটারের জন্য একটি কার্খানির্কীর্ষক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্য ছিলেন বিভাসাগর মহাপাত্র, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলী, দীন ঘোষ। এই কমিটি বাছাই করিয়া দিত, আমাদের মধ্যে কে কি সাজিবে।

(খ) “ঠাকুরবাড়ীর দ্বিতীয় পর্ব—মহারাজা (তখন তাঁহাকে আমরা বড় রাজা বলিতাম) নিজ বাড়ীতে রত্নমঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন। তথায় তাঁহার স্বরচিত ‘বিভাসূন্দর’ প্রথম অভিনীত হইল।<sup>২</sup> কমিটি বাছাই করিলেন;—বিখ্যাত ঋপদ খেয়ালের ওস্তাদ মদনমোহন বর্ম্মন হইলেন ‘বিভা’, আমি হইলাম ‘সূন্দর’।

“তৎপরে ‘রুক্মিণী-হরণ’<sup>৩</sup> ও ‘মালতীমাধব’<sup>৪</sup> অভিনীত হইল। মালতীমাধবে আমি ‘মকরন্দ’ সাজিয়াছিলাম। ক্ষেত্র সেন ‘মালতী’ ও যদু চাট্টোয় ‘মাধব’

১ ১৮৫৯।—সং

২ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫।—সং

৩ রামনারায়ণ তর্করত্ন—১৩ই জানুয়ারী ১৮৭২।—সং

৪ এ —১৪ই জানুয়ারী, ১৮৬৯।—সং

সাজিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোতুকনাট্যও অভিনীত হইত, যথা,—‘উত্তর সৰুট,’<sup>১</sup> ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেণী’<sup>২</sup>, ‘বুঝলে কি না’<sup>৩</sup>। শেখোক্ত নাটিকা মহারাজের স্বরচিত। একটিকে লক্ষ্য করিয়া একটা ছোকরা চুইমি করিয়া একথানা কেতাব লিখিল, ‘কিছু কিছু বুঝি,’—তাহার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) “মহারাজের বাগানে—‘মালতামাধব’ অভিনীত হইল। এইবার আমি ‘মাধব’ সাজিয়াছিলাম। ‘মালতী’ ক্ষেত্র পেন, আর হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অশ্বোরথ’ যোগী’। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন; ইহার পূর্বে রাজবাড়ীতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পালা শেষ হইলে আমরা বেশ পরিবর্তন করিতে যাইতেছি, এমন সময় মহারাজা বলিলেন—‘পোষাক ছাড়িবেন না, লাট সাহেব তলব দিবেন। কথা কহিতে হইলে খবরদার Sir বলিবেন না, My Lord বলিবেন।’ মাইকেল মধুও খুব করিয়া আমাকে শিখাইলেন, My Lord বলায় ভুল না হয়।

“হঠাৎ আমাকেই ডাকা হইল। বড়লাট ডাকিতেছেন! মাথা ঘুরিয়া গেল। স্বপ্নাবস্তার মত চলিলাম। যাইবার সময় মনে হইল, যেন কাণের কাছে বড় রাজা বলিলেন, ‘My Lord ভুলিবেন না’; মনে হইল যেন মাইকেল মধু বলিয়া দিলেন, ‘সাবধান! My Lord!’ লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘Were you the hero when I came to his residence?’ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর হইল, ‘Yes, Sir!’ তৎক্ষণাৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন Yes, my Lord; there were two heroes, he was one of them.’ বস্! সব মাটি! সহস্র দর্শকের সম্মুখে দোপালোকিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া মনে বড় সাহস হইয়াছিল। এই লাট সাহেবের সম্মুখেও দুইবার অভিনয় করিলাম। তবে কেন এমন হইল? এমন না হইলে গিল্যাণ্ডের হোসে কেরাণীগিরি করিব কেন?

“আর একটি ব্যাপার বলি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার বামুনে কপাল কত মন্দ। দর্শকবৃন্দের মধ্যে বেওয়ার মহারাজা ছিলেন। তিনি ছ’ গাঁটরি কাম্বারি শাল ও এক খান মোহর আনিয়া বড় রাজাকে বলিলেন—‘আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এইগুলি আমি অভিনেতৃগণের মধ্যে বিতরণ করি।’ বড়রাজা বলিলেন, ‘ও কথা মনেও আনিবেন না, উহার সকলেই আমারই মত ভ্রশ্ননোক, উহার কখনই এরূপ দান গ্রহণ করিবেন না।’ আমরা সকলেই বড় রাজার সমকক্ষ! দান গ্রহণে অসমর্থ! ওগো বিদেশী রাজা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে আমি ঠাকুরবাড়ার বড় রাজাবাহাদুরের সমকক্ষ নই, নই, নই! আমি অত্যন্ত দীন দীন ব্রাহ্মণ, গিল্যাণ্ডের হোসের সামান্য কেরাণী মাত্র। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি, রাজার দান গ্রহণে অসমর্থ হইব কেন?

১ রামনারায়ণ তর্করত্ন—১৩ই জামুয়ারী, ১৮৭২।—সং

২ মধুসূদন দত্ত—৮ই মার্চ, ১৮৭৩।—সং

৩ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬।—সং

“লাট লাহেবের কাছে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। কান্দীয়া শাল ও মোহরের ধান বুদ্ধি-বিশ্বাস ঘটাইয়া দিল। বড়রাজার Prestige অক্ষুণ্ণ রহিল। সমস্ত আকাশ ছড়িয়া নক্ষত্রপুঞ্জ আমার দুঃখে হাসিতে লাগিল।

“ইহার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা হইলেন, এবং তদুপলক্ষে আবাদিসের প্রত্যেককেই এক এক ঘোড়া গঙ্গাজলে শাল উপহার দিলেন।

“কন্থম পর্ব। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি সান্তালদিগের বাড়ীতে<sup>১</sup> পেশাদারি থিয়েটার খুলিলেন। ‘নীলদর্পণ’ অভিনীত হইল।<sup>২</sup> তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক মাজিত।

আমরা retire করিলাম।

\* \* \* \*

১৫ আষাঢ়, ১৩১৮

মহেন্দ্রবাবুকে বলিলাম “মুখ্যো মহাশয়, আজ এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিখানি পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি অত্যন্ত ঐতিহাসিক বলিলেন, ‘মহেন্দ্র বাবু আমার বালাবন্ধু, বোধ হয় আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়। তিনি তোমাকে যে বাঙ্গালা Stage-এর ইতিহাস দিয়াছেন, এমনটি আর কেহ দিতে পারিবে না। তাঁহার যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন তিনি “চার এয়ারের তীর্থযাত্রা” নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।<sup>৩</sup> আমার দাদা সেই পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলেন, “মহেন্দ্র যে এমন বই লিখিতে পারে, তাহা কে জানিত? বাস্তবিক ছেলেটি একটি genius।” “কুলীন কুলসর্কষ” নাটকের অভিনয় যখন দেখিতে গিয়াছিলাম তখন বলিতে পারি নাই যে মহেন্দ্র অভিনয় করিল।’

“মুখ্যো মহাশয়, আপনার সেই পুস্তক একখানি দেখিতে পাই কি?

তিনি বলিলেন—“দুঃখের বিষয়, আমার নিকট একখণ্ডও নাই। আর যে থিয়েটারে মতিয়াছিলাম, তখন আর ওসব খেয়াল করি নাই। শনিবারে প্রায়ই বড় রাজার Emerald Bower-এ কিম্বা ছোট রাজার ‘প্রমোদ-কাননে’ কিম্বা ছাত্তুবাবুর পেন্সিলি<sup>৪</sup> বাগানবাড়ীতে গান বাজনা, আনন্দ উৎসবে কাটাইতাম। বড় রাজার অল্পদিন অক্ষয় তৃতীয়া। ঐ উপলক্ষে কিছু বেশী ধুমধাম হইত। ধীরাজ (ও ইদানীং প্যারীসোহন কবিরত্ন) গান বাধিতেন, আমি তাঁহাদের সহিত গাহিতাম। ছাত্তুবাবুর বাগানে নীলনাথব ডাক্তার আমার সাক্ষরদ ছিলেন।

“এক এক দিন ছোট রাজা আসিয়া আমাদের গানে যোগ দিতেন। এক দিন

—) ১ টিপ্পরে ‘বড়িওয়াল বাড়ী’ নামে খ্যাত মধুদেবন সান্তালের’ বাড়ীতে। (ডঃ ব্রজেননাথ

১ গায় কৃত ‘বঙ্গীষ নাট্যশালার ইতিহাস’)—সং।

২ ৩ ডিসেম্বর, ১৮৭২।—সং

৩ রাশি—সং

৪ পানিহাটি।—সং

তিনি বলিলেন, ‘ধীরাজের সেই গানটার অর্থ আমি আজ নিশ্চয়ই বাহির করিব,  
তোমরা সেই গানটা গাও ত ?’ আমরা গান ধরিলাম—

আমায় হের হর-অঙ্গনা  
আমি ফলার করুব না,  
তুমি কালশী গোফুলবাদী  
ঘরে চাল বাড়ন্ত ঘুচুলো না ।  
গেল ভজার মায় কাঁধা,  
মোলো রাজা মাকাতা,  
ইচ্ছের আরক্ত হবে ওষধ পাই কোথা ?  
আবার নদের রাজার রাজ্য গেল,  
আমায় আইবুড় নাম ঘুচল না ।  
আমি ফলার করুব না ।  
কাগে নিয়ে গেল কাণ,  
তোমায় দিব থইয়েন ধান,  
আউটে ক্ষীর কোরো,  
না হয় পেতে শুয়ো প্রাণ ।  
আবার শিবে শুড়ি কাটা গেল,  
আমায় খেউরি হওয়া হোলো না ।  
আমি ফলার করুব না ।

“দেখ, যাহার মাথামুণ্ড কোনও অর্থই করা যায় না, ছোট রাজা তাহার একটা  
সোজা মানে বাহির করিবেন কি করিয়া ?

“ধীরাজ আবার গান ধরিত ( এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, কোনও একটি ব্যক্তি-  
বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই গান রচিত হইয়াছিল ) ; ধীরাজ গান ধরিত—

কোম্পানীর চাকরি গেছে, আ যদি  
নাই সে শরীর  
রাই কিশোরীর,  
আগে পৃথিবীতে পা দিতেন না,  
এরি ছিলেন অহকারী ।  
পির গরু নাই বিচার,  
চপ্ কটলেট অনিবার,  
আহার হোতো না বাবুর  
ধিনে সে ‘কাউল করি’ ।

বোমারের Beer যেতো, -  
 Moselle এতে মাখা ধরতো,  
 বাজে লোকের বরাদ্দ ছিল ব্রাণ্ডি ।  
 এখন dish হয়েছে কলাপাত,  
 চামচে হয়েছে হাত,  
 ব্রাণ্ডির বদলে এখন

যা করেন মা ধাতেশ্বরী ।

“আমি বুদ্ধ হইয়াছি, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু এই সকল গান যখন আমার মাথার মধ্যে ঝঞ্জিয়া উঠে, তখন আমারও দেহে চাঞ্চল্য অনুভূত হয় । Auld Lang Sync<sup>১</sup>-এর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝিবে ? কিন্তু যদি আমার কথায় সে সময়কার একটি চিত্রও তোমাদের মনোমধ্যে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব ।”

---

১ এটি একটি স্কটল্যান্ডের জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত । পরিশিষ্টে উল্লিখ্য ।—সং

## এগার

১লা আশ্বিন, ১৩১৮

পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, “আজ আপনি অমুগ্রহ করিয়া কবি বিহারীলালের কথা বলুন।”

তিনি বলিলেন—

“বিহারীলাল আমার খুব বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। আমা অপেক্ষা তিনি ৩৪ বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু সে কারণে আমাদের উভয়ের গলায় গলায় ভাব হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকার, তেজীমান্ ও অকুতোভয় ছিলেন। আমি চিরকালই ক্ষীণজীবী, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এমন কি ভক্তি বলিলেও হয়, ছিল। সাংসারিক অভিজ্ঞতা, লোকজ্ঞতা, আমা অপেক্ষা তাঁহার অনেক অধিক ছিল; কিন্তু আমার এই সকল হীনতাসত্ত্বেও আমি লেখাপড়ায় অগ্রসর থাকতে উভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা ঢেক ফাঞ্জিল হইয়া পরস্পর অনেকটা পোষাইয়া গিয়াছিল এবং উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও স্নেহাহুগত্য ঘটিয়াছিল।

“বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন। আহিরীটোলার নিকটে তাঁহার বাটী, এবং অহিরীটোলার ছোকরারা দাঙ্গাবাজির জন্য কতকটা প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোনও এক বালক বালাকালোচিত বিবাহকলহপ্রসঙ্গে, লাঠির মধ্যে গোপন করা থাকে যে গুপ্তি তদ্বারা তাঁহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, রক্তে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছিল। সন্নিকটে একজন পাহারাওয়াল ছিল, সে রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘বাবু কি হইয়াছে? কে আপনাকে মারিয়াছে?’ বিহারী পুলিশে জানান কাপুরুষতার কার্য্য বিবেচনা করিয়া কহিল, ‘কেহ আমাকে মারে নাই, চোঁকাটে মাথায় চোট লাগিয়াছে।’ আঘাতকর্ত্তা বালক তখনও পালায় নাই, নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, এবং বিহারীর কথা শুনিতে পাইল। বিহারী পুলিশে জানাইতেছে না দেখিয়া তাহার দ্বারা একটা উৎকট ভয় জন্মিল; সে ভাবিল, বিহারী নিজেই তাহাকে খুন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুলিশের কাছে গোপন করিয়াছে। এই ভয়ে সে এতদূর অভিজুত হইল যে, সেই দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, নিজে আসিয়া বিহারীর পারে ধরিয়া দাঙ্গা মিটাইয়া ফেলিল।

“বিহারীর লেখাপড়ার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মুক্তবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইঙ্গুল কলেজে বাধাবাধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তি-বৈশিষ্ট) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুক্তবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল; সাজ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষকও বড় ‘কেও কেটা’ ছিলেন না। তিনি আমাদের লক্ষপ্রতিষ্ঠ ভাইল চেয়ারম্যান নীলাধর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ায়



অনেক বালককে মৃদুবোধ পড়াইয়াছিলেন। মৃদুবোধ সাক্ষর হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ যথা,— রঘুবংশ, কুমারলতাব, আর বোধ হয় ভাববি, মৃত্যুদাক্ষল, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুন্তলার এক অপূর্ণ সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন; নাটকের প্রাকৃত ভাষা লাল অক্ষরে, তাহার ঠিক, নীচেই প্রাকৃতের সংস্কৃত অনুবাদ কাল অক্ষরে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় হ্রস্ব ৫৬ ছন্দ মূল সংস্কৃত, বাকি অংশ ইংরাজি ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইংরাজি ব্যাখ্যার মধ্যে আবার স্থানে স্থানে তিন জন টীকাকারের সংস্কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ছিল কিন্তু এই সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি ইংরাজি অক্ষরে ছাপা ছিল। কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি মুগ্ধকার্য্যে কেহ কখনও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; বইখানির দাম হইয়াছিল উনিশ টাকা। বিহারীদের যদিও অল্পকষ্ট ছিল না, তথাপি ১২ টাকা দামের একখানি শকুন্তলা কিনেন এরূপ সঙ্গতিপন্নও তাঁহারা ছিলেন না। বিহারীর পিতা যাজ্ঞাক্রিয়া করিতেন, অনেকগুলি ধনবান স্ববর্ণবণিক তাঁহার যজ্ঞমান ছিল। অজ্ঞান জাতির পুরোহিতদিগের অপেক্ষা স্ববর্ণবণিক জাতির পুরোহিতদিগের আর অনেক অধিক। বিহারী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাই তাঁহার আদার অগ্রাহ্য হয় নাই; পিতা ১২ দ্বিগুণ পুত্রকে ‘শকুন্তলা’ কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা একত্রে পড়িলাম। বোধহয় বিহারীর তখন ইংরাজি ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজীও তিনি কতক দূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বায়রণের Childe Harold, এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দু’পাচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে অতি সামান্য সাহায্যেই তিনি ভালরূপ তাৎপর্য্য করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল; বাঙ্গালাসাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দ্বাতারায় ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। তিনি অল্প বয়সেই পদ্ম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পদ্মগুলিতে প্রথমাবধিই আমি একটি নৃতন ‘ধর্ভা’ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহা আমার খুবই ভাল লাগিত; এবং সেই ‘ধর্ভা’ উত্তরকালে তাঁহার সমস্ত লেখাতেই লক্ষিত হয়। আমার দ্ব্যেষ্ঠ তাঁহার পদ্মরচনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং উল্লিখিত নৃতনের জন্ত বিহারীকে উৎসাহ দিতেন। সেই নৃতনখ আমি বিরূপে বুঝাইয়া দিব, তাহা ঠাণ্ডাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইংরাজিতে শোণ ও তাঁহার অল্পসংখ্য কবিত্বের পর জ্যাব, কাউপার, বায়রণ যে এক নবীনতা আনিয়াছিলেন, বিহারীর নবীনতা কতকটা সে প্রকারের

ছিল। ভাবব্যঞ্জক কোনও প্রচলিত শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না ; এবং সেকেলে ভাব সকল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন।

“তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা ‘সঙ্গীতশতক’ পাঠ করিলে ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পাঠক-সমাজে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থরচনার দোষে নহে, পাঠকদ্বিগের সহৃদয়তার অসম্ভাবে। ‘সঙ্গীতশতক’ গ্রন্থ এক শত বাঙ্গালা গানে গ্রন্থিত। গানগুলি ‘কাণ্ড ছাড়া গীত নাই’ সে ধরনের গান নহে। কোনটিতে তাঁহার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোনটিতে একটি সুন্দর বর্ণনা বা একটি চমৎকার লক্ষ্যার আকাশের বর্ণবৈচিত্র্য বা একটি ফুলের বাগানের কথা ইত্যাদি। সর্বত্রই রচনা এরূপ স্থূললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িতে পরম আপ্যায়িত হইতে হয়। বিহারীর গলার স্বর ছিল না কিন্তু স্বরবোধ ছিল, এবং অনেকগুলি স্বর তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। অনেক গান আমার নিজে নিজে গাহিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। একটি গান—

( স্বর বেহাগ )

নধর নূতন তরুণর কিবা সুশোভন  
সাদরে দিয়েছে এসে লতাবধু আলিঙ্গন।  
উভয় উভয় পাশে, বাঁধা বাহু-শাখা-পাশে  
কুসুম বিকাশি হাসে ভালো ভ্রমর-গুঞ্জন।  
মিলায়ে বায়ুর স্বরে, কুহুস্বরে গান করে  
নাচে আনন্দের ভরে ক’রে বাহু প্রকম্পন।

আর একটি গান—

( পূরবা )

আজি লক্ষ্য লাভিয়াছে অতি মনোহর  
পরিয়াছে পাঁচরঙ্গ সুন্দর অম্বর।  
হাসি হাসি চন্দ্রানন, আধ ঘন আবরণ  
আধ প্রকাশিত আভা কিবা শোভাকর।  
কালো মেঘ কেশমাঝে, সাদা মেঘ সিঁথি সাজে,  
তার মাঝে জলে মণি তারকাহৃন্দর।  
নীলজলধর পরে, যেন নীল গিরিবরে,  
দাঁড়ারে রয়েছে রূপে উজ্জলি অম্বর।

এরূপ মূর্তিমান লক্ষ্য-বর্ণনা আমার অতি অপূর্ব বোধ হয়। আর একটি গান—

( সোহিনী )

কোথায় রয়েছ, প্রেম, দাঁও দরশন  
কাতর হয়েছি আমি করি অবেষণ ।  
কপটতা ক্রুরমতি, বিষময়ী বক্রগতি  
দংশিয়ে তোমারে বুঝি করেছেন নিধন ।

আর একটি গান—

( ঝিঝিট )

প্রাণ প্রেমসী আমার,  
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার ।  
হেরিলে তব বদন, যেন পাই ত্রিভুবন  
অন্তরে উছলি উঠে আনন্দ অপার ।

আবার—

( বাহার )

হায়, স্তম্ভময় ফুলবন হয়েছে দাহন ।  
নীরব এখন কোকিলের কুহুরব অলির গুঞ্জন ।  
আজ পুণিমার ভাষে, ফুল ফুটে নাহি হাসে,  
করে না মধুর বাসে প্রমোদিত বন ।

একশতটি গানের প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি অপূর্বতা আছে । বিহারী বিশেষ যত্ন করিয়া উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে কিছু অর্থব্যয় করিয়া গানগুলি ছাপাইয়াছিলেন । But the book fell still-born from the press, পকাশখানিও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ । এইত বাজালা পাঠকসমাজের সহৃদয়তা ! কিন্তু বিহারী নিরুৎসাহ হয়েন নাই । তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার রচনাতে পদার্থ আছে । এই বিশ্বাসে ভর্য করিয়া তিনি কবিতা রচনা ছাড়েন নাই ।

“ইহার পর তিনি ‘বঙ্গসুন্দরী’, ‘সুন্দরী কাব্য’, ‘সাধের আসন’, ‘সারদা মঙ্গল’ এই কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট অতি চমৎকার গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন । তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল যে, আপাততঃ লোকে যতই অগ্রাহ্য করুক, কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার রচনার প্রতি পাঁচজনের লক্ষ্য পড়িবে এবং তাহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে । অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার পুত্ররা তাঁহার গ্রন্থাবলি ছাপাইয়াছেন । আজকাল বাজারে সেগুলির কাঁটিত কিরূপ আমি জানি না, এবং বিহারীর উল্লিখিত ধ্রুব জ্ঞান সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না তাহাও বলিতে পারি না । তবে তাঁহার রচনার প্রতি আমার সেই প্রকার admiration এখনও জাজল্যমান রহিয়াছে, এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের ক্ষয়ও সেই admiration প্রস্ফুরিত হইয়াছে দেখিতেছি । ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ‘সাধনা’ নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি বিহারীর বিষয়ে এত প্রশংসাপূর্ণ এক প্রবন্ধ<sup>১</sup> লিখিয়াছিলেন যে, তাহা আমি হেন বিহারীর তত্ত্বও

<sup>১</sup> ‘বিহারীলাল’, সাধনা, আবার ১৩০১

যথেষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করি। এমন কি রবি ঠাকুর এক প্রকার নিজস্বার্থেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পঞ্চরচনা বিষয়ে তিনি বিহারীর ছাত্র, তাঁহার লেখা হইতে অনেক hint পাইয়াছেন।

‘বঙ্গসুন্দরী’ একখানি অতি সুললিত পঞ্চগ্রন্থ। ইহাতে নারীজাতির সুকোমল চরিত্র পরিপাট্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বিহারী কৌত্তের বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ‘বঙ্গসুন্দরী’র মধ্যে কৌত্তের ভাব অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নারীজাতিকে বিহারী কোমলতা, করুণাপরায়ণতা এই সকল গুণে পুঙ্খ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন, এবং সেই অভিপ্রায় উক্ত কাব্যে সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

‘স্ববাবলা’ কাব্যের চমৎকারিতা সমালোচনা দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে। স্বয়ং পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য যিনি অনুভব করিতে না পারেন, কাব্যের ভাবগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না।

‘সাধের আসন’ ও ‘সারদামঙ্গলের’ বিষয়েও ঐকমত্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। তবে আমার নিজের মত বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, ‘সারদামঙ্গল’ বিহারীর শেষাংশেই সময়ের রচনা। আমার বোধ হয়, তাঁহার জীবনের এই অংশে তাঁহার হৃদয়ে জর্জরিতবোধের একটু অক্ষুণ্ণতার ভাব (Vagueness) আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিতেছি। আমার নিকট যাহা অক্ষুণ্ণ বলিয়া প্রত্যয়মান হয়, আমি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম ভাবগ্রাহী ব্যক্তির নিকট তাহা সেরূপ না বলিয়া বোধ হইতেও পারে। ভাবগ্রাহিতা-বিষয়ে আমার আত্মশ্রদ্ধা নাই। বিজ্ঞানের পরিষ্কৃতিত আমার চিত্ত কিছু পছন্দ করে, হৃতরাং আমি যাহা অক্ষুণ্ণ বলিব, তাহার মধ্যে হয়ত স্বেচ্ছাভিত্তিক তত্ত্ববিশেষ নিহিত আছে। আমি ত কোন কীটাপুঁকীট—নিউটনের মত মহীয়ান পুঙ্খ মিল্টনের Paradise Lost পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘What does it prove?’ ইহাতে প্রমাণ হইল কি? কিন্তু তাহা বলিয়া Paradise Lost কেহ অনাদর করে না। লোকে কেবল এই মাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, নিউটন বিজ্ঞানে বডলোক হইলেও কাব্যশাস্ত্রে বালকের স্থায় ছিলেন।

‘যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী ‘সাধের আসন’ লিখেন।

‘বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিছা প্রথম উঠতি বয়সে যৎসামান্য কিকিং চরিত্রস্থলন হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যতদিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্মলস্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। ভক্ত্যন্ত আমি যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্যপাতীত।

আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ইহা আমি অত্যন্ত স্নান্য বিষয় ভাবিতাম। একবার মাত্র তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল কিন্তু অল্পকাল পরেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে আমারই সম্পূর্ণ দোষ। তাহাতে আবার পূর্বতন সম্ভাব পুনরুজ্জীবিত হইল এবং আমি দেখলাম যে আমার প্রতি বিহারীর স্নেহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

“তাঁহার রচনাগুলি সর্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হই বলিতে পারি না।

“দেখিতে বিহারী প্রথমে যে প্রকার বলিয়াছি, যাবজ্জীবন সেই রকমই ছিলেন, দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়াদেহ ও দৃষ্টপুষ্ট। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপ-ছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার ক্রীক্ষেত্রে তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে তৎকাল প্রচলিত নিয়মামুসারে হাঁটাপথে যাপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যহ ১০।১২ ক্রোশ হাঁটিয়া এবং চিড়া মুড়কি দুগ্ধ দধি মৎস্য ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর দৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালীজাতির সেরূপ খুব কমই আছে।

“একবার তাঁহার সহিত গঙ্গাতীরে ট্রাও পথ দিয়া আসিতেছিলাম। এক জন গোরা আমাদিগের সামনা সামনি হইল। এরূপ স্থলে প্রায় বাঙ্গালীকেই পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, গোরা সোজা চলিয়া যায়। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, গোরাটি বিহারীর মূর্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখপানে একবার তাকাইয়া আপনা হইতেই পাশ কাটাইল; আমরা দু'জনে সোজা চলিয়া আসিলাম।

“আর একবার, বিহারীর মুখে শুনিয়াছি যে, বড়বাজারের বাঁশতলার গলির ভিতর দিয়া মহাসমারোহে বর যাইতেছিল। অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে বিস্তর লোক বর দেখিবার জন্ত গোলমাল ও ছটোপাটি করিতেছিল। এরূপ স্থলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইতেছিল; পুলিশের লোক দু'ধারি দাণ্ডা চালাইতেছিল; তাহার মধ্যে একজন গোরা কনটেবল ছিল, সে আবার একটু অধিক মাত্রায় ঐ কাজ করিতেছিল। বিহারী সেই সময়ে পথের ধারে এক বোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দিকে দাণ্ডা উত্তোলন করিল। গোরা রাস্তায়, বিহারী একটু উচ্চ স্থানে; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, গোয়ার মার খাইতে হয়। তখন তিনি আর কিছু না করিয়া অগ্নানবন্ধনে গোয়ার বুকের উপর এমনই সজোরে এক লাথি হাঁকিয়াছিলেন যে তাহাকে চিংপাত হইতে হইল। সেই সময়ে ভিড় ভয়ানক বাড়িয়া গেল। গোরাটি উঠিয়া অত ভিড়ের মধ্যে বিহারীকে ঠাহর করিতে পারিল না। বিহারীও পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে পশ্চাৎপদে সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।”

## বার

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আবার তাঁহার পূর্ব-স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, “দ্বারি বাবুর মৃত্যুর অনেক দিন পরে তালতলায় নীলমণি কুমারের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি Positivist Club স্থাপিত হয়। সে সময়ে কয়েকজন ইংরাজ Positivist আমাদের দেশে ছিলেন; সিভিলিয়ন গেড্জ (Geddes I. C. S.) খুব পণ্ডিত ছিলেন, বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সহিত positivism লব্ধকে আমার আলাপ হইয়াছিল কি না স্মরণ হয় না। কটন, বেভরিজ, হ্যাগার্ড এবং আরও ২।১ জন ছোকরা সিভিলিয়ন positivist বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেই ছোকরা সিভিলিয়ন দুইজন বিশেষ কোন অপকর্ষ করায় সার্বিস্ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ইংরাজরা আমাদের ক্লাবে আসিতেন না। বাল্‌গানী সভ্যদিগের মধ্যে ছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), ছোট আদালতের জজ K. M. Chatterjee, হাইকোর্টের অহুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, আমার ছাত্র নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার।

“ইহারা সকলেই যে পুরা কৌতের শিষ্ট ছিলেন তাহা বলা যায় না; কিন্তু Humanity-র কার্য্যে জীবনকে পর্য্যবসিত করা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যকর্ম্ম এই মতটি সকলেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পূর্ণ কৌতের মতাবলম্বী ছিলেন। শেষাংশেই তাঁহার বৌক হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত কৌতের মত কিছু কিছু পরিবর্তিত করা আবশ্যিক। এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি Humanity-র নাম দিতে চাহিয়াছিলেন, ‘নারায়ণী’। এতদ্ব্যতীত কৌতের অভিপ্রায় ছিল যে Humanity-র মূর্ত্তি যিহু খৃষ্টের জননী Madonna-র প্রতিকৃতির অল্পরূপ করিতে হইবে। ম্যাডোনা যেন একটি দুঃখপোষ বালক কোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ইহাই ভবিষ্যতে visible representation of Humanity বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু যোগেন্দ্র বলিতেন যে, ষাগ্‌রাপর্য্য মূর্ত্তি আমাদের দেশের লোকের ভাল লাগিবে না। সেই জন্য তিনি নারায়ণীর একটি ছবি প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন, কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা ও কপালে লিন্দুর দেওয়া নারী একটি শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত যোগেন্দ্র শেষাংশে কৌতকে ঋষি নাম দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার একটু বাদানুবাদও হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, অমরকোষে লিখিতেছে, ঋষয়ঃ সত্যবচনঃ অর্থাৎ ঋষিরা সত্যবাক্যী; ইহার অর্থ সাধারণ সত্যবাদী নহে, ইহার অর্থ বাক্‌লিঙ্গ; যে ব্যক্তির এমন ক্ষমতা আছে যে, যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে, যেমন শাপ দেওয়া ও বর দেওয়া, তিনিই প্রকৃত ঋষিপদ-ব্যাচ্য। ঋষি শব্দের প্রাথমিক অর্থ যে এই প্রকার

সীমিত (limited) তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না। যোগেন্দ্রের সহিত বাদানুবাদ প্রসঙ্গেই সর্বপ্রথম আমার মনে এই অর্থের স্ফুর্তি হইল। এ কথা আমি যোগেন্দ্রকে জানাইয়াছিলাম; এবং সেই নিমিত্ত কৌৎসে নাম দেওয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। যোগেন্দ্র কিন্তু আমার এই পরাধুখতাদর্শনে কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যোগেন্দ্র কৌৎসের যে হিন্দুমানি সংস্করণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা আমি বিশেষ পছন্দ করিতে পারি নাই। কটন প্রভৃতি ইংরাজ Positivist-রাও যোগেন্দ্রের নারায়ণীয়ুতির বড় একটা অল্পমোদন করিতে পারেন নাই। উক্তপ্রকার প্রবণতার বশবস্তী হইয়া যোগেন্দ্র আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জবাকুসুমসন্দেশ প্রভৃতি সূর্যের স্তব পূর্ণাস্ত Positivism ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সমস্ত উত্তম দেখিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম, পাছে জিনিষটা বিবেচক লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ইহার পর অল্পকাল মধ্যেই যোগেন্দ্র লোকলীলা সম্বরণ করিলেন; সুতরাং এই সকল উত্তমও বন্ধ হইয়া গেল।

“যোগেন্দ্রের মৃত্যুর পরে এ দেশে Positivism-এর আর কেহ পাণ্ডা রহিল না। এখন ত ইহা এক প্রকার নিভ্রাবস্থায় রহিয়াছে। যদিও অবিক্রিত ভাবে কোনও কোনও ব্যক্তির ইহার দিকে ঝোঁক থাকে, তাহার প্রকাশ নাই; পাঁচ জন একত্র হইয়া সমালোচনা করিবারও কোনও ব্যবস্থা নাই। ফলতঃ আমার বোধ হয় যে, এ দেশ এখনও কৌৎসের ধর্মের জ্ঞাত পরিপক্ব হয় নাই; কখনও যে হইবে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। যখন যুরোপেই উহা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তখন এ দেশের কথা ত অনেক দূরে। কৌৎসের উৎসাহী শিষ্যেরা খুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন বটে যে, কালসহকারে তাঁহার ধর্মের প্রাধান্য হইবেই হইবে, কিন্তু আমি সে ভরসা তত দূর করি না। এত বড় বড় লোককে হার্বার্ট স্পেন্সার ও মিলের এত গোঁড়া দেখিতে পাই যে, সেই স্রোত কোন দিক দিয়া বন্ধ হইবে তাহা কিছুতেই ঠাহরাইতে পারি না।

“তালতলায় আমাদের ক্লাবের যে অধিবেশন হইত, তথায় কৌৎসের কোন এক গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ প্রথমে পাঠ করা হইত; পরে তৎসম্বন্ধে যাহার যাহা মন্তব্য উপস্থিত হইত, তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। সভার অধিবেশন দুই এক বার কে. এম. চ্যাটার্জির বাড়ীতেও হইয়াছিল। সেই সময়ে চ্যাটার্জি এক একটি বক্তৃতা দিতেন। ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি, যিৎ খুঁট ও তাঁহার দ্বন্দ্ব শ্রিত্য যে জ্যোতিষশাস্ত্রের রূপান্তর বিশেষ, এ idea-টি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কোনও কোনও যুরোপীয় চিন্তায়িতা ইহা প্রথম প্রবর্তিত করিয়া দিয়া থাকিবেন। খুঁট ধর্মের সাংঘাতিক বিরোধী এই প্রকার কতকগুলি মত সময়ে সময়ে যুরোপে দেখা দিয়াছে। দেখ, Strauss নামক পণ্ডিত কর্তৃক প্রণীত *Leben Jesu* নামক গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব হইবা মাত্র খুঁটানমণ্ডলি ভক্তিত, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য-

বিমূঢ় হইয়াছিল ; কিন্তু অল্পকাল গতেই খুঁটানেরা এরূপ প্রক্রিয়া করিয়াছে যে, ঐ গ্রন্থখানি এখন কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ । কৌৎস একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যীশু খৃষ্ট খুঁটান ধর্মের নামমাত্র প্রবর্তক , প্রকৃত প্রবর্তক লেপ্ট্‌ পল । যেমন বুদ্ধের বিষয় তেমনই কোনও কোনও ব্যক্তি যীশু খৃষ্টের বিষয়েও সন্দেহ করেন যে, ঐ নামে কেহ কখনও ছিল কি না । কিন্তু এই সকল ধারণার বনিয়াদ কিছুই উপলব্ধি হয় না । হয় ত খুঁটানদিগের দোঁর্দ্দণ্ড প্রতাপধারা সে সকল জন্ম হইয়া গিয়াছে । মিল কিন্তু বলেন, Bless them that curse you, Love them that hate you, Do good to them that spitefully use you—এ প্রকার কথা বলিবার লোক কল্পনার দ্বারা নির্মিত হইবার নহে । সত্য সত্য তেমন মানুষ অবশ্যই জন্মিয়া থাকিবে । মিলের এই কথাটা অনেকাংশে মনে লাগে বটে ; কারণ কল্পনা যতই স্বাধীন হউক, তথাপি উহা সীমাবদ্ধ । এ দিকে প্রকৃতির ক্ষমতা এত বেশী যে সময়ে সময়ে এমন এক একটা সত্য ঘটনা ঘটয়া উঠে স্বাভাবিক নিকট কল্পনা অপেক্ষ হইয়া যায়, যথা হানিবল, নেপোলিয়ন, জোন অব্‌ আর্ক, শার্লট কর্দ্দে ।”

পণ্ডিত মহাশয় চূপ করিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত আপনার কখনও Positivism সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল ?” তিনি বলিলেন “না—না তবে ঘটনা চক্রে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি কৌৎসের শিষ্য । আমার দ্বাদশ মৃত্যু হইলে আমি যেন সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখিলাম । হৃদয়ের আবেগে একখানা খুব উজ্জ্বলপূর্ণ চিঠি কৌৎসকে প্যারিসের ঠিকানায় লিখিলাম ; আমার নিজের ঠিকানা দিয়াছিলাম Care of Iswar Chandra Vidyasagar । কৌৎস যে তখন জীবিত নাই তাহা জানিতাম না । চিঠিখানা dead letter আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিভাগাগরের হাতে পড়িল । আমাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, ‘প্যারিস থেকে তোমার একখানা চিঠি ফিরে এসেছে । তোমার এ আবার কি পাগলামি ?’ বুঝিলাম, তিনি ঐ খোলা চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে পাগল ঠাহরাইয়াছেন । আমাকে তিনি কিসে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছেন এ কথা আমি তাঁহাকে একদিন অভিমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, ‘আরে না, না, সে রকমের পাগল নয়, তুই একটু বেশী romantic ।’

“তুমি বোধ হয় জান না, বিভাগাগর মহাশয় একটু তোৎলা ছিলেন ; কেহ তাহা টের পাইত না । তোৎলার প্রধান ঔষধ আস্তে কথা কথা । বিভাগাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না । ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে তিনি তোৎলা । সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি ত অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; কখনও ক্লাস পড়ান নাই । একবার শুনিয়াছিলাম তিনি ‘উত্তরচরিত’ ও ‘শকুন্তলা’ ক্লাসে পড়াইবেন, কিন্তু বসন্তত্যা তাহা ঘটে নাই । আমার বোধ হয়, পূর্বোক্ত কারণ বশতঃই তিনি ক্লাস পড়ান ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না । কিন্তু কোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন চাকরি করিতেন তখন বোধ হয় সময়ে সময়ে



তঁাহাকে এক এক জন সিভিলিয়ন ছাত্র লইয়া বাঙ্গালা পড়াইতে হইত। কারণ তিনি নিজেই গল্প করিয়াছেন যে তিনি বিদ্যাসুন্দরের অন্নীল অংশ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তঁাহার ছাত্র তঁাহাকে সে বিষয়ে অভয় দান করেন।<sup>১</sup> ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ বাহির হইবার পূর্বে বাঙ্গালায় ‘পুরুষ পরীক্ষা’<sup>২</sup> ও ‘প্রবোধ চন্দ্রিকা’<sup>৩</sup> নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। সিভিলিয়নরা তাহাই পাঠ করিত। এখনকার রীতি অনুসারে ঐ দুখানি গ্রন্থ পছন্দ হইবার কথা নহে। সেই জন্তই বিদ্যাসাগর ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ রচনা করেন। ‘পুরুষ পরীক্ষা’ গ্রন্থের মধ্যে একটি সন্দর্ভ লইয়া পূর্বে খুব হাস্যপরিস্রাব চলিত। এই সন্দর্ভের মধ্যে লেখা আছে যে, বুদ্ধি চারি প্রকার বেগবেগা, বেগচিরা, চিরবেগা, চিরচিরা। বেগবেগার অর্থ, যে শীঘ্র বৃদ্ধিতে পারে, অথচ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; বেগচিরা শীঘ্র বৃদ্ধি, অনেক দিন মনে রাখে; চিরবেগা বৃদ্ধিতে দেরী হয় অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; চিরচিরা বৃদ্ধিতে দেরী হয়, কিন্তু অনেক কাল মনে থাকে। এই চিরচিরা লইয়া লোকে বিস্তর আমোদ করিত। যাহা হউক সে গ্রন্থ দুখানি একেবারে লুপ্ত হওয়া ভাল নহে; কারণ বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত রীতির পূর্বে কি প্রকার রীতি প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ ডেপুটি পণ্ডিতদিগের মধ্যে, তাহার অতিসুন্দর নমুনা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ পড়াইবার সময় বিদ্যাসাগর বোধ হয় হাড়ে চটিয়া যাইতেন; বোধ হয় তঁাহার শয্যাকণ্টক বোধ হইত; তাই তিনি অত উৎসাহের সহিত ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ রচনা করেন। ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কব্বাল খানি পাইয়া ছিলেন; রক্ত মাংস ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজন্য করিয়া দিয়াছেন। তাই বাঙ্গালায় অমন সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

“১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত হয়।<sup>৪</sup> ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া মুর্শিদাবাদে যান। আমি তখন বোধ হয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাসে পড়ি। রামকমল সেনের বাড়ীর উপরে এক ছেলের ভিতর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের, ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাস বসিত। ১৮৫০ সাল হইতে মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কালঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছোঁড় করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলেন, সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাহিনা। কালক্রমে যাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। বিদ্যাসাগর যখন তঁাহার ‘নিষ্কৃতিলান্ড প্রয়াস’ গ্রন্থে এই মনোমালিন্যের কারণ সম্বন্ধে নিজে চুপ করিয়া গিয়াছেন, তখন যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইব না।

“তর্কালঙ্কারের এক খুঁড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগর

১ পৃ ৭১-৭২ জ্যৈষ্ঠ ২ হরপ্রসাদ রায় কর্তৃক অনূদিত এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।—সং ৩ বৃদ্ধাক্ষয়  
বিদ্যালঙ্কার—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।—সং ৪ প্রথম প্রকাশ : ১৮৩৩ সংবৎ অর্ধাব্দ ১৮৩৭।—সং

তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের লেখা মৃত্যুর মত কলমল করিত। লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লেখাপড়া জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একবার Librarian-এর নামে শাৰ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল; সে কবিতার আশ্রয় কিছুই আমার এখন মনে নাই, কেবল 'লাইব্রেরিয়ান গরীবান' এই দুটি কথা যেন কাণে বাজিতেছে। পুনশ্চ,

তারাশঙ্কর শঙ্কর সদয়া  
বিভাগাগর সাগর কৃপয়া  
বিজ্ঞানমন্দির মধ্য বিরাজে  
পুস্তকধন্যক লাইব্রেরিকাজে।

‘পুস্তকধন্যক’ লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না তাই কথাটা পরিবর্তিত হইল। তারাশঙ্কর, তথা বিভাগাগর, খুব আযোগ্য পাইয়াছিলেন।

“আবার রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিভাগাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়ো বাঁ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন,

যঃ দেখরো নিয়গতঃ করন্তি  
সঃ দেখরো নিজালয়ং নয়ন্তি।

“লোকটির impudence আবার এত ছিল যে, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতে কাটকুট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে ‘সঙ্কর’, খুড়ো ভাবিলেন দস্ত্য স হুল; লিখিলেন তালবা ‘শ’ এবং আদর্শ পুঁথিতে ‘স’ কাটিয়া ‘শ’ করিয়া দিলেন।

“বদনমোহন চলিয়া গেলেন।<sup>১</sup> কিছু দিন পরেই বিভাগাগর বীটন মেমোরিয়ালের (Bethune memorial) জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বীটনকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু কবে হইল ঠিক আমার মনে পড়ে না,<sup>২</sup> কিন্তু বেশ মনে পড়ে, যে দিন বেথুন কলেজগৃহ খোলা হইল। সংস্কৃত কলেজে আমি তখন স্নানিক আট টাকা বৃত্তি পাই। বিভাগাগর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘তোমার scholarship থেকে এ মাসে দু’টাকা কেটে নিচ্ছি, বীটন মেমোরিয়ালের জন্ত। কি বলিল?’ বিভাগাগর যখন বলিলেন, ব্যাপারটা বুঝি আর নাই বুঝি, তাঁহার কথায় কি প্রতিবাদ করা চলে?

“Law Member ও শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন স্তম্ভের বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন চলে পারিতোষিক দেওয়া হইত, সেই সময়ে তিনি বক্তৃতা করিতেন। একবার আমি বিভাগাভূষণের ক্লাসের পারিতোষিক লইতে টাউন হলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, dais-এর উপর অনেক যুরোপীয় উপবিষ্ট। নিম্নে আলাহিদ্দা আলাহিদ্দা জায়গায় সংস্কৃত, হিন্দু, কৃষ্ণনগর, হুগলি ও ঢাকা কলেজের জন্ত স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। ‘কাদম্বরী’র অনুবাদক তারাশঙ্কর ও আমার দাদা সংস্কৃত কলেজের front bench-এ উপবিষ্ট। সভাপতি

ছিলেন বাজালার ডেপুটি গবর্নর Sir John Littler। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বাটন উপবিষ্ট। আর জন বেঁটে ছিলেন, পেটটি মোটা। বাটন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রসঙ্গবাবুর মুখে শুনিয়াছি ( কারণ, তখন তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতার রসগ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল ন', ) বাটন সভাপতির দিকে ফিরিয়া 'Sir John'—বলিয়া সহসা পুরা নামটি উচ্চারণ না করিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রসঙ্গ বাবু বলিলেন যে, বেশ বুঝা গেল, ডেপুটি গবর্নরের সেই খরীদকৃত, বস্তুলোদয় মূর্তিটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া Sir John বলিতে গিয়া বাটনের মনে Falstaff-এর স্থিতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া লইয়া শুধু Sir দিয়া বক্তৃতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কলেজগুলি পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল; বক্তৃতায় ছেলেদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ পরস্পরের প্রতি এই রেবারেখির আবশ্যকতা আছে কি? শিকারের সময় এক প্যাক কুকুর অগ্রসর হইয়া যদি খরগোসটাকে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে অন্ত প্যাকগুলির বিশেষ লজ্জার কারণ কি?

“বাটনের নাম করিতে গিয়া কাম্পেন রিচার্ডসনের নাম স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে তোমাকে কিছু বলিয়াছি”; বাটন তাঁহাকে কণ্ঠস্বয়োগ করিতে বাধ্য করেন, তাহাও বোধ হয় তোমাকে বলিয়াছি। চাকরি গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি অধ্যাপনা করিতেন, একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘আপনি surrender at discretion-এর ভুল অর্থ গণ্যকলা ক্লাসে বলিয়া দিয়াছেন, আপনি কি উহার প্রকৃত অর্থ জানেন না?’ কাম্পেন উত্তর করিলেন—‘I never surrendered at discretion, and therefore it is possible I do not know what it exactly means.’ কেন তাঁহার চাকরি গেল সে কথা তোমাকে প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন স্মরণেছি, রাজনারায়ণ বাবু কাম্পেনের চরিত্র-দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাটন বক্তৃতায় কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া hoary libertine আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা জানিতে কাহারও বাকি ছিল না। কিন্তু তোমায় বলিয়াছি, কাম্পেন surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি বিজ্ঞপ্তি করিয়া লিখিলেন—‘There was a man who was *little* and he was *beaten* (বটন), and there was a man who was *littler* (Sir John Littler) and he was \* \* ।’ একজন Law Member, লর্ড মেকলে, কাম্পেনকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর এক জন Law Member তাঁহাকে কণ্ঠস্বয়োগ করিতে বাধ্য করিলেন।”

## ভের

১৩ই কান্তিক, ১৩১২

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দানের কথায় উত্থাপন করাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “আমার মত তারককে যাহারা বিশেষ ভাবে জানে, তাহার। তারকের এই দানে বিশ্রিত হইবে না।

“আমার যখন ১৮১৬ বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তারকের সহিত আমার বন্ধুত্ব। আমরা প্রায় সমবয়সী। বোধ হয় তারক আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট হইবেন। তিনি পড়িতেন হিন্দু কলেজে জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টে; আমি পাড়তাম সংস্কৃত কলেজে; আসাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা ত বড় কিছু ছিল না, কি গতিকে যে হইল ত হ। আমার স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে গতিকেই হউক, আসাপ পরিচয়ের পর হইতেই তারকের প্রতি আমার একটু বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। ভাদিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের অকুতোভয়তা, অল্প বয়সে ইংরাজি ভাষাতে বিশেষ দখল, এই সব কারণে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যেই বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতাম; অল্পবয়স হইতেই কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতাম। বিভাগাগর কখনও কখনও লাইব্রেরীতে আসিয়া হাসিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া চালায়া যাইতেন। আমার দাদাকে তিনি চারি খণ্ড folio মহাভারত পুরষ্কার দিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত মহাভারতের সমস্ত খণ্ডগুলি আমি দশ এগার বৎসর বয়সের মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চায় রত থাকিয়া ইংরাজিতে পারিপাট্য লাভ করিবার অবসর তখন হয় নাই; সেই অল্প বয়সে তারক যেরূপ ইংরাজী কাহাতে পারিতেন, সেরূপ পারিপাট্য আর কাহারও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল।

“সে অল্প পঞ্চান্ন ছাপান্ন বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। সেই সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও আমাদের উভয়ের মনোমালিন্ত জন্মে নাই। আমরা ‘লখা’ শব্দের অর্থ মোটামুটি সহচর বা বন্ধু বুঝিয়া থাকি; কিন্তু টাকাকার মল্লিনাথ স্থলবিশেষে লখা শব্দের বিশিষ্ট অর্থ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি কোথা হইতে একটা শ্লোকখণ্ডও উদ্ধৃত করিয়াছেন ‘একপ্রাণঃ লখা প্রোক্তঃ’ অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে মিল হইলে লখা হয়। তাহার মানে এই যে, তুমিও সেক্সপীয়র ভালবাস আমিও সেক্সপীয়র ভালবাসি, তোমারও বাহাতে হাসি পায় আমারও তাহাতে হাসি পায়, তুমিও যাহা স্থগা কর আমিও তাহা স্থগা করি, এইরূপ নানা প্রকার মিল থাকিলে দুইজনে পরস্পর লখা হয়। তারকের সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মিল আছে; বিশেষতঃ হাসির কথা সন্দেহ। আমরা উভয়েই

একশ্রেয় রূপ ও জয়াজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, দেখা সাক্ষাৎ বড় কম, তথাপি এখন পর্য্যন্ত একলা বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে যদি কোনও হাসির কথা আমার মনে আসে, তৎক্ষণাৎ তারককে মনে হয়; ভাবি যে, সে এ কথাটা শুনিলে খুবই হাসিত।

“তারকের মত বিমল বুদ্ধি আমি খুবই কম দেখিয়াছি। অল্প-বয়স হইতেই তাহার ইংরাজি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তৎকালে স্ত্রী উইলিয়াম হ্যান্টিংটনের নৃতন চলন হইয়াছিল; তারক তাঁহার গ্রন্থ খুব পাঠ করিতেন ও তাঁহার খুব ভক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি মিল ও স্পেন্সারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদিও দর্শন শাস্ত্র কতক কতক পড়িতাম বটে, কিন্তু তারকের সহিত কথাবার্তা কহিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভূতপূর্ব চক্ষুক্ষম্মীলন হইয়াছে। একটা বিষয় অত্যাধি আমার স্মরণ আছে, আমার একটি বিশেষ অস্থিতা আছে, সে অস্থিতাটির বাহ্যিক কোনও লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না; কিন্তু আমি নিজের ভিতরে ভিতরে দৃঢ়ত্ব অবচ্ছন্দতা অন্বেষণ করি। একদিন তারকের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আমি বলিলাম যে, অনেকে ইহা Imaginary (কাল্পনিক) বলিয়া আমাকে উপহাস করেন; তারক কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে বলিলেন, ‘the imaginary is not the less real.’ এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লাগিল, এবং তদবধি আমার মানসক্ষেত্রে উহা উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারকের নিকট আমি যে কত জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তারকের ইংরাজি গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি যেরূপ মিষ্ট, আমার কাছে আর কাহারও আবৃত্তি কখনও সেরূপ মিষ্ট লাগে নাই। ইংরাজী গদ্য-পদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এক প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative, চাঁৎকার, হাতপা নাড়া, ইত্যাদি। আর এক প্রকার আবৃত্তি তরঙ্গবিহীন, একমেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়ের বহির্ভূত, ঠিক বুঝিতে গেলে বোধ হয় তাহাকে Serene বলা যাইতে পারে।

তাঁহার বিমলবুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, Reason নামে আমাদেরিগের যে একটা attribute আছে উহার বশবর্তী হইয়া সমস্ত কার্য সম্পন্ন করা, এই বৃত্তি তারকের যে প্রকার বলবতী দেখিয়াছি এরূপ কাহারও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, Sentiment বা Impulse তাঁহার স্বভাবে কিছু মাত্র নাই। এতকালের সঙ্গসঙ্গের দ্বারা আমি ভালরূপই জানি, তাঁহার মধ্যে Sentiment কত প্রবল। একদিনের কথা মনে পড়ে। চা বাগানের এক ‘সাহেব’ একজন কুলীরমণীর প্রতি এরূপ পাশব কলপ্রয়োগ করে যে, উহাতে শ্রীলোকটির যুহা হয়। সেই সময় সর্বত্রই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম যে আমার কাছে ঐ কথা বলিতে বলিতে তারকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। Impulse-এর বিষয় অধিক বলিবার আশঙ্ক্য নাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার মেজাজ কিছু গরম, তিনি

অগ্নেই চট্টিয়া উঠেন, ইহা নিতান্ত অমূলক নহে। লেবুপ মেজাজ গরম না হইলে বোহ হয় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট সমধিক সম্মানিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বভাবের মোকই বল আর গুপাই বল, কোন রূপ সম্ভায় তিনি সহ্য করিতে পারেন না; সম্ভায় ছোটই হউক আর বড়ই হউক, দেখিলেই তিনি আগুন হইয়া উঠেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকেরা হয় ত অনেক সময়ে মনের ভাব চাপিয়া ধায়; তারক সেইটি আদৌ পারেন না।

“তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি; এ দান তাঁহার পক্ষে খুব সম্ভব। বন্ধুবান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু বিশেষ দ্বারে পড়িলে পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা একেবারে দান করিয়াছিলেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন।

“বদান্ততা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষাত্মকমিক। তাঁহার পিতা কালীকির পালিত ঘেঘন কলিকাতায় একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্ততা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের সন্নিকটবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসতবাটী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘You are the architect of many a man’s fortune in town.’ কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাটী বলিয়া যাহা বিখ্যাত আছে, ঐ বাটী কালীকির পালিত নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

“কালীকির কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তোমাদের বিপন্ন কলেজের পুরাতন বাড়ীটির ঠিক পশ্চিম অংশে তারকের মাতামহপ্রদত্ত একখানি একতলা বাড়ী ছিল। কতদিন সেই বাড়ীতে তারকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি; তাহার বসিবার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কত নিভৃত বিজ্ঞান আলোচনা, কত ভবিষ্যতের আশার কথা, দুইটি অশান্ত কুক্ক হৃদয়ের কত ব্যাকুল স্পন্দন!

“তারকের বাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই বোপার্জিত, এবং অক্লিষ্ট পরিভ্রমের ফল স্বরূপ। এই অর্থ উপার্জন করিতে তাঁহাকে যে কুরু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবরাই জানেন। এত পরিভ্রমের খন অগ্নানবধনে অকাতরে দান করা অসামান্য মহাত্ম্যবতাসূচক এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।

“কলেজের পাঠ সাফ করিয়া তারক যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথম উদ্ভবে একবার যুগ্মশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার কিছু টাকা লোকসান হইল। সেই উপলক্ষে

তঁাহাকে স্প্রীম কোর্টে স্তর মর্ডেন্ট ওয়েলস নামক দুর্ধর্ষ জজের সমক্ষে লাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তারকের অকুতোভয়তা, ইংরাজি বলিবার পরিপাটি, straight-forwardness ইত্যাদি দর্শন করিয়া জজ এরূপ impressed হইয়াছিলেন যে, তঁাহার স্নায়ের মধ্যে এই বাক্যটি তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, Here is a young man fresh from college who straightforwardly answers questions put to him, ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব? ইহার পর তঁাহার ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার বাসনা উপস্থিত হয়। তিন চারি বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যখন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অগামান্ত বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, কাৰ্য্যাভিনিবেশ, অননুমানস্কতা ও অস্লিষ্ট পরিশ্রমের গুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

“তোমরা বোধ হয় জান না যে, তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালা ভাষার এক জন লেখক হইবেন এ প্রকার প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত ‘ভ্রমভাঞ্জনী’ নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। তদাতীত কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক সংস্থাপিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে কিছু দিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।”

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম—“আপনার নিকট হইতে ৬প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।” তিনি বলিলেন—

“প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এক উচ্চবংশের কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বাধিকারী এই নামটা কোন এক সময়ে বোধ হয় Prime Minister এই প্রকার এক উন্নত রাজপুরুষকে বুঝাইত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে মাঘ কবি আত্মপরিচয় প্রদানকালে এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন; ‘অধিকার’ শব্দটা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ State function; সেই অর্থ ধরিলে সর্বাধিকারী বলিতে a state functionary who looked after the departments of a state এইরূপ বুঝাইতে পারে। ইংলণ্ড রাজ্যের Prime Minister বলিতে যদিও ঠিক তাহা বুঝায় না, তথাপি তিনি প্রধান অমাত্য এই অংশে সর্বাধিকারীর পদের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

“প্রসন্নবাবু বংশজ ছিলেন। বোধ হয় তঁাহার কোনও পূর্বপুরুষ এক সময়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা বিশেষের রাজ্যে ঐ পদ পাইয়াছিলেন; তদবধি তঁাহাদের বংশে নামটা স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে। যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, হাবড়ার সন্নিহিত শিবপুর সহরে একটি মুসলমান বংশ আছে, তাহারা অজ্ঞাপি ‘কাজী’ নামে অভিহিত হয়, যদি চ এক্ষণে তঁাহাদিগের মধ্যে কেহই কাজী পদস্থ নহেন।

“প্রসন্নবাবুর জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাখানগর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটি হুগলী জিলায় অন্তর্গত, এবং এক সময়ে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল; কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের অপরাপর অনেক স্থানের মত ম্যালেরিয়া দোষে

নিতান্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। প্রসন্নবাবুর কিঞ্চিৎ ভুলসম্পত্তি ছিল বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার নিজস্ব গুনিয়াছি যে, কলিকাতায় থাকিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে টাকা-কড়ির অভাবে তাঁহাকে অনেক সময়ে বিলম্ব কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, এমন কি রাজিতে পাঠ করিবার জন্তে প্রদীপের তৈল পর্যন্ত জুটিত না। তিনি বাস্তব লক্ষ্যের নিম্নে দাঁড়াইয়া পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্দীপন করিতেন। এই সমস্ত বাধা বিস্তৃত সত্ত্বেও তিনি বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন চারি বৎসর চল্লিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকবার সর্বোচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, কুমিল্লা, এই তিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত; সুতরাং সে সময়ে সর্বোচ্চ পদ লাভ করা কম সুখ্যাতির কথা নহে। তখন যে সকল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত সেগুলি বাৎসরিক রিপোর্টে ছাপাইয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণের গোচর করাইয়া দিতেন। আমার মনে আছে, ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রের একটি উত্তর প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন; তাহা আমি রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম। সেবার সেক্সপীয়ারের টেম্পেষ্ট নামক নাটক পরীক্ষার পুস্তক ছিল, প্রসন্নবাবু তাহারই উত্তর লিখিয়াছিলেন; এবং তৎসময়ে ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ যশস্বী ছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার অল্প অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা পাটীগণিত ও বাঙ্গালগণিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালা পাটীগণিত প্রসন্নবাবুর চিরস্থায়ী কীর্তি। যখন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালার মধ্যঃপ্রদেশে বিভাগচর্চার জন্য ইন্স্পেক্টর, ডেপুটি ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিস্তর নতুন বিভাগ স্থাপন করিলেন,—আমাদ ১৮৫৪, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে,—সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে ইংরাজী ধরণের কতকগুলি নতুন গ্রন্থ শিষ্ঠদিগের পাঠ্যপুস্তকী করিয়া প্রণয়ন করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। পাটীগণিত রচনা করিবার ভার প্রসন্নবাবু গ্রহণ করিলেন। এই গুরুতর কার্য তিনি কি প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় বোধ হয় দিতে হইবে না। তাঁহার পরিগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষণে বাঙ্গালা পাটীগণিত শাস্ত্রে বহুমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার পরের সমস্ত পাটীগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সাহায্য না পাইলে অস্বাভাবিক কেহ এ কার্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ চলন নাই, কারণ বোধ হয় সে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত। এবং আমাদের দেশে সকল কার্যই সুপারিশের দ্বারা চলে, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অস্বস্তিগ্রস্ত গ্রন্থকারগণ তাঁহার সাহায্য লইয়াই তাহার গ্রন্থকে পদ্ধত করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে,

তোয় শিল, তোয় নড়া,

তোয়ই ভাকি দাঁতের গোড়া।

প্রসন্নবাবুর পাটীগণিতের পদ্ধতি ইহারই একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। বাঙ্গালা পাটীগণিতের



প্রবর্তনিতা বলিয়া প্রসঙ্গবাবুকে সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে দুই খণ্ড বহুবিকৃত বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাহার কারণ বাক্সালাতে গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন বীজগণিত পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং সেই দুই খণ্ড এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু থাকিলে, গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে ভাবার প্রতিষ্ঠা বিলক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিত।”

পণ্ডিত মহাশয় ধামিলেন। আমি বলিলাম, “আপনার মুখে পূর্বে শুনিয়াছি যে, পাটীগণিত রচনা করিবার সময় প্রসঙ্গবাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৮রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটীগণিত ও বীজগণিতের পরিভাষা সম্বন্ধে ঋণী ছিলেন?”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“না। বিভাগাগর মহাশয়ের ‘লীলাবতী’ প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না। তিনি নূতন ধরণে ইংরাজী প্রণালীতে অধ্যাপনার প্রবর্তন করিবার পূর্বে সংস্কৃত কলেজে ‘লীলাবতী’ রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট ‘লীলাবতী’ পড়ি; বিভাগাগর ইহাকে পরে মুদ্রিত করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ‘লীলাবতী’ পড়েন কলেজের এক খোঁটা পণ্ডিতের কাছে তাঁহার নাম পণ্ডিত যোগদ্যান। পণ্ডিত যোগদ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্ত কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্বন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোঁটা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোঁটা পণ্ডিত নাথুরাম<sup>২</sup> এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিভাগাগর জয়নারায়ণের ছাত্র। শুনিয়াছি তারানাথের চাকলা দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—‘তারা তু পবন এব।’ যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাক্সালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্ততম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাঁহাদিগের নাম একটিকে একে গ্রন্থিত হইয়াছিল :

কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দস্বরো

নাথুরামো প্রোক্ত বর্জ্যপানয়নং।

১ পাটীগণিতে “ব্যবহৃত পারিতোষিক শব্দগুলির বিষয়ে প্রসঙ্গকুমার লিখিয়াছেন : ‘এই সকল শব্দের সকল বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর অনেক সাহায্য করিয়াছেন।’ সংস্কৃত কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীনাথ দাস ও প্রোক্তন ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্যও প্রস্তুত হাজারোপযোগী করার জন্য সহায়তা করেন।’.....বীজগণিতের সম্বন্ধে “গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন : ‘আমার প্রিয় ছাত্র ও বন্ধু নরীন্দ্রবুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন। (সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ গোপিকাচরণের ভট্টাচার্য্য) —সং

২ নাথুরাম শাস্ত্রী ভজরাটী ছিলেন। (ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১ম খণ্ড’ উল্লেখ্য) —সং।

যাতে স্বর্গে প্রেমভ্রমো মনীবী

টিকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনাং ।

“পাণ্ডু গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞারত্ব সর্বপ্রথম মন্নিনাথের টাকা সর্বস্বিত ‘শকুন্তলা’ প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—‘কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতী কলকল্লা এখানে করবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।’

“এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের Moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিজ্ঞানাগর, বিজ্ঞানভূষণ, গিরিশ বিজ্ঞারত্ব কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না; পরসার লোভে সংপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এ গুণটা সাধারণতঃ আছে। তবে জ্ঞান পণ্ডিতরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না, বুঝ লইত।”

## চৌদ্দ

১২ই চৈত্র ১৩১২

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “সম্প্রতি একটি লোকের মুখে শুনিলাম যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘দুরাকাজ্জের বুধা ভ্রমণ’ নামক একখানি গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, বন্ধিমবাবুর আবির্ভাবের পূর্বে ঐ ধরণের রচনা কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল; এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকার মহাশয় ঐ গ্রন্থের নামোন্মেষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তিনি কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন। বোধ হয়, সংবাদটি এক মুখ হইতে অল্প মুখে কিঞ্চিৎ অগ্ৰাধৃত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে, এবং তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, উহা রামকমলের। ঐ গ্রন্থ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। ‘বিচারক’ নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectator-এর ধরনে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিস্ত বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিত্বাতা তারানাথ ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

“বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে স্বল্পবয়স কবি বিহারীলাল ‘পূর্ণিমা’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রাতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অগ্রতম লেখক হইলাম। তুমি হয় ত শুনিবে আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকও প্রকাশিত হইয়াছিল,—‘জু’হুলের গাছ’ ও ‘তাঁতিয়া টোপি’। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত ‘রত্নদার’ নামক বালাপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু ‘তাঁতিয়া টোপি’ কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। ‘পূর্ণিমাতে’ আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। ঐ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

“কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া ‘অবোধ বন্ধু’ নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ পত্রিকা খানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র ‘পল-বর্ষদিনিয়া’ গ্রন্থ কদালী ভাষা হইতে অল্পবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি

জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোভির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে যুরোপের duel ( অর্থাৎ যুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই ) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। একটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছিলাম—তাহার নাম ‘উজ্জ্বল’। চিঠিপত্রের প্রণালীতে লেখা। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ আমি ইহা মুদ্রিত হইতে দিই নাই। এমন কি, সমস্ত টাইপযোজনা হইয়াছিল; আমি বিহারীলালের অজ্ঞাতে সেই টাইপযোজনা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসি। ঐ রচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিহারীলাল উহা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যখন শুনিলেন যে, আমি গল্পটি চিরকালের জগৎ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তখন তিনি আমাকে কেবল মারিতে বাকী রাখিয়াছিলেন।<sup>১</sup>

“ইহার পর ‘ভারতী’ পত্রিকায় আমি কয়েকটি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বায়রণের English Bards and Scotch Reviewers-এর অনুরোধে যে পঞ্চগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ তুমি পূর্বেই একটি প্রসঙ্গে কতকটা লিপিবদ্ধ করিয়াছ।<sup>২</sup> এই গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ‘বিচিত্রবীর্ষ্য’ নামক একখানি গ্রন্থ ও একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস<sup>৩</sup> রচনা করিয়াছিলাম। ‘বিচিত্রবীর্ষ্য’ হস্তলিখিত অবস্থায় পাঠ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল বলিয়াছিলেন,—It would do credit to a veteran writer’,—বোধ হয়, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের অত্যাক্তি। পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা কার, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত কারয়াছিলাম।<sup>৪</sup>

“কখনও গ্রন্থকার বা লেখক হইবার সাধ আমার বড় একটা তীব্র ছিল না। এক্ষণে কেহ কেহ আমার লেখার বিষয়ে অহুসঙ্কান করাতে আমি এই বিবরণটি সন্ধান করিলাম। লেখাগুলি একত্র মুদ্রিত করিলে বাঙ্গালা ভাষায়, কি আমার নিজে, কোনও উপকার হইবে কি না, তাহা বলিতে পারা না। এক্ষণে আমি এত প্রাচীন ও অধিক হইয়াছি যে, নিজে তদ্বিষয়ে কোনও সাহায্য করিতে পারি বোধ হয় না, কিন্তু যদি সংগ্রহ হয় এবং ছাপাইবার আয়োজন হয়, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাময়িক সাহিত্যে লিখিবার অবসর বড় একটা ছিল না। বোধ হয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘সর্বস্বত্বকরী’<sup>৫</sup> পত্রিকায় কিছু কিছু

১ পৃ: ১০৫ষ্টম।—সং ২ পৃ: ২০-২২ ঙ্গষ্টম।—সং

৩ প্রকৃত পক্ষে ‘ইংলণ্ডের ইতিহাস’ কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্যের রচনা। (ঐ: ব্রজেনপ্রদাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ‘কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য’)—সং

৪ প্রকৃত পক্ষে ইহা ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়। (ঐ) ৫ প্রকৃত নাম ‘সর্বস্বত্বকরী’।—সং

লিখিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন প্রণালীর আয়তন পরিবর্তন করিতে এবং বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতি কোনও পত্রিকার কথনও লেখেন নাই।

“তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশীতে পাণিনি ব্যাকরণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণই তাঁহার speciality (বৈশিষ্ট্য) ছিল, এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্দেশে দুর্গাদাস, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি মুক্তবোধ ব্যবসায়ীদিগকে তিনি বড়ই অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু মুক্তবোধ ও নোপদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মতে পাণিনি না জানিলে সংস্কৃত শিক্ষা হইতেই পারে না। ব্যাকরণ সম্বন্ধে ‘শব্দার্থরত্ন’ নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্বে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল; পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে কি না এবং অত্য়পি ঐ গ্রন্থের অংশীলন হয় কি না, বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, উহাতে বাক্যপদীয় অথবা হরিকারিকা নামক অত্যুৎকৃষ্ট তর্জহরি-প্রণীত গ্রন্থের সারাংশসকল সম্মিলিত হইয়াছে। বাক্যপদীয় একখানি সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের অত্যামূল্য পুস্তক। ইহাতে যে কি প্রকার কল্পনাচাতুর্য্য (speculative ingenuity) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থখানি আমি যে ভালরূপ জানি, এ অভিমান আমার নাই; অতি যৎসামান্য আভাস পাইয়াছি মাত্র। তাহাতেই আমার উহার প্রতি এতটা প্রভাব ও ভক্তির উদয় হইয়াছে। তারানাথ বোধ হয়, ঐ গ্রন্থখানি ভালরূপ অংশীলন করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় গোলভুঙ্কর পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও বাক্যপদীয় ভালরূপ দেখেন নাই। বাক্যপদীয় পণ্ডে লিখিত; উহার অনেকগুলি কারিকা এখনও আমার মুখস্থ আছে। একটিতে নিম্ন-লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা আছে:—যদি কোনও একটা জিনিষ হইতে আর পাঁচটা জিনিষ প্রস্তুত হয়, তবে সেই বিষয়ের সংস্কৃত বাক্য রচনা করিতে গেলে ক্রিয়াতে কোন বচন দিতে হইবে, একবচন না বহুবচন? যেমন মনে কর, একটা বৃক্ষ হইতে পাঁচ খানা নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, এখন এখানে কিরূপ বাক্য রচনা করিবে? “একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি” বলিবে না “ভবন্তি” বলিবে? আমার মনে মনে আছে “ভবন্তি”। কিন্তু যে হরিকারিকাটি মুখস্থ আছে, সেটি তদ্বিপরীত। কারিকাটি এই—

প্রকৃতেবিকৃতেবাপি যত্রোক্তং হনোরপি।

বাচকঃ প্রকৃতে: সংখ্যাং গুণ্যান্তি বিকৃতে: তু।

অর্থাৎ যে জিনিষটা হইতে তৈয়ারী হয়, আর যেটা তৈয়ারী হয়, দুইটাই যে স্থলে উল্লিখিত হইতেছে, সে স্থলে ক্রিয়াতে প্রথমটার যে বচন, সেই বচনই দিতে হইবে, দ্বিতীয়টার বচন দিতে হইবে না। ভুলভুলারে

একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবন্তি

এইরূপ বলিতে হয়। এ বিষয়ের মীমাংসা আমি ত এখন কিছুই দিতে পারি না, তর্কবাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিতেন। আর একটা প্রশ্ন আছে। পাণিনি অপাদান কারক define করিতে গিয়া লিখিয়াছেন

‘ধ্রুবমপায়ে অপাদানং’

অর্থাৎ দুইটা বস্তুর পরস্পর পৃথক হইবার স্থলে যেটা স্থির থাকে, সেইটা অপাদান। যেমন বৃক্ষাৎ পত্রং পততি, অর্থাৎ পাতাটাই সরিয়া গেল, বৃক্ষ স্থিরই আছে; স্তূতরাং বৃক্ষই অপাদান। কিন্তু পানিনিকৃত এই definition-এর উপর ফাঁকি উঠিল, ‘ধাবতো অশ্বাৎ পততি’ বোড়া দৌড়িতেছে, তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে সওয়ার পাড়িয়া গেল, এ স্থলে অশ্ব ত স্থির নহে; কিন্তু তাই বলিয়া সওয়ারের পক্ষে অশ্ব কি অপাদান হইবে না? প্লেটো কোনও এক সময়ে মানুষকে define করিয়াছিলেন a biped without wings ডানাবিহীন দ্বিপদ, তাহাতে কোনও এক ব্যক্তি একটা মোরগের দুই ডান কাটিয়া হাটের মাঝে টাঙ্গাইয়া দিয়া তলায় লিখিয়া রাখিল,—এই দেখ, প্লেটোর মানুষ! পাণিনির অপাদানবিষয়েও পুরোক্ত অল্পপপত্তির (difficulty) কি প্রকার মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রকার সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাহার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না।

“এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, ‘হরিকারিকা’তে কি প্রকার বিষয়ের আন্দোলন করা হইয়াছে। আর একটি কারিকা শুন, বোধ হয়, এটিও হরিকারিক। হইবে। কারিকাটি এই—

যাহ্যজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।

তানি কিং পদ্বত্তানি সন্তি পাণিনিগোপদে।

অর্থাৎ, ‘মাহেশ’ নামে এক ব্যাকরণ আছে, সমুদ্রতুল্য; পাণিনি তাহার নিকট গোপদতুল্য; ব্যাসের শ্রেণীত পুরাণাদিতে যে সকল পদ আমরা আধ বলিয়া থাকি, সেগুলি ‘মাহেশ’ ব্যাকরণ হইতে পাওয়া যায়, অতি ক্ষুদ্র পাণিনিতে কোথায় পাইবে? ‘মাহেশ’ ব্যাকরণ অতাপি আছে, কি লুপ্ত হইয়াছে, জানি না; কিন্তু যদি থাকে, সংস্কৃতাহুশীলনকারীদিগের অহুসন্ধান করা উচিত। তর্কবাচস্পতি মহাশয় জীবিত থাকিলে ইহার কোনও না কোনও সংবাদ পাওয়া যাইত।

“আমি তাহার নিকট সংস্কৃত কলেজে ভাট্ট ও অভিধান পড়িয়াছি। তাহার শ্রেণী প্রথম শ্রেণী বলিয়া অভিহিত ছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যামূষণ, ব্রাহ্মগোবিন্দ গোস্বামী ও প্রাণকৃষ্ণ বিজ্ঞানাগর যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, ও চতুর্থ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুক্তবোধের নিক্তি ও শব্দ শেষ করি; গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে এক বৎসর থাকিয়া ধাতুপ্রাকরণ শেষ করি; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর থাকিয়া মুক্তবোধের অবশিষ্টাংশ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে পূজ্যপাদ তাবানাবোধের ছাত্র হই। এই সময়ে হতিলাল নামে আমার এক

সহাধার্মী ছিলেন। তিনি যুদ্ধবোধের কুট কথা লইয়া খুব নাড়চাড়া করিতেন। যুদ্ধবোধের বিষয়ে একটা প্রবাদ আছে যে, বোপদেব স্বজ্ঞগুলি যতদূর পারেন অল্পাঙ্কর করিয়া গিয়াছেন; কাহারও সাধ্য নাই, কোনও একটি স্বজ্ঞের একটিও অঙ্কর কমাইয়া গঠন করিতে পারেন। যদি কেহ ভাবেন, তিনি অঙ্কর কমাইতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, কোথাও না কোথাও ঠেকিয়া যাইবেন। মতিলাল প্রত্যহ এক একটি ঐ প্রকারের ফাঁকি আনিয়া দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কখনও এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন চিন্তা করিয়া সমাধা করিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহাকে বিস্তর মাথা ঘামাইতে হইত। কিন্তু তিনি বোপদেবকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার মানরক্ষার জন্ত কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

“সংস্কৃত syntax-এর (শব্দযোজনাবীতির) উপর ‘বাক্যমঞ্জরী’ নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের উহা পাঠ করা উচিত।

“সুধু ব্যাকরণ নহে তারানাথ স্মৃতি ও জ্যোতিষ ভালরূপ জানিতেন। ‘বাচস্পত্য অভিধান’ ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত তিনি দুইখানি প্রয়োগগ্রন্থ (rituals) লিখিয়া গিয়াছেন—‘তুলাদানপদ্ধতি’ ও ‘গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি’। এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানি লোপ হওয়া উচিত নহে; ঐ ঐ বিষয়ের তাৎপর্ষ্য বিবরণ ঐ দুই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

“‘বাচস্পত্য অভিধান’ প্রথমে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্ন ও আমি, এই তিন জনে প্রস্তুত করিব বলিয়া কথা হয়, বোধ হয় ১৮৬৫-৬৬ সালে; কিন্তু কার্যকালে গ্রায়রত্ন ও আমি সরিয়া পড়িলাম। তর্কবাচস্পতি মহাশয় গুরুলিত কার্য ত্যাগ করিবার লোক নহেন। তিনি গভর্নমেন্টের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা সাহায্য পাইলেন। ইনস্পেক্টর উড্রো ‘সাহেব’ আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, সে কথা তোমাং পূর্বে বলিয়াছি; তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে গভর্নমেন্ট যাহাতে অর্থসাহায্য করেন, সেই সঙ্কে তাঁহাকে আমি বিশেষ করিয়া অহরোধ করিলাম। মহামতি উড্রো সাহেব, তারানাথের অধিতীয় বিদ্যাবস্তার পরিচয় পাইয়া উক্ত সাহায্য ঘটাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় একাকী ঐ গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন; দশ বৎসরের অধিক কাল পরিশ্রম করিয়া কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন।<sup>১</sup> আমার বিশ্বাস, এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারাই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। তিনি কানীতে দেহত্যাগ করিলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের তাঁহার জায় কানীপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

“আমাদের দেশের লোকের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের, যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, অর্থাৎ Versatility-র অভাব, তারানাথের তাহা ছিল না।

এত শাস্ত্রচর্চার মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করিতেন। কখনও বা শালের কারবার, কখনও বা নিজ গ্রাম অধিকাকালনায় যত্ন কি প্রস্তুত করিবার কারবারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে একটি হাসির কথা মনে পড়ে। একদিন এক সত্যায় বিচার করিতে করিতে তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রোটিপূরক (with haughty assurance) বলিয়া উঠিলেন—‘এ কথা যদি না হয় ত আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।’ প্রতিষ্পন্দী তৎক্ষণাৎ পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—‘কোন ব্যবসা মশাই? শালের ব্যবসা, না শাস্ত্রচর্চার ব্যবসা?’

‘পরিশেষে তিনি অর্থোপার্জনের সঙ্কল্প কতকটা সিদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থ নিজকৃত টীকা সহিত মুদ্রিত করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জীবানন্দও সেই কার্য চালাইয়া যে বিশেষরূপ সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন।

‘বিভাগাগর মহাশয় যখন বহুবিবাহের অবৈধতার বিষয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন, সে সময়ে তাঁহার মূখে শুনিয়াছি যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রথমে তাঁহার মতের অহুমোদন করিতে উত্তত ছিলেন। বহুবিবাহ যে অবৈধ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিভাগাগর একটি সুপরিচিত মহাবচনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা করেন। সে বচনটি এই—

‘সবর্ণাগ্রে বিজাতীয়াং প্রশস্তা দায়কর্ষণি।

কামতস্ত প্রবৃত্তানাম ইমাঃ স্যাঃ ক্রমশোহবরাঃ।

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রাণাং সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্বা কল্মষস্তোক্তান্তান্তাঃ স্বা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ।’

পূর্বে এই শ্লোকের মোটামুটি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষে প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ করা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকর্তব্য; পরে ইন্দ্রিয়-চারতর্ক করিবার জন্য ইচ্ছা হইলে স্বজাতীয়া বা ভিন্নজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিভাগাগর মহাশয় অতি সূক্ষ্মবিবেচনা প্রয়োগ পূর্বক মহাবচনটির এইরূপ অর্থ স্থির করিলেন যে, ধর্মকর্মের জন্য স্বজাতীয়া পত্নীর একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্বজাতীয়া পত্নী হইতেই পারে না, ভিন্নজাতীয়া পত্নী চাহি। কিন্তু মগ্ন প্রতিলোম-বিবাহের একান্ত বিদ্রোহী ছিলেন, অতএব তিনি অহুমোদ-রীতিতেই ভিন্নজাতীয়া পত্নীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিভাগাগরের যুক্তি এই ছিল যে, যখন মহুর মতে কাম্যবিবাহ ভিন্নজাতীয়া কন্যা ব্যতীত হইতেই পারে না, এবং যখন কলিতে জাতাস্তরবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, তখন কলিতে বহুবিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় হইতেছে।

‘বিভাগাগর মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা বিলম্বন স্মরণশক্তির দ্বারা উদ্ধাবিত হইয়াছে। বিশেষ প্রণিধানের সহিত বচন দুইটির পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য



অনেক সময়ে বোধ হয় যে, মন্থর অভিশ্রম বা ইহাই ছিল। তবে একটা গোল এই থাকে যে, শূত্রের পক্ষে কি কাম্যবিবাহ ঘটিবে না? কারণ শূত্রের চেয়ে ছোট জাতি আর নাই, এবং মন্থর মতে কাম্যবিবাহ আপন অপেক্ষা ছোট জাতির কন্যার সহিতই শাস্ত্রানুমোদিত। যাহা হউক, বিজ্ঞানাগরের মুখে শুনিয়াছি, তারানাথ তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আশ্বর্য্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—‘আমাদের চিপ্লে না হোলে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বার করতে পারে?’ বিজ্ঞানাগরের গাঁট্টা গোটা ধর্কাকৃতি দেহ ছিল; এই জন্য তারানাথ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আদর করিয়া তাঁহাকে ‘চিপ্লে’ বলিয়া ডাকিতেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে এই আদরের ডাকনাম আমি অনেকবার শুনিয়াছি।

“বিজ্ঞানাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব মুদ্রিত হইল। কিছু দিন পরে দেখিলাম তারানাথ উহার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক লিখিলেন। অগত্যা বিজ্ঞানাগর বাদান্ত্ববাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তারানাথের যে প্রকার সর্বসংগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহাতে কোনও একটি সিদ্ধান্তে স্থায়ী ভাবে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসাধ্য ছিল। তিনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অল্পকূল ও প্রতিকূল যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। দুই প্রকারের যুক্তিই তাঁহার চক্ষুর উপরে সর্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত। সকল দেশের শাস্ত্রেই প্রায় প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অল্পকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিজ্ঞান থাকে। কেবল Positive Science অর্থাৎ জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা আর উল্টাইবার জো নাই। পৃথিবী ঘুরিতেছে, পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ বজ্রিশ ফুট; ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে; এই সকল কথা প্রতীতি করিতে গেলে পাগলামি করা হয় মাত্র। নতুবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না; কলিতে ভিন্নজাতীয় বিবাহ হইতে পারে কি না; ক্ষত্রিয় জাতি অত্মাপি আছে, কি লোপ পাইয়াছে, এ সকল বিষয়ে মতামত চিরকালই আছে ও থাকিবে। তারানাথ যদিও প্রথমে বহুবিবাহের অবৈধতার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার বোধ হয়, কোনও ব্যক্তির অন্তরোধে তর্কবুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে, যদিও তিনি বিধবাবিবাহে মত দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেশ জানিতেন যে, সে মতের বিপরীতে বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে।

“বিজ্ঞানাগরের প্রবল যুক্তিতে কাহারও মন আর্জ হইল না। ঐহায়া যুরোপীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া একাধিক বিবাহ বিধেয় হইতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল বিজ্ঞানাগরের মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। ইংরাজ গভর্নমেন্ট বহুবিবাহনিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। বিধবাবিবাহের বৈধভাসম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা খড়ম্ব। কারণ বিধবাবিবাহে কোনও জঘন্যতা নাই, কেবল অল্পমতি

দেওয়া মাত্র (Permissive—not coercive)। আইন বিধবাকে বলিড়েছে—‘ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর; না হয়, না কর; কিন্তু যদি কর, তোমার সম্মান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।’ পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয়; এই জবরদস্তি করিতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের তরসা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন লিপাহী বিদ্রোহের অন্ততম কারণ। সুতরাং এরূপ আইন বিষয়ে ইংরাজের আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। বিভাগাগরের চেষ্টা বিফল হইল।

“কিন্তু একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিভাগাগরের বয়স অনেক কম ছিল, কিন্তু তখন কুজাপি তিনি পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহু-বিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘ব্রজবিলাস’, ‘রত্ন-পরীক্ষা’, ‘কতৃচিত ভাইপোস্ত’ এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকবহ। এই রসিকতা সে কালের দৈশ্বর গুপ্ত বা গুডগুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতাদ্বাষে দূষিত নহে, ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাক্সালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই। যাহারা বিষয়ী লোক, তাহারা সংস্কৃতশাস্ত্রের কথা বড় একটা বুঝেন না, সুতরাং তাহারা বিভাগাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায় আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এ দেশে এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিভাগাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছডান হইয়াছে, যদি যুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা হাস্ত-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত এবং বিভাগাগরের নাম এক্ষণে বিভাবন্তার জন্ত যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্তও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিভাগাগর এ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; কারণ, তিনি বাক্সালা ভাষায় বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, কেহ পদ্মক আর না পদ্মক, আনন্দ কলক আর না কলক, বাক্সালা লিখিতে তাঁহার নিজের এত আমোদ বোধ হইত যে, সেই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

বিভাগাগরকে সকলেই দ্বিগুণজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন; কিন্তু যাহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তার হাসি-তামাসার কি একটি অভূত শক্তি ছিল। সে সকল রসিকতার কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে বোধ হয়, বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ শক্তি এখন কাহারও আছে কি না, বলিতে পারি না। আমরা কিছু কিছু সময়ে সময়ে মনে পড়ে। বটন কলেজ ক্যাবরই কোনও না কোনও কবিতার শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। এক সময়ে

বিভাগাগর লেক্টেচারী ছিলেন, তখন অনেক উচ্চপদস্থ ‘লাহেব’ কমিটির মেম্বর ছিলেন। একজন ফিরিকী ত্রীলোক প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কি কারণে জানি না, একজন স্কুলের পণ্ডিতের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ জন্মিয়াছিল; তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করেন। বিভাগাগর লেক্টেচারী; তদন্ত করিবার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইল। তিনি বিশেষ অনুরোধের পর বুঝিলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষই নাই। পরে এই বিষয়ের জন্য একদিন কমিটির বৈঠক হইল। সেই বৈঠকে বিভাগাগর সকলকে পরিকাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পণ্ডিতটি নিরপরাধ। কিন্তু কমিটির মেম্বর অধিকাংশ যুরোপীয়; প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফিরিকী; কমিটি ভাবিল, পণ্ডিতকে একেবারে নির্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে শিক্ষয়িত্রীর অপমান করা হয়; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, ‘তবে না হয়, দু’এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে suspend করা যাক; কেমন, বিভাগাগর, তুমি কি বল?’ বিভাগাগর গতান্তর না দেখিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her. আচ্ছা,—তবে তাই কর, যদি তোমরা ভাব যে, কিছু বলিদান না করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না। ইংরাজরা আর যাহাই হোক, প্রকৃত রসিকতা (Wit) পাইলে গুণগ্রহণ করিতে পারে। বিভাগাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন। একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্নমেন্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলম্ব অপমানিত হইয়াছিল; বিভাগাগর তাঁহাদের বিষয় বিমর্ষভাবে দেখিয়া কিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—‘ওহে, আজকে political world-এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।’ এই gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল। বিভাগাগর একবার তাঁহার কোনও এক বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন; বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বিভাগাগর আসাতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু অন্তমনস্কভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রিয়াক্ষণ এই প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া বিভাগাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, ‘যাও, আর উলখুস্ কোরচ কেন? বাড়ীর ভেতরেই যাও।’ এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসর পাইলেই শব্দরবাড়ী যাইতেন; এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় শব্দরবাড়ীতে থাকিতেন। বিভাগাগর এক দিন একত্রে দু’জনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—‘হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহাদেবো!’।

## পল্লের

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “বিজ্ঞানাগরের একটা চিরকালের অভ্যাস ছিল যে প্রায় ছোকরা দলের সকলকেই তিনি কখনও ‘তুই’ ছাড়া ‘তুমি’ বলিতে পারিতেন না। তিনি আমাকে যে ‘তুই’ বলিতেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি যখন ৩৭ বৎসর বয়সে কেবল আত্মার করিয়া আমার দাদার সঙ্গে কলেজে যাইতাম, প্রত্যহ তাঁহাদের ক্লাসের ঘরের এক পাশে সমস্ত দিন বেঞ্চের উপর গড়াগড়ি দিয়া বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী আসিতাম, তখন বিজ্ঞানাগর এক দিন (তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) আমাকে লইয়া নিম্নতম শ্রেণীতে প্রাণরক্ষা বিজ্ঞানাগরের ঘরে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই অবধি প্রায় আমার চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়াছি, কখনও ‘তুই’ ব্যতীত ‘তুমি’ সম্বোধন পাই নাই। ইহা যে কখনও আমার মন্দ লাগিয়াছিল এমন কথা আমি বলি না, আমি বরং ভাবিতাম যে, তিনি যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ও আমাকে যে স্নেহ করেন, ‘তুই’ সম্বোধন তাহারই পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু বেশ বৃদ্ধিতে পারিতাম যে ইহা সকলের ভাল লাগিত না। সংস্কৃত কলেজের একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন; তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র গুপ্ত \*। বিজ্ঞানচর্চা গল্পে আমা অপেক্ষা তিনি অনেক junior ছিলেন, এক দিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, ‘তুই বলিতে যতক্ষণ, তুমি বলিতেও ততক্ষণ; তবে যে বিজ্ঞানাগর মহাশয় যাহাকে তাহাকে তুই বলিয়া বলেন, তুমি বলিতে বড়ই বিমূখ, ইহার মানে বুঝা যায় না।’ উমেশ গুপ্ত এই কথা বিরক্তির ভাবেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমার এই বোধ হয় যে, এই অভ্যাসটি বিজ্ঞানাগরের সারল্যাগুণের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে, বিজ্ঞানাগরের সেটি আদৌ ছিল না; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোক দেখান বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সেটা পরিবর্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা’কে ছেলেবেলা হইতে যে, ‘তুই’ সম্বোধন করিতেন, যুত্মকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। বিধবা বিবাহের গল্প করিতে বসিয়া একদিন তিনি বলিলেন,—যখন আমি বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আপনার মত স্থির করিয়া বসিয়াছি, তখন ভাবিতাম যে, মা’কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না, তিনি কি বলেন? আমাকে এ বিষয়ে বন্ধপরিকর হইতে বলেন, কি মানা করেন? এই অভিপ্রায়ে এক দিন তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, ‘মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর (আমি যাকে চিরকালই ‘তুই’ বলে ডাকি; ছেলেবেলার অভ্যাস কখনও ছাড়িনি) আমি ত বিধবাবিবাহ চালাব

\* কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ “অবৈদ্যক” নামক গ্রন্থটুকি করিয়া edit করেন, ও “বসন্ত চিন্তামণি” “সৌর্য্যকাকিনিকাজয়” “কথাসরিৎসাগর” প্রভৃতি বাদ্যলার অনুবাদ করেন।

স্থির করেছি, এতে তোর মত কি ?' মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'এটা যে শাস্ত্রের যথার্থ মত, তোর কি তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে ?' আমি বলিলাম, 'হাঁ আমার তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে।' তখন তিনি বলিলেন, 'তবে তুই চালাগে যা, আমার তা'তে অমত নেই।' ❦

‘এখনকার দিনে আমি দেখিতেছি যে পুত্র একটু বড় হইলে এবং যোজগারী হইলে, পিতা তাহাকে ‘তুই’ বলা দূরে থাকুক, পরোক্ষে ‘তিনি’ বলিয়া থাকেন। আমি অনেক পিতার মুখে এইরূপ শুনিয়াছি, এবং আমার এটা যেন কেমন কেমন লাগে। কোনও কোনও পরিবারের মধ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, বাল্যকালেও পিতা পুত্রকে ‘তুমি’ বৈ ‘তুই’ বলেন না, পুত্রও পিতাকে শৈশবাবস্থা হইতে ‘আপনি’ ‘মহাশয়’ বলিতে অভ্যাস করে। ইহার একটা মানেও আছে। সেই সকল পরিবারের বর্ত্তার বিবেচনা করেন যে, সভ্যতার সমুদ্রাচার ( কথাবার্তা আদবকায়দা ইত্যাদি ) শিক্ষা করা বালকের পক্ষে একান্ত কর্তব্য, এবং খুব অল্প বয়সেই অভ্যাস করা ভাল।

‘বিদ্যালয়গর যে সকল ছোকরাকেই ‘তুই’ বলিতেন, আমি এমন কথা বলিতে চাহি না। আমার মনে হয় না যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলকে ‘তুমি’ ছাড়া ‘তুই’ কখনও বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নিজের কথা আমি জানি, বাজুকুমার সর্বাধিকারীর কথা জানি; ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর কথাও জানি। কলিকাতায় একবার হোসেন খাঁ নামক বাঙ্গালীর দিনকতক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সূর্যবাবু তাহার দু’চারিটা ভেকি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া এক দিন বিদ্যালয়গরের কাছে গল্প করিতেছিলেন। বিদ্যালয়গর বলিলেন, ‘আরে আমি তোর কথা শুনি। তোকে আমি জানি, তুই কতকটা আহ্লাদে। আমি আমার হাতে আংটি মুঠো করে ধরে থাকি, যদি আমার হাত থেকে হোসেন খাঁ আংটি উড়িয়ে দিতে পারে, তা হোলে বুঝব যে, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।’ শ্রীমান্ নীলাদ্রর মুখোপাধ্যায় যখন কাশ্মীরের দেওয়ানী করিয়া মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখনও বিদ্যালয়গরের কাছে সেই সাবেক ‘তুই’ সম্বোধন পাইলেন, ভুলেও একবার ‘তুমি’ নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, প্রসন্নকুমার রায় (মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম হেডমাষ্টার) ইহাদের কাহাকেও কখনও তিনি ‘তুই’ বলেন নাই। অথচ প্রসন্নবাবুর তুই এক বৎসরের ছোট তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সূর্যবাবুকে তিনি ‘তুই’ বলিতেন। এই বিষয়ে তিনি যে কি পার্থক্যের নিয়ম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও আমি বুঝিতে পারি না। ইদানীন্তন বালকদিগের মধ্যে তাঁহার অপরিচিত একটি এম. এ. চাকরীর প্রার্থনার তাঁহার নিকট গিয়াছিল। ছোকরাটি থ্রিলফিট, লম্বা চুল রাখিয়াছিল। বিদ্যালয়গর তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, ‘আরে তোকে মাষ্টারি কর্ত্ত্ব দোবো কি। তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।’ এরূপ অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও তিনি কাহাকেও বা ‘তুমি’ কাহাকেও বা ‘তুই’ বলিতেন।

“শেষাশেষি বিভালাগর কতকটা misanthrope নরজাতিবেদী হইয়াছিলেন। বিশ্বর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য হইয়াছিল যে অনেক লজ্জ করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ অসার যে, অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কাজ নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন স্থগার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কোনও বিধবাবিবাহবেদী তাত্তিক তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অনেক বেশী, যদি বিধবাবিগের বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক অপরিণীতা কুমারীর বিবাহ হওয়া তার হইবে, সেটা কি মঙ্গলকর? এই আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া তিনি এক দিন বলিলেন,—‘ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না; অসার ও ডে’পো হবার এমন পথ আর নাই।’

“এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সত্যজ্ঞাতি ও সত্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অসত্যজ্ঞাতিদিগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাঁহার অন্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কথ্যটাড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতাল জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙ্গালী সাঁওতাল পরগণায় কিছু জমি খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমি আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সীমাসহরদ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীট অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্ত দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে যে অমুক শিমূল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজী হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—অমুক শিমূল গাছটা বটে; পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতে বলিয়া উঠিল, কিন্তু ঐ গাছটি বটে, বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিভালাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন, ‘দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাহসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।’

“আমার এই পুরাতন প্রেমের মধ্যে বিভালাগর কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বোধ হয় বেশ ক্ষুদ্রকম করিতে পারিতেছে; কিন্তু যখন তিনি তাঁহার মেছোবাজার ষ্ট্রিটের ছোট একতলা বালাবাড়ীর একটি কক্ষে বলিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা শুনাইতেন, তখন আমার অন্তরে যে পুলক সঞ্চারিত হইত, তাহার স্রোত আভাসটুকুও বোধ হয় তোমরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছি; বিভালাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন; আসবাববিহীন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারার হেলান দিয়া একখানি বহি হাতে করিয়া বিভালাগর নিবিটচিত্তে পাঠ করিতেছেন; কলেজে হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার

লহিত দেখা করিতে গেলাম ; বলিলাম, ‘শত্ৰুনাথ পণ্ডিত তাঁহার বাড়ীতে এক ডিনার পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; কিন্তু আমার ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ নাই, সেখানে আমি যাই কি করিয়া ?’ বিভাসাগর বলিলেন, ‘তাই ত ; এটা বেশ বিবেচনার কাজ হয় নি।’ আমিও আর নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেলাম না। এম্মিতর কত ছোট বড় কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তাহাকূট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন ; সটক। নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার হাতে থাকিত। তিনি নশ্তও লইতেন ; তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিন্তু নশ্ত কিংবা তামাক কিছুই সেবন করিতেন না।

“বিভাসাগর নিজের ছাত্রাবস্থার কত গল্পই করিতেন। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সঙ্গদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন ; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার ‘ভাব লাগিয়া’ গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, ‘আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।’ এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বলিয়া রহিলেন, তাঁহার গুণস্থল অশ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া গেল ; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল ; আমার বোধ হয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীৰ্ত্তিচন্দ্রকে সন্মোদন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বংকীৰ্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য  
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।  
শ্রীকীৰ্ত্তিচন্দ্রনূপ কঙ্কললাঞ্ছনেন  
প্রেম্যাংসমক্করদলৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥

হে কীৰ্ত্তিচন্দ্র মহারাজ। তোমার কীৰ্ত্তি চন্দ্রের জ্বায় আকাশে উদ্ভিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন, এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ মিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

“দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি যুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবায় চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুক্খি হরেন্দ্র হোম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন ; তাঁহাকে সন্মোদন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অশ্বিন সংস্কৃতপাঠশালায়সি স্থাপিত যে স্থা-  
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে স্থয়ি ।  
তন্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্বাধাস্তদুচ্ছিতয়ে  
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীৰ্ত্তিচিরং স্থাস্ততি ॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবর তুল্য ; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য । এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্ভত হইয়াছে । সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীৰ্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে ।

“সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিস্ত অধ্যাপিত অর্জন করিয়াছেন ।

“অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছ্বাসের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাঁহার ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগাণককেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থা দেখিয়াছি । তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন—

ত্রিভাগশেষাশু নিশাশু চ ক্ষণং  
নিমীলা নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত ।  
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীতালক্ষ্যাবাক্  
অসত্যকণ্ঠাণিতবাহুবন্ধনা ॥<sup>১</sup>

তখনই ‘আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত ।

“ঐ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদের নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না । বায়রণের ‘চাইন্ড হারল্ড’ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন ভাবোন্নত হইতাম যে, ‘আহা, হা, করিয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইত ।

“বিদ্যাসাগর বরাবরই চেয়ারে বসিতেন, কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না । তাঁহার মেছোবাজারের সেই ছোট বাড়ীটিতে ত ফরাসের ব্যবস্থা ছিল না ; কিন্তু সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সুন্দর ফরাসের বিছানা ছিল, বিদ্যাসাগর কখনও সেখানে বসিয়া গল্প করিতেন না ; গল্পকটবর্তী একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া কথাবার্তা করিতেন, আমরা বিছানায়

১ ‘ব্রজের ত্রিভাগের একভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে পার্বতী, কণকালমাত্র নন্দনখণ্ডল ব্রুজিত করিয়া, কাহারকেও লক্ষ্য না করিয়া, ‘হে নীলকণ্ঠ ! তুমি কোথায় চলিয়াছ ?’ এইরূপ বাক্য বলিয়া কাহারও কণ্ঠালিনন করিতেছেন এইরূপ ভাব করিয়া হঠাৎ আগ্রহিত হইতেন ।’ ( ৪৫৭ )—  
( হরিদাস সিদ্ধান্তবানীশ ভট্টাচার্য কৃত অম্বাবা )—সঃ



উপবেশন করিতাম। বিভাগসংস্কারের সহিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বহুকালস্থায়ী। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাড়ি বোঁবাজারে ছিল; তাহারই সন্নিকটে বিভাগসংস্কার বাসা করিয়াছিলেন; ক্রমে বিভাগসংস্কার নিজের বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজকৃষ্ণের বাড়িতে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিজের বাসায় কিন্তু তাঁহারই আত্মীয় দশ-বার জন লোক সদাসর্বদা থাকিত; তিনি তাহাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যয়ভার বরাবর বহন করিতেন। পরে বিভাগসংস্কার যখন মেহোবাজারে বাসা করিলেন, তখনও বোঁবাজারে তাঁহার এই বাসা ছিল, তাঁহার গ্রামের লোক আসা যাওয়া করিত, এবং সেইখানেই থাকিত। যখন তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখনও বোঁবাজারের বাসা ছিল।

“বিভাগসংস্কারের চট্টিজুতার কথা শুনিয়াছ, তিনি চট্টিজুতা ব্যতীত আর কিছু পায়ের দিতে নাই; তাঁহাকে কখনও খড়ম পায়ের দিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; কখনও কখনও তিনি লম্বা করিয়া তালতলার চটি বিলাতি বার্ণিশের মত ঝকঝকে কালো করিয়া ব্রুশ করাইয়া লইতেন; এই চট্টিজুতা পায়ের দিয়া তিনি খুব হাঁটিতে পারিতেন।

“দেখ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বেশী দূর হাঁটিতে হইলে চট্টিজুতা পরাই ভাল, পায়ের গোড়ালিতে ফোঁস পড়ে না। আমি কিন্তু তাহা পারিতাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আমি একবার গ্রীষ্মাবকাশে পদ্মভঞ্জে হাবড়া হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসন্নবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম। শুধু পায়ের পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, চট্টিজুতা হাতে ছিল! সেখানকার জল হাওয়া তখন খুব ভাল ছিল। সেবার বগায় নিকটবর্তী তিন চারিটা গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছিল, আমার অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তি আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিশীথে যখন গ্রাম স্তম্ভ, প্রসন্নবাবুর কোনও সাড়াশব্দ নাই, আমি নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদী অভিমুখে চলিলাম; নদীর কূল কিনারা দেখা যায় না। সেই জলরাশির উপর কাঁপাইয়া পড়িবার জন্ত নদীকূল। জলের ভিতর দিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়া এক বৃহৎ বটগাছের উপর উঠিলাম। নীচে চাহিয়া দেখি, গ্রামের কয়েকজন লোক আমাকে অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়াছে; তাহারা আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বৃদ্ধ হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়া অনুন্নয় করিল; তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না; বৃক্ষশাখা হইতে জলরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িলাম। এপার ওপার সত্তরণ করিয়া আমার ক্লাস্তিবোধ হইল না। বিভাগসংস্কারের দামোদর নদীবক্ষে সত্তরণের কথায় বিশ্বাসের কিছু আছে কি?

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Act-এতেই বিভাগসংস্কারের নাম আছে, কিন্তু তিনি যে কখনও সেনেটের কার্যে যোগদান করিয়াছেন তাহাও আমার স্মরণ হয় না। অবশ্যই ১৮৭২ সালের পূর্বের কথা আমি ঠিক জানি না, ঐ বৎসর

হইতে আমি সেনেটের মেম্বর হইয়া আসিতেছি। ধৃতি ও চটুপুত্ৰ ব্যতীত আর কিছু পরিধান করিতেন না বলিয়া যে তিনি সেনেটে যাইতেন না, এমন আমার মনে হয় না।

“বিদ্যালাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহারা সঙ্গে কখনও বাড়াহুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দোহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন, ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যালাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, ‘হী রে, ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?’ ললিত উত্তর দিতেন, ‘আছে বৈ কি। আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কা’র?’ বিদ্যালাগর হাসিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল; যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাঙ্গালদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেনরার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার ভাব স্বন্দরে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্ধায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্ধায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যালাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

“আমার এই পূর্বস্মৃতিবিস্মৃতি করিতে বলিয়া যাহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারিলাল, জজ দারকানাথ। আমার দাদা সংস্কৃত শাস্ত্রশাস্ত্রে ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে অশপণিত ছিলেন; ‘কুম্ভমাঙ্গলি’ ও হবস, দুইই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ‘কুম্ভমাঙ্গলি’র এত খ্যাতি ছিল যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কাউয়েল ‘সাহেব’ গ্রন্থখানিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন; গ্রন্থকার উদয়ানাচার্য্য সম্বন্ধে ‘সাহেব’ তাঁহার পুস্তকের মূখবন্ধে লিখিয়াছেন, Udayana-charya is a fixed star of which neither the distance nor the dimensions can be ascertained, তিনি কোন্ দেশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাহার কাছে অধ্যয়ন করিলেন, ইত্যাদি কিছু জানা যায় না। সেই গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক syllogism,—ক্ষিত্যাদিকং সর্বত্বকং কার্য্যস্বাৎ অর্থাৎ the five elements, earth, water, etc. must have had some author or creator, because they are the result of some activity (কার্য্য) like all artificial objects। এই স্মৃতিতত্ত্বে বিদ্যালাগর প্রভৃতি কয়েকজন মনোবী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

“আমি Positivist ; আমি নাস্তিক । যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসঙ্গ বিবৃতির সূত্রপাত হয়, শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাননাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে, —‘কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক ; he can write and he can fight, and he can slight all things divine.’”

## পরিশিষ্ট আলোচনা

আজ পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, “আমার গোটা দুই কথা নিবেদন করিবার আছে, অল্পগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।

“প্রথম কথা,—‘নিষ্ক’ শব্দের কনিক হইতে উৎপত্তি\* সন্দেহ জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় ঐতরের ব্রাহ্মণ হইতে এই গাথাটি আমাকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

‘দেশাদেশাং সমোচানাং সৰ্বাসামাণাভূত্বিণাং

দশাদদাং সহস্রাণ্যাজ্যেয়ো নিষ্ককঠ্যঃ ॥’ (ঐতরের ব্রাহ্মণ)।

আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী নিম্নলিখিত শ্লোকটি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

‘শতং দালীসহস্রানি কৌন্তেয়শ্চ মহাশ্বনঃ ।

কশ্বকেশ্বরধারিণ্যো নিষ্ককঠ্যঃ শ্বলকৃত্যঃ ॥’

(মহাভারত। বনপর্ক, ২৩২।৪৬)

“দ্বিতীয় কথা, যুধিষ্টিরাক্ষ সম্বন্ধে আলোচনাটা যেরূপ দাঁড়াইল তাহা আপনাকে শুনাইতে চাহি। সে দিন রামেন্দ্রবাবুর মত আপনাকে শুনাইয়াছি। আপনার বক্তব্যটুকুও রামেন্দ্রবাবুকে শুনাইয়াছি; তাহার শেষ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। এখন কি দাঁড়াইল শুনুন।

“রামেন্দ্রবাবু বলেন, যুধিষ্টিরাক্ষ সম্বন্ধে তিন রকম tradition আছে। (১) বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের,—পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেকের মধ্যে এক হাজার বৎসরের কিছু অধিক ব্যবধান; এই হিসাবের ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় খৃঃ পূঃ দেড় হাজার বৎসর দাঁড়ায় (round numbers দেওয়া গেল, দু’শ এক’শ বৎসর ধৰ্তব্য নহে)। (২) শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব। এই হিসাবে যুধিষ্টিরের সময়ে খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের কিছু বেশী দাঁড়ায় (কলি ৫০০০ বৎসরের কিছু উপর, এখন খৃষ্টাব্দ ১৯১১, বাদ আন্দাজ ৩১০০)। (৩) কলির আরম্ভের আন্দাজ পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে। বোধ হয় এইটি বরাহমিহিরের theory, বৃহৎসংহিতায় দেখিয়াছি। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর দাঁড়ায়।

“বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হইত। তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, সেই সময়ে কিবা তাহার কিছু দিন পূর্বে, সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে Vernal Equinox মহাবিশ্বের সংক্রান্তি হইত, এবং সেই সময়ে বৎসরারম্ভ হইত। আজকাল পণ্ডিত্য অধিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের প্রথম

নক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হয়, এবং সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বৎসরারম্ভ হয়। পঞ্জিকা। ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন মহাবিশুব সংক্রান্তি লিখে, কিন্তু আজকাল বিসুবসংক্রমণ তাহার ২১ দিন পূর্ব্ব, ২ই চৈত্র হয়। ঐ বিসুবসংক্রমণের দিনই দ্বিবারাত্রি সমান হইয়া থাকি। পঞ্জিকাগণনার বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রায় পনের শত বৎসর পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে বিসুবসংক্রমণ হইত, এবং ১লা বৈশাখ বৎসরারম্ভের এবং অশ্বিনীকে নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র গ্রহণের সার্থকতা ছিল। প্রায় বায়ান্তর বৎসরে বিসুবসংক্রমণ একদিন করিয়া পিছাইয়া আইসে। এইরূপে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ২১ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। পঞ্জিকার যদি আর সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শীতকালে দিন রাত্রি সমান হইবে।

“এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিক কালে সূর্য্য রুদ্রিকানক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিসুবসংক্রমণ এবং বৎসরারম্ভ হইত। নক্ষত্রচক্রের এক এক নক্ষত্র তের ডিগ্রির কিছু অধিক স্থান ব্যাপিয়া আছে। সেই নক্ষত্রের আদি, মধ্য, অন্ত, কোন্ খানে বিসুবসংক্রমণ ঘটিত তাহা না জানিলে সূক্ষ্মরূপ কালনির্দেশ চলিত পারে না। কেন না বিসুবসংক্রমণ এই সমস্ত স্থানটা পার হইতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার Orion নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। মন্ত্রযুগের শেষ এবং ব্রাহ্মণযুগের আরম্ভ জীষ্টের ২৫০০ বৎসর অথবা আরও কিছু পূর্ব্ব ঘটয়াছিল। তিনি এই মতেই পক্ষপাতী।

“যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া বনে যাওয়ার শান্তনু রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি স্তব্ধের ঋষি দেবাপি। ঐ স্তব্ধে শান্তনুর নাম আছে। বেদের শন্তনু মহাত্মারতের শান্তনু। শান্তনুর রাজত্বকালে অনাবৃষ্টি ঘটায় দেবাপি আসিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐ স্তব্ধে সেই উপলক্ষে দেবাপিকর্ত্ত্বক দৃষ্ট হইয়াছিল। বৃহদেবতা গ্রন্থে এই উপাখ্যান আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুধিষ্ঠির বেদের মন্ত্রযুগের শেষকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

“অন্যদিক হইতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। বশিষ্ঠ, তাঁহার পুত্র শক্তি, এবং পৌত্র পরাশর, ঋগ্বেদসংহিতার বহু মন্ত্রের ঋষি। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া সেরূপ প্রসিদ্ধি নহেন, কিন্তু তিনি বেদের সকলন ও বিভাগদ্বারা বেদব্যাস আখ্যা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী এবং মহাত্মারতের রচনাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রযুগের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে উল্লিখিত গণনা অনুসারে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বা তাহার কিছু পূর্ব্বকালকে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

“বৈদিকযুগের কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত এরূপ প্রমাণ বেদের মধ্যেই আছে। বিসুবসংক্রমণের কাল ক্রমশঃ সরিয়া বাণ্ডার কৃত্তিকা এখন ঠিক পূর্ব্ব উদিত না হইয়া একটু উত্তর-পূর্ব্ব উদিত হয়। এই উত্তরস্থান কতটুকু সরিয়া গিয়াছে তাহা

দেখিয়াও বেদের কালনিরূপণের কতকটা সাহায্য হয়। এতদ্বারা পূর্বোক্ত অতমানই অনেকটা সমর্থিত হয়।

“তাহার পর ‘আলন্ মঘাস্থ মুনঃ শালতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতো’ এই উক্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন, ‘কৃষ্ণকমলবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। মঘা ও লগ্নবি Fixed Stars তাহাদের relative positions বদলায় না। এই অল্প আলন্ মঘাস্থ মুনঃ কথাটার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। তদ্ব্যতীত ঐ বচনের সঙ্গে যে ধরা হয় যে মুনগণ এক এক নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া থাকেন, ইহারও কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠিরের সময় মুনগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন; তাহার পর ক্রমশঃ একশ’ বৎসরে এক এক নক্ষত্রে সরিয়া গিয়া এখন অগ্রত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, এই জ্যোতিষ বাক্য অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কালগণনার চেষ্টা নিষ্ফল; কেন না, ঐ জ্যোতিষবাক্যের কোনও সঙ্গত অর্থই পাওয়া যায় না। তবে আমি একটা মানে দিতে পারি। আমার ব্যাখ্যা এই :—

“The Ecliptic is a fixed circle in the celestial sphere, and it makes the plane of the earth’s orbit round the sun. Its axis passes through a fixed point on the celestial sphere which is called the Pole of the Ecliptic. The earth’s equator does not lie in the plane of the ecliptic, but is inclined to it by about twentythree and a half degrees; so the earth’s axis of rotation, instead of passing through the Pole of the Ecliptic, passes through another point in the celestial sphere which is twentythree and a half degrees distant from the Pole of the Ecliptic. This latter point is called the Pole of the Equator. This point, however, is not fixed. It revolves round the fixed Pole of the Ecliptic once in about 26,000 years. What is called the Precession of the Equinox is a consequence of this motion of revolution of one Pole round the other. The solstitial colure is a line joining the two poles, one of which is thus fixed and the other moving. This line, therefore, makes a similar revolution round the fixed pole of the Ecliptic; and the end of the line where it cuts the Ecliptic moves along the Ecliptic once in 26,000 years.

“The lunar asterisms, which are twentyseven in number, are star-groups roughly distributed along the Ecliptic; and as the solstitial colure revolves, it passes from asterism to asterism, crossing each asterism in  $26,000/27$  or roughly 1000 years. At

present the colure passes through the asterism *Ardra* ; but between 2500 B. C. and 1500 B. C. it passed through the asterism *Magha*.

“Now if a line be drawn from the Pole of the Ecliptic to a point in the asterism *Magha*, this line will be found to pass through the constellation Great Bear. Which is the same as the constellation of seven *Rishis* ; and if we will call this the *Rishi* line, it will be readily seen that this *Rishi* line was very close to, and at times almost identical with the solstitial colure between the years 2500 B. C. and 1500 B. C. During the period the colure passed through the *Rishis* and through the asterism *Magha* as well. The only rational interpretation that can be given to the text আসন্ মধাস্থ মনঃ যুগিষ্ঠিরে শাসিত পৃথ্বী is that when Judisthira lived, the solstitial colure passed through the constellation of *Rishis* and the asterism *Magha*. In that case Judisthira lived sometime between 2500 B. C. and 1500 B. C.

“The *Rishis* form a fixed group of stars in the heavens, and they can have no motion relative either to the Pole of the Ecliptic or to the lunar asterisms which are also fixed. It is the line of the colure and not the *Rishi* line that moves across the asterisms. But the two lines were coincident in some past epoch, and by a confusion of thought what was really a motion of the colure was taken to be a motion of the *Rishis* themselves. Even so the duration of motion through an asterism would be about a thousand years, and not a hundred years only, as is assumed in the Sanskrit astronomical texts.

“অর্থাৎ এক হাজারে কোনও রূপে শুল্ক ভুল হইয়া একশতে দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হয়। মূনিগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষি নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করেন, এবং যুগিষ্ঠিরের সময় তাঁহারা মধ্য নক্ষত্রে ছিলেন; এখন সরিয়া অন্য নক্ষত্রে আসিয়াছেন, এই যে প্রচলিত জ্যোতিষ বচন, ইহার অন্য কোনও রূপ সম্ভব অর্থ পাওয়া যায় না।”

## নাকে ৩৭

ইহা কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। ইহার ইতিহাস লম্বা আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন :—

হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাফুর লোক, তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলে। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ লম্বা একটু টাকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিচ্ছেদিনিধি

ওরফে

মিষ্ট অমল বিভাষুধি।

ধনুন্ধর ওরফে 'গুণেন্দ্র'

অগ্নিতট্ট ওরফে 'ধুম্মালি'

চাঁদকবি

রত্নসভা

আমি

... যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

... উমাকালী

... হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



## কাব্যোক্ত পাত্র

### পুরুষ

কষ্টকল্প বিচ্ছেদিনিধি

[ বন্ধুসমাজে, মিষ্ট অমল

বিজ্ঞানস্থি নামে পরিচিত ]

ধনুন্দর

[ বন্ধু সমাজে “গুণেন্দর” ]

অগ্নিভট্ট [ বন্ধুসমাজে “ধূমখালি” ]

চাঁদকবি

বাণু পা পাঁড়ে

একজন নানাসাধুবিশারদ বহুভাষা-পণ্ডিত  
কিন্তু বিষয়বুদ্ধি প্রায় নাই। সস্ত্রাতি  
রত্নসভা\* ইহাকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়া  
অধ্যাপকত্বে বরণ করিয়াছেন।

একজন ব্যবসাদার বড় মাহুষ ;  
বিচ্ছেদিনিধির বন্ধু।

উকীল, বিচ্ছেদিনিধির ছাত্র,  
পূর্বোক্ত উভয়ের বন্ধু

একজন কিন্তু-তকিমাকার কবি পূর্বোক্ত  
সকলের বন্ধু।

বিচ্ছেদিনিধির দারবান।

### স্ত্রী

রাঙা বোঁ

সতিন্ বোঁ

মোকদ্দা

কুণ্ড

গর্ভরী

সন্ধ্যাবালা }

বিচ্ছেদিনিধির বর্ষায়সী গৃহিণী ;

অভাব কিছু অধিক স্বল্প।

বিচ্ছেদিনিধির সুবতী স্ত্রী।

রাঙাবোঁএর দাসী।

সতিন্‌বোঁএর দাসী।

রাঙাবোঁএর কন্যাস্বর।

“রত্নসভা” নানা জাতীয় পণ্ডিতের একটা বৃহৎ সভা ; কোন ধনশালী রাজা  
প্রতি বৎসর এক এক জন অধ্যাপককে মনোনীত পূর্বক অনেক টাকা বৃত্তি দিবার ভার  
এই সভায় প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

নাকৈ থং

( হান্ত-কাব্য )

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্তাক

কষ্টকল্প বিস্তেনিধি । (Seated,—a quantity of bank-notes scattered before him)

বিস্তেনিধি । (Solos স্বগত )

চেরু টাকা ।—উঃ চেরু heaps of'em ,

জয়্ জয়্‌কার রত্নসভার । well, that's a name !

অনেক শম্মা—বিস্তেনিধি, বিস্তেদুধি ভায়া

বৈচে যান—( বড় নয় । ) আমারি যা হওয়া ।

“একাদশ বৃহস্পতি”—বচনটা ত ঠিক ।

ভাগ্য ফলাতি সর্বত্র—শাস্ত্র কি অলৌক ?

নিদেন্ অনেক দুখী প্রাণী ( নামের পিঠে ছালা )

রত্নসভার দোহাই দিয়ে জুড়োন পেটের জালা !

( নোটগুলো নেড়ে চেড়ে )

তা, এই গ্যালো—একশো একশো—আর একশো—এই ;

( এ মাস্টা চলবে ভালো, ভাব্‌ন। বড় নেই ! )

আর চারশো—ওতে শুধুবো অম্বর ভায়াব দেনা ;

অখণী মানবো শ্রাদ্ধ—পরেও যদি ট্যানা ।

এই পাশ্‌শো—বড় গিন্নির হাতে দেবো ফেলে ;

বাগ্‌দানটা অনেক দিনের, আর চলে না ঠেলে ।

( আ গ্যালো যা, তবু ফুরায় না ! )—বাকি এ পঞ্চাশ

( সবটাকা একবারে কি না ! ) এ পঞ্চাশ, —ও সর্বনাশ,

এ বছরের লাইসেন্সি যে আজো নিতে বাকি !

( বেওসাদারি মন্দ নয়, সেটাও হাতে রাখি, )

ও টাকাটা, পাঠাই তবে অগ্নিভট্টের কাছে,

ভক্ত শীর্ষং যুক্তি ;—কে ওখানে আছে, ?

( বাপ্পা পাড়ের প্রবেশ )

এক জেরা ঠহুরো—

( ছইখানি চিঠির মোড়কে শিরনামা লিখিয়া )

দো খং লেকে যাও ;

ইয়েঃঠো কান্ধীরি ঠাকুর—লেও হাত্মে উঠাও,

ঠাকানা মালুম ? ইয়েঃ খাম্ উনহিফো দেনা ।—

দোসরা ইয়েঃঠো ভট্জী ( ছায় তো পহচানা ? )—

লছালা মুরদ, গোরা, বেলকা তৌছর লীর—

উনকা পাস্ লে জানা ।

বাপ্পা ।—

হাঁ মালুম কিয়া, মায় ।

( বাপ্পা পাড়ে চিঠি লইয়া নিজ্জাস্ত । )

বি । ও সৰ্ব্বরি । আয়, হেখা ।—

( সৰ্ব্বরীর প্রবেশ )

ঠাকুর মা কোখায় র্যা ?

সব । পূজো কচে ঠাকুর ঘরে ; আমি ঘাই—আ্যা—আ্যা—( পালাবার চেষ্টা । )

বি । শোন্না বলি, ফুল তুলেছে কে র্যা আজ তাঁর ?

তুই তুলিচিস্ ?

সব । না বাবা না, আজ যে সৌদির\* ভার ।

বি । যেই তুলিস্, তা অতো কেন ? আন্দাজিটাক্ দিবি,

পূজোয়-পূজোয় মলো গাঙ্গী !—বলি শোন্ সবি ।

বলো গে তো রাঙা বৌকে আমার ঘরে যেতে ।

সব । কেন বাবা ? তাকে কি তুই সন্দেহ দিবি খেতে ?

আমায় দে না—

বি । দেবো এখন, আগে গিয়ে বল্ ;

লক্ষ্মা মেয়ে সবি আমার, চল্ মা, ঘরে চল্ ।

( উভয়ে নিজ্জাস্ত । )

## প্রথম অঙ্ক

### দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

( পাশের ঘর )

( স্বাভা বো এবং বিজ্ঞানিধির প্রবেশ । )

স্বাঃ বো । কেন ডাকলে ?

বি । আর কিছু না, এই কথানা নোট  
( তিনশো টাকা ) মাকে দিও,—স্বাস্থ্যের মোট ;  
উপরি অতিথি যত কিছু, সবই এতে সারা—

স্বাঃ বো । আর হতভাগীর হলো বুঝি কথাই আশায় ঝাঝ  
দেবো—দেবো, হচ্ছে-হবে, কতই এলাকাটি !  
মিছে খালি কেঁদে মলুম ভিজিয়ে আচোট মাটি ।  
বলে দেবে এক-খানা—তা সেই বা এত কি ?  
চাট্টে মেয়ে পেটে হনো—ছাড়া গলা ছি !  
মুখ দেখাতে লজ্জা করে, লোকে কতই বলে ,  
আমার বেলায় শুকনো হাঁড়ী—সবার বেলায় চলে !  
এদিক কিছু বলি নাই—ভালো, টানাটানি,  
এখন কি যে—ঐ কি বলো—শুনচি কাণাকাণি  
রত্নসভার কি নছারি—কি একটা ভারি  
পদ হয়েছে—তবু কেন এখন মারামারি ?  
না যদি দেও, বলুই না হয়—ভাঁড়ীভাঁড়ি কেনো ?  
মন ঠাণ্ডায় প্রাণ ঠাণ্ডা আসল কথা জেনো ।  
এদের—ওদের—তাদের বেলায় কতই শুভে পাই ;  
ধন্য ভেবে দেওত দিও, এখন আমি যাই ।

বি । চটুই কেন ? শোনো বলি—

স্বাঃ বো । শুনে শুনে কালা !

বি । সত্যি বলছি এবার তোমার পোহাবারোর পালা ।

স্বাঃ বো । ( ধমকে ) তিন সত্যি কর ।

বি । তিন সত্যি ?—মেয়ের পড়ে !

স্বাঃ কি বাৎ হায় হাতী কি দাঁৎ—কব্জি না তোড়ে,  
ইয়াৎ থাক্‌হো জী !

রাং বোঁ । ও আবাবু কি ? কি দেবে দেও ।

( বিচ্ছেদ হস্ত প্রসার )

দেখি—দেখি, কত ভরী ?

বি । ধরো, এই নেও ।

রাং বোঁ । ( গালে হাত )

ও পোড়া ছাই ! কি অভাগগি !—এতেই কাঁপাই এত ?

ছেঁড়া কাগজ একটুকরো—যেতি পাতের মত !

কাজ নি—রাখে —

বি । আ আবাগী, পাশশো টাকার নোট !

ঐ ভাঙালিই দর্শনলী হয়—আর এক ছড়া গোট !

রাং বোঁ । ( আঁচলে বেঁধে )

জিগ্‌গুবো—ঠাকরুণকে—

বি । দিকি—বিলক্ষণ ।

( মুখরা প্রথরা ভাষা তথাপি কাঞ্চন )

দাঁড়াও—শোনো, বলি শোনো—

রাং বোঁ । শুন্‌বো, তা এখন

মিটুই আগে সন্দেহটা ।

( প্রস্থান )

বি । আ তোমার মরণ !

## প্রথম অঙ্ক

### তৃতীয় গর্তাঙ্ক

( ধনুন্ধরের বৈঠকখানা । )

( অগ্নি এবং ধনুন্ধর আসীন । )

অগ্নি । হরে কিষ্ট ! হরে কিষ্ট । রাখামাধব, ছি !

ধনু । ( XIX Century মুড়ে )

অ্যা,—কিহে, ও অগ্নিভট্ট ? কও ব্যাপারটা কি ?

অগ্নি । ( ধনুর হাতে দিলে )

এই নেও পড়ো চিঠি খানি—এই নেও ধরো নোট,

রত্নসভার অধ্যাপক—কেবল ভোটের যোট !

ধহু । ( নোট ও চিঠি হাতে—স্বাক ! )

আঃ গ্যালো যা ! রওত দেখি ;

( উল্টে পাল্টে )

—না পাশ্শোই বটে !

বেশ পঞ্চাশ, বিস্তেনিধি !

অগ্নি ।

ল্যাজ বেঁধে দাও জটে ।

চাচা ছোলা বুদ্ধিখানি গুরুর আমার বেশ ;

দিনকাণাটা মাঝে মাঝে—ঐটে দোবের শেষ !

অনেক জানে, অনেক পড়ে, অনেক ভাষায় জ্ঞান,

বিষয় কাজে এই খান্টা ( কপালে হাত দিয়ে )—

আদ্যারে ল্যাগ্যান্ !

তীর আবার গে বেওলাদ্যরি—সাইসেনির পাস !

মকন্ গিয়ে ভটি পড়ে—নয় করন্ গে চাষ !

ধহু ।

চটো কেন ?

অগ্নি ।

দেখো দেখি—চটবো না ত কি ?

পঞ্চাশে—পাশশোর ফের—তার টিকি কেটে দি ।

ধহু ।

খাকুলে ত ?

অগ্নি ।

কি বলবো ছাই—চাঁদ কবি যে নাই !

ধহু ।

না, বেচারী—ভাক্সে কত !—ফেরোং দেওরা চাই ।

অগ্নি ।

তুমি দেখছি আর একটি ! রগড় করে কে ?

সাধে খুঁজি চাঁদ দাদাকে,—খাকতো যদি সে—

ধহু ।

তাই বলো না—রগড় ঝোজো ?

অগ্নি ।

বল্বে ঘোড়ার ডিম্ !

টাকা ফেরৎ দেবে তাকে ? খাক আগে হিমসীন্ !

ধহু ।

তবে চলো বড়ীর হাতে দিয়ে আসি তাঁর,

বাড়তি যেটা লাড়ে চাশ্শো—বেশ হবে পরজার !

ঘরে ঘরে বাখ্বে ভালো—জলটা উচুনীচু !

ভাল মাহ্বেবের মেয়ে না হয় পেয়ে যাবে কিছু ।

অগ্নি ।

বেশ কথা এ,—চলো তবে—খাবার খেয়ে আসি,

শীশ্গিরি বলো গাড়ী জুড়ে ।

( প্রস্থান )

ধহু ।

কোন দ্বার রে ? ঘাঁসী,

কোচ্মানকে ভেজো ইহা ।—না, বিকি পীরের খাসী ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম গর্তাঙ্ক

( বিভেদিনিধির বাট )

( ধনুস্বর ও অগ্নিভট্টের প্রবেশ । )

ধনু । বিভেদিনিধি মহাশয়, বাড়ী আছেন গো ?

অগ্নি । কারুই যে লাড়া নাই—

ধনু । ও বিভেদিনিধি,—ও—ও—

না, ঘরে নাই । —ও সন্ধ্যা, —ও নিশি—ও সন্ধ্যা, —ও

নিশি—ও সন্ধ্যা, —ও নিশি—ও সন্ধ্যা, —ও

ও গো, কে আছে গো ?

অগ্নি । গ্যালো যা বাড়ী শুদ্ধ কালো ?

রাং বো । ( পরদার ভিতর হইতে যুদ্ধস্বরে )

ও মোক্ষদা, জিগগোস্ না, কে ?

মো । ইয়া গা, কে তোমরা গা ?

কাকে খোঁজো ?—কতা বাড়ী নেই ।

ধনু । কতার মা ?

তিনি কোথা ?—আর মেয়ে সব যত কুঁচো কাঁচা ?

মো । ও গো, সবাই গ্যাছে—সে বাড়ীতে ।

ধনু । বাইরে এসো বাছা ।

( মোক্ষদার প্রবেশ )

ইয়া গা, একাই তুমি আছে ?—বোঁও নেই ঘরে ?

মো । কোন্ বোঁ গো, রাঙা বোঁ ?—বাড়ী মাথায় করে

তিনিই কেবল আছেন একা ।

ধনু । ( অগ্নিকে ) কর্তব্য কি পরে ?

অগ্নি । গুরু-পত্নী—হান্ কি তাতে ?—ওগো বাছা শোণো ।

ধনু । করিস্ কি,—ও মিন্‌সে ?

অগ্নি । তুমি গাছের পাতা গোণো,

একাই আমি যাবো না হয় । ও স্বি, তাঁকে বলো,

বাবু একটি মোটা সোটা—গণেশ পেঁটা, থলো,

ধীরপুয়ে ঘর, বড় দরকার—দেখা কস্তে চান ।

আর—পড়ো আমি গুরুঠাকুরের—আমাস্তরে পান

এনো দুটো হাতে করে ।

মো । ( অগ্নির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিয়া )

আশনারা দাঁড়ান ।

( প্রস্থান )

মো । ( পরদ্বার পশ্চাৎ ভাগে )

ও রাভাবো, খড়কি তুলে দেখদেখি চেরে

বাবু ছুটা, কে ওনারা ? চিন্তে পার মেয়ে ?

একটি ওদের গেরখারি, একটি কিছু কাঁচা

( জানিনে মা আজকালকার কলকাতার কি চ্যাঁচা )

পান খেতে চায় ! আবার বলে আসবে তোমার ঠাই ;

চেনা শুনো হবে বুঝি ! দরওয়ানটাও নাই ?

রাং বো । ও কি, ওদের আসতে বল, বসতে জায়গা দে ।

মো । ( দুইখানি আসন পাতিয়া )

আমুন তবে ।

রাং বো । ও মখি, ও পোড়ারমুখী কপাট টেনে দে ।

( কপাট অর্ধবন্ধ করণ )

( ধমুঃ ও অগ্নি অন্তরে প্রবেশ )

ধমু । দরকারী কাজ তাই আজকে এতো বাড়াবাড়ি,

কতটা কি গাঁজা টানেন ! টাকার ছড়াছড়ি ?

পকাশেতে পাশ্শো দেন—হিসেব আটাআটি !

রাখো তুলে, ধরো এখন সাড়ে চাশ্শো খাঁটি ।

পাশ আপিসে পকাশ দিতে পাশ্শো দেছে ফেলে,

মাথা খুঁড়লেও দিওনা তাঁয়, দেখবো কেমন ছেলে !

ও টাকাতে গয়না করো—না হয় যদি পারো

কোম্পানীর কাগোজ কিনে আখের হুসোর করো

দাঁতে কুটা নিলেও তবু দিও না এ তায়,

কোথা পেলে এখন যেন সন্ধান না পায় ।

মো । ( রাভা বোঁএর হইয়া ) উনি বল্চেন—

আপনিই রাখুন, কাজ কি হাতের ফেরে ;

গয়নাস্তরে পাশ্শো টাকার নোট দিয়েছেন ধরো

আজ সকালে ; তাই ভাব্চেন আবার কেমন করো

নেবেন এটা ?

ধমু । ( মোক্ষদার প্রতি ) কই, দেখি ? নেও ত চেরে ।

( অগ্নিকে ) গ্ৰহে সন্ধ্যা—বুঝেছ ত ?



অগ্নি । তোমার আগে—all bright as day.  
 ( ভিতরে বাক্স টানার ও চাবি খোলার শব্দ )  
 মোঃ। ( ধনুর প্রতি )  
 এই নিন, এই কাগজখানি আজ সকালে দিয়া  
 নিরুদ্দেশ সেই অবধি । ( নোট প্রদান )  
 ধনু । ( নোটখানি দেখিয়া )

ও শর্মা ভায়া,  
 দেখো দেখো, যা ভেবেছি ঠিকঠাক এ তাই ।  
 ( নোট দেখাইয়া )

অগ্নি । হৃদ কলে বিচ্ছেদিনিধি “ড্যাম his আই”  
 ধনু । ( ৫০০ টাকার নোট দিয়া )

এখন তুলুন সবগুলি এ সিদ্ধকটা খুলে ;  
 আ-হাবা, বামুনের মেয়ে, এতেই গেচেন ভুলে ?  
 পাশ্শো নয়ত ! পঞ্চাশ যে তোমার যা তা হেথা,  
 এখন কি আর এ সব নিতে ধন্যধন্যির কথা ?  
 পাশ্শো দেছে পাশ্শোই গুর । কসে বাধুন গিরে  
 পরন্তু দিনে বিকেল বেলা আসব আবার ফিরে ।  
 আমরা এলে পরে যেনো—দেছেলো যে খানি,  
 সেইখানিকে দেখিয়ে তাঁকে, করেন টানাটানি ।  
 ঘোরফের সব মিটে যাবে মিলবো যখন হবে ;  
 ভালমাহবের মেয়ে তোমার পুরো পাশ্শোই হবে ।

( আসন হইতে উত্থান । )

রাং বোঁ । ও মোক্ষদা, বস্তুতে বল, খাবার তৈয়ের করি ।  
 ধনু । আজ থাক্, সে পরন্তুই হবে, আগে চুরি ধরি ।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

বিচ্ছেদিনিধির অন্তঃস্থায়ী বাটী

( সজিন বোঁ ও কুঞ্জর প্রবেশ । )

স । কি লো কুঞ্জ—দেখা হোলো ?

কু । না, লতাই মা, না

- স । ও বাড়ী নেই,—গেছে কোথা ?  
 কু । ইচ্ছে যেথা ।  
 স । তোমার মাথা !—ভেঙ্গে বল ! তোর আজ্জের নতুন কেতা !  
 কু । সবই নতুন—একলাই কেনে থাকবো হেঁড়া স্নাতা ?  
 স । তুই যে দাম্ভরায়কে টেকা দিলি ? ও কুঞ্জ কি ।  
 কু । সতাই মা, শুন্‌লুম গিয়ে ও বাড়ীতে  
 স । ( সাগ্রহে ) কি শুন্‌লি, কি ?  
 কু । শুনে এলুম কাণামুখো পাংশো ঢাকার নোট,  
 তিনশো ভরির চন্দ্রহার একশো ভরির গোট ;  
 রাঙা বোয়ের ভাঙ্গা কপাল শুন্‌লুম গ্যাছে ফিরে ।  
 তখন ভাগ্যবতীর পেশাবাদাম—সতীনমায়ের জিরে !  
 স । রাখ্‌ তোর ছড়াকাটা—কে বল্লো তাকে ?  
 কু । ওরাই বলে—তারাই বলে—পাড়াশুদ্ধ লোকে ।  
 স । কুঞ্জ, আমার মাথা খাসলো, আনগে তাকে ডেকে ।  
 কু । ( জিব কেটে )  
 ছি কি কথা ? আনবো তো গা নাগাল পেলে তায় ?  
 চৌপাহারা চান্দিকে যার তায় কি ধরা যায় ?  
 কাটলে শেকল আর কি পাখী দাঁড়ের পানে চায় ?  
 এখন রাঙা বোয়ের খাঁচায় পোরা, আর কে তাকে পায় !  
 স । পোষা যে লা ? অনেকদিনে অনেক ছাত্তু গুলে  
 সিটা দিতে শিখিয়েছি তায় সেও কি যাবে ভুলে ?  
 যা কুঞ্জ যা, যেখানে পাস, আ—ঐ যে গুণমণি ।  
 ( দূরে বিচ্ছেদনিকেকে দেখিয়া )  
 যা, সরে যা—ঐ ঘরে থাক্‌ ; আজকে খুনোখুনি !  
 ( বিচ্ছেদনিকির প্রবেশ )  
 স । ( তাহার নিকটে গিয়া )  
 আমার কিছু চাই ।  
 বি । হাতে কিছু নাই ।  
 স । ওদের, ওদের বেলা  
 তবে ঢাকার কেন খেলা ?  
 রাঙা ভোবায় জলে  
 শুনি, ছি নী নি চলে ।  
 ঢাকাই জালা পেট,  
 চন্দ্রহাজে পেট !

কাঁকাল গাছা বোট  
তাইতে সোণার গোট !  
আমার বেলা যেই,  
অমনি হলো নেই !

বি । কে বলেছে এ সব কথা ?

স । কেন ?—একি সব উচ্ছে নতা

বি । দি, দিয়েছি ইচ্ছে আমার ।

স । কে তোলাবে—আমার— ?

বি । যা ছিল তা সব গিয়েছে ।

স । কতো ছিল ?—কে নিয়েছে ?

বি । তোমায় বলে তা—হবে কি ?

স । শুভকরী আঁক শিখছি ।

বি । ক্যামা কর—ক্যামা কর—সত্যি হাতে নাই ।

সর্বো । একাদশ বৃহস্পতি—কি তবে সে চাই !

শনিবারে স্নেবে পুরে এলো এতো গুলো—

মার্কামারা—“ভেলম-পেপার”—সে গুলো কি ধুলো ?

ভাল বটে নাগরালি কারো মুখে খাজা !

তারি যেনো আট্টা মেয়ে—আমি কি তা বাঁজা ?

বি । ক্ষেমকরী ক্যামা কর—হিসেব শোণো বলি ;

ধূলিগু“ড়ি সবই গ্যাছে—শূন্ত এখন থলি ।

দিকি করি পায়ে ছু“য়ে

( জাতপাতপূরক )

—চাশুশো মহাজনে,

তিনশো গেল পেটে খেতে—পঞ্চাশ লাইসেনে ;

আগ পাশুশো—আর পাশুশো রাখতে দিয়াছি,

ভাল মন্দ আখের ভেবে—

স । আমিই তবে কি

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ও বিত্তেনিধি ?

বি । কিরে বাবে যত পাবো, তোমায় দেবো সব,

গুরু হাঁড়ি—পায়ে নেড়ে—কেন কর রব ?

স । লেখো তবে—লেখো থত—( আনতো কি ইংগ্যাও )

হৃদয় লিখে দেও—“প্রমিলরি বণ্ড”

আমি নাকি বোকা মেয়ে—আমায় কেবন ফাকি ?

গুণনিধি, গুণীন্ আমি, চিনি ভালো—চাকি ।

বি। ( খত লিখিয়া পাঠ করণ )

“I O U—আই প্রমিস্”—সাতশো টাকা সাড়ে,

“অন্ ডিমাণ্ডে” দেবো আমি হুদে যত বাড়ে ;

মাসে মাসে—টাকায় টাকা হুদে দিতে স্বীকার ;

না যদি দি—সতীন বোঁএর শ্রীপদ-প্রহার ।

স। এখন—সে বাড়ী যাও বিচ্ছেদিনিধি !—করো গে আহ্বার ।

সঃ বোঁ। ( প্রস্থান )

( ভাবিতে ভাবিতে বিচ্ছেদিনিধির প্রস্থান )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

( বিচ্ছেদিনিধির গৃহ )

( আসান তন্তুপোষে— )

বিচ্ছেদিনিধি, ধনুকের ও অগ্নিতট্ট ।

ধনু। আজ্ঞে বড় ব্যাজার ব্যাজার ?

বি। এমন কিছু নয় ।

ধনু। তবু—তবু ?

বি। মাথা মুণ্ড—

ধনু। বলতে লজ্জা হয় ?

বি। আর আলিও না,—ঢের জলেছি !

অগ্নি। সে কেমন আবার ?

কি জ্বালাতন গুরুঠাকুর ?

( সন্ধ্যাবালার প্রবেশ )

সন্ধ্যা। ও বাবা, একবার

বাড়ীর ভেতর মা ডাক্চে

বি। যা যা—এখন যা ।

সন্ধ্যা। আর শীগ্গির শীগ্গির করে—ডাক্চে তোকে মা ।

বি। সেও মরুক—তুইও মর, দে—কাপড় ছেড়ে দে ।

যাবো এখন—যখন খুলী ।

ধনু। ভারী গরম যে ?

যাও না কেনো, একটবার শুনেই না হয় এসে ;

আমরাও ত বসবো, খাবো—দোষটা কি তা গেলে ?

বি । বড় জ্বালালে চল্ যাচ্চি । ( সন্ধ্যার সহিত গ্ৰন্থান । )

অগ্নি । আমরাও গুড়ি গুড়ি  
চলো না কেন পেছ ধরি ।

ধনু । আ বিস্তের বুড়ি !

টের পাবে যে—সব ফাস্বে—তুমি কি পাগল ?

হেথা বসেই সব শুন্বে ;—ভাবনাটা কেবল

পারবে কি না ভাল রাখতে ;—নয় কুঁহলে থল ।

অগ্নি । ঐ বেধেছে—নারোদ নারোদ !—পারবে না কৌদল ?

কৌদল ছাড়া মেয়েমানুষ কে দেখেছে কবে ?

ধনু । শোণো—শোণো—হচে কি ।

রাং বো । ইয়াগা নাকি তবে

পাঁশ্শো টাকার একথানা নোট গয়নান্তরে দেছ ?

জুয়োচুরি এমনতরো কদ্দিন শিখেছ ?

তাই বুঝি, তা—ঠাক্কণকে দেখতে দিতে মানা ?

ভেঙ্কি খেলার চোখে ধুলো—যায় পাছে বা জানা !

নেই বা দিতে ;—এ ভাড়ামি এ বয়সে—ধিক্ !

গলায় দড়ি ! বিতেনিধি উপেধটাতেও ধিক্ !

আর একটা—কি ঐ যে—রত্ন কিসের পায়া—

তাতেও ধিক্—ধীক্—ধীক্—বড়ই বেহায়া !

মাথা খুঁড়ে মরুবো আমি—ঘর সংসারে ছাই,

এই নাও সেই জালী কাগোজ—

( ৫০ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া )

বি । কি জ্বালা—বালাই ।

এই থানা কি সেই থানা ?

রাং বো । না, অনেক স্রাডাং ভাই

আছে কি না—দ্বিচ্চে আমার হাতে গুণে গুণে ?

বলতেও লাজ নাই কি মুখে ?—পোড়াও গে উঠনে !

বি । তাইতো—তবে কেন্ন হোলো ! কাকে দিহ্ন তুলে ?

রাং বো । হয় তো তাকেই দেছ—যার পাখ্-ধুলো খাও গুলে !

বি । ( ক্রুদ্ধ হইয়া )

মুখ সাম্লে কথা বলিস—বড় বাড়াবাড়ি ?

শিকের তুলে এমনিই হয় ভাঙ্গা ছড়ার হাঁড়ী !

- ধম্ম । ( বাহির হইতে )  
 বিচ্ছেদিনিধি, বলি গুণি ?—কি হয়েছে অ্যা ?  
 ভদ্রলোকের কথার কেতা এমনিই বটে, ছা !
- বি । ( হতবুদ্ধিভাবে নোটখানি দেখিতে দেখিতে প্রবেশ )  
 তাইত ।—তবে এ কি হলো ?
- ধম্ম । কি হয়েছে বলো ।
- বি । হবে কি আর মাথা মুণ্ড ।—এদিক ওদিক গ্যালো ।  
 শম্মাভায়া, ই্যা হে, তোমার চিঠির ভেতর মোড়া  
 নোটখানা সে কত টাকার ?
- অগ্নি । না দ্বিবি শালের ষোড়া  
 পুরস্কার হলো শেষে । এ নৈলে কি হয় ?  
 গুরুর মত গুরু বটে—বিচ্ছেদিনিধির জয় ।  
 হুকুম যেমন—তেমনি দিছি সরকারি-আপীসে  
 চাণ্ডরটিকে এখন দেখি জেলে পাঠাও শেষে ।
- বি । আরে চটো কেন ? আমার হেথা—বেশ্মোতেলো জলে  
 ধম্ম । চটবার তো কথাই বটে—  
 বি । বাচি আমি ম'লে ।
- ধম্ম । কি হয়েছে, বলুই ছাই—বুঝতে তবে পারি ।
- বি । মাথা মুণ্ড বলবো কি আর—করিছি ঝকমারি  
 রত্নগভার টাকার পিণ্ডি—হাতে নিয়ে তুলে ।  
 পাশ্শো টাকার একখানা নোট—কাকে দিছি ভুলে ।  
 ঠিক মিলুতে ঘাম ছুটেছে—নাকে দ্বিগুণ ঋৎ  
 এ ঝকমারি আর করবো না—দেখবো অগ্ন পথ ।
- ধম্ম । জানো আমার ঠিক ঠাকে আছে লেয়াকৎ ।
- বি । ই্যা তা জানি ।
- ধম্ম । চলো—তবে, নাকে দেবে ঋৎ  
 রাডাবো এর চরণতলে,—মিলিয়ে দেবো তবে  
 আর এক কথা—একটা ভালো ফলার দিতে হবে ।  
 থাকবো তাতে আমরা দুজন—ইয়ার বকল আর ;  
 চান্দকবিকে হবে দিতে কথকতার ভায় !  
 আগাগোড়া সভার মাঝে ভাবে তোমার ভূব ।  
 রাজী হওত, ভ্রমটা তবে করি এখন দূর ।
- বি । তাই নই,—আর সর না প্রাণে ! যেথা সেথা জালা,  
 দিবারান্তির ঝগড়া কোদল—কাণ্টা ঝালা পালা ।

এক জায়গায় দাসের খৎ—এক জায়গায় নাকে ;  
 অধ্যোপকি কর্ণ ভালো—চরকার পাকে পাকে !!  
 ধহু । চল এখন বোয়ের কাছে ।  
 বি । আজকে না হয় থাক ।  
 ধহু । না না,—না তা হবে না—ছেঁচতে হবে নাক !  
 পঞ্চাশ্ দ্বিতে পাশ্শো দিলে—পাশশোতে পঞ্চাশ ;  
 ঠিকঠাকে মিলে গ্যালো—মিট্‌লো দশের আশ্ !!  
 ( সকলের অন্তরমহলে প্রবেশ )

সমাপ্ত

## দ্বিতীয় পর্ধ্যায়

### এক

১৩ই কান্তিক, ১৩২০ ।

অপরাত্নে কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি যে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত গাড়ি লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের গৃহে পৌছিয়া প্রথমেই তাঁহার পিতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চরণবন্দনা করিলাম। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ; অবশেষেও পূর্বের মত সবল নহে ; দেহ কৃশ, কিন্তু সতেজ।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমি বলিলাম—“আপনার স্বৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়। সম্ভ্রান্তি আমি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছি ; শিক্ষিত-সমাজে তাহা অনাদৃত হয় নাই ; কিন্তু আপনি যে সকল কথা বলিতে পারেন, তাহা আর কেহ পারিবেন না।” কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন—“আমার পূর্বস্মৃতি শুনিতে চাও ? বহু পুরাতন কথা আমার বেশ মনে আছে বটে, একটিও বিস্মৃত হয় নাই। তবে শোনো।

“১৮২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমি জন্মগ্রহণ করি ; ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি কলিকাতায় চাকরি করিতেন ; পীড়িত হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিলেন,—মরিবার জন্য। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একবার আমাকে বৃকে ধরিয়া লইয়াছিলেন ; সেই নিবিড় আলিঙ্গনের স্বাতি আমার চিরজীবনের साथী হইয়া আছে। এত ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে আমার জীবন আবিস্তিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অতি শৈশবের এই স্মৃতিটুকু মুছিয়া যায় নাই।

“কৃষ্ণনগর একটা নগর নহে ; অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টি। গোবিন্দ লড়ক, বৈকুণ্ঠ লড়ক, নতুন লড়ক, টাঁদ লড়ক, হট্টনগর, আমিন বাজার, গোয়াড়ি, মোক্ষা, ঘূর্ণী, মালোপাড়া, পান্নালা, নেদেরপাড়া, বেলেডাঙ্গা, রুইপুতুর, বাঘাডাঙ্গা প্রভৃতি ৩০।৪০ টি স্বতন্ত্র স্বাধীন গ্রাম ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল—শিবনিবাস ; সেখান হইতে আসিয়া তিনি এই সমস্ত গ্রাম একত্র করিয়া একটি বড় নগর স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম হইল কৃষ্ণনগর। আমাদের এই পাড়ার নাম নেদেরপাড়া কেন হল জান ? হট্টনগরের দস্তরা মহারাজার কর্মচারী ছিলেন ; সমাজে তাঁহারা ‘হট্ট দস্ত’ বলিয়া পরিচিত ; মহারাজের নিকট হইতে তাঁহারা এই গ্রামটি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন ;



অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আনাইয়া এখানে একটি ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপিত করিলেন ; রাজকোষে কিন্তু একটি পয়সাও দিতেন না ; ক্রমে ইহার ‘না দেয়ার পাড়া’ নাম আহিষ হইল ; অল্প রূপান্তরিত হইয়া উহা ‘নেদের পাড়ার’ দাঁড়াইল । ক্রমে হট্ট দত্তদিগের বংশলোপের উপক্রম হইল ; নিকটস্থ পান্নালা গ্রামের গুপ্ত-বংশ হইতে একটি ছেলেকে আনিয়া পোস্তপুত্র গ্রহণের আয়োজন করা হইল ; কিন্তু adoption-এর অব্যবহিত পূর্বেই ভদ্রলোকটির জীবিয়োগ হয় ; সুতরাং ছেলেটি পোস্তপুত্র হইল না বটে, কিন্তু হট্টদত্তদিগের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইল । তদবধি সে ‘দত্ত’ উপাধি গ্রহণ করিল । উনিই আমার পূর্বপুরুষ । এই জন্তই আমরা ‘দত্ত’ বলিয়া পরিচিত ; বস্তুতঃ আমরা পান্নালার ‘গুপ্ত’ ।

“পিতার মৃত্যুর পর জ্যাঠামহাশয় চার-পাঁচ বৎসর আমাদিগকে ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন । তিনি পূর্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন ; পরে মোক্তারী করিতেন । বাল্যকালেই আমার struggle আরম্ভ হইল ।

“পাঁচ বৎসর বয়সে পুরোহিত ঠাকুর আমার হাতে খড়ি দিলেন । মেজদাদা আমাকে পাঠশালায় লইয়া গেলেন, বলিয়া দিলেন যে, আট বার দাঙ্গা বুলাইতে হইবে, নহিলে বাড়ি আসা হইবে না । দুর্গানন্দ রায়ের বাটীতে পাঠশালা ছিল ; চার-পাঁচ বছর পড়িতে হইত । প্রথম বৎসর, খড়িতে লেখা ; দ্বিতীয় বৎসর, তালপাত ; তৃতীয় বৎসর, কলাপাত ; চতুর্থ বৎসর, কাগজে লেখা । তখন আমি পাঠশালার ‘সদ্বার পোড়ো,’ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইতাম । গুরুমহাশয়ের নাম রঘুনাথ রায় ; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ; আমাকে বড় ভালবাসিতেন । প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আমাদের কুটারের চতুঃপার্শ্ব ভূমি অনেকদূর পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যাইত ; গুরুমহাশয় আমাকে কাঁধে করিয়া পাঠশালায় লইয়া যাইতেন, ও অপরাহ্নে পাঠশালা হইতে গৃহে লইয়া আসিতেন । দরিদ্র বিধবার এই পঞ্চমবর্ষীয় শিশুপুত্রটি পাঠশালায় উপস্থিত না থাকিলে, গুরুমহাশয়ের অধ্যাপনায় মন লাগিত না । তাঁহার বংশে এখন কেহই জীবিত নাই । তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহের কথা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় ভক্তি-রসে আশ্রুত হইয়া উঠে । গুরুমহাশয়কে লচ্ছল গৃহস্থের ছেলেরা পূজা-পার্বণে কাপড়-চোপড় দিত ; কিন্তু শাধারণতঃ বেতন-স্বরূপ এক আনা, দুই আনা, চার আনা পর্য্যন্ত দিতে হইত !

“পাঠশালার প্রথম দুই-তিন বৎসর কেবল লেখা হইত, মুদ্রিত পুস্তকের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে ; ‘আমড়াভলার ছাপা’ বলিয়া পরিচিত দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্র, চাণক্যের স্তোক, গুরুমহাশয় মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া বলিতেন ; আমরা শুনিয়া মুগ্ধ করিতাম, হয় ত দুই-চারি জন ছাত্র বইগুলি ক্রয় করিত । খাতা পত্র লেখা ; জরিপ চিঠি ; জমাগুয়াশিল বাকি ; এই সমস্ত আমরা শিখিতাম । কাহাকে কি ‘পাঠ’ লিখিতে হইবে, তাহা আমাদের মুগ্ধ ছিল । একটু আধটু এখনও স্মরণ আছে—

গানের অমিত্যার যদি হয় মুলমান,  
‘বন্ধের সেলাম বলে’ লিখিবে তখন ।

“সমস্ত ‘পাঠ’ শ্লোকের মধ্যে গ্রথিত ছিল। লিখিবার জন্ত কলাপাত চাই; কাহারও বাগানে প্রবেশ করিয়া কলাপাত কাটিয়া আনা হইত; এ সময়ে কাহারও কোনও নিষেধ ছিল না; ইহাই প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। এক বকম পাঠী (মাতুর) তৈয়ারী হইত, তাহার নাম ‘পোড়ো পাঠী’ (পাঠশালায় পড়ুয়ারা এই সব ছোট ছোট মাতুরে বসিত); সমস্ত গ্রামেই খুব বেশী বিক্রয় হইত; গত পঞ্চাশ বৎসর বোধ হয় এ ব্যবসায়টি লুপ্ত হইয়াছে। শরের বা কঞ্চির বা কলমির (শাক নহে) কণম ব্যবহৃত হইত। লেখাপড়ার খরচ কত কম ছিল, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছে; অথচ ইহাই Mass Education ছিল।

“মুখে মুখে নামতা পড়ান হইত; অঙ্কের বই ছিল না; tables গুলি, কাঠাকালি, কুড়োকালি মুখে মুখে হইত। তখনকার লেখাপড়ার ব্যবস্থা এই বকম ছিল। বৈষ্ণবসন্তান হাতের লেখা পুঁথি পাঠ করিয়া কবিরাজি শিক্ষা করিতেন; সকলেই হাতের লেখা ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেন। একখানি বই সাধারণতঃ গৃহস্থের কুটির প্রবেশ লাভ করিত,—সেটি পঞ্জিকা। পাজি দেখিয়া সব কাজ করা হইত; এমন কি ঘর ছাইবার জন্ত ঘরামি লাগাইতে কবে হইবে, তাহাও পাজি দেখিয়া স্থির করা হইত। দোকানদারের ছেলে,—মালীর, ভেলীর, কামারের, ছুতারের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল; অল্প লেখাপড়া শিখিয়াই তাহার পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। বড় বড় রাজমিস্ত্রীরা লিখিতে পারিত না, হিসাব করিতে পারিত না, পাঠশালায় আসিয়া দু’এক বৎসর অধ্যয়ন করিত।

“১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মিশনারি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। বিদ্যালয়টি ঐ বৎসরেই স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে খুষ্টান মিশনারিরা গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলি দেখিয়া বেড়াইত। এ পরিদর্শন অবশ্যই গভর্নমেন্টের অসুমোদিত ছিল না। কলিকাতার ‘মিশনারি সোসাইটি’ হইতে তাঁহাদের উপর এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন দেশীয় পাঠশালাগুলির শিক্ষাপ্রণালী ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। পাঠরী সাহেবেরা দরিদ্র গুরুমহাশয়দিগকে কিছু অর্থদানে আপ্যায়িত করিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। দশ বৎসর পরে একটি মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মিশনারিরা চিন্তামণি সরকার নামক একটি ছাত্রকে খুঁইধর্মে দীক্ষিত করিল। সেই স্কুলের শিক্ষক ব্রজবাবু \* তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিলেন। কালীচরণবাবু ও আমি তাঁহার সহিত যোগ দিয়া একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত করিলাম। এই জন্ত ইহাকে সাধারণতঃ ব্রজবাবুর স্কুল বলে।<sup>১</sup> আজ প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া সেই A. V. School বেশ চলিয়া আসিতেছে। সে যাহা হউক, আমি দশম বর্ষে সেই পাঠরীদের স্কুলে প্রবেশ করিলাম। অধ্যক্ষ C. H. Blumhardt ‘ট’ বলিতে পারিতেন

\* এই ব্রজবাবু (৩৩জনাব মুখোপাধ্যায়) বিভাগসর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইনিই ‘সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী’র স্বাধিকারী।—লেখক

১ ‘ব্রজবাবুর স্কুল’-এর বিদ্যমান ইতিহাসের জন্ত ঐতিহ্য—‘ভারতবর্ষ’, অক্টোবর—১৯২১

না, 'ত' বলিতেন। ডিয়ার সাহেব আমাদের সেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিতেন। পান্ডুরী সাহেবের একথানা বই পাঠশালায় পড়া হইত; বইখানি একটি অভিধান বিশেষ। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছেলেরা উহা মুখস্থ করিত; আমি তখন খড়ি লিখি, বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র; তাঁহাদের আবৃত্তি শুনিয়া আমারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমিও আবৃত্তি করিতাম—

অংশ—ভাগ / অঙ্ক—চিহ্ন / অণু—পর

“ডিয়ার সাহেব পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ঐ বই হইতে প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিল না। আমি অগ্রসর হইয়া সাহেবকে বলিলাম, ‘আমি বলিতে পারি।’ সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া আমাকে একটি পয়সা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

“মিশনরি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভাল হইত না। ইংরাজি First Reader পুস্তকখানি পড়িলাম। বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না দেখিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময় ৩৭২নং লাহিড়ার পঞ্চম পুত্র শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী তাঁহাদের বাড়ীর দ্বারালয়ে আমাদিগকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর ছয় ছেলে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব, দ্বিতীয় পুত্রের নাম তারাবিলাস, তৃতীয় পুত্রের নাম রামতত্ত্ব। শ্রীপ্রসাদ কলেজের মুহুরি ছিলেন, Hobhouse সাহেবের কাছে যাইতেন; তিনি আমাকে যেটুকু ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন, তাহা আমার বড় কাজে লাগিল। কিন্তু লে কথ। পরে বর্ণিত হইবে।

“লাহিড়ী মহাশয়েরা জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ কুলিন; ছ'ঘরের মধ্যে বংশমর্যাদায় উচ্চতম। কলিকাতার হিন্দুকলেজে যখন De Rozio শিক্ষকতা করিতেন তখন রামতত্ত্ব লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কলিকাতার পঠদশায় শ্রামাচরণ সরকার ও রামতত্ত্ব বাবু একটি ছোট বাসায় মেল করিয়া থাকিতেন। বহুদিন পরে শ্রামাচরণ সরকারের একটি ছোটখাটো জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁহার পুস্তকের একস্থানে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন যে, শ্রামাচরণ এক সময়ে সামান্য পাচক (cook) ছিলেন। রামতত্ত্ববাবু ইহা contradict করিয়া বলেন—আমরা কলেজে পড়িবার সময়ে বাসায় থাকিতাম। মাঝে মাঝে যখন পাচক থাকিত না, আমরা দুজনে পালাক্রমে রাখিতাম; বোধ হয় সেই জন্যই লেখক স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, শ্রামাচরণ cook ছিলেন। রামতত্ত্ববাবু রসিককৃষ্ণকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন; রসিককৃষ্ণের নাম করিবার সময় তাঁহার চোখে জল আসিত। তিনি বলিতেন রসিকের মত thoughtful মানুষ আমি দেখি নাই; রসিক dared to think for himself। রামগোপাল ঘোষকেও তিনি খুব প্রীতি করিতেন। তিনি জানিতেন যে, রামগোপালের চরিত্র-দোষকলা ছিল; তথাপি রামগোপাল তাঁহার প্রীতির পাত্র ছিল। শেষ পর্যন্ত রামতত্ত্ববাবুর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার শিক্ষক ডি, রোজিও তাঁহার নৈতিক চরিত্র গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। সাহেব নিজে Free-thinker ছিলেন; ছাত্রগণও সেই

রকম দাঁড়াইল। ঐ একমাত্র দোষে সাহেবের চাকরি গেল। কালক্রমে রামতল্লাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনিতা রামমোহন রায় যখন খ্রীষ মিশনারিদের সহিত বাদাখুবাদ করিতেছিলেন—তর্ক করিয়া Dr Adams<sup>১</sup> কে পরাজিত করিলেন, তখন রামতল্লাবু তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার মায়েব আশ্রয় কারয়াছিলেন, বাপের আশ্রয় করেন নাই।

“আমার এক আত্মীয় রেজিষ্টারি আপিলের মুন্সী ছিলেন; আমি তাঁহার নিকটে নকল-নবিস কাজ করিতে লাগিলাম; কুঞ্চনগরের ডাক্তার সাহেব (Civil Surgeon) ডাক্তার ফুলার তখন রেজিষ্টার। ১৮৪৬ সালের ১লা জাহুয়ারি ডাক্তার সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। তদবধি ঐ ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিষ্টেট ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে আসিল। তখন চার্লস্ প্যারি হবহাউন্স (Charles Parry Hobhouse) জেলার অ্যাসিষ্টেট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত, লর্ড ব্রাউটন (Lord Broughton) পরে President of the Board of Control হন। চার্লস্ পরে—স্বার চার্লস্ হবহাউন্স হইয়াছিলেন; আমাদের Court Fees Act-এর ইনি জনক। এই সাহেবই আমার ভাগ্যবিধাতা হইলেন। আমার সহিত একটি-আপটি কথা কহিতেন; আমি শ্রীপ্রসাদ বাবুর অগৌরবদে যেটুকু ইংরাজি আবৃত্ত করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতাম। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমার সেই আত্মীয় মুন্সী মহাশয়কে বলিলেন, ‘আমার ইচ্ছা এ ছেলেটি পড়া শুনা করে।’ তখন সবে মাত্র কুঞ্চনগর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহার ইচ্ছা আমি সেই কলেজে ভর্তি হই। আমি কলেজে অধ্যয়নের ব্যয়নির্বাহে অসমর্থ শুনিয়া তিনি নিজে টাকা দিয়া আমাকে কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর কুঞ্চনগর কলেজ স্থাপিত হয়; ১৮৪৬ সালের ১লা জাহুয়ারি আমি কলেজে ভর্তি হই।

“এখন যে স্থানটি ‘পুরাণো কলেজের হাতা’ নামে পরিচিত উহার একটু ইতিহাস আছে। ঐ অঞ্চলে পূর্বে বড় ডাকাতি হইত; পুলিশ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন, তাঁহার নাম এলিয়ট। তিনি ভবানীপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় একজন ধনাঢ্য ভদ্রলোককে বলিলেন, ‘তুমি যদি ঐ খানে একখানি বাড়ি করিয়া দিতে পার, উহা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসগৃহ হইবে; একদিনও খালি থাকিবে না; তুমি উপযুক্ত ভাড়া পাইবে।’ ভদ্রলোক বাড়ি তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ির সম্মুখে বড় রাস্তা; রাস্তার অপর পার্শ্বে পুলিশের থানা বসিল। অন্নদিনের মধ্যেই ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল। তখন গোয়ালি অঞ্চলে লোকে বাস করিতে আরম্ভ করিল; নতুন নতুন বসতবাটি নিৰ্ম্মিত হইল। কিছুকাল পরে কুঞ্চনগরে কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের বিকল্পে কলিকাতার সমস্ত সাহেব মত প্রকাশ করিলেন। একা বোডন সাহেব (মিঃ সেসিল বোডন) প্রস্তাবের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। কলেজ স্থাপন

করা যখন স্থির হইল, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেভর (Trevor) কলেজের জন্ম স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ বাড়িটি ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইল।

“কলেজ চালাইবার জন্ম একটি স্থানীয় কাউন্সিল গঠিত হইল, তাহার সদস্য হইলেন—কৃষ্ণনগরের মহারাজ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার সাহেব। যে নূতন সিভিল সার্জন আসিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার চার্লস্ আর্চার (Dr Charles Archer) তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন, পরে ইনি ‘Ophthalmic Surgery’-র অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে যখন হাওডায় ও অন্তঃপ্রাণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তিনি দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া কেবলই সাহিত্যিক আলোচনা করিতেন। নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দশ-বারটি ছেলের মাসিক বেতন তিনি নিজের পকেট হইতে দিতেন; সন্ধ্যার পর ‘Natural Philosophy’-র উপর বক্তৃতা দিতেন, আমরা সেই বক্তৃতা শুনিতাম। তিনি আমাদের পুরীক্ষা করিলেন; আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন—আমার সত্যর্থ বন্ধু অধিকাচরণ ঘোষ, আমি দ্বিতীয় স্থান পাইলাম। উভয়েই তাঁহার নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাইলাম। অগ্নিকা Whewell’s History of the Physical Sciences পাইলেন; আমি পাইলাম Arnold’s History of Rome। ম্যাজিষ্ট্রেট E. T. Trevor অক্ষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, আমাদের অঙ্কের পুরীক্ষা লইতেন; আমাকে তিনি একখানি প্লেফেয়ারের ‘ইউক্লিড্’ কিনিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি তাঁহার বাড়িতে যাইতাম, তিনি আমাকে ইউক্লিড্ পড়াইতেন; তিনি আমার জ্যামিতির সর্বপ্রথম শিক্ষক; ১৮৪৮ সালে আমাকে তিনি Mitford’s History of Greece প্রাইজ দেন। তাঁহার বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, সেই লাইব্রেরী-ঘরে সকাল বেলায় আমি ইউক্লিড্ পড়িতাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস্ বিনি ট্রেভর (Charles Binny Trevor) বারাসতে জজ ছিলেন; রোজ সকালে পকেটে টাকা লইয়া বাহির হইতেন, যত ছেলে দেখিতে পাইতেন, তাহাদিগকে খাবার কিনিয়া দিতেন।

“কৃষ্ণনগরে ট্রেভর সাহেব যে বাংলায় বাস করিতেন, তাহার এক অংশে হব্‌হাউস থাকিতেন। তিনি প্রাতঃকালে একাগ্রচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহাদের একটি Book Club ছিল; নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তাঁহারা কিনিয়া আনিতেন। হব্‌হাউস আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিলেন। কাপ্তেন প্যারীর (Captain Parry) কথা শুনিয়াছি কি? লেখাপড়া খুব জানিত; সাগরবক্ষে দেশ-বিদেশে পর্যটন করিয়া বেড়াইত। Prescott তাঁহার Essay on Lockhart’s Life of Scott-এর একস্থলে কাপ্তেন প্যারীকে Literary Sindbad আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই কাপ্তেন প্যারী আমাদের অ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হব্‌হাউসের পিলেমহাশয় ছিলেন; হব্‌হাউসের নামকরণের সময় তিনি baptismal font-এ Sponsor হইয়াছিলেন; তাই উহার নাম হইল প্যারী হব্‌হাউস (Parry Hobhouse)।

“আমি ত একেবারে কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম।

লর্ড মেকলের মন্তব্যানুযায়ী কার্খারস্তের পর School Book Society স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। সেইগুলিই সর্বত্র পঠিত হইত। আমরা কি কি বই পড়িতাম শুনিবে?

১। Fifth Number Reader—(School Book Society's Publication).

২। Second Number Reader—( ইহার মধ্যে Miss Edgeworth-এর কয়েকটি গল্প ছিল )।

৩। Stewart's Geography.

৪। Chamier's Arithmetic.

৫। Gay's Fables.

৬। Goldsmith's History of Rome.

৭। Third Number Prose Reader—( ইহাতে Aesop's Fables ছিল )।

৮। জ্ঞানার্ণব—ইয়েটস সাহেব ( Rev. W. Yates D. D. ) কর্তৃক বিরচিত।

৯। সারসংগ্রহ—ঐ ( বিলাতী রীতিনীতি সম্বন্ধে পাঠ সম্বলিত ছিল )।

“প্রথমে আমরা পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন করি, পরে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আমাদের বাঙ্গালার অধ্যাপক হইলেন। খড়িয়ার ওপারে বিষ্ণুগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন; পরে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তিনি আমাদেরকে কোন পুস্তক পড়িয়াছিলেন, ঠিক তাহা আমার স্মরণ নাই। গল্প করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। মুখে মুখে আমাদেরকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিখাইতেন। বড় কড়া লোক ছিলেন, ছেলেদের পনায়ন নিবারণ করিবার জন্ত তিনি নিজের একটি স্বতন্ত্র গেঞ্জিষ্টর খাতা করিয়াছিলেন। পরে যখন বিদ্যাসাগরের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ প্রকাশিত হইল,<sup>১</sup> তিনি ঐ পুস্তক খানি আমাদেরকে পড়াইতেন।

“মদনমোহন খুব তেজস্বী ছিলেন।<sup>২</sup> একদিন একজন বড় সাহেব কর্মচারী পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বুদ্ধাজুঁ দেখাইয়া আহ্বান করিয়াছিল; পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, ‘খবরদার, ভদ্রলোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিবেন।’ সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

“তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, একবার ইয়েটস সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বচসা হইয়াছিল। সাহেব একটু উত্তেজিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কোথায় বাঙ্গালা শিখেছেন?’ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, ‘বিলাতে।’ তর্কালঙ্কারের বিজ্ঞপে তর্ক বন্ধ হইয়া গেল।

“টোডর ও হব্‌হাউস সাহেব অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা কহিতেন; তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন।

১ ১৮৪৭ খ্রীঃ ১ম—সং

২ পূর্ববর্তী ৭১ পৃষ্ঠায় আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি স্মৃতব্য।—সং

“আমাদের প্রথম জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (First Junior Scholarship Examination) বাঙ্গালায় অস্থবাদের পরীক্ষক ছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Major G. T. Marshall। জুনিয়র পরীক্ষা পাঁচ দিন ধরিয়া হইত। ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষা হইত না। ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ইংরাজি-বাঙ্গালা অস্থবাদ, এই পাঁচ দফা পরীক্ষা হইত। বিলাতের হেলিবেরি হইতে যত সিভিলিয়ন এখানে আসিতেন, সকলকেই হু’ তিন বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা পড়িতে হইত।

“কৃষ্ণনগর কলেজের উন্নতির জন্য সাহেবদের একাগ্র চেষ্টা ত ছিলই, মহারাজ ক্রীশচন্দ্রও যথেষ্ট প্রমত্বীকার করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মত তিনিও আমাদের পরীক্ষক ছিলেন।

“তখন সর্বশুদ্ধ চারিটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল,—হুগলী, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও কলিকাতার হিন্দু কলেজ।<sup>১</sup> প্রবন্ধ-পত্রিকা কলিকাতা হইতে সর্বত্র স্থানীয় কমিটির নিকট প্রেরিত হইত। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট সামুয়েল সাহেব ‘Friend of Education’ থ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার ছোট আদালতের জজ কুহন গিডিয়ন স্কর্স (Colquhoun Gideon Scorece)—Crimean War-এর সময়ে তিনি জজ ছিলেন—ও চট্টগ্রামের কমিশনার আর্চিবল্ড স্কর্স (Archibald Sconce)—পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন; সর্বত্রই স্থানীয় কমিটির যাহাতে কোনও ভ্রুটি না হয়, সে বিষয়ে গভর্নমেন্টের খুব নজর ছিল। রামতত্ত্বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে, উত্তরপাড়া ও হাবড়ার Salt চৌকির কমিশনার কোবার্ণ (Cockburn) সাহেব স্থূল কমিটির দুইটা মিটিং-এ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লর্ড ডালহৌসি স্থূল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এই বিষয় অরগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কেন তুমি উপস্থিত হইতে পার নাই?’ Cockburn সাহেব উত্তর করিলেন যে, তাঁহার ডিপার্টমেন্টের কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই স্থূল কমিটির মিটিং-এ আগা ঘটে নাই। লর্ড সাহেব বলিলেন, ‘স্থূল কমিটির মিটিং-এ তুমি যে অজুহাতে দুইবার উপস্থিত হইতে পার নাই সেই Substantive post-এর পদ তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।’

<sup>১</sup> হুগলী মহেশ্বর মহসীন কলেজ—১লা আগস্ট, ১৮৩৬, কৃষ্ণনগর কলেজ—১লা জানুয়ারি ১৮৩৬; ঢাকা কলেজ—২০শে নভেম্বর, ১৮৪১; হিন্দু কলেজ—২০শে জানুয়ারি, ১৮১৭। (ত্রঃ ‘বাংলার উচ্চ শিক্ষা’—বোম্বেনচন্দ্র বাগল)—সং।

## দুই

১৪ই কান্তিক, ১৩২০

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনি যখন কলেজে ভর্তি হইলেন, তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কে ছিলেন?” উমেশবাবু বলিলেন—“কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন্। আর হেডমাষ্টার ছিলেন—এফ. ডব্লুইউ. ব্রাড্‌বেরি (F. W. Bradbury)। কাপ্তেন রিচার্ডসন্ কলিকাতার হিন্দু কলেজে দশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন।

“লর্ড মেকলের শিক্ষাসংস্কার মন্তব্যের পর যখন ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তিত করাই সাব্যস্ত হইল, তখন কলিকাতায় একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত করা হইল; সভাপতি হইলেন স্বয়ং মেকলে—President of the General Committee of Public Instruction. লর্ড হার্ডিং (Lord Hardinge) ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্বে সার জন মুওরের (Sir John Moore) সহচর (Aide de camp) ছিলেন; কিন্তু এদেশে তিনি ইংরাজি শিক্ষাপ্রবর্তনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার কমিটিতে ছিলেন—রামকমল সেন, রসময় দত্ত, কাপ্তেন রিচার্ডসন, কাপ্তেন হেস্ (Captain Hayes), ডাক্তার মোয়াট (Doctor Mouat)। কাপ্তেন হেস্, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতে হইয়াছিল। বীটন্ (Bethune), বীডন্ (Beadon), হ্যালিডে (Halliday), ও রামগোপাল ঘোষ কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমতঃ যে চারিটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলি দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর ও ঢাকা কলেজের জন্ত অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্নের ব্যবস্থা ছিল; হুগলি ও হাটু কলেজের জন্ত স্বতন্ত্র প্রশ্ন করা হইত। ইহাদ্বিগকে এক সূত্রে গ্রথিত করার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই ছিলেন; এক বীডন্ সাহেব জোর করিয়া উহা সম্পাদিত করিয়াছিলেন; তখন তিনি গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি; তিনি বলিলেন, মফঃস্বলের কলেজে ভাল ছেলে আছে, হিন্দু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে তাহারা পাল্লা দিতে পারিবে। তাঁহার জিদ বজায় রহিল। ১৮৪৮ সালে একই প্রশ্নপত্র হইতে সমস্ত কলেজগুলির পরীক্ষা করা হইল। আমি General list-এ পঞ্চম স্থান অধিকার করিলাম; একটি পদক (Rochfort Medal) পাইলাম। বীটন্ সাহেবের আনন্দের লীলা রহিল না; তিনি, বীডন্ ও মোয়াট সাহেবকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদ্বিগকে পারিতোষিক দিতে আসিলেন; বক্তৃতায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন—(“Though fifth in order, the number of marks gained by him is within 22 of the highest number of marks gained by the first scholar of the Hindu College) আমি যেন কলেজকে গৌরবান্বিত করিয়াছি, ইহাই তিনি স্পষ্ট



করিয়। বলিলেন, “Not only on the individual honour he had achieved for himself, but also on the honour he had reflected on his college.” কলিকাতা হইতে কিন্তু তখনও প্রাইজগুলি আসিয়া পৌঁছায় নাই। স্থানীয় কলেজ কমিটির সদস্য মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ইহার কয়েকদিন পূর্বে নিজের ব্যবহারের জন্য একখানি বহুমূল্য শাল ক্রয় করিয়াছিলেন; সেই শালখানি তিনি আমাকে পুরস্কার দিলেন। বাটন্ সাহেব বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গলা শুকাইয়া আসিত; তিনি দুই তিন বার জল পান করিতেন।

“পরবৎসর আমি মৌনিস্বর্ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (Senior Scholarship Examination) General list-এ প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। এবারও বাডন্ ও মৌয়াট সাহেবকে সঙ্গে করিয়া বাটন্ সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিতে আসিলেন। বক্তৃতার রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে পার,—

“A year has elapsed since I last visited this college. I told you then that I had just come from warning the students of the Metropolitan college that they must expect soon to find formidable rivals in the mofussil institutions and must exert themselves to the utmost, if they wished to keep their old pre-eminence. I congratulate this college of Krishnagar on having so speedily verified my prediction. Last year the foremost man among you occupied the fifth place in the comparative list.....this year your leader is at the head of all the colleges.”

“বাডন্ সাহেব আরও অনেক কথা বলিলেন। প্রাইজ দেওয়া হইয়া গেলে পর আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন; শ্রদ্ধেহে তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বালিলেন—‘যখনই তুমি কলিকাতায় যাইবে, আমার সহিত দেখা করিও।’ পরে যখন তিনি বক্তৃতা ছোট লাট হইলেন, তখন স্ত্র সেন্সি বাডন্ কলকাতায় আসিয়া কলেজ পরিদর্শন করিতে আগমনেন; যতক্ষণ ছিলেন আমার সহিতই আলাপ করিলেন; তজ্জন্ত প্রিন্সিপালের একটু ঈর্ষা হইয়াছিল। স্ত্র সেন্সি আমাকে বলিলেন—‘Do you know what is the first question I put to the gentlemen here?’ আমি বলিলাম—‘How should I know?’ তিনি হাসিয়া বলিলেন—‘I asked about you; they gave you a very high character.’ স্ত্র সেন্সি বরাবরই আমাকে স্নেহ করিতেন। ঢাকা হইতে আসিয়া একবার তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কিহে, কি চাই বল?’ আমি বলিলাম,—‘তাঁহা বলিবার নয়।’ প্রশ্ন হইল—‘কেন?’ উত্তর—‘না অগত্যা দেশে যাইবেন না।’ তিনি স্মিতমুখে—‘আজ্ঞা, এই রাজ্য।’ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

করিয়া দেখি যে ভাইবোনের আটকিন্সন (Atkinson) সাহেব আমাকে ঢাকা হইতে বদলি করিয়া দিয়াছেন।

“কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কান্থেন রিচার্ডসন আমার মূখে সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়া আমাকে পঞ্চাশের মধ্যে ( ) ষাট নম্বর দিলেন। ‘মার্চ্যান্ট্ অফ্ ভেনিস্’ আবৃত্তি করিতে দিয়াছিলেন। আমার মনে আছে, আমি ‘In sooth’ কথাটার অর্থ করিতে পারি নাই; আমার সত্যর্থ বামাচরণ বলিতে পারিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রিন্সিপ্যাল কলেজের পূর্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া সেক্সপীয়র পড়িতেন; ফলষ্টাফের বক্তৃতা পাঠ করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।”

উমেশবাবু একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাহার চরিত্র কেমন ছিল?” দত্ত মহাশয় বলিলেন—“কান্থেন রিচার্ডসনের চরিত্রদোষ ছিল; তাহার রক্ষিতা এক বাঙ্গালিনী একটা স্বতন্ত্র বাড়িতে ছিল; এ ব্যাপার চাপা रहিল না; বীটন্ সাহেব স্পষ্টই তাহাকে ‘hoary headed libertine’<sup>১</sup> আখ্যা প্রদান করিলেন।

“কলেজে রামতল্লু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে দিন কতক ‘Paradise Lost’ পড়িয়াছিলাম। তাহার পড়াইবার ধরণ ছিল এক রকমের। কেতাবের ভাষা ব্যাখ্যা করার দিকে তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। কোনও একটা text অবলম্বন করিয়া তিন বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। যাহাতে ছেলেরা হুচরিত্র হইয়া উঠে, সেইরূপ উপদেশ তিনি দিতেন। তাহার অধ্যাপনায় তখন freethinking-এর ভাব খুব প্রকাশ পাইত। তাহার কথায় একজন বিচলিত হইয়াছিলেন,—তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; বহুদিন পরে নগেনবাবু এজন্য প্রচারক হইয়াছিলেন। রামতল্লুবাবুর ভাই প্রসাদবাবু ইংরাজি reading পাড়তেন খুব ভাল; তিনি কলেজে কান্থেন রিচার্ডসনের আবৃত্তি শুনতে যাইতেন। রামতল্লুবাবু যখন আমাদের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন—রচফোর্ট (Rochfort); হেডমাষ্টার ছিলেন—হারিসন্ (Harrison); গণতের অধ্যাপক ছিলেন—ব্রাড্‌বেরি (Bairdury), সেক্সপীয়র পড়াহতেন—বান্‌ল্যাণ্ড সাহেব, একটি শ্লোকে ছেলেরা অধিকাংশ শব্দকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—

সেক্সপীয়র পড়াতে বান্‌ল্যাণ্ড।

বীটসনের নাই জ্ঞানকাণ্ড।

বান্‌ল্যাণ্ডের লম্বা দাড়ি।

তা’র নীচে রামতল্লু লাহিড়ী।

রামতল্লু লাহিড়ী সদাশয়।

তা’র নীচে দয়াল রায়।

দয়াল রায়ের নাড়ী পটকা।

তা’র নীচে গুরো হটকা।

গুরো হট্কার লদাই য়োব ।  
 তা'র নীচে বেণী বোস ॥  
 বেণী বোসের লদাচার ।  
 তা'র নীচে গোবিন্দ কোড়ার ॥  
 গোবিন্দ কোড়ারের মোটা বুদ্ধি ।  
 তা'র নীচে গদাই চক্রবর্তী ॥  
 গদাই চক্রবর্তীর পেটটা মোটা ।  
 তা'র নীচে হরনাথ জ্যাঠা ॥

“বান্ধ্যাও সাহেব দিব্য কলম কাটিতে পারিতেন । দয়াল রায় খুব মদ খাইতেন ; গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় বেজায় লম্বা ( হট্কা ) ছিলেন । শ্লোকের শেষোক্ত শিক্ষকটির পুরা নাম ছিল হরনাথ মিত্র ।

“ক্যাপ্তেন রিচার্ডসন্ ইংরাজি কাব্য খুব ভাল পড়াইতেন ; Bacon's Essays-এর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । Kerr সাহেব বেকনের Novum Organum অম্ববাদ করিয়াছিলেন । কলিকাতায় ডক্ কলেজের একজন অধ্যাপকও Bacon's Novum Organum অম্ববাদ করিয়াছিলেন ; কার্ সাহেবের চেয়ে তাঁহার অম্ববাদ ভাল হইয়াছিল ।

“গ্রীষ্মকালে আমাদের কলেজ বন্ধ হইত না ; প্রাতে স্কুল বলিত । পূজার সময় ছুটি হইত , ছুটির পূর্বেই পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল । ছেলেরা কলেজ পরিত্যাগের পরেও ৩।৪ বৎসর সিনিয়র বৃত্তি ভোগ করিত । হুগলি কলেজের একটি ছেলে একাদিক্রমে ছয় বৎসর উক্ত বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন । বাটন্ সাহেব বলিতেন,—এভাবে বৃত্তি দেওয়া অহুচিত ।

“সীনিয়র পরীক্ষার জ্ঞাত আমরা পড়িতাম—

Mill's Logic.

Adam Smith's Theory of Moral Sentiments.

Reid's Inquiry.

Arnold's History of Rome.

Elphinstone's History of India.

History of England. ( কোনও পুস্তকের নাম করা ছিল না ; কোনও একটা period নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত । )

Mathematics—Arithmetic হইতে Integral calculus পর্যন্ত (Pure and Mixed)

Richardson's Selections.—ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি কবির অধিকাংশ রচনাই পড়িতে হইত ।

“সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহা অবশ্যগঠিতব্য নহে—optional ।

গণিতশাস্ত্রে আমার সতীর্থ অধিকাচরণ ঘোষ সর্কাপেক্ষা পারদর্শী ছিলেন ; আমাদের গণিতের অধ্যাপক হারিসন্ সাহেব খুব পাকা লোক ছিলেন । সানিয়ন্ পরীক্ষায় মৌলিক ইংরাজি রচনায় আমি ৫০-এর মধ্যে ৪৭ পাইয়াছিলাম । আমার প্রব্রোত্তরগুলি শিক্ষাসমিতির বাৎসরিক রিপোর্টেও ( Principal Kerr's Reports of Public Instruction in Bengal 1831-1850 ) কিছু কিছু আছে ।

“সে সময়ে আর একটা পরীক্ষা ছিল, তাহার নাম লাইব্রেরী-পরীক্ষা । সানিয়ন্ পরীক্ষার জন্ত যে সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত, তদ্ব্যতিরিক্ত বহু গ্রন্থ লাইব্রেরী হইতে বাছাই করিয়া লইয়া আয়ত্ত করিতে হইত । ১৮৫০ সালে আমি দর্শন শাস্ত্রে লাইব্রেরী-পরীক্ষা দিলাম ; শতকরা এক শত নম্বর আদায় করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলাম ; স্বর্ণপদকও পাইলাম । কলেজে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—অধিকাচরণ ঘোষ ও রাসবিহারী বসু । রাসবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অনেকদিন কাজ করিয়াছিলেন ; তাঁহার মত নির্ভীক ডেপুটি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না । যখন তিনি কটকে ছিলেন, তদ্রূপ কলেজের মেট্‌কাফ সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিঙ্গ হয় ; কলেজের সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করেন ; রাসবিহারীর কৈফিয়ৎ তলব করা হয় ; তাঁহার বক্তব্য পাঠ করিয়া বোর্ড স্বীকার করিল যে কলেজেরই অগ্রায় করিয়াছেন । রাসবিহারীর ভ্রাতৃপুত্র রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসু স্বনামধন্য হইয়াছেন ।

“আর অধিকাচরণ ? লাইব্রেরী-পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল । তিনি যে আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর তোমায় কি বলিব ! আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম । পরীক্ষার কিছু পূর্বে বসন্তরোগে তিনি শয্যাগত হইলেন । এখানে তাঁহার আত্মায় পরিজন ছিল বটে, কিন্তু আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম । আমার শুভাভিধানী আত্মীয়গণ অনেক নিবেদন করিতেন ; আমি তাহাতে কর্ণপাত করিতাম না । শেষে তাঁহার আমাকে আমাদের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন । আমি উন্নতের মত সেই ঘরের অপেক্ষাকৃত একটা জীর্ণ অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উর্দ্ধখানে ছুটিয়া অধিকার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম । অধিকাচরণকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না । কিন্তু তাঁহাকে বাচান গেল না । প্রাণপণ প্রয়াস ব্যর্থ হইল । আমার খুব জ্বর হইল । লোকে ভাবিল আমারও বসন্ত হইল । আমি কিন্তু সে স্বাভাৱ রক্ষা পাইলাম ।

“১৮৫৬ সালে মহারাজের দত্ত ভূমির উপরে কলেজের নূতন বাড়ী নির্মিত হইবার কালে আমরা অধিকাচরণের স্মৃতিরক্ষার জন্ত বহুপরিকর হইলাম । তাঁহার সতীর্থ ছাত্রেরা টাকা তুলিল । একটি tablet-এ কত খরচ হইবে, তাহা আমরা জানিতাম না । শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন্ ( Bethune ) সাহেবকে জানাইলাম । তিনি বলিলেন, ‘তোমরা যে টাকা তুলিয়াছ তাহা আমাকে পাঠাইয়া দাও ; অকুলান

হইলে আমি বুঝিব।' ( I will see ; send what you have raised. ) বাহিরের লোকেও টাকা দিয়াছিল। আমার মনে আছে ভক্তার আঁচর দশ টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার এবং বাটন সাহেবের ইচ্ছা ছিল, ভাষাটা একটু পরিবর্তন করিয়া—'fellow students of the Krishnagar College'-এর পরে 'and admirers' এই দুটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া হয় ; কিন্তু তাহাতে খরচ আরো বেশী হইবার ভয়ে আমরা রাজী হইলাম না। সকলের প্রকার নিদর্শনস্বরূপ এই tablet-টি প্রাচীরগারে বসান হইল—

"This tablet is erected to the memory of Ombica Charan Ghose by his fellow students of the Krishnagar College as mark of their respect for his character and regret for his untimely death.

Died 26th March 1850, aged 20 years."

"অধিকাচরণের সহিত আমার নিবিড় সখ্যতাবের কথা পূর্বেই বীটন সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের রিপোর্টে দেখিতে পাইবে, তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে আমাকে বলিলেন—'And you, Omesh Chunder Dutt, whom I have so often had occasion to mark out for praise, be assured of this, that not even in that moment, which you probably thought the proudest in your life, when from this place I hailed you as the first scholar of your year throughout Bengal, not even then did I look on you with so kindly a feeling or so hearty a desire to serve you, as when I heard of your affectionate kindness to your dying friend and competitor ; when I learned how carefully you had tended him in his malignant disorder, undeterred by the the terror of contagion, which is so often powerful enough to break through stronger natural ties than those which bound you to your departed friend. I doubt not that your own approving conscience has already amply rewarded you ; for it is in the plan of the Allwise contriver of the world that every sincere act of kindness to a fellow-creature carries with it its own peculiar inimitable joy ; but it is also my pleasing right to tell you that your behaviour in this matter has not been unobserved, and that by it you have raised yourself higher in the good opinion of those whose good opinion I believe you are deserving. May such examples multiply among us ! May we have such students as Ombica Charan Ghose ! May your conduct, one towards another, be so marked with brotherly love that it shall cease to call for particular notice or special commendation. Let

these be the fruits of knowledge, and who shall then venture to say that a blessing is not upon the tree.\*

“অধিকার ও আমার নাম আমাদের এ অঞ্চলের অনেক কবিতায় গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। স্বাক্ষরকারী ‘স্বধীরজন’ নামক কবিতাপুস্তকের একটা লাইনে অধিকা উমেশ নাম দুটি পাশাপাশি বসান ছিল।

“যশোহর জেলার চৌগাছার অধিকার বাড়ী ছিল। চৌগাছার ঘোষদেব অনেকই তখন এখানে থাকিতেন। অধিকা ঈশ্বর ঘোষের বাড়ীতে থাকিতেন। ঈশ্বর ঘোষ গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্নবাবুর কৃষ্ণনগরের মোক্তার ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে ২৪/২৫ জন লোক দুই বেলা আহার করিত। গোবরডাঙ্গার বাবুদের দেওয়ান ছিলেন—রাধাকৃষ্ণ ঘোষ। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিল ছিলেন—তারিণীপ্রসাদ ঘোষ। তারিণীপ্রসাদ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন, বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন; মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমি আদালতে যাইতাম। তাঁহার পুত্র গিরীন্দ্রপ্রসাদ দুটি শিশু সন্তান রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। সেই দুটি ছেলে, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ, কলিকাতাতে থাকে। অধিকার দুইটি সহোদর ও একটি বৈমাত্রের ভাই ছিল—উমাচরণ, কালীচরণ, শ্রামাচরণ। উমাচরণ জমিদারি বিষয়কর্ম দেখিতেন। কালীচরণ প্রথমে ওকালতি করিয়া পরে অনেকদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন।

“অধিকার মৃত্যুর পর তাঁহার দিদি আমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, ‘অধিকা নাই, তুমি এস, তোমাকে দেখিলেই আমি তাইয়ের শোক তুলিতে পারিব।’ চৌগাছার গিয়া আমি দিনকতক কাটাইলাম। আর একবার চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় সেখানে গিয়াছিলাম। কপোতাক্ষীর জল কত স্বচ্ছ ও নির্মল ছিল তাহা তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না। একদিন এপার ওপার সাঁতার দিতেছিলাম; আমার পায়ে শৈবালদ্বীপ এমন ভাবে জড়াইয়া গেল যে আমার ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা হইল; কালীচরণ একখানা নৌকা আনিয়া আমাকে উঠাইয়া লইলেন। এখন আর সে চৌগাছা নাই। চৌগাছার কথা ভাবিলে একটা বৈষ্ণব গান মনে আসে—

আমি দেখে এলাম শ্রাম,

তোমার বৃন্দাবন ধাম,

কেবল নামটি আছে।

“আমার জীবনের এই সমস্ত পুঁয়তন কাহিনী দেশের লোককে শুনাইতে আমার বড় একটা ইচ্ছা হয় না। আমার লম্বয়ক কেহ বোধ হয় এখন জীবিত নাই। আমার

\* হাইকেল যুবুয়ন জীবন-চরিত-রচয়িতা জিহুজ বোগীন্দ্রনাথ বহু তাঁহার কবিতাপ্রসঙ্গ খিতীয় ভাগের যুগ্মবন্ধে এই আধর্ষ বন্ধুজের কথা আলোচনা করিয়া এডুকেশন রিপোর্টের এই অংগটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

মনে হয় আমি একটা মন্ত anachronism। যে কয়টা দিন বাঁচি the world forgetting and by the world forgot হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয়।

“আমার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, চুণীলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত (বরদ্বার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তের পিতা) ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮৪৮) সানিয়র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। আমার পরবৎসর, ১৮৫০ সালে শ্রীনাথ দাস প্রথমস্থান অধিকার করেন। আমার দু’তিন বৎসর পরে দ্বারকানাথ মিত্র ও পূর্ণচন্দ্র সোম (হুগলি কলেজে ইহার সত্যার্থ ছিলেন) উক্ত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন।

“এতদিন জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির টাকায় সংসার চালাইতে হইতেছিল; এখন চাকরি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তখনকার Council of Education-এর সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন হেস্ (Captain Hayes) ১৮৫১ সালে চট্টগ্রামের স্কুলে একশত টাকা বেতনে বিতার শিক্ষকের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষাবিভাগে মতপান অত্যন্ত গহিত বলিয়া বিবেচিত হইত। চট্টগ্রাম স্কুলের শিক্ষক M’C Carthy সাহেব মদ খাইয়া স্কুলে আসিতেন; বিভাগীয় কমিশনের Sconce সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; M’C Carthy পদচ্যুত হইলেন; আমি তাঁহার পদ অধিকার করিয়া বসিলাম।

“ইংরাজ অধ্যাপকদিগের নৈতিক দোষালোর একটু কারণ ছিল; তাঁহার প্রায় সকলেই অবিবাহিত ছিলেন; Nesfield সাহেব বিবাহ করেন—অনেক দিন পরে।

“স্কুল গুলির উপর গভর্নমেন্টের খুব দৃষ্টি ছিল, তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ। অনেক সরকারী স্কুলে খুব ধুমধামের সহিত সরস্বতী পূজা হইত; গভর্নমেন্টের আপত্তি ছিল না। কৃষ্ণনগর কলেজে হইত না বটে, কিন্তু দুর্গাদাস চৌধুরীর মুখে শুনিয়াছি যে রামপুর বোয়ালিয়ার হেডমাষ্টার সারদা চরণ মিত্র, স্কুলের মধ্যেই খুব জলকলম করিয়া সরস্বতী পূজা করিতেন; শেষাংশেই স্থানান্তরে পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

“চট্টগ্রামে কয়েক মাস কাজ করিয়া আমি এখানে বদলি হইয়া আসি। কিছু দিন পরে আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। একদিন আমার উপর আদেশ হইল যে, হুগলিতে ভূদেবাবুর নর্থ্যাল স্কুল পরীক্ষা করিতে হইবে। ভূদেবাবু ইন্সপেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনি আমার স্কুল পরীক্ষা করিবেন?’ লজ্জা সাহেব বলিলেন, ‘না; আমি উমেশচন্দ্র বস্তুকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিব।’ আমি যথারীতি পরীক্ষা ব্যাপার সম্পাদিত করিলাম। শুনিলাম যে সেই সময়ে সেখানে Teachership পরীক্ষা হইবে। একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, Sutcliffe সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট; ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Lodge ও Thwayte সাহেব পরীক্ষক। আমি তাবিলাম মন্দ কি? পরীক্ষাটা দেওয়া যাউক। আরও ৫০।৬০ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। কাগজে-কলমে ও মৌখিক পরীক্ষার পর আমাকে একটা ক্লাস পড়াইতে দেওয়া হইল। কুড়ি একশ বৎসর বয়সের কতকগুলো ছুট ছেলেকে একত্র করিয়া একটা ক্লাস গঠিত করা হইল। বয়ে প্রবেশ করিবার পর তাহারা

খুব গোলমাল কৰিতে লাগিল ; সটল্লিক সাহেব তাহাদিকে চুপ কৰিতে বলিলেন । আমি সাহেবকে বলিলাম—“আপনি কথা কহিলেন কেন ? আমাকে নিযুক্ত কৰিবায় সময় গৰ্ভৱন্তে ত একজন পুলিচ মাৰ্জেক্ট আমাকে ঘেন নাই ; গোলমাল আমাকেই ধামাইতে হইবে ।” কিছুক্ষণ পৰে ক্লাসটা নিস্তব্ধ হইল , আমার অধ্যাপনায় সটল্লিক প্ৰমুখ পৰীক্ষক মণ্ডলী খুসী হইলেন ।

“হুগলি হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় গিয়া তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডাইৰেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত দেখা কৰিলাম । তিনি বলিলেন—‘তোমার পৰীক্ষার ফল কি ?’ আমি উত্তৰ দিলাম, ‘জানিনা ; তবে বোধ হইল পৰীক্ষকগণ খুসী হইয়াছেন ।’ তিনি বলিলেন—‘তুমি হুগলিতে ফিৰিয়া যাও ; তোমার পৰীক্ষার ফল আমাকে শীঘ্ৰ অবগত কৰাইবে ।’ হুগলিতে ইন্স্পেক্টর লজকে সকল কথা বলিয়া আমি দেশে ফিৰিয়া আসিলাম ।

“সেই সময়ে ক্লামণ্ট (Clermont) নামক একজন ইংৰাজ শিক্ষক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন , তাঁহার একটু পানদোষ ছিল ; গ্ৰায়ই সোমবার দিন ষথালময়ে তাঁহার স্কুলে আশা ঘটয়া উঠিত না । তাঁহার বিৰুদ্ধে ৱিপোর্ট হইল । তিনি বলিলেন যে শাৰীৰিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্কুলে আসিতে পাবেন নাই । ডাক্তাৰেৰ মাৰ্টিফিকেট লইতে আদেশ হইল । তাঁহার জ্ঞা ডাক্তাৰ সাহেবকে (Dr Palmer) মাৰ্টিফিকেট জন্ত অনেক অহুন্নয় বিনয় কৰিলেন । ডাক্তাৰ মিথ্যা মাৰ্টিফিকেট দিতে বাজি হইলেন না । ক্লামণ্টেৰ পদাবনতি ঘটিল । ফলে বাটসন্ সাহেব ২০০ টাকা হইতে ৩০০ টাকায় উন্নীত হইলেন ; আমি বাটসন্ সাহেবেৰ পদে উন্নীত হইলাম ।”



## তিন

আজ প্রাতে চা খাওয়ার পর আচার্য্য দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তখনকার দিনে কলিকাতা যাওয়াআসা আপনাদের নৌকাযোগে হইত?”, তিনি বলিলেন, “হাঁ। আমরা নৌকায় আনাগোনা করিতাম। নাকাশিপাড়ার বাবুদের বাড়িতে এক চাকর ছিল, সে পদব্রজে কলিকাতায় যাইত। ভোর বেলায় রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতায় পৌঁছিত, পরদিন ফিরিয়া আসিত। তাহার পর পাঁচ ছয় দিন সে আর বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিত না। এখান হইতে নৌকাযোগে শান্তিপুরে যাইতে দেড় দিন লাগিত; নৌকায় চার পাঁচবার শান্তিপুরে গিয়াছি; পদব্রজে যাওয়ারই আশা নাহি। অত্যন্ত কষ্ট ছিল; দিগ্‌নগরে তামাক সেবনের একটা আড্ডা ছিল। অনেকে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়িতে আসিয়া পূজা করিত। কোনও বৈতসন্তান ক্রিসম্মা না করিয়া জলস্পর্শ করিত না; সকলেই টিকি রাখিত। প্রত্যেক গৃহস্থের গরু ছিল, গোয়ালাকে মাসে এক আনা দিলে মাঠে গরু চরাইয়া লইয়া আসিত; চাউল, কেনা হইত; আউল ধান এখানকার কেহ খাইত না। আট দশ জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আনন্দময়ীর ভোগ খাইতে পাইতেন। তখনকার দিনে কেবল মাত্র কবিরাজি চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল; নাপিতে ফোড়া কাটিত। তখনকার প্রধান রোগ ছিল জ্বর। কবিরাজ জ্বরকে সহজে জন্ম করিতে পারিতেন না; কেবলই লক্ষ্যন<sup>১</sup> ও খই-বাতাসা পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। প্রায় ৪০ বৎসর হইল, এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে বৎসরে প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দিল, সে বৎসরে ইহার প্রকোপ বড় বেশী হয় নাই; পর বৎসরে অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল; ১৮৮০ সাল হইতে ক্রমাগত চলিয়াছে; তবে ১৮৬০-৬৫ মধ্যে এক বছর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল।”

আচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন.....পরদিন আমি বলিলাম—“বীট্‌সনের পদে আপনি উন্নীত হইলেন, এই পর্য্যন্ত কাল বলিয়াছেন তার পরে?” তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—“১৮৬৪ সালে বীট্‌সনের মৃত্যু হইল; আমার তিন শত টাকা বেতন হইল। ১৮৬৬ সালে আমি ঢাকা কলেজের হেড মাস্টার হইয়া তথায় বসিল হইয়া গেলাম। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্শন’ তৎপূর্বে রচিত হইয়াছিল; বইখানির আবির্ভাবে<sup>২</sup> সর্ব্বত্রই একটা চাকল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল! তাবার জন্ম নহে। ভাষা হিসাবে ‘আলালের ঘরে দুলাল’ খুব ভাল বই ছিল।

“ঢাকায় আমি প্রায় এক বৎসর ছিলাম। সে বৎসর উড়িষ্যায় বিধব দুর্ভিক্ষ।<sup>৩</sup> কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রেন্ডান্ড (Brennand) সাহেব লেখা-পড়া বেশী জানিতেন না; গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। শালনটি তাহার কিন্তু খুব কড়া ছিল। তাঁহার মত

১ উপবাস।—সং ২ ১৮৩০ খ্রিঃ।—সং

৩ উড়িষ্যার ‘ন-অক’ (১৮৬৬ খ্রিঃ) দুর্ভিক্ষ। ইহাতে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়।—সং

কৃপণ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না, কলেজের বাবদে খরচ করিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন। আমাকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতে হইত; কিন্তু লাইব্রেরিতে একখানিও Reference বই খুঁজিয়া পাইতাম না, যতদিন আমি ছিলাম, একখানিও পুস্তক কেনা হইল না, পরে শুনিলাম যে, ক্রফ্ট (Croft) সাহেব লাইব্রেরির আমূল সংস্কার সংসাধিত করেন। আমি যে চেয়ারে বসিতাম, সেটি ভাঙা ছিল, সাহেব কিছুতেই একটা নূতন চেয়ার ক্রয় করিলেন না, মিস্ত্রী আনাইয়া অল্প খরচে এক রকম সারাইয়া গইলেন। তিনি নিজে খুব শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সর্বদাই মজুরের মত খাটিতেন। তাঁহার পরিবার তখন বিলাতে, আমি ঢাকা হইতে চলিয়া আসিবার কিছু পরেই তিনিও বিলাতে চলিয়া গেলেন।

“ইংরাজি সাহিত্যেও একজন ইংরাজ অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম জর্জ বেলট (George Bellet)। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন, মেজাজটা কিছু গরম; কিন্তু স্বভাবটা যেন একটু ফচকে গোছের ছিল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন পড়াইতাম, তিনি একটা পাসের ঘর হইতে আড়ি পাতিয়া শুনিতেন। অনেক দিন পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র—চণ্ডীচরণ চট্টপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি যে বেলট তাহাকে বলিয়াছিলেন—‘সেকপীয়র বাল্কালোর মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত জানে, আর কেহ জানে না।’ চণ্ডীচরণ তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঢাকায় আমার বাসা তদ্রূপ Law Lecturer উপেক্ষা মিত্রের বাড়ির পাশে ছিল। সে সময়ে গোয়ালন্দ হইতে শীমার যাইত না, কুষ্টিয়া হইতে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইত।

আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলাম। লেথব্রিজ,—Roper Lethbridge সাহেব তখন প্রিন্সিপ্যাল। কলিকাতা হইতে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার Lethbridge সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন; আমার বাড়িতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উড্রো (Woodrow) সাহেব তাঁহার পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, লালবিহারী দেকে দিলেন না। সেপ্টেম্বর মাসে প্যারীচরণের মৃত্যু হয়, নবেম্বর মাসে আমি তাঁহার পদে উন্নীত হই। লেথব্রিজ সাহেব ছয় মাসের ছুটি লইলেন, আমি তাঁহার স্থানে officiate করিতে আরম্ভ করিলাম; তিনি নিজে জোর করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার অস্থপস্থিতিতে আমি যেন প্রিন্সিপ্যালের কাজ করি। বাহির হইতে আর কেহ আসিয়া officiate করেন, ইহা তাঁহার আদর্শও ইচ্ছা নহে; স্বতন্ত্রাং ডাইরেক্টরকেও তাঁহার অমুমোদন করিতে হইল। এমন সময় প্যারীচরণ সরকারের পদ খালি হইল। সটক্লিফ (Sutcliffe) সাহেব এক জন ইংরেজের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, লেথব্রিজ আমার জন্ত বিদ্য করিয়া বসিলেন, উড্রো সাহেবেরও বৌক আমার দিকে। তিনি আমাকে বলিলেন—What is Lal Behari De's qualification? He has written one book; You could write twenty books. লর্ড ইউলিক ব্রাউন (Lord Ullok Brown) তখন মুন্সির পাহাড়ে ছিলেন, পূর্বে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে অনেকবার তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছি,

তিনি আমাকে লিখিলেন,—“শুনিলাম তুমি কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ করিতেছ, তোমার বেতন বৃদ্ধি হইল কি ?” উত্তরে আমি লিখিলাম, “উক্ত পদে আমি ছয় মাসের জ্ঞাত অস্থায়ী ভাবে কাজ করিতেছি, বেতন বৃদ্ধি হয় নাই ; কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা পদ খালি হইয়াছে, সেটার জ্ঞাত আপনি বোধ হয় কিছু চেষ্টা করিতে পারেন।” তিনি একেবারে আর রিচার্ড টেম্পলকে আমার জ্ঞাত লিখিলেন। আমার বেতন বৃদ্ধি হইল ; কিন্তু আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম না। লালবেহাঈ দে ও মহেশচন্দ্র গায়রত্ব হটিয়া গেলেন। গায়রত্বের জ্ঞাত কলিকাতার কয়েকটি সাহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

“স্টকলিক সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের উপর বেজায় চটা ছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও ভাল বসেজ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার সম্বন্ধে হইত না ; অনেক সময়ে আমাদিগকে লজ্জা দিবার চেষ্টা করিতেন। একবার ডাইরেক্টর ইয়ং (Young) সাহেব প্রিন্সিপাল লজ্জকে (Lodge) ডিজাঙ্গা করিয়া পাঠাইলেন—‘আপনার কলেজের পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই, ইহাব কারণ কি ?’ সাহেব আমাকে ডাইরেক্টরের পত্র খানি দেখাইয়া বলিলেন—‘ইহার উত্তরে কি লিখিয়াছি দেখিবে ?’ দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন—‘আমি কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র অসুগ্রহ চাহি না ; আমি চাহি fair play , আমি আর উমেশ দত্ত থাকিলে কিছু ভয় করি না। আমার ছাত্র যত্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাদাস দত্তকে দশ টাকা বৃত্তি ঘৃণ দিয়া আমার কলেজ হইতে তোমাদের কলিকাতার কলেজে লইয়া গেলে ; আগামী বৎসরে তাহাদের নিকটে আমাদের কলেজ পরাজিত হইবে।’”

আচার্য্য দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন, পরক্ষণেই উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—“আজ কাল কৃষ্ণনগর কলেজের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন ; কিন্তু একবার কেহ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, যে এই দুর্গতির জ্ঞাত কে দায়ী ? কেন কলেজের এই দুরবস্থা হইল ? এ অঞ্চলের লোক কি পূর্বাঙ্গেক্ষ লেখাপড়ার জ্ঞাত কম আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ? কলিকাতার Council of Education-এর অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে যে কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল যে কলেজ কলিকাতার হিন্দু কলেজের এক মাত্র প্রবল ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল ও কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সদস্য স্টকলিক সাহেবের চক্ষুশূল হইয়াছিল ; সেই কলেজ এখন উঠাইয়া দিতে পারিলেই যেন একটা অনাবশ্যক ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।” একটু সামলাইয়া লইয়া দত্ত মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“Lodge আমাকে বড় খাতির করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে আমার অস্থখ হইয়াছে ; তখনও ছুটির জ্ঞাত দরখাস্ত করি নাই ; তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—‘শুনিলাম তোমার অস্থখ হইয়াছে ; কলেজে এস না ; আমি রাতিমত বন্দোবস্ত করিয়া লইব।’ তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে কলেজের কাজ করিতেন।

“ছয় মাস বিদ্যায়ের পর বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লেখব্রিজ সাহেব কার্য্যভার

গ্রহণ করিলেন ; আমি তাঁহার আনিষ্টান্ট হইলাম । হেডমাষ্টার হইলেন বীয়েশ্বর মিত্র । বীয়েশ্বর বহরমপুর হইতে আসিয়াছিলেন । একটা বিশেষ কারণে তিনি অকালে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । লব (Lobb) সাহেব যখন প্রিন্সিপ্যাল, তখন আমাকে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হয় ; লব বলিলেন—‘উমেশ দত্তকে এখান হইতে লইয়া গেলে আমার একজন ইংরাজ অধ্যাপক চাই, নইলে আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি না ।’ লব Positivist ছিলেন ; তাঁহার পাণ্ডিত্যও প্রগাঢ় ছিল , বাইবেল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ; কিন্তু সেক্ষপীয়রে দখল তাঁহার তাদৃশ ছিল না । একদিন আমাকে বলিলেন—‘দেখ, এই জায়গাটায় “so” শব্দটার অর্থ যদি “if” করা যায়, তাহা হইলেই একটা মানে দাঁড় করান যাইতে পারে , “So” শব্দের if অর্থে ব্যবচাব সেক্ষপায়র কোথাও করিয়াছেন কি ?’ আমি তৎক্ষণাৎ সেক্ষপীয়রের কাব্য হইতে কয়েকটি passage আৱান্তি করিয়া দিলাম । তিনি খুব খুশী হইলেন । পরে যখনই আট্-কাটত, তখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন ।

“১৮৭৪ সালে আমি আবার প্রিন্সিপালের পদে officiate করিলাম । লেথব্রিজ সাহেব আমাকে বলিলেন, ‘I will resist your being superseded unless it is by a Cambridge man,’ তিনি কেম্ব্রিজ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন ; ইতিহাসের চর্চা করিতেন, গণিত শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন , এক ঘণ্টা কেবল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন ; ইংরাজ সাহিত্য অধিকাংশ আমাকেই অধ্যাপনা করিতে হইত ; সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন । যখন তিনি এখানে আসিলেন, তখন তাঁহার নাম Ebenezzar Lethbridge , তাঁহার দ্বার কাকা Roper মহার পূর্বে তাঁহার স্নাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান ; সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল Roper Lethbridge ; ঐ সম্পত্তির জগ্ন তাঁহাকে প্রতি বৎসর বিলাত যাইতে হইত । স্ত্রর রিচার্ড টেম্পলের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ; স্ত্রর রিচার্ড তাঁহার গোপনায় চিঠিপত্রগুলিও স্ত্রর রোপারকে দেখাইতেন । কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর বিলাত হইতে তিনি বরাবর আমাকে চিঠি লেখেন, Christmas Card পাঠান ; কেবল ১৯১২ সালে তাঁহার নিকট হইতে বড়দিনের কার্ড পাই নাই ।”

অধ্যাপক দত্ত মহাশয় একটু চূপ করিলেন । আমি বলিলাম—“ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বাঙ্গালীর সহিত সাহেবদের ব্যবহার বেশ ভাল ছিল বলিয়াই ত বোধ হয় ।” তিনি বলিলেন—“তখনকার সাহেবেরা খুব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন । একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি,—কোম্পানির আমলের সাহেব কর্মচারী ও Crown-এর আমলের সাহেব কর্মচারী যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয় ।”

প্রশ্ন করিলাম—“কে, এম, বন্ডোপাধ্যায়ের সহিত আপনাদের আলাপ ছিল কি ?” দত্ত মহাশয় বলিলেন—“কে, এম, বন্ডোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল

না; আমি তাঁহার একখানি বই কিনিবার জন্য একবার তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন ত বটেই, খুব স্বদেশহিতৈষীও ছিলেন। Black Act-এর<sup>১</sup> গোলাযোগের সময় তিনি নির্ভীকভাবে রামগোপাল ঘোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি রামতল্লাবাবুর বন্ধু; বাটন্ সাহেবের বাড়িতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়। রামগোপাল বিরাট সভায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে খুব ছুখা শুনাইয়া দেন। Dr Mouat সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'It is a proud day for your country men.' কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁটান পায়রি হইলেও ইংরাজের গির্জায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহার জন্য হেড্‌মাস্টার নিকটে স্বতন্ত্র গির্জাঘর হইল। অধ্যাপক রচফোর্ট (Rochfort) একদিন আমাকে বলিলেন—'বিলাতে আমি কে, এম, ব্যানার্জির নাম শুনিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া আমার বড় ইচ্ছা হইল যে, কলিকাতায় তাঁহার চর্কে গিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আসি। রবিবারে তাঁহার চর্কে গিয়া বসিলাম; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, পাছে বক্তার কালো রঙের আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত করে। যাহা শুনিলাম, তাহা ইংরাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর Sermon অপেক্ষা কম উপদেশ বলিয়া বোধ হইল না।'

“রামতল্লাবাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করিতাম। পেঙ্গন লইয়া যতদিন তিনি এখানে ছিলেন, আমার বাড়িতে প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার পিতা পূজা-আহিক লইয়াই থাকিতেন। রামতল্লাবাবু কানী গিয়া পৈত্যাগাছটি ফেলিয়া দিয়া আসেন। বাপ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন; তিনি বাপের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি পৈত্রিক বাড়িতে স্থান পাইলেন না; আলাদা বাড়িতে তাঁহাকে থাকিতে হইল; সে সময়ে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়াছিল। চাকর মিলিত না; কলেজের ছেলেরা তাঁহার সেবা পরিচর্যা করিত। এই পৈত্যাগ প্রসঙ্গে একদিন তাঁহার সহিত আমার খুব তর্ক হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—‘আমার conviction-এর বিরুদ্ধে আমি কাজ করিতে পারি না।’ আমি বলিলাম—‘বাপ আপনাকে শুধু পৈত্যাগ রাখিতে অহরোধ করিয়াছিলেন বৈ ত নয়! conviction-এর নিকটে natural tenderness-কে sacrifice করার কতটা পৌরুষ আছে বলা যায় না।’ পৈত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু অনেকদিন পরে তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ দেন বারেন্স ব্রাঙ্কশের ঘরে।”

১ “১৮৯২-৯০ সালে গবর্নর জেনারালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধহলে কোম্পানির কোজদারী আদালতেরও হস্তবিধির অধীন করাই ঐ সকল পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগের অভ্যাসের হইতে রক্ষা করা ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির ‘কালো কান্ড’ (Black Acts) নাম দিয়া তথাকথিত ঘোর আন্দোলন করেন।” (শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত ‘রামতল্লাবাবু ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’)—সং

আচার্ধ্য দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—“কৃষ্ণকমলবাবু স্বপ্নে একটি চমৎকার গল্প শুনিয়াছি। একদিন রামতনুবাবু বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে বলিলেন—‘ওহে আমাকে একটি রহস্যনি বামুন যোগাড় করে দিতে পার?’ বিজ্ঞানাগর বলিলেন,—‘কেন হে, আবার বামুনের দরকার কি? বাবুজি খানসামা হোলোই ত চলে।’ রামতনুবাবু ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—‘হাঁ আমার কোনও আপত্তি নাই বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে যে বামুন ছাড়া চলবে না।’ বিজ্ঞানাগর হাসিয়া বলিলেন—‘বাপের কথায় পৈতাগাছটি রাখতে পারলে না; এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ।’ রামতনুবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।”

উমেশবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—“দেখিলে ত? শুধু conviction সব সময়ে বলায় রাখা চলে কি? রামতনুবাবু দেখিয়া শুনিয়া বড় মেয়েটিকে ব্রাহ্মণের ঘরে দিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরও ব্রাহ্মণ্য অহঙ্কার খুব প্রবল ছিল। আমি জানি কোনও বৈষ্ণব তাঁহার কাছে সহজে যাইত না। বৈষ্ণব জাতটা বড় অহঙ্কারী। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বামুন বলিয়া অহঙ্কার এত উৎকট, এত aggressive ছিল যে বৈষ্ণবরা তাঁহাকে দূরে পরিহার করিতেন কিন্তু তাঁহার রংপুয়ের মোক্তার একজন বৈষ্ণব ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিতেন—‘I am a Brahmin Christian।’ Conviction রোজ রোজ বদলাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের জাতাভিমান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায় কি?

“রামতনুবাবু প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন। একদিন পথে সরকারী উকিল তারিণীবাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামতনুবাবু বলিলেন, ‘ও কি, প্রণাম করেন কেন?’ তারিণীবাবু উত্তর করিলেন, ‘আপনি যে ব্রাহ্মণ।’ রামতনুবাবু বলিলেন, ‘না, আমি ত ব্রাহ্মণ নই’। উত্তর হইল,—‘আপনি ‘নই’ বললেই কি হয়?’ কাশীশ্বর মিত্র মূল্যে ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করিতেন। ব্রাহ্মরা তাঁহার এই ব্যবহারে আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, ‘এ courtesy আমি কেন দেখাব না।’ রেভারেন্ড লালবিহারী দে খুঁটান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাতাভিমান ছিল। তিনি জাতিতে স্ত্রবর্ণবণিক; কিন্তু তিনি বলিতেন যে স্ত্রবর্ণবণিক মাত্রই বৈষ্ণবজাতি। তিনি নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতেন। আমার কাছে গল্প করিতেন যে, বল্লাল সেন তাঁহাদের অধঃপাতের কারণ। সাহেবদের মধ্যেও উৎকট জাতাভিমান আছে। পূর্বে তোমাকে লর্ড ইউলিক ব্রাউনের কথা বলিয়াছি; তিনি আইরিশ লর্ড। যখন তিনি এখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখনও তিনি লর্ড হন নাই; তাঁহার দাদা জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে টাউয়ার্স (Towers) নামে আর একজন আইরিশম্যান এখানকার জজ ছিলেন। ইউলিক ব্রাউনের দাদার অমিহারিতে টাউয়ার্স বংশ বাস করিত। সেই জন্ত ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউন জজ টাউয়ার্সের সঙ্গে কখনও খাইতেন না।

“ভূষেবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—‘ইংরাজ যদি বাকালীর মেয়ে বিয়ে করে ত ভাল হয়।’ আমি কিন্তু দেখিতেছি ভাল হয় না। বরিশালে কম্প (Kemp) সাহেব সকলের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন; একটি এদেশীয়া মহিলাকে বিবাহ করিয়া একঘরে হইলেন। মনোমোহন ঘোষের কন্যাকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি বিবাহ করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ হয়। Queen’s Proclamation-এর সময়ে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ষ্টীভেন্স (Stevens), তিনি আমাকে বলিলেন,—‘আমরা স্থির করিয়াছি যে একদিন আমরা সকলে তোমার বাড়ী যাইব, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ কর, একটা সখের যাত্রা দ্বাও, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহার তালিকা দিতোছ।’ সেই তালিকার মধ্যে লর্ড রিচার্ডসন, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গর্ডন ও আর আর খাঁটি সাহেবের নাম ছিল, কিন্তু ফিরিজি সিভিল সার্জেন বেন্সলি (Bensley) নাম ছিল না। অগত্যা সেই রকমই নিমন্ত্রণ করিতে হইল। সাহেবেরা সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন, ঘরে কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহারা খুব আপ্যায়িত হইলেন।

“রামতল্লাবুকে আমি খুব ভক্তি করিতাম। আমার এই শয়নঘরের দেওয়ালে তাঁহার ছবি বরাবর এমন ভাবে রক্ষিত ছিল যে, ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তাঁহার প্রতিকৃতি প্রথমেই আমার নয়নগোচর হইত। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত নির্মল ছিল। কলেজে তিনি দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। অকশান্ত ভাল জানিতেন না। Campbell-এর ‘PLEASURES OF HOPE’ অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। বরাবরই Deist ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্ম হইবার পূর্বে হিন্দুসামাজিক ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। বরাবর মদ পাইতেন। আমরা কিন্তু ‘Cato of Utica’-র কথা স্মরণ করিতাম;—‘It will be easier to prove that drinking is a virtue than that Cato could be guilty of a vice.’

## চার

আচার্য্য দত্ত মহাশয় বলিতে লাগিলেন :—

“রামভট্ট বাবুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী রাজবাড়ীতে কাজ করিতেন। কিছু জমি ছিল ; বারুইহাটা গ্রামে তাঁহার প্রজা ছিল। আমি ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহাকে খুব বড় দেখিয়াছি ; বোধ হয় তাঁহার আশী বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি তালপাতার ও নারিকেল পাতার ছাতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দুই গাছা পৈতা ছিল, একটি মৃগচর্মের, অন্যটি সূতার। সর্বদাই পূজা আত্মিক লইয়া থাকিতেন। ছেলে শ্রীপ্রসাদকে ডাকিতেন—‘রামগঙ্গা’। দুর্গাপূজায়, শ্রামাপূজায় ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়ান খুব ছিল ; মেয়ে জামাই দৌহিত্র প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার পুত্র কেশব যশোরে অনেক টাকা রোজগার করিয়া বাড়িতে ভাল করিয়া পূজার দালান দিয়াছিলেন।

“তারাকান্ত রায়, উমাকান্ত রায়, শিবকান্ত রায়, রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর শালক ছিলেন ; অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী কান্তিক দেওয়ানের পিসী। কান্তিকচন্দ্র খুব ফণী ছিলেন ; ফানী ও ইন্দ্ৰাজি ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল ; তিনি গানবাজনার ওস্তাদ ছিলেন। আমি তাঁহার গান শুনিতে যাইতাম। রাজবাড়ীতে গান বাজনার চর্চা ছিল। বৃদ্ধ দেলওয়ার ণী কেবলমাত্র হাতে তালি দিয়া গান গাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। খরেকদি খুব ভাল লানাই বাজাইত ; সেতারেরও ওস্তাদ বলিয়া মহারাজ তাহাকে স্বখ্যাতি করিতেন।

“মহারাজ গিরীশচন্দ্র খুব সুপুরুষ ছিলেন। অমন লম্বা মাছুষ প্রায় দেখা যায় না। দেহে খুব বল ছিল। দোণেছের তাঁতীর তাঁহার কাপড় বুনিত—তেরো হাত লম্বা। আমার জ্যাঠামশাই তাঁহার কর্মচারী ছিলেন ; মহারাজ একবার সেই কাপড় তাঁহাকে একজোড়া দিয়াছিলেন। মহারাজের আজ্ঞা ছিল যে তাঁহার প্রত্যেক কর্মচারী নিজের নিজের বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিবে। একবার তিনি শুনিলেন যে, আমার জ্যাঠামহাশয় কস্তারগ্রস্ত বলিয়া দুর্গোৎসব করিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, ‘কি! আমার কর্মচারী দুর্গোৎসব করবে না! যা’ দরকার আমার তোবাখানা থেকে যাবে; পূজার সমস্ত খরচ আমার।’ কর্মচারীদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে বৎসরে একদিন তাঁহার শুভাগমন হইত। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ীতে তিনি আসিয়াছিলেন ; আমরা সব ছেলেপুলে গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আনন্দময়ীর পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইত। তৎকাল দিনে নিয়ম ছিল, গাভীর বাটের প্রথম দুধ, গাছের প্রথম ফল, আনন্দময়ীকে দিয়া আসিতে হইবে। রাজবাড়ীতে বৈকালে ভোগ কি ছিল জান? বোলো গুড়ের পাক। একটা প্রকাণ্ড কটাহ হইতে সমস্তটা একটা বোরাব মধ্যে ঢালা হইত ; দশ বাঘেরো বোরা এইরকমে বোকাই করা হইত। গুজা লাফ হইল, সেই ভোগ কুড়ুল দিয়া



কাটিয়া কর্ণচারীদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। পূজার প্রতিমা গড়িত,— শাস্তিপুরের কারিকর। একজন দুর্গা, অম্বর ও সিংহ গড়িত; একজন লক্ষ্মী-সরস্বতী; একজন কালিক-গণেশ; একজন সাজ লাগাইত; একজন চালচিত্র করিত। প্রতিবার প্রতিমার নতুন পাট হইত। প্রতিমা গড়া শেষ হইলে মহারাজ করযোড়ে কারিকর-দিগকে বলিতেন—‘তোমরা যদি অল্পমতি কর, তা’হ’লে আমি মাকে পাটে বনাতে পারি।’ তাহার বলিত—‘আপনি বসান।’ পূজার সময় একশত ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া জায়গা লাল শালু দিয়ে মোড়া ও ঘেরা হইত; পূজার পরদিন আর সে শালু দেখিতে পাওয়া যাইত না। এ জেলার ব্রাহ্মণমাত্রই দেবোত্তর জমি পাইত ও রাজবাড়ীতে খাইতে পাইত।

“মহারাজ গিরীশচন্দ্রের দুই রাণী ছিলেন। হুর্ভাগ্যবশতঃ বড় রাণীর মস্তক বিকৃতি ঘটয়াছিল। কিন্তু ছোটরাণী খুব বুদ্ধিমতী ও স্নেহবানী ছিলেন। স্বয়ং পাক করিয়া মহারাজকে সোণার থালে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। আহারের পর মহারাজ খড়্কে-কাটি লইতেন—ব্রাহ্মণের হাত হইতে; শাস্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও খড়্কা নামে পরিচিত। ছোটরাণী শ্রীশচন্দ্রকে পোস্তপুত্র গ্রহণ করেন।

“কুমার শ্রীশচন্দ্র যখন একটু বড় হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি খরচ-পত্রের অকারণ বাহুল্য যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে একটু কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিবেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের স্নানের জল একসের তেল বরাদ্দ ছিল; শ্রীশচন্দ্র কমাইয়া এক পোয়া করিলেন। যে ব্যক্তি তেল মাখাইত, সে এক পলা তেল লইয়া মহারাজের কাছে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘একি!’ ব্যাপার অবগত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে তিনি বলিলেন—‘তুমি বোঝ না; চাকর-বাকরের কিছু পাওয়া চাই, নইলে উহাদের চলবে কেন?’

“ব্রাহ্মণ পরিচারক মহারাজকে খড়্কে-কাটি দিত। অগ্রদূত হইতে যখন দ্বাদশ গোপাল আনা হইত, নৌকা খড়িয়া নদীর ঘাটে পৌঁছিলে, ব্রাহ্মণ পাঙ্কী-বেহারী পাঙ্কী কাঁধে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিত।

“মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ফালী ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রী বামাহন্দরী চমৎকার রীতিতে পারিতেন; আমি অনেকবার তাঁহার রান্না খাইয়াছি। মহারাজ সত্যশচন্দ্রের স্ত্রী ভুবনেশ্বরীও চমৎকার রীতিতে পারিতেন। মহারাজ স্বয়ং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। মহারাণী তাঁহাকে বলিতেন,—‘তুমি উমেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছ; তিনি ত তোমাদের বাহিরের টেবিলের খানা খাবেন না; আমি তাঁর জল রীতিব।’ সে রকম রান্না আমি কোথাও খাই নাই। মহারাজ সত্যশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পত্তি Court of Ward-এ গেলে মহারাণীর একশত টাকা মাসিক allowance বরাদ্দ হইল। তাহাতে তাঁর কষ্ট হইল। আমাকে তাঁহার কষ্টের কথা জানাইলেন। আমি ষ্টেন্ডেন্স সাহেবকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করার মহারাণীর ছয় শত টাকা মাসহারা ধার্য করা হইল। আমি শিক্ষাবিভাগের কর্ম হইতে অবসর

গ্রহণ করিলে পর মহারাণী আমাকে তাঁহার এষ্টেটের দেওয়ান হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন ; আমি সম্মত হইলাম না ।”

আচার্য্য দত্তমহাশয় একটু চুপ করিলেন । একটু পরে বলিলেন—

“রামতত্ত্ববাবুর কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু কৃষ্ণ-নগরের ইতিহাসের সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের ইতিহাস কতটা জড়িত হইয়া আছে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি । ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের সময়ে মহারাজ ত্রিশচন্দ্রের কতটা ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল, সে কথা পূর্বেই তোমায বলিয়াছি , আবার যখন এখানে ব্রাহ্মমন্দির-নির্মাণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হাজার টাকা দান করিলেন এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কর্তা হইলেন, তখনও তাঁহাদের কাধ্যে মহারাজের sympathy ছিল । কেশবচন্দ্র সেন একটা বিধবাবিবাহ উপলক্ষে যখন এখানে আসিলেন, সমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখনও মহারাজের sympathy ভিতরে ভিতরে তাঁহার দিকে ছিল । বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে দল দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহার নেতা হইলেন তারিণী প্রসাদ ঘোষ ।”

আজ অপরাহ্নে দীনবন্ধু মিত্রের কথা উত্থাপন করিলাম । আচার্য্য দত্ত মহাশয় বলিলেন,—“দীনবন্ধু খুব আমুদে লোক ছিল ; আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত ; প্রায়ই আমার সহিত দেখা করিতে আসিত , একবার আমার ব্যায়ামের সময় বক্সি চাটুঘোকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল । রামতত্ত্ববাবুর মত দীনবন্ধুবও একটু পানদোষ ছিল ; কিন্তু পাছে আমি টের পাই, এই জন্য সে সদাই সতর্ক থাকিত । সেক্সপীয়র পড়িতে খুব ভাসবাসিত । তাহার যে পাণ্ডিত্য খুব বেশী ছিল তাহা নহে ; তবে সেক্সপীয়র হইতে মালমস্কা আদায় করিয়া নিজের নাটকের পুষ্টিসাধন করিত । দেখনা, Merry Wives of Windsor-এর Falstaff-কে কেমন সে হৌদলকুৎ-কুতের পোষাকে খাড়া করাইয়াছে । তাহার ‘সধবার একাদশী’ যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমি ঢাকায়, যখন ‘নীলদর্পণ’ বাহির হইল, তখন আমি এখানে ।

“ভাকবিভাগের কর্মচারী হইয়াও দীনবন্ধু এই বইখানা প্রকাশিত করিয়া, যে চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমরা আজিকার দিনে বুঝিতে পারিবে না । লৌভাগ্যক্রমে শ্রু জন্ পাটরু গ্রান্ট নীলকরের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইলেন । বড় বড় লোক নীলকরদিগের সহিত আত্মীয়তাস্বন্ধে আবদ্ধ ছিল । লর্ড ম্যাকনটনের একজন আত্মীয় এখানে জমিদার ছিলেন । হিন্দু প্যাট্রিয়ার্ট জিদ্ করিয়া বলিল যে, Indigo Commission বসান হোক । নীলকরেরা বলিল যে তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বাজারে প্রচারিত হইয়াছে । ‘প্যাট্রিয়ার্ট’ তাহার উপযুক্ত জবাব দেয় । কমিশন বসিল । সভাপতি হলেন সেটন কার (W. S. Seton Kerr) ; মি: রিচার্ড টেম্পল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রেভারেন্ড জে সেল ও ফার্ডিনান্দ

। (W. F. Fergusson) কমিশনের মেম্বর ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হার্শলের জবানবন্দী আমার বেশ মনে আছে।

‘প্রশ্ন।—তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমরা মতে ইহার প্রতিবিধানের কোনও উপায় আছে কি ?

‘উত্তর।—হ্যাঁ খুব সহজ উপায় আছে (A very simple remedy)।

‘প্রশ্ন।—কি ?

‘উত্তর।—উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার (Justice between the parties)।

‘প্রশ্ন।—তুমি কি বলিতে চাও যে, এই লোকগুলো বাস্তবিকই অত্যাচার পীড়িত (Do you mean to say these people are really oppressed) ?

‘উত্তর।—হ্যাঁ, আমি বলিতে চাই (Yes, I do)।’

‘যখন পাদরী ব্রমহার্ডের জবানবন্দী লওয়া হয়, তিনিও জোর করিয়া বলিলেন যে, ন্যায়-বিচার হয় না।

“১৮৬০ সালে গ্রীষ্মকালে এই কমিশন বসিয়াছিল, পনের দিন ধরিয়া এখানে জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল।

‘যশোহর জেলায় লক্ষ্মীপাশা অঞ্চলে একজন নীলকর ছিল; তাহার নাম ম্যাক্ আর্থার। একদিন সে সেখানকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেনব্রিজ সাহেবকে সকাল বেলায় breakfast-এ নিমন্ত্রণ করিল। বেনব্রিজ আগে হইতেই জানিতেন যে, ম্যাক্ আর্থার অত্যন্ত অত্যাচারী বলিয়া সেখানে একটা অখ্যাতি ছিল। তিনি সেই নীলকরের কুঠির ২।১ মাইল দূরে নিজের তাঁবু ফেলিলেন। অতি প্রত্যুষে ম্যাক্ আর্থারের বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন যে, কে যেন ক্রন্দনের স্বরে ক্ষীণস্বরে বলিতেছে—‘দোহাই সাহেব, দোহাই সাহেব।’ সেই শব্দ অহুসরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ম্যাক্ আর্থারের গুদামের ভিতর হইতে এই কাতর ধ্বনি আসিতেছে। নীলকরকে কিছু না বলিয়া তিনি সর্দার বেয়ায়াকে বলিলেন, ‘গুদামের চাবি লইয়া আমার সঙ্গে আয়।’ চাবি খুলিতেই একটা ককালসার মানুষ ধল করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া গেলেন। নিমন্ত্রণ থাইতে গেলেন না। ম্যাক্ আর্থার সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কি! আমার অজান্তসারে আমার গুদামের চাবি খুলিয়া লোকটাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল! এই অত্যন্ত ‘বেআইনি’ ব্যাপার লইয়া গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে সেই লোকটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, বেনব্রিজ নিজের তাঁবুতে বসিয়া তাহার জবানবন্দী লইলেন। সে বলিল, ‘কুঠির সাহেব আমাকে কিছু খেতে দেয়নি, শুধু ধান খেতে দিবেছিল।’—তিনি একটা রিপোর্ট লিখিয়া তাহাকে সম্বন্ধে পাঠাইয়া দিলেন। গভর্নমেন্ট এ বিষয়ের রীতিমত তদন্ত করিলেন। তদন্তের ফলে ম্যাক্ আর্থারের অর্ধদণ্ড হইল।

“সামান্য ছয় শত কি সাতশত টাকা অর্থদণ্ড হইল বটে ; কিন্তু স্ত্রার জন্ পাটর, গ্রাণ্ট্ খুব কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আর একটু গোড়ার ইতিহাস না জানিলে সে মন্তব্যটুকু বুঝিতে পারিবে না।

“যখন স্ত্র ফ্রেড্রিক হ্যালিডে বাঙ্গালার ছোট লাট, তখন যশোহরের মধ্যমতী চন্দনা-নদীতে ঘন ঘন ডাকাইতি হইত, জেলার পুলিশ কিছুই করিখা উঠিতে পারিত না। অনেক বিবেচনা করিয়া, কমিশনের সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিলেন—‘মধ্যমতী চন্দনার উপরে একটা floating sub-division করিলে হয় না?’ এই প্রস্তাব স্থানীয় জনসাধারণের ‘মত্তমোদিত হইবে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করা হইল। বেশী আপত্তি করিল,—নীলকর ম্যাক্ আর্থার! সে বলিল, ‘এখানে একটা সবডিভিসন করিলে, মোক্তারের শুভাগমন হইবে; আর এই সকল চাষারা জুয়াচোর ও দুইবুড়ি হইয়া নষ্ট হইবে।’ তাহার এই আপত্তি শুনিয়া লাট-সাহেব হ্যালিডে বলিলেন—‘Floating sub-division-এ কাজ নাই।’

“এই সমস্তই কাগজে কলমে লাট দপ্তরে লিপিবদ্ধ ছিল। স্ত্র জন্ পাটর গ্রাণ্ট্ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ম্যাক্ আর্থার বেনডিক্স-ঘটিত ব্যাপারের উপর মন্তব্য প্রকাশ কালে লিখিয়াছিলেন—‘These proceeding throw a strong light upon M’c Arthur’s disinclination to have a subdivision.’

“স্ত্র ফ্রেড্রিক হ্যালিডে নীলকরদিগের বন্ধু ছিলেন। স্বস্ সাহেবের কথা আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন এখানে জজ্, তখন লর্ড ডালহৌসি বাঙ্গালার গভর্ণরের কাজ চালাইতেন; তাহার সেক্রেটারি ছিলেন স্ত্র সেসিল বৌডন্। স্বস্, স্ত্র সেসিলকে লিখিলেন—‘আমি নীলচাষের ব্যাপার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; আমার এই চিঠি ও minute আপনি অল্পগ্রহ করিয়া লর্ড ডালহৌসীর হস্তে দিবেন।’ তখন লর্ড ডালহৌসি স্ত্র ফ্রেড্রিক হ্যালিডেকে বাঙ্গালার মনুদে বসাইবার ব্যবস্থা একরকম পাকা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে মার্চ মাসে তিনি লিখিলেন, ‘The fittest man in the service of the honorable company to hold this great and most important office is, in my opinion, our colleague the Hon’ble F. J. Halliday.’ কাজেই স্বস্দের কাগজপত্র নূতন ছোট লাট হ্যালিডের হাতে পড়িল। তিনি চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—‘স্বস্ জানে কি?’ যশোহর, নবদ্বীপ, রাজসাহার নীলচাষের উপর কমিশন বসাইলেন। কমিশন স্বস্দের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল ; আরও বলিল,—‘নীলকরেরা বনজঙ্গল কাটিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিয়াছে।’

একটু চুপ করিয়া আচার্য্য দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া—‘আব্দুল লতিফের Case-টা জান কি?’ আমি উত্তর করিলাম, “না”। তিনি বলিলেন, ‘গোবরডাঙ্গার নিকটে কোলারুওয়া সবডিভিসনে হাবড়ার আব্দুল লতিফ সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। তাহার নিকটে সেখানকার কুঠির সাহেবের নামে একটা নালিশ হইল।

সাহেবের নামে বাক্সালা ভাষায় ছাপান নোটিশ জারি হইল। তাহাতে লেখা ছিল—‘তুমি আসিবে।’ সাহেব চটিয়া গেল; লাট সাহেবকে জানাইল যে, মৌলবী তাকে ‘তুমি’ বলিয়া আহ্বান করায় তাহার মানহানি হইয়াছে। স্তর ফ্রেড্রিক কমিশনার বিভণ্ডয়েলকে এ বিষয়ের অহুসঙ্কান করিতে বলিলেন। মৌলবী লোভা জবাব দিলেন—‘এই যে ছাপান ফরম্,—এ ত আমি আবিষ্কার করি নাই; গভর্ণমেন্ট এরিয়াছেন; আমি শুধু ভরাট করিয়াছি মাত্র।’ স্তর ফ্রেড্রিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—‘মৌলবী ঠিকই করিয়াছে; কিন্তু সে ওখানে অনেক দিন আছে, তাহাকে অন্তত বদলি করিয়া দেওয়া হউক।’

‘স্তর জন্ পীটার গ্রাণ্ট্ বাক্সালার ছোট লাট হইলে পর, সেই সকল কাগজপত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

‘লর্ড ডালহৌসির প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন—কোর্টেনে (F. F. Courtenay)। Courtenay-র একজন বিশিষ্ট বন্ধু সগুর্স (Saunders) যশোহরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সগুর্স জরে বড় ভাগতের্ছিল; বদলি করিবার জন্য Courte ay হালিডেকে অহুরোধ করিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে একটি পদ খালি হইল, কিন্তু হালিডে সগুর্সকে না আনাইয়া অগষ্টন এলিয়টকে এখানে আনাইল। সগুর্সের মৃত্যু হইল। Courtenay অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লর্ড ডালহৌসিকে সকল কথা বলিয়া দেন; হালিডেকে প্রাইভেট চিঠিও দিলেন। হালিডে injured innocence-এর ভাণ করিলেন। Courtenay লিখিলেন,—‘তোমার ethical laxity আছে; তোমার assumed surprise আমি বুঝি; আমি সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিব।’ Friend of India ও Englishman পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটা বাহির হইল। Friend of India-র সম্পাদক সমস্ত চিঠি খানাকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন।

‘স্তর পীটার গ্রাণ্ট্ এই ব্যাপারটাও মুদ্রিত করাইয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

‘তিনি আমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন; আমার সঙ্গে দেখা করিতেও আসিয়াছিলেন। খুব জোরান শরীর ছিল; সারা রাত্রি খাটিতেন—শেষে তিন ঘণ্টা ঘুয়াইতেন; সমস্ত চিঠি নিজে লিখিতেন অথবা বলিয়া যাইতেন।

‘বাক্সালার লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের আবৃত্ত ও শেষ দেখিলাম।’ আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, স্তর জন্ পীটার গ্রাণ্ট্ দেশের লোকের শ্রদ্ধা যতদূর আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারেন নাই। নীলকরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা শুধু কথার কথা নহে; প্রকৃতই ঘটনাছিল। ১৮৬০ সালে তিনি যে minute লেখেন, তাহার একস্থলে ছিল :—‘On my return a few days afterwards, along the same two rivers (the Kumar and Kaliganga), from dawn to dusk as I steamed

along these two rivers of some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with rows of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males stood between the riverside villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest'.

“১৮৬২ সালে তিনি পদত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহাকে বিদায়কালে অভিনন্দন করিলাম। যে address দেওয়া হইল তাহা আমারই রচনা; তাহাতে আমার স্বাক্ষর ছিল। তৎক্ষণে তিনি আমাকে লিখিলেন—“It is impossible for one, whose humble endeavours in the public service of our country have been so generously appreciated as mine have been by you, ever to forget you.’

“হালিডে ও গ্রাণ্টের মনোমালিন্দের কথা যে সকল বলিলাম, তাহাতে মনে করিও না যে, স্ত্রীর ফ্রেড্রিক হালিডেকে দেশের লোক শ্রদ্ধা করিত না। ছোট লাট হইবার পর তিনি ইংরাজিতে প্রথম অভিনন্দন পান,—কৃষ্ণনগরে—১৮৫৫ সালে; সে address-ও আমি রচনা করিয়াছিলাম। তিনি রচনার ভাবানু মুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘কে লিখিয়াছে?’—আমাকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গেলে পর, তিনি অনেকক্ষণ আমার সহিত আলাপ করিলেন ও আমার উন্নতি কামনা করিলেন।”

২২এ চৈত্র, ১৩২০

আজ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম—“আপনার স্বতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার যদি আপত্তি না থাকে,”—আমাকে বাধা দিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, “আমার বলিবার এমন কি আছে, যাহা আপনি আগ্রহের সহিত শুনিতে পারেন?” আমি বাংলায়—“আপনি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র; সে সময়ে অনেক কথা আপনি বলিতে পারেন।” তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—“১৮৩২ সালের ৬ই জুন তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি, ১৮৪০ সালে বাঙ্গালা স্কুলে ভর্তি হই।

“আপনি বোধ হয় জানেন না, লর্ড অক্‌ল্যান্ডের সময়ে এদেশে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়।<sup>১</sup> এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ রহিয়াছে, ঐখানে আমাদের বাঙ্গালা স্কুল ছিল। প্রবেশিকা ফা সমেত এক বৎসরে বেতন আগাম দেওয়া হইল—দুই টাকা মাত্র; দ্বিতীয় বৎসরের বেতন চারিটাকা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরে যতদিন পর্যন্ত স্কুল কলেজে পড়িয়াছিলাম, বেতন হিসাবে আর একটি পয়সাও খরচ করিতে হয় নাই।

“বাঙ্গালা স্কুলে দুই বৎসর লেখা পড়া করিয়াছিলাম। লর্ড অক্‌ল্যান্ড মাঝে মাঝে এই বাঙ্গালা স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার শিক্ষকদিগের মধ্যে পণ্ডিত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে বেশ মনে পড়ে, ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিতেন; কিছু কিছু পড়াইতেন। কি পুস্তক পড়া হইত, ঠিক আমার স্মরণ নাই, ভূগোল পড়িতে হইত; রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়িতাম।

“এই বাঙ্গালা বিভাগয়ের ছাত্রদিগের মধ্য হইতে ছয়জন ছেলেকে বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে পড়াইবার নিয়ম ছিল। আমাদের বৎসরে নির্বাচিত ছাত্রদিগের মধ্যে আমি অন্ততম ছিলাম; বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভ করিলাম।

“২২ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটে,—এখন যেখানে মিউনিসিপ্যাল আপিস রহিয়াছে, ঐখানে হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল। হেড মাষ্টার ছিলেন—উমাচরণ মিত্র; তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। গণিতের শিক্ষক ছিলেন—রাধামাধব দে। ইতিহাস পড়াইতেন—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতাম, তন্মধ্যে মনে পড়ে,

১ “.....বাংলা পাঠশালার ভিত্তি প্রস্তর ১৮৩৯ সনের ১৪ জানুয়ারী ডেজিড হোয়ার কর্তৃক প্রোথিত হয়।.....১৮ জানুয়ারী ১৮৪০.....বাংলা পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক হয়।” (‘বাংলার জনশিক্ষা’ বোর্ডেচক্র বাঙ্গল) —সং

Homer's Illiad, Murray's Grammar, Playfair's Geometry, Goldsmith's Rome.

“স্কুলে হেয়ার সাহেব শিক্ষকতার কার্য করিতেন না। প্রথমে তিনি ষড়্ভৈষ্যার করার ব্যবস্থা লইয়া এদেশে আসেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচারে তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া, কোম্পানি বাহাদুর এক সহস্র টাকা বেতনে তাঁহাকে ছোট আদালতের জজ করিয়া দিলেন। সাহেব প্রতি রবিবারে স্কুলে আসিয়া আমাদের জামা খুলিয়া সাবান দিয়া গা ধোয়াইয়া দিতেন। যাহাতে ছেলেরা পরিষ্কৃত পবিত্রস্থান থাকে, সে বিষয়ে তিনি খুব যত্নবান ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বাঙ্গালায় কথা কাহতেন। তিনি নিজে শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন, মালাস্তে শিক্ষকদিগের বেতন দিবার জগা স্কুলে আসিতেন। যতদূর স্মরণ হয়, বোধ হয় গ্রীষ্মকালে ছুটি ‘ছল ন পূজার সময় হইত, বড় দিনের ছুটিও ছিল।

“হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অগ্রতম ছিলেন। তৎকাল কলেজ হইতে তিনি প্রতি মাসে তিনশত টাকা allowance পাইতেন। তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বাগলেন—‘আমি ও টাকা লব না। উহার পরিবর্তে আমার স্কুলের ত্রিশটি ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন পায়, ইহাই আমার বাসনা।’ তদবধি ত্রিশটি করিয়া হেয়ার স্কুলের ছাত্র হিন্দু কলেজে বেতন না দিয়া অধ্যয়ন করিতে পাইত। সেই ত্রিশ জনের মধ্যে আমাদের বংশেরে আমি অগ্রতম। এমনি করিয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ লাভ করিলাম। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর দিন আমার খুব মনে পড়ে। সব স্কুল বন্ধ হইল। গোলদীঘিতে গোর দেওয়ার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রেরা নগ্নপদে গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেও ত্রিশজন ছাত্র বরাবর হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইত। এই ব্যবস্থা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থাপনায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল।

“হিন্দুকলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল—

Pope's Essay on Criticism.

Cowper's Task (Richardson's Selections).

Drama একখানা, বোধ হয়, Otway-Venice Preserved.

Bell's Euclid

Stewart's Geography.

Goldsmith's Rome.

Keightley's India.

প্রবোধ চন্দ্রোদয়।

“আমাদের হেড মাস্টার ছিলেন—রিচার্ড জোনস্ (Richard Jones) খুব যোগ্য লোক; স্বল্প বয়সে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু তিনি



[স্পার্মিটেণ্টেণ্ট্‌ও ছিলেন ; পরে কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার নিজের একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল ; সাটক্লিক্ সাহেব বলিতেন—‘কলিকাতায় আর কাহারও এত বড় লাইব্রেরি নাই।’

“আমাদের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন—ভন্ (Vaughan) সাহেব, তাঁহার নিকটে আমরা একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। হেয়ার স্কুলে আমরা Hind's Algebra হইতে অঙ্ক কসিতাম। হিন্দুকলেজে আসিয়া দেখি যে, Wood's Algebra হইতে অঙ্ক কসিবার ইকুম হইয়াছে। তখন সবে মাত্র কলিকাতায় Wood's Algebra আমদানি হইয়াছে ; অনেক দাম। হেয়ার স্কুলের ছেলেরা Hind's Algebra হইতে অঙ্ক কসিয়া আনিলে সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—‘তোমরা এ ক্লাসের উপযুক্ত নও (you are not fit for the class)’,—অগত্যা কলেজের একটা ছেলের বই দেখিয়া অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলাম।

“আমাদের ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক ভাইনিং (Vining) সাহেব খুব ভাল লোক ছিলেন। বাঙ্গালা পড়াইতেন রামচন্দ্র মিত্র। মিজ জ মহাশয় আমাদের Geograpy-ও পড়াইতেন। সাহেবদিগের সহিত সম্ভাব রাখিবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ প্রয়াস ছিল ; পাচজননের নিকট হইতে খবরের কাগজ লইয়া আসিয়া সাহেবদিগকে পড়িতে দিতেন।

“স্কুল-বিভাগে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া আমি জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পাস করিয়া Fourth College Class-এ উন্নীত হইলাম। প্রথম বার্ষিক প্রেক্ষিতে আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল—

Shakespear's King John.

Vanity of Human Wishes.

Spectator (First Half).

Euclid I-VI and XI.

Plane Trigonometry—Hindman's.

Wood's Algebra (Upto Binomial Theorem and Summation of Series).

Hume's History of England.

Stewart's Mental Philosophy.

“কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লজ্ সাহেব (Edmund Lodge) ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন ; বিশেষতঃ তিনি লেক্সপীয়র ও জন্সন্ পড়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি গণিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। চৌরঙ্গীতে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে বাইতাম, সেখানে আমার সহিত অনেকক্ষণ ইংরাজি কাব্যের আলোচনা করিতেন।

“Spectator পড়াইতেন ফোগো সাহেব (D. Foggo) ; লোকটি কেহিজেব বি. এ. ; বিবাহ করেন নাই ; রুগ্ন ছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন—সটক্লিক্

সাহেব (Sutcliffe)। স্কুলের হেডমাষ্টার জোনস্ সাহেব দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

“দ্বিতীয় বৎসরে আমরা নতুন পাঠ্যপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

Shakespeare's Hamlet.	...	...	শিক্ষক
Bacon's Essays.	...	...	লজ্
Scott's Lay of the Last Minstrel.			ফোগো
Potter's Mechanics.			}
Geometrical Conic Sections.			
Algebra.			
Guizot's History of the English Revolution.			
Physical Geography			
Stewart's Mental Philosophy.			

“দ্বিতীয় বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করা গেল।

Shakespeare's Macbeth.  
Do. Henry VIII.  
Milton's Paradise Lost I-II.  
Bacon's Advancement of Learning.  
Dugald Stewart's Mental Philosophy.  
Analytical Conics.  
Differential and Integral Calculus.  
Hydrostatics.  
Adam Smith's Wealth of Nations.  
Smith's Moral Sentiments.  
Mill's Logic.  
Macaulay's History of England.  
Arnold's Lectures on Modern History.  
Spherical Trigonometry.  
Newton's Principia.

“লজ্ সাহেব প্রথমে আরাবিগের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু Council of Education-এর সেক্রেটারি ডাক্তার মৌআটের সহিত তিনি ঝগড়া করিলেন, কিছু দিনের জন্য দুটি চাহিয়াছিলেন, দুটি মঞ্জুর হইল না; তিনি পদত্যাগ করিলেন। লটক্লিক্ সাহেব আরাবিগের গণিতের অধ্যাপক হইলেন। জোনস্ ও লটক্লিক্ উভয়ে  
পুরা. ১২

অধ্যক্ষের কাজ (Joint Principals) করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে যখন হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হইল, তখন সটক্লিফ সাহেব প্রিন্সিপ্যাল হইলেন ; জেন্স কেবলমাত্র অধ্যাপনা করিতেন।

“গণিতের আর এক জন অধ্যাপক ছিলেন—ভিসেন্ট রীস। ইহার জন্মস্থান সুইটজারল্যান্ড। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া Surveyor General-এর অফিসে Meteorological Reporter হইয়াছিলেন। প্রত্যহ বেলা তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কলেজে আসিয়া অঙ্ক কলাইতেন ; তিনটা ক্লাসের ছাত্র একত্র করিয়া তিনি পড়াইতেন। একখানি বীজগণিত (Lacroix' Algebra) তিনি ফরাসি ভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই নিরীহ অধ্যাপকটি যে নেপোলিয়নের ধ্বজাধারী (standard bearer) ছিলেন, এমন কল্পনা কাহারও মনে লহা উদ্ভিত হইতে পারে না ; কিন্তু প্রত্যহ বেলা চারিটার পর তিনি আমাদিগকে তাঁহার জীবনের সেই পুরাতন কাহিনী শুনাইতেন। যুরোপের রঙ্গমঞ্চে নেপোলিয়নের সমরাত্মিনয় যেন আমরা চোখের উপরে দেখিতাম। যেনা (Jena), অষ্টার্লিটজ (Austerlitz), মস্কো (Moscow),—ছবির পর ছবি দেখাইয়া যাইতেন ; আর তাঁহার দুই গুণ প্রাবিত করিয়া অশ্রু বহিয়া যাইত।

“চতুর্থ বৎসরে আমরা Merchant of Venice, Othello, Tempest, Novum Organum, Dryden's Macflecknoe, Dryden's Absalom and Achitophel, Young's Night Thoughts, Mill's Political Economy, Optics, Astronomy, Calculus পড়িয়াছিলাম। নীনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও আমাদিগকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া চাকরি পাইবার জন্য একটি পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। মহাহুভব লর্ড হার্ডিঞ্জের পিতামহের Public Service Resolution অনুসারে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা তিন জন এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম,—রাধাগোবিন্দ দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও আমি। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ডেপুটি ইন্সপেক্টর হইলাম।

“আমাদের নীনিয়র পরীক্ষায় অয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংরাজি প্রবন্ধের প্রশ্নপত্র রচনা করেন,—‘Write an essay on Poetry’। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে টাউন্ হলে প্রশ্নপত্র বিতরণের সময় সাহেবেরা বলিলেন—‘Try to please the Governor’। শিক্ষাসমিতির সভাপতি কামারূপ সাহেব ইংরাজি সাহিত্যের প্রশ্ন করিলেন। বিভাগাগর বাক্যলা প্রবন্ধ লিখিতে দিলেন।

“স্তর চার্লস উডের মন্তব্য<sup>১</sup> কার্যে পরিণত হইলে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আমি প্রথমেই বাঁকুড়ায় স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হইলাম। গর্ডন ইয়ং

<sup>১</sup> Wood's Education Despatch of 1854 : ইহাতে সর্বপ্রথম শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ছিল। ইহা হাড়া ইহাতে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায়তন (network of graded schools) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল।—মঃ

তখন শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ইন্সপেক্টর হইলেন—উজ্জ্বল সাহেব; বর্তমান ও উড়িষ্যা বিভাগে—হড্‌সন এম্‌স্‌; বেহারে—চ্যাপম্যান; আলাহাবাদে—বিল্‌স্‌। প্র্যাট্‌ ও চ্যাপম্যান সিভিলিয়ান ছিলেন। উজ্জ্বল সাহেব প্রথমে লা মার্টিনীয়র কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য অনেকদিন করিলেন; পরে মৌজাটের স্বয়ংস্বয় কিছুদিন কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি করিয়া করিলেন। শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠন হইলে পর তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলগুলির ইন্সপেক্টর হইলেন।

“আমি যখন বাঁকুড়ার বাই, তখন সেখানে কেবলমাত্র একটি জিলা স্কুল ছিল। আমার চৌদ্দ মাস অবস্থানকালে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন রেলগাড়িতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত; তাহার পরে দামোদর পার হইয়া ঘোড়ার গাড়ী। বাঁকুড়ার দুই ও বি খুব ভাল পাওয়া যাইত। স্কুল পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় গ্রামের মধ্যে ঘুরতের গন্ধ পাইয়া পাখি ধামাইয়া বি কিনিতাম,—টাকার সাত পোয়া। উৎকৃষ্ট চাউলের মন তিন টাকার কম ছিল।

“বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া হাওড়ার আসিলাম। কিছুদিন পরে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত অদল বদল করিয়া লইলাম। সে আসিল হাওড়ার, আমি গেলাম কলিকাতায়।

“তখন কলিকাতায় ‘এডুকেশন গেজেট’ ওয়ার্যান্‌ শ্বিথ সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। কাগজখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্বিথ সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা-পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইল। আমি তাঁহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ছাত্রবৃত্তি পদবিদ্যায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইয়াছিল।

“১৮৫৮ সালে বন্ধু কানাইলালের সাহচর্য্যে হ’কাপটিতে আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলাম; তাহার নাম,—Model School। হেডমাষ্টার হইলেন, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; বেতন পঞ্চাশ টাকা মাত্র। এই তারাপ্রসন্নবাবু পরে বঙ্গবানের সর্গশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া বহু বৎসর দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

“আমি যখন বাঁকুড়ায়, ভূদেববাবু তখন হাওড়ার হেড মাষ্টার। আমি যখন হাওড়ায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর হইলাম, ভূদেববাবু তখন হুগলি নর্থ্যাঙ্ক স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন। ভূদেববাবুর দায়গার কাউপার সাহেব হাওড়ায় হেডমাষ্টার হইলেন। হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেববাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট আপিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেববাবু ইহার সম্পাদক হইলেন। ভূদেববাবুর পিতা \* খুব পণ্ডিত

\* ২৭এ লোন্ড, ১৩২১।

আজ সন্ধ্যার পর বীড়ন উঠানে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে ভূদেববাবুর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—“ভূদেববাবুর পিতা বিদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

ছিলেন ; নিজে নিত্য পূজা করিতেন । একদিন তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন ; ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল ; আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহার পুত্র ভূদেব আর্চো পূজা করেন নাই । তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল ; কারণ পূজা না করাটা যে কত ঘোষের তাহা তাঁহার ছেলে বুঝিল না । ভূদেববাবু ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়িতেন । একদিন তাঁহার বাপের এক বন্ধু তাঁহাকে মুণ্ডবোধ ব্যাকরণের পরীক্ষা করেন , তিনি সম্ভোবজনক উত্তর দিতে পারেন নাই ; তাঁহার পিতা তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করেন । ভূদেব গৌ ধরিয়া বলিলেন—‘আমি সংস্কৃত পড়ব না ; আপনাদের সংস্কৃত পড়া এমন ধারা যে, না পারলে এত প্রহার ! আমি সংস্কৃত পড়ব না ।’ ভূদেববাবুর ইংরাজি পড়া আরম্ভ হইল । কলিকাতার হিন্দুকলেজে তিনি মাইকেলের সতীর্থ বন্ধু । বহুদিন পরে মাইকেল বিলাত হইতে কিরিয়া আসিয়া ভূদেববাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন । ভূদেববাবুর বাডীতে মাইকেলের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল ।

‘বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেববাবুর বাডীতে । বঙ্কিমবাবু তখন মবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন , মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন । হিন্দুকলেজে পঠদশায় দীনবন্ধু মিত্রের ও মহেন্দ্র সরকারের সহিত আমার খুব জ্ঞানাতনা হইয়াছিল ; তাঁহারা আমাদের নীচের ক্লাসে পড়িতেন । আমার বিশ্বাস, ১৮৫৪ সালের Education despatch-এর ফলে বাল্যলা রচনার দিকে অনেকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন । হুগলির হেড পণ্ডিত রামগতি স্ত্রাবরত্ন স্বনামধন্য হইয়াছেন । পরে

পিতার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন । জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা তাঁহার খুব ছিল , কয়েক বৎসর পত্রিকা করিয়াছিলেন । ভূদেবকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দ্বিবার সময় আমার বাবাকে তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন, বাহাতে আমার দ্বাধাকেও হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিচা বেওয়া হয় । বাবা কিন্তু তাঁহার কথায় বিচলিত হন নাই । ছেলেকে সংস্কৃত পড়াইয়া কোনও লাভ নাই, এই রকম ধারণা তর্কভূষণের ছিল । কর্ণম্বয়ে প্রবেশ করিয়া ভূদেববাবু সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন । তাঁহার অনেক সঙ্গুণ ত ছিলই , তাঁহার মত সুশ্রী পুরুষ সচরাচর নয়নপোচর হয় না । সরল স্বর্ধী দেহ, নখর গৌর কান্তি , তাঁহার মত বহুশতভক্ত বাল্যলী শিক্ষিত সমাজে প্রায় দেখা যায় নাই । কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলিলেন, ভূদেববাবু Comte-র দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন, ‘Comte যে রকম হৃদয়ভাবে তাহার দার্শনিক মতগুলি বিধি বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হয়, সে বোধ হয়, বায়ু পণ্ডিতের ধ্বতাটা কোনও রকমে শিখিয়া লইয়াছে ।’ কিন্তু Comte যে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সাহিত্য সম্বন্ধে বড় একটা বেলী কিছু জানিতেন, এমন তো বোধ হয় না । তাঁহার Positive Polity-র এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছিলেন—‘যখন আমার ধর্ম্ম সর্জক গৃহীত হইবে, তখন ধাঁহার প্রচারকের কাজ করিবেন, তাঁহারা ইংরাজকে বলিবেন, —ব্রাহ্মণ চিরদিন স্বাধীনতা ভালবাসে, সে ব্রাহ্মণ স্বাধীনভাবে তাহার সমাজ-তত্ত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দাও, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণকে কিরাইয়া দাও ।’ আর একস্থলেও ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর সম্পর্কের অশ্রীতিকর উল্লেখ আছে । সে বাহা হোক, ভূদেববাবুর প্রতি অনেক ইংরাজের অত্যন্ত অজ্ঞা ছিল । লক্ষ্যসাহেব তাঁহার নির্মল চরিত্রের ও বলুত্বের প্রশংসা করিয়া এক উচ্ছ্বাসপূর্ণ এবং মুগ্ধিত করিয়াছিলেন ।

তাহার জায়গায় আমি কালীপ্রসন্ন বিহারীকে আনাইলাম ; ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিভাসাগর যে ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ লিখেন, তাহার এক অংশ রামগতি জায়রত্ন কর্তৃক রচিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ‘শিউলিকা’ লিখিলেন। বিভাসাগর এডুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বীটন সাহেবকে ধরিয়া বলিলেন—‘ইংরাজি হিন্দু কলেজের ছেলেরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয় ! আমার কলেজের ছেলেরা কেন হয় না ?’ শেখার দু জন ডেপুটি হইলেন ; মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাহাদের অন্ততম।

“প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পাটীগণিত ও বীজগণিত রচনা করিলেন। ১৮৭১ সালে আমি জ্যামিতি লিখি ; সমগ্র পুস্তকখানা মুদ্রিত করি ১৮৭২ সালে। আমার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্লেজেরারের জ্যামিতির প্রথমার্ধ বাঙ্গালার লিখিয়াছিলেন,— বিশেষ ভাল হয় নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Encyclopedia Bengalensis হইতে একটা অংশ (১৮৪২) ভূদেব বাবু পুনর্মুদ্রিত করেন ; তাহাতে মৌলিকতা কিছু ছিল। জ্যামিতির শেষার্ধ্বে ঢাকার কালীকুমার দাস অণুবাদ করেন। সর্বাপেক্ষা অধিক গুণগণা দেখাইয়াছিলেন—কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ মহোদয়ের রামকমল ভট্টাচার্য্য ; নানাশাস্ত্রে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আমার পুস্তকের জ্যামিতিক পরিত্রাণ সম্পূর্ণ আমারই। নর্থ্যাল স্কুলে প্রসন্নবাবুর পাটীগণিত ও আমার জ্যামিতি আগাগোড়া পঠিত হইত। উঃ! সাহেবের কথায় আমি বাঙ্গালার ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) রচনা করি। আর একখানি বই লিখিলাম ; তাহার নাম দিলাম—‘জ্যামিতিক অঙ্কশীলনী’ (Geometrical Problems) ; ভূগোল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি নাই।

“শিক্ষাবিভাগে ভূদেববাবুর উন্নতির কথা আলোচনা করিতে গেলে, একটি বহুত উদ্ভাটিত করিতে হইবে। আমি ছাড়া আর কেহ সে ব্যাপারটি অবগত আছেন কি না, জানি না। মেড'লিকট যখন ইন্স্পেক্টর, ভূদেববাবু তখন তাহার অ্যাসিস্ট্যান্ট। কয়েকজন সিভিলিয়ন ‘Indian Empire’ নামে, একখানি কাগজ বাহির করিতেন। সেক্রেটারি অ্যাশলি ইডন্ ও ইন্স্পেক্টর মেড'লিকট তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন ; ভূদেব বাবুও লিখিতেন। এই স্মৃতি ইডনের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের আরম্ভ। ক্রমশঃ তিনি ইডনের কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন—‘এ দেশে সিভিলিয়নের সাহায্য ব্যতীত উন্নতি করা অসম্ভব।’ একদিন তিনি ইডন্ সাহেবকে বলিলেন—‘মেড'লিকট আমার patron ছিলেন ; সিভিলিয়নের সাহায্য না পাইলে এ দেশে উন্নতি হয় না ; আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ,—আপনাকে আমার patron হইতে হইবে।’ অগত্যা সাহেব স্বীকৃত হইলেন। কিছু দিন পরে ইডন্ চিফ কমিশনের হইয়া বর্ধার চলিয়া গেলেন। তরু অর্ধ ক্যাম্পবেল ভূদেববাবুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাইরেটের আটকিসনকে লিখিলেন—‘যদি তুমি সত্যক না হও, তোমার শিক্ষাবিভাগের সর্বনাশ হইবে।’ ভূদেববাবু কোনও রকমে দুটি লইয়া বর্ধার সিয়া ইডনের শরণাপন্ন হইলেন।

সাহেব বলিলেন—‘এখন ত আমি কিছু করিতে পারি না ; কোনও রকম করিয়া মিন কড়ক কাটাইয়া দাও ।’ তখন অ্যাশলি ইউন বাজার ছোটলাট হইলে শিক-বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে একটা পদ পালি হইল । ডাইরেক্টরের মনোনীত লোক একজন ছিল ; কিন্তু ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভূমি কোথায় ?’ (Where is that old man, Bhudev ? ) ভূমিবাবুর বেড় হাজার টাকা বেতন হইল ।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২২

আজ প্রাতে স্বনামধন্য নটরাজ শ্রীযুক্ত অন্নতলাল বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্বত্বকথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন—“আপনার ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার নিকটে কলিকাতায় থিয়েটারের বনিয়াদ পত্তনের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার অনেক কথা মনে হইয়াছিল। একটা কথা ধরুন। ‘কুলীনকুলসর্ব্বস্ব’ নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জনসাধারণে পরিচিত। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটকখানি পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রচনা করিয়া দেন। এ বিষয়ের ভাল করিয়া অন্বেষণ হওয়া উচিত। বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া আমারও সন্দেহ হয় যে বোধ হয় উহা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নহে। প্রথমতঃ দেখিবেন—বক্তৃতার ভাষাটা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্ত্যন্ত নাটকের ভাষা এতটা সংস্কৃত যে” না নহে। আবার দেখুন, তাঁহার অন্ত কোনও নাটকে

যিয়ে ভাঙ্গা তপ্ত লুচি

দু চারি আদার কুচি<sup>১</sup>

এই ধরণের কবিতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি ও রকম কবিতা রচনা করিয়া সিদ্ধহস্ত, তিনি যে একেবারেই আর ওপথ ঘাড়ালেন না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। বিশেষতঃ তখনকার দিনে ও-ধরণের কবিতা অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। আমি জানি, ভাল ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ রকম সহজ সরল কবিতা রচনা করিয়া আনন্দবোধ করিতেন, মশের কাছে সমাদরও পাইতেন; বটতলার ছাপাখানায় সেই সকল কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইত। ইদানীং অনেক জায়গায় আমি সেই সকল বইয়ের সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আর সেগুলি পাই না। আর একটা কথা,—‘কুলীনকুলসর্ব্বস্ব’ নাটকে পট-পরিবর্তন নেই; পণ্ডিত মহাশয়ের অন্ত্যন্ত নাটকে কিন্তু ইংরাজী নাটকের পদ্ধতি অল্পসারে গর্তাঙ্কাদি বিভাগ আছে। তাই বলিতেছিলাম যে উক্ত নাটকের রচয়িতা বাস্তবিক পণ্ডিত মহাশয় কি না, সে বিষয়ে আপনারা একটু অন্বেষণ করিয়া দেখিলে ভাল হয়।”

আমি বলিলাম—“মহেন্দ্রবাবু যেখানে শেষ করিয়াছেন; আপনারা সেইখানে আরম্ভ করিয়াছেন; আর্চডুশেখরের সঙ্গে ঋহারা পাবলিক থিয়েটার প্রথম দাঁড় করাইলেন, আপনি তাঁহাদের অন্ততম। আপনি যদি আমাদের বাঙ্গালী টেজের পত চুন্নামি বৎসরের ইতিহাস আত্মপুর্নিক বর্ণনা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর থিয়েটার পুরের ইতিহাসটা বোধ হয় এক রকম দাঁড় করান যাইতে পারে। আপনার জীবদ্দশায় যদি সেই ইতিহাসের হালনকলা সন্নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটা বড়



সাহিত্যিক ক্ষতি হইবে। এতাবৎ যে সকল বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাঙ্গিরে মধ্যে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আপনাকে জজের আসন গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আপনি নিজের বক্তব্য বলিয়া যাউন; বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকা বিচার করিবেন। আগে আপনি আপনার বালা জীবনের কথা কিছু বলুন।”

মুখ হইতে গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া বহু মহাশয় বলিলেন—“বঙ্গাব্দ ১২৬০এর ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম কৈলাশচন্দ্র বহু। আমাদের আদি বাসস্থান কলিকাতা নহে; আমরা ধলুচিতার বহু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমার প্রপিতামহ ধলুচিতা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীর সম্মুখে আমাদের কলিকাতার পুরাতন বাটী ছিল; তখন গ্রে-স্ট্রীট রাস্তা ছিল না।

“ওরিয়েন্টল সেমিনরিতে আমার পিতাঠাকুর বিদ্যালভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সতীর্থ বন্ধু শঙ্কুনাথ পণ্ডিত পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান কলেজ যেমন বিভাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীৰ্ত্তি, ওরিয়েন্টল সেমিনরি তেমন গৌরমোহন আচ্য মহাশয়ের অক্ষয় কীৰ্ত্তি। শিক্ষাপ্রচার করিতে গিয়া যদি কোনও বাঙ্গালীর martyrdom হইয়া থাকে, তাহা গৌরমোহন আচ্যের। নিম্নতম শ্রেণীতে ইংরাজি ভাষা শিখাইবার জন্ত তিনি ফিরিজি শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। আমার মনে আছে একজন শিক্ষকের নাম ছিল শ্বিথ, আর একজনের নাম ছিল ব্যালিস্। মাঝের শ্রেণী-গুণিতে ভাল ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। উপরের দিকে খাটি ইংরাজ ও ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হইত। এক হিসাবে ওরিয়েন্টল সেমিনরি হিন্দু কলেজের বিপরীত দিকে চলিয়াছিল। হিন্দু কলেজ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার গৌরব করিত; ওরিয়েন্টল সেমিনরি সামাজিক সংরক্ষণ-নীতির প্রশ্রয় দিয়া প্রাচ্য আদর্শকে ভিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসিয়াছিল। বাছাই করিয়া ভাল ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্ত গৌরমোহন শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন; নৌকাযোগে কলিকাতার প্রাত্যাবর্জন করিবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহায্য না লইয়া যে বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তান উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে বাঙ্গালীর ছেলেকে সংযত প্রাচ্য আদর্শে দীক্ষিত করিয়া উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েন্টল সেমিনরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া? তাহার উন্নতির জন্ত একান্তভাবে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যুকে martyrdom বলিব না ত কি বলিব? অথচ এই করণ ব্যাপারটির বিষয় করজ্ঞান কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী অবগত আছেন? ওরিয়েন্টল সেমিনরির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কত গভীর তাহা আপনি শুনিতে বিস্মিত হইবেন। আমি ভূরিষ্ট হইবার পরে আতুড় ঘরে পিতা আমার মুখ দেখিলেন কি দিয়া জানেন! ওরিয়েন্টল সেমিনরিতে পঠক্শার তিনি যে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেই সোণার মেডেলটি

সেই সন্তোষাত শিশুটির চোখের সামনে কণ্ঠকের জন্তু ধরিয়া তাহার কচি মূঠা ভিতরে অতি ধীরে তাহা বক্ষা করিলেন। মহাশয়, আজ আমার মাথায় একগাছি চুলও কালো নাই; প্রকৃতি দেবীর শুভ্র আশীর্ব্বাদ আমার শিরে অজস্র বসিত হইয়াছে; এ জীবনে অনেক পুরস্কার দুই মূঠা ভরিয়া অর্জন করিয়াছি; কিন্তু এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সেই প্রথম পরিচয়ের নিম্নীখে আমার পিতৃদেবের সেই যে আশীর্ব্বাদ হিরণ্যমণ্ডিত হইয়া আমার অঙ্গ চুষন করিয়াছিল, তাহার সহিত বাবার ওরিয়েন্টল সেমিনারিতে পঠদশার একটি আনন্দস্মৃতি বিজড়িত হইয়া এই অতিক্রম ব্যাপারটিকে আমার নিকটে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশের নিকট হইতে অনেক পুরস্কার দুই মূঠা ভরিয়া অর্জন করিয়া আবার অকাতরে বর্জন করিয়াছি; দেশের আশীর্ব্বাদ নতরস্বকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু সেই যৌবন-প্র্যোচনের বিজয়োল্লাসের মধ্যে বোধ হয় কি এক অভিশাপ ছিল, একটা অহমিকা ছিল, একটা মত্ততা ছিল, তাই ভোগের দিন ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। আজ বার্ককোর সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহর গণিতেছি আর ভাবিতেছি—ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়, অর্জনের চেয়ে বর্জন পুণ্যতর। অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমার সমস্ত অর্জিত পুরস্কারকে, অজস্রবসিত আশীর্ব্বাদধারাকে, কর্ম্মীর বিজয়োল্লাসকে ছাপাইয়া সেই স্ববর্ণপদক আজ আমার জীবনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

“আরও শুনিবেন? মাতৃসন্তানের সঙ্গে যে গাভীর দুগ্ধ পান করিতাম, তাহা ওরিয়েন্টল সেমিনারির পয়সা হইতে ক্রয় করা হইত। বাবা ওরিয়েন্টল সেমিনারিতে শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি হেড্‌মাস্টার হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম করিতে পারি,—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), চন্দ্রনাথ বসু, সুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল যে বাবার ছাত্র ছিলেন, তাহা আমি ঘটনাচক্রে একদিন তাহারই মুখে শুনিলাম। তখন মল্লহার রাও গাইকবাড ও কর্ণেল ফেন্নার ঘটিত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা করনা হইতেছিল; রেলিভেট্‌ সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল : এই অপরাধে গাইকবাড অভিযুক্ত।<sup>১</sup> কৃষ্ণদাস পাল ‘হিন্দু পেট্রিট’ পত্রিকায় লিখিলেন—‘আমরা একশত গাইকবাডকে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নরঞ্জনকে হারাইতে প্রস্তুত নহি।’—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ‘হীরকচূর্ণ’ নামে একখানি নাটক লিখিলাম; চুইমি করিয়া কিছু হাসি ঠাট্টা করিলাম। নাট্যসাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা। অজুর্ দন্তের বাড়ীর দেববাবু আমাকে একদিন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নিকটে লইয়া যান; তাঁহার সাহায্য আমার তখন অত্যন্ত আবশ্যক। আদ্য নাম শুনিয়া তাঁহার একটি বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—‘ওঃ ইনিই আপনাকে থিয়েটারের টেজে বিক্রম করিয়াছেন।’ তাকিয়ায় ঈষৎ হেলান দিয়া কৃষ্ণদাস পাল আমার বলিলেন—‘আপনার নাম অন্নভলাল বোস? বাড়ী কোথায়?’

আমি বিনীত ভাবে উত্তর দিলাম—‘কম্বুলিয়াটোলার’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কম্বুলিয়াটোলার বোস ? কৈলাসচন্দ্র বোস আপনার কেউ হবেন ?’ আমি বলিলাম—‘আমি তাঁহারই পুত্র ।’...‘তুমি তাঁর ছেলে ?’ এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন—‘তুমি তাঁর ছেলে ? আমিও যে তাঁর ছেলের মত, আমি যে তাঁর ছাত্র ! তুমি ত আমার গুরু-ভাই হলে !’ এই বলিয়া তিনি স্নেহে আমাকে কাছে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; যে কাজের জন্য আমি তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহা এমনভাবে স্থলস্থাপন করাইয়া দিলেন যে তেমন কিছুতেই আশা করিতে পারি নাই ।

“খুব ছেলেবেলায় মনে পড়ে, বাবা সেক্ষণীয়র আবৃত্তি করিতেন ; আমি একবর্ণও বৃথিতাম না, কিন্তু মৃদু হইয়া তাঁহার সেই আবৃত্তি শুনিতাম । অনেকে তাঁহার আবৃত্তি শুনিতে আসিতেন ; ভবানীচরণ দত্ত রোজ আসিতেন । কবিতা আবৃত্তির দিকে এখনও আমার একটা প্রবল ঝোঁক আছে । অল্পবয়সে অল্পকূল অবস্থার মধ্যে পণ্ডিত হওয়ার দরুণ এই প্রবৃত্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, কে জানে ? ইংরাজি বা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস বাবার ছিল কি না আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে অনেক সময়ে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন ; ‘ভাস্কর’ ও ‘রসরাজ’ অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে আসিত । মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে বাবা ওরিয়েন্টল্ সেমিনারির শিক্ষকের পদত্যাগ করিয়া ম্যাকেঞ্জি লায়াল্ কোম্পানীর এজেন্সি করিয়া কিছু বেশী পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন । তখনও তাঁহার পড়াশুনার অভ্যাস খুব ছিল । দ্বিপ্রহরে আপিসের কাজ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি প্রত্যহ মেট্রিকার্ফ হলে গিয়া পড়িতে বসিতেন । আমাদের পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য তিনি পূর্বেই একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন । এই স্কুল হইতে ছেলেরা প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ১৮৬৪ সালে । এখানে যেমন সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, সংস্কৃত কলেজ বাতীত অন্য কোথাও আর সে রকম ছিল না । প্রথম শ্রেণীতে রঘুংশ কুমারসত্ত্ব পড়া শেষ হইয়া যাইত । ইদানীং সর্বজনবিদিত অজিত স্মারক মহাশয় তখন এই বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসে পড়াইতেন । আপনারাও রিপন কলেজের ছুতপূর্ব পণ্ডিত রামলক্শ্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা রামমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এখানে আমি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িয়াছি । শ্রীযুক্ত নীলাধর মুখোপাধ্যায়ের পিতা এখানে অনেকদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে আমাদের পাড়ার বিশ্বস্তর বৈদ্য মহাশয় যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন । ওরিয়েন্টল্ সেমিনারির কয়েক জন ভাল ভাল শিক্ষককে লগ্গায়ে ছ’ এক ঘণ্টা করিয়া এখানে আনাইয়া এখানকার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; আমার মনে আছে সেমিনারির শিক্ষক থালো সাহেব আমাদের গণিতকে মাঝে মাঝে অঙ্ক কসাইতেন । ইন্সপেক্টর প্রধান শিক্ষক ছিলেন—হেনরি হাইড্ । তিনি প্রত্যহ বয়স্ক হইতে জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া ইন্সপেক্টর আসিতেন । তাঁহার মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা মাত্র ।

“ওরিয়েন্টল্ সেমিনারি হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ

হই ; আমার পরীক্ষা দিবার কথা ১৮৬৬ সালে, কিন্তু তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র ; হতভাগ্য ছই বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে আমি পরীক্ষা দিতে পাইলাম । আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ; ইতিহাস পড়াইতেন চন্দ্রনাথ বসু ; অঙ্ক কলাইতেন বেণীমাধব দে ; ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতেন ফ্রেড্রিক পেনি । দুইটি পণ্ডিত ছিলেন খাটি সেকেলে টুলো পণ্ডিত—একজনের নাম গণেশ, অপরটির নাম সরস্বতী । সরস্বতী পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বাড়ীতে বলিয়া এক খোরা ফলারের সঙ্গে একশত আম অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিতেন । কিন্তু ছেলেরা তাহাদের নামে তখন ছড়া তৈয়ার করে নাই । কিছু পূর্বে হিন্দুজুলের ছেলেরা তাহাদের শিক্ষকদের নামে যে ছড়া করিয়া ছিল তাহা আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল—

গুড্ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং,

তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং

ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা,

তার নীচে গুপে কানা—“ইত্যাদি ।

“এটান্না পরীক্ষা দিবার পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল । তখন যত বাকাল্য বই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই আমি পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম । মদনমোহন, তারাপ্রসন্ন, বিজ্ঞানাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল সব ছেলেই পড়িত । বটতলার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দেব পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল । তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক এক খানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম । নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল । লাল-বিহারী একদিন দোকান হইতে আমাকে একখানি নাটক পাঠাইয়া দিল,—তাহার নাম ‘আইন সংযুক্ত কাহিনী নাটক’ । ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে । Preparatory class-এর মার্শমান পাঠ করিয়া কখন যে ওখানা পড়িতে পাইব, তাহার জন্ত অস্থির হইয়া রহিলাম । পড়িয়া দেখিলাম,—কথোপকথনচ্ছলে সমস্ত পিনাল কোড খানা নাটকে পরিণত করিবার চেষ্টা ! বুঝিতে পারিলাম ভাক্তার যত্নগোপালের ‘ধাত্মশিক্ষা’র ধরণটুকু অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে লেখকের এই বিষয় বিড়ম্বনা । Dialogue-এ কিছু লেখা হইলেই তাহা নাটক হইল, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া উকিল প্রহরকার এই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন । এক এক খানি নাটক খুব উৎসাহিয়া যাইত । ‘ফলসারে নাটক’ নামক একখানি গ্রন্থ লন পাইয়াছিলাম ; রচনাটি অতি সুন্দর । আর কিছু কোথাও সে বই দেখিতে পাই না । বিবাহের দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয় ; লালবিহারীর দোকান হইতে নাটক চাহিয়া পাঠালাম । দীনবন্ধু মিত্রের ‘লীলাবতী’ সেই প্রথম আমার হাতে পড়িল । তখনকার দিনে দীনবন্ধুর নাটকের জন্য আমার লব্ধে উৎসাহ বহু হইয়া থাকিতাম ; বহিষের পুস্তকের জন্য তখনও স্নান-সাধারণের স্বেচ্ছায় উৎসাহ হইত না । যখন বঙ্গদর্শনে ‘বিষয়ক’ ধার্মবাহিক প্রকাশিত হইত লক্ষ্মীলাল তখন হইতে বহিষ লব্ধের জন্য ছুড়িয়া বসিলেন ; তাহার পূর্বে লব্ধে শোঁজ করিত

—দীনবন্ধুর কোনও নৃতন নাটক বাহির হইল কি না। বিবাহের দিন ‘লীলাবতী’ আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,—‘তাই ত, পত্নীটি আমার কি রকম হবেন ! সারদাসুন্দরীর মত হলেই ভাল হয় ; আমার ত বৌক লীলাবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদাসুন্দরীর মত হবে। যদি না হয়। লীলাবতীও মন্দ নয়, কিছু……।’ বিবাহ হইয়া গেল। দেখিলাম আমার পত্নীটি সারদাসুন্দরীও নন, লীলাবতীও নন, …একটি চেলির পুটুলি। (Chronicler মহাশয় এইখানে একটু সাবধান না হইলে আমার বিপদের সম্ভাবনা। আমি একথাগুলি কিছু ভয়ে ভয়ে বলি।)

“পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি ডাক্তারির ভাণ করিয়া খেলা করিতাম ; কলাগাছ কাটিয়া amputation-এর সখ মিটাইতাম ; বেলের আটা পচিয়া পোকা হইলে জৈবিক বসান’র অভিনয় করিতাম ; বেলের আটা সেবন করাইয়া বাস্তবিকই কোনও কোনও রোগীকে আরাম করিতাম। আবার মুনিসিপ্যালিটির রাস্তার পরিদর্শক সাহেব লাঞ্ছিত হাট পরিতাম। ওরিয়েন্টল সেমিনারিতে পড়িবার সময়েই ব্লাওফোর্ড সাহেবের রসায়ন সঞ্চকে বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। মেডিক্যাল কলেজে আমার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, তান্ত্রিকী চরণ বসু, ৬মহেশ্বরনাথ বোষ ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ম্যাক্‌নামারা সাহেব যখন রসায়ন পড়াইতেন, স্থল ইন্সপেক্টর এইচ. উড্রো মধ্যে মধ্যে সেই বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন ; ঘটনাচক্রে প্রায়ই তিনি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে পড়িত আমাদের গ্রামবাজারের ইস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—‘ছেটা মোমাছি কেটা পা ( ছটা মোমাছির কটা পা ) ?’ তাঁহার নাম H. Woodrow ছিল ; ছেলেরা বলিত—‘উড্রো’। তিনি লম্বা স্তর করিয়া বলিতেন,—‘আমি উড্রো নই, এইচ. উড্রো’ ;—শেষ ওকারের স্তরটা অনেকদূর-টানিয়া লইতেন।

“মোটের উপর দুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম। মধ্যে মধ্যে কাশীতে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া থাকিতাম ; তিনি আমাকে তাঁহার নিজের ছেলের মত স্নেহ করিতেন। তখন তাঁহার নিজের সম্ভান হয় নাই। শেষে একেবারে অ্যালোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চর্চা করিবার জন্য কাশীতে লোকনাথ বাবুর বাটীতে রহিলাম। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাল্যকাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এগার বৎসর বয়সের সময় আমাদের বাটার সল্লিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া হাওয়ার আমার একটি হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল। লোকনাথবাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলেন যে হাড় fracture হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অহুসতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিণিকে লইয়া আসেন। আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতার হোমিওপ্যাথির প্রথম Surgical case হয়। যেদিন প্রথম বন্ধন মোচন করিয়া একটা

পাংলা bandage বাঁধিয়া দেওয়া হইল, সেদিন সেই ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার জন্য, বিভ্রাস্তগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন। একটা হাসির কথা আমার মনে আছে। খোঁজ হইতেছিল, পাংলা paste board কোথায় পাওয়া যায়। একজন বলিলেন, ‘সেক্সপীয়রের মলাট ছিঁড়িয়া লইলে হয় না?’ ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—‘Or the cover of the Bible may do!’ খুঁজির মধ্যে বেরিনি সাহেবের শ্রদ্ধা ছিল না। তখন জানিতাম না যে, যে ডাক্তার হাত হোমিওপ্যাথিক Surgery-তে জোড়া লাগিল, সেই হাত ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথির সেবার নিযুক্ত হইবে। লোকনাথবাবু জজ ব্যাক্স আয়রনলাইডের জীকে বিষয় আমাশয় রোগ হইতে মুক্ত করিয়া কালীতে হোমিওপ্যাথিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিয়াছিলেন। জজ সাহেব নিজে হোমিওপ্যাথ হইলেন। লোকনাথবাবু তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া লংসারী হইলেন। তাঁহার একটি ছেলে সুরেন্দ্র সম্রাতি বিলাত হইতে ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছে; আর একটি ছেলে দ্বিজেন্দ্র মেও হাঁসপাতালের Resident Surgeon। ডাক্তার লোকনাথবাবুর সাক্ষী জী কচি ছেলেগুলিকে লইয়া বিধবা হইলেন; কত কষ্টে যে তাহাদিগকে মাহুয করিলেন, তাহা ভগবান জানেন। আমার জীবনপ্রবাহ বক্রগতিতে এতাবৎ চলিয়া আসিয়াছে; যে ক্ষুদ্র লক্ষীর্ণ ধারাটি বার্মাণসী তীর্থে লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের চরণতল ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার সার্থকতায় আমার জীবন ধন্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন পরে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম—

‘কোথা তাত লোকনাথ দেবপদে প্রণিপাত,  
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে।  
কত স্নেহ ভালবাসা, কত স্মৃতি কত আশা  
পেয়েছি পারের পাশে কিশোর জীবনে।

\* \* \*

এমনি নিদ্রাঘ নিশি, ছাড়েতে লকলে মিশি  
পাশাপাশি পালকেতে করি আগরণ।  
কত গল্প বহুতর, মিথ্যা দম্ব মনোহর,  
গ্রহগতি হেরি, করি তারকাগণন।  
তোমার ইঙ্গিতে রাতে, সেই পাচিকার সাথে,  
রন্ধন বলিয়া মন্দ কলহরোপণ।  
পিসীবারে মনসাধে, কৃপণতা অপবাদে  
কাঁদারে, সেখেছি পরে ধরিয়ে চরণ।

\* \* \*

ইংরাজ জজের আরা, ছাড়িতে ছাড়িতে কারা,  
জব চিকিৎসার পায় প্রাণ পুনরার।

• পুরস্কার দিতে এর,                      আরবণ্-সাইডের,  
    কোমল কৃতজ্ঞ মন পুলকেতে চায় ।  
 মহাপ্রাণ লোকনাথ,                      নিজে না পাতিয়া হাত  
    দীন দুঃখী তরে চার চিকিৎসা-আলয় ।  
 হানিমান্ জয় জয়,                      ভারতে কানীতে হয়,  
    হোমোপ্যাথি হস্পিটাল্ প্রথমে উদয় ।

“কানীতে অবস্থানকালে ডিউক্ অভ্ এডিনবরাহ দর্শনলাভ আমার ভাগে ঘটিয়াছিল। তখনও আমি কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করি নাই। একটি বিশালকার হস্তীগুষ্ঠে লর্ড মেরো ও ডিউক্ অভ্ এডিনবরা পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। সেই শালপ্রান্ত মহাভূজ লর্ড মেরোর করণ পরিণাম স্মরণ করিলে এখনও মনে বেদনা বোধ করি।”

“বিজ্ঞানাগর তাঁহার পিতৃদেবকে কানীতে রাখিতে গিয়াছিলেন। লোকনাথ-বাবুর বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ই লোকনাথবাবুকে হোমিও-প্যাথি শিখিতে বলেন। লোকনাথবাবু যথাসাধ্য তাঁহার লব্ধনা করিলেন। তখন গজার উপরে সেতু নির্মিত হয় নাই। ভোর রাতে নৌকাযোগে নদী পাশ করিয়া বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে রাজঘাট ঠেশনে পৌছাইয়া দিতে হইবে। সে কার্যের ভার আমারই উপর পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না; যদি ভোর রাতে জাগ্রিতে না পারি? স্থির করিলাম,—ঘুমাইব না; সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইচ্ছিতে বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে ধরিয়া বলিলাম—‘গল্প বলিতে হইবে।’ তিনি বলিলেন,—‘গল্প শুন্বি? কি রকম গল্প বলব,—দু মিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত?’ ছোট বড় বিচিত্র রূপকথার বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন—‘ওরে চুড়ী কিন্তে হবে।’ এত রাতে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন—‘পেতেই হবে; কানীতে এসে চুড়ী না নিয়ে কিরে যাব কি করে?’ সেই রাত্রিতে চুড়ী কিনিয়া আনা হইল। বিজ্ঞানাগর মহাশয় আবার গল্প বলিতে লাগিলেন। শেষ রাতে তাঁহাকে রেল ঠেশনে পৌছাইয়া দিলাম; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।

“কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিত এই সময়ে কানীতে আমার প্রথম আলাপ হয়। নবীন তখনও কোনও বই লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া বন্ধুবান্ধবকে শুনাইত। লোকনাথবাবু জানিতেন,—নবীন একজন ভাল কবি। তখন কানীতে ‘বুদ্ধরামঙ্গল’-এর খুব ধুম; হোলির পরে বঙ্গলবারে হইত। নদীর উপরে মাচ, গান, যাত্রা; কানী-নগরের সহিত বিজিয়ারা-গ্রামের রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। লোকনাথবাবু বলিলেন,—‘নবীন বুদ্ধরামঙ্গল

১ আশ্বিনান পরিবর্তনে সেলে লর্ড মেরো ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী এক জাহাজে কর্তৃক হস্তাক্রান্ত হইয়া দ্বিত হন।—সং

দেখতে যাচ্চ, পক্ষে বর্ণনা করতে হবে।' কালী, কলম, কাগজ, ও একটি বোতল মদ লইয়া নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম। বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে নবীনকে বলিলাম,—‘লিখবে ত লেখ, নইলে মদ দোব না।' নবীন এক নিঃশ্বাসে বুড়ুয়ামঙ্গল লিখিয়া ফেলিল।...অনেক দিন পরে নবীন যখন Personal Assistant to the Commissioner of Chittagong ( কমিশনার ছিলেন ছান্নি সাহেব ) আমি তাহার একটি পত্রের উত্তরে কালীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম—

‘কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ।  
কালীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ।  
বুড়ুয়ামঙ্গল মেলা মহা ধুমধাম !  
বসন্ত-বাহারে মাজে বারাণসী ধাম।  
জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান।  
তুলে তুলে চলে অনেক শত জলঘান।  
তারে দীপ, নারে দীপ, দীপ তরী 'পরে।  
লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে।  
তরঙ্গী তরঙ্গী রূপে উজ্জল বিমল।  
যামিনী কামিনী দীপে আমোদে বিহ্বল।  
নাচে রজ্জা মেনকার অলঙ্কার সকল।  
তরঙ্গে উছলে জলে লাগিয়া তরল।  
কি স্বর-গহর তোলে ভাসিয়ে গগন।  
অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন।  
আমি ধরে' বলিলাম তোমারে নৌকায়।  
হইবে বর্ণিতে মেলা কম কবিতায়।  
নন্দনে রচিলে বসি মকরকেতন।  
হ'ত কি না হ'ত গীত তোমার মতন।’

“নবীনচন্দ্র বেশী দিন কালীতে থাকিতে পারিলেন না, কর্তৃস্থানে ফিরিয়া গেলেন। বাগ'বাজারের অভয়চন্দ্র মল্লিক কালীতে আমাদের বাড়ীতে উঠিলেন। ইট ইড়িয়া রেল কোম্পানির কর্তৃ লাইন তখন খোলা হইয়াছে ; তিনি সেই রেলের জন্ত আমি আগাগোড়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি Land Acquisition Deputy Collector ছিলেন। লোকনাথবাবু সঙ্গে তাঁহার শত্ৰু-জামাই সম্পর্ক পাতান ছিল। লোকনাথবাবুকে বরাবর জামাই বঞ্জীয় তত্ত্ব করিতেন। কালীতে আমার প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কিছুকাল পরে কলিকাতার তিনি আমার সন্ধান পাইয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়া আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ভেগুটি করিয়া বিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অদুর্ভাগ্যবশত হাকিম না থাকিলে মল্লিক মহাশয় কি করিতে



পারেন ? গভ্বর্মেন্টের কাছে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী ; তিনি কৰ্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ইষ্ট-ইন্ডিয়া রেল কোম্পানির বড় সাহেবেরা জন্মি সংক্রান্ত গোলমাল উঠিলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিত। আমি কিন্তু তখন ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে নতুন থিয়েটারে আখড়াই দিতে যাইতাম। ভুবন নিয়োগীর বাড়ী যাইতে হইলে অভয়বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া গেলেই শীঘ্রই যাওয়া যায় ; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়া ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়া লুকাইয়া থিয়েটার করিতে যাইতাম।...অভয়বাবুর পৌত্র ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এখন লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

“এই সময়ে সর্বত্রই ডেবুজের আবির্ভাব হইল। কাশীতে আমাদের বাসায় চাকর বামুন সকলেই জর পড়িল। কোনও রকম করিয়া একটু জলসাবু তৈয়ার করিয়া রোগীদের পথ্য ও আমার নিজের আহার সারিয়া লইতে হইত। ১৮৭২ সালের গোড়ায় লোকনাথবাবুর চিঠি লইয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া ঝাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে গেলাম। বলদেব পালিত মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। ঝাঁকিপুরেও তখন অনেকে ডেবুজের পীড়িত ; উকিল গুরুপ্রসাদ সেনকে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। দুইমাসে আমার চারটি টাকা রোজগার হইল। ডাক্তার বসন্ত দস্ত আমার মুকুর্ষি হইলেন। বলদেববাবুর বাসায় কিছুদিন অবস্থানের পর একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসন্তবাবুর সঙ্গে আমি থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া কার্ঘ্যে ত্রুটি করিয়া দিলেন ; যাহাতে আমার উন্নতি হয় কাম্মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে আসিয়া ঝাঁকিপুরে ছয় সাত দিন আমাদের বাসায় ছিলেন। সহর খুব সরগরম হইয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড সভায় কেশববাবু বক্তৃতা করিলেন। আমি বক্তার কাছে বসিয়া সমস্তটা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কলেজের একজন ইংরাজ অধ্যাপক সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক বাগ্মীর বক্তৃতায় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি ; কেশববাবুর বক্তৃতা *grand, divine, inspired*।—আর কাহারও সন্মুখে আমি এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নই। পহেলা জাহ্নয়ারিতে তিনি যখন কলিকাতা টাউন হলে প্রতি বৎসর বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, দেশী বিদেশী সকল প্রোভাই কিম্বরে ও পুলকে অভিভূত হইত ; বক্তৃতায় মধ্যে তিনি যখন দক্ষিণ হস্তের তর্জনি হেলাইয়া *There, my God* বলিয়া উঠিলেন, তখন সেই তর্জনী সন্মুখের আমাের মুখ কিরাইতে হইত ; সহসা মনে হইত যেন এখানে তাকালেই ঈশ্বরকে আমরাও দেখিতে পাইব। দেখুন, পরমহংস ঠাকুর একদিন একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা তুমি যে হিন্দুধর্ম সন্মুখে বক্তৃতা দিবে বেড়াও, তোমার চাপ্‌রাস্ আছে ?” ব্রাহ্মণ বলিলেন—“ঠাকুর, চাপ্‌রাস্ বুঝতে পারলুম না ; চাপ্‌রাস্ কি ? আমার চাপ্‌রাস্ নেই ?” “তা’ হ’লে তোমার কথা মানবে কেন ? দেখ, একটা গাঁয়ে একটা পুকুর ছিল ; গাঁয়ের সকলেই সেই পুকুরের জল খেতো ; কিন্তু সেই পুকুরের পাড়টা ছুই লোকেরা মরলা করত, কারণ বায়ণ জনত না। একদিন গাঁয়ের সকলে

মিলে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করলে। কিছুদিন পরে একটা চাপ্‌রাস-পর্য্য লোক এসে পুকুরের পাড়ের ওপর একটা গাছে হাকিমের আদেশ লঠকে দিয়ে গেল। তার পরে আর কেউ পুকুরের পাড় ময়লা করে নি। তার চাপ্‌রাস ছিল, তাই তার কথা মানলে। তোমার চাপ্‌রাস না থাকলে তোমার কথা লোকে মানবে কেন?’ আমার মনে হয় কেশব সেনের চাপ্‌রাস ছিল।

“কেশববাবু তখনকার যুবকদিগের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অনেক ছোকরা চস্মা পরিতে আরম্ভ করিল। কেশববাবু চস্মা নাকে দিয়া ঘুমাইতেন। একদিন আমি তাঁকে বলিলাম—‘চস্মা চোখে না থাকলে স্বপ্নও দেখতে পান না?’ তিনি হাসিয়া উঠিলেন। একদিন বলন্তবাবু ও কেশববাবু বাসা হইতে বাহির হইয়া ঘাইবার কিছু পরে আমি বলদেববাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। ঘাইবার সময় চাকরকে বলিয়া গেলাম আজ আর বাসায় ফিরিব না। সন্ধ্যার পর তাঁরা দুজনে আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কেশববাবু বলিলেন, ‘আজ ফুজি করে এত খাবার কিনে এনে চাকরের কাছে শুনি যে তুমি আজ আর বাসায় ফিরবে না। আমরা ভাবলুম তাও কি হয়? এ খাবার খাবে কে?’—এখন ত যখনই আমার মনে হয় যে আমাকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

“বলদেববাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দে তিনি সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন একটি শ্লোক আমার মনে পড়িতেছে,—

‘সমাচ্ছন্নাকাশে জ্যোত্স্নালে।

জলে স্বর্ণলেখা তড়িগ্নালাভালে ॥

হৃদে ভেমতি শ্রীমতী রাধিকার

প্রিয়প্রাপনাশা হবে অঙ্ককার।’

“এই ছন্দে তিনি ভর্তৃহরির রচনা করিয়া ফেলিলেন। তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সঙ্গলাভ আমার বেশী দিন ঘটিল না।

“১৮৭২ সালের শেষার্শ্বে ঝাঁকিপুুর পরিত্যাগ করিলাম।

“এইবার আমার খিয়েটর জীবনের কথা আসিয়া পড়িবে। কালীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংশ্রবে আসিয়াছিলাম, উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁহাদের অন্ততম। নানা কারণে তিনি তখন তাঁহার পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোণ দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় আসিলেন। আজ তাঁহার নামটুকু উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আবার আপনি তাঁহার দেখা পাইবেন। আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি,—রাজচন্দ্র সান্যাল। তিনি তখন ফুইন্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান্। গ্রিকিপ্যাল গ্রিকিংস্ সাহেবের স্বরচিত বেণুবনের কুণ্ডলীধিকার লঙ্ঘ্যার একাকী তাঁহার পাঠচারণা আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যাইয়াছে। প্রত্যহ সেই বেণুকুণ্ডলের মধ্যে উপবেশন করিয়া গ্রিকিংস সাহেব রামায়ণ

ইংরাজি পক্ষে অস্থবায় করিডেন। রাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরি হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। ইংরাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ প্রত্যাশূর্ণ হৃদয়ে লাল্লাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তৎকাল লাল্লাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী। আজ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় লইলাম।”

## সাত

২২শে ফাল্গুন, ১৩২২

আজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—“গোড়াতেই আপনাকে আমার ছেলেবেলাকার আরও ছ’একটা কথা বলিয়া লই। এখন পর্য্যন্ত আমি এমন কিছু বলি নাই যাহাতে আপনি আমার বাঙ্গালা রচনার—বিশেষতঃ Parody রচনার—গোড়ার হুজুরিতে পাবেন। আজ প্রথমেই সেই কথা আপনাকে বলিব।

“আমার একজন খুব দূর সম্পর্কার কাকা ছিলেন; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু। তাঁহার চুই খুড়া খুটান হইয়া যান;—একজনের কস্তায় বিধুমুখী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু, যশ অর্জন করিয়াছেন; তাঁহার বংশের আর একজন কেশববাবুর সমাজের ব্রাহ্ম হইলেন। প্যারীকাকার সতীর্থ হুজুর ছিলেন নবকৃষ্ণ ঘোষ; নবকৃষ্ণবাবু জ্যোতিষশাস্ত্র বোধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ‘রামশর্মা’ নামে সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তখনকার খুটান পাঠ্যরীতি ছিলে বিছালাত করিয়া তাঁহার পঠদশায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন। একটু বেশী বয়সে প্যারীকাকা বেঙ্গল থিয়েটারের তখনকার নামজাদা নট ‘স্বাদাদু’ গিরীশ ঘোষের সঙ্গীকে বিবাহ করেন। আমার পিতার মৃত্যুব অন্তকাল পরেই তাঁহার স্বত্বা হয়।

“তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাঙ্গালা বই পড়িয়া শুনাইতাম; ‘ভাস্কর’ কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাঙ্গালা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। তিনি স্নেহ-রচনার লিঙ্গহস্ত হইলেন; ‘ভাস্করে’ তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা,

শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,

প্যারীকাকা লিখিলেন,—

আহা,

বৃষভের লাজে শোভে যেই পুচ্ছরাজি,...

পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

আমি হয় এ বিপুল বিশেষ কে না ভবে

দেখি মোর লাক্য।

“তাঁহার এই সকল স্নেহ-রচনার ক্রমে আমি তাঁহার লাক্যেদ হইয়া উঠিলাম; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাঞ্চপুরের লজ্জা আহ্বান করিতেন। আমার রচনার তিনি লম্বা প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্বে কবিতা রচনার আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই ভ্রামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তখনকার দিনে অক্ষকীড়ার ওস্তাদ তাঁহার মত আর কোনও বাকালী ছিলেন কি না সম্ভেদ। তিনি একথানা বই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন—‘অক্ষবল চরিত’। পণ্ডিত মহাশয় ‘ছন্দপ্রকাশ’, ‘ছন্দবোধ’ প্রভৃতি কল্পখানি অতি সুন্দর পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটারি। বাবার অল্পমতি লইয়া ঐ পুস্তকগুলি স্কুল-পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইল। আমরা রিত্তালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। পরে প্যারীকাকার নিকটে অল্প পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটী মোটেই দশাঙ্ক নহে, কয়েকটা ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আশ্চর্যকরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটী বানান করা হয়। এখনও আমার সেটী মুখস্থ আছে—

শ্রীশ্রীহরিপদে যে বা করয়ে স্মরণ  
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন ।  
মৃত্যুস্তর নাহি থাকে সদা আনন্দিত ।  
তপ জপ করে সদা মনের সহিত ।  
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন ।  
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ ।  
বন্দি ঈশ্বর চরণ খোজে মোক্ষপথ ।  
স্বজন স্বজন তাঁর শত্রু হয় হত ।

“এ কবিতাটী লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোনও রকম করিয়া মিল চাই; এ ত হইল শব্দের গৌজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—‘একটা ভাল করে পড়া লেখ না।’ তখন সবমাত্র স্তর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—‘স্তর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা কবিতা লেখ না।’ আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া মাইকেলের ‘রেখে যা দায়ে মনে’ কবিতাটির ছন্দে একটা পড়া রচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা ‘ভাস্করে’ প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অঙ্করে দেখি। কবিতাটী আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্বেত-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সরসতা, native wit, ছিল; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।

“আমার যে একটু native wit ছিল, অল্পবয়সেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। আমাদের ছেলেবেলার কলিকাতার নাট্য সমাজে কালিদাস সান্যাল খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একাধারে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে এবং Organiser। বর্ধমান রাজবাটীতে তাঁহার খুব আদর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত অর্থ লব্ধ করিতে পারিতেন; কিন্তু সেদিকে আদৌ তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার রচিত ‘নলদময়ন্তী’ নাটক কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। তিনি কটোগ্রাফি বড় ভাল-বাসিতেন। তখনকার দিনে বিলাত হইতে রীতিমত তৈয়ারী প্লেট আমদানী হইত

না ; কলোডিয়মের সাহায্যে আলোক চিত্র তুলিতে হইত। সময়ে সময়ে তাঁহার খুব ভাল সোয়া আবশ্যক হইত। আমাদের সোয়ার কল ছিল। একদিন তিনি আমাদের বলিলেন—‘ওহে খুব ভাল সোয়া কিছু আমাকে দিতে পার?’ আমি বলিলাম, ‘তা কেন পারব না?’ কিছু পরে আন্দাজ তিন সের সোরা কালীদাদাকে দিলাম। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ‘খুব ভাল ত? ছন নেই ত? আমি হু একবার ‘না, না’ বলিয়া শেষটা বলিলাম—‘আজ্ঞে, একটু আছে বৈ কি, তা নইলে যে শুধু পীটরু হোতো।’ তিনি বলিলেন—‘আ কি হোতো?’ আমি উত্তর দিলাম,—‘শুধু পীটর হোতো। ছন না থাকলে কি সল্ট-পীটর হয়?’ কালীদাদা হাসিয়া উঠিলেন। আমাদের উৎকৃষ্ট সোয়া ইংরাজ রাসায়নিক কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইত।

“পায়ীকাংকার মৃত্যুর পরে আমার বাঙ্গালা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনা-চক্রে আমি একখানা প্রহসন নাটক লিখিয়া ফেলিলাম। আমাদের পাঠ্য একটা সখের যাত্রার দল ছিল। একদিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বলিল—‘আপনি একটা আমাদের পালা লিখে দিন।’ আমি বলিলাম, আমি কী লিখে দোব?’ তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; একথণ্ড দান্তরায়ের পাচালী আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’—তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম; নামটা বড় ছোট খাট হইল না—‘একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?’—এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত। রচনায় যে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল তাহা নহে; তবে এইটুকু বলিতে পারি—আমি অনুকরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চুরি করি নাই। কথাটা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কারণ ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যে চোরাই মাল সর্বত্রই নজরে পড়িতেছে।

“রস-সাহিত্য-রচনার জন্ত আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কালীতে যখন লোকনাথবাবুর বাসায় ছিলাম, ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত, যশোর হইতে নিয়মিত ভাবে কাগজ বাহির হইত; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহিয় হয় নাই। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র হাত্তোদীপক প্রসঙ্গ ‘বিবিধ’ নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরল Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইঙ্গনাখে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। শিশির বাবুর প্রতিভা যে কতদিকে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা আর আপনাকে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তিনি গান বাজনার বিচক্ষণ সমজদার ছিলেন, কৃষ্টি করিতে ঈনিডেন; কবি ছিলেন, স্বরসিক ছিলেন। প্রবল ষটিকার অনেকগুলো গ্রাম উৎসব হইয়া গেল; তিনি সেই সমস্ত গ্রাম পৰ্যটন করিয়া সেই সাইক্লোনের গতি নির্দেশ করিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ‘academist’ ধরনের পোষাকী ব্যাপার ছিল না।

নীলকরে প্রসীড়িত প্রজাদিগের দুর্গতি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; দেশবাসীর বেঘনায় তাঁহার স্বপ্নিও চকল হইয়া উঠিত।

“দেখুন আপনাকে এই সকল স্বতিকথা বলিতে বলিয়া ভাবিতেছি যে, মানুষ যখন বিচিত্র কৰ্ম্মপ্রবাহের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে একটা কোথাও গিয়া ঠেকে, তখন কিসে কি হইল, তাহার হিসাব নিকাশ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন উঠিয়া উঠে। বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের দ্বাতপ্রতিদ্বাতে যে মানুষটী পড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পক্ষে ভৌলকণ্ড লইয়া সেই বিচিত্র শক্তি-তরঙ্গের voltage ওজন করিতে বলা বাতুলতা মাত্র। কেহ আমাকে প্রশ্ন না করিলে আমার বালাজীবনের এতগুলো কথা একত্র সাজাইয়া বলিতে পারিতাম না; তবুও অনেকটা বোধ হয় এলোমেলো লইয়া যাইতেছে। যে কথটা আগে বলা উচিত ছিল, যে ব্যক্তির নাম আগে করিলে ইতিহাস হিসাবে নিখুঁত হইত, সে কথটি অথবা সে নামটী পরে মনে পড়িতেছে। কি করিব; যখন যেমন মনে পড়িতেছে, আমার স্বতিকথা সেই রকম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

“ছেলেবেলায় আমাদের জিম্জিষ্টিকের খুব ধুমধাম ছিল। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে একজন ফিরিকি (তাহার নাম ছিল পীটার) জিম্জিষ্টিক খেলা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে কেঁ'ক হইল, ঐ রকম খেলোয়াড় হইতে হইবে। সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তোষী হইলেন দুর্গাদাস কর, নবগোপাল মিত্র ও শ্রামাচরণ ঘোষ। অল্পদিনের মধ্যেই ভাল জিম্জিষ্টিক আখড়া স্থাপিত হইল। আমাদের ওস্তাদ হইলেন পীটার। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিখিল অখিলচন্দ্র চন্দ্র। পরে তিনি Ward's Institution-এ (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত) শিক্ষক হইলেন। শ্রাম ঘোষ ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি বই রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্নানমধ্যস্থ দুর্গাদাস কর শ্রাম ঘোষকে উৎসাহ দিতেন। আর নবগোপাল মিত্র? আজ আমরা পত্রিকার স্তম্ভে কিছা বক্তৃতার আসরে তাঁহার নাম তুলেও মুখে আনি না; কিন্তু একদিন তিনি কলিকাতার বাঙ্গালী যুবকদিগের নেতৃত্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ‘শ্রামশাল পেশার’ সর্বত্র আদরগীর ছিল। এই ‘শ্রামশাল’ শব্দটা বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ভাল করিয়া জন সমাজে চালাইয়া যান। শব্দ ঘোষের লেনে তাহার বাড়ী ছিল। ছুতীয়াবশতঃ আমাদের সমাজে ‘শ্রামশাল’ শব্দটা বড় unlucky; কোনও ‘শ্রামশাল’ অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত ভাল করিয়া দাঁড়াইল না। নবগোপালবাবুর উত্তোষে চৈত্র মাসে একটা মেলা বলিত। এই আমাদের প্রথম ‘শ্রামশাল’ মেলা। বোডাসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। আমার মনে আছে, এই মেলার মহেন্দ্র ভট্টাচার্য একটা রাসায়নিক বিভাগ খুলিয়াছিলেন। আসন্ন নবগোপালবাবুর চেলা হইলাম।

“আমাদের দেখাদেখি চারিদিকে জিম্জিষ্টিক আখড়া স্থাপিত হইল। স্ত্র রজ্জ ক্যাম্পবেল্ হুইবার আমাদের আখড়ার আলিয়া মেডাল দিলেন। বিভাগলগ্নদ্বায়ে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। শ্রাম ঘোষ হুগলি কলেজে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত

হইলেন। আমাদের পাড়ার নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমরা একটা আখড়া করিলাম।

“ছেলেবেলায় আমাদের এই কথুলিয়াটোলায় খুলে বখন অধ্যয়ন করিতাম, অর্ধেন্দুশেখর মুক্তকি আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ছাড়া আর যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল মনে পড়ে না। বয়ঃ বোধ হইত তাঁহার মধ্যে রসকল কিছুই ছিল না। পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; আমরা তুলিলাম যে তিনি ও বাবু (পরে মহারাজ শ্রম) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মামাত ‘পিলতুত’ ভাই ছিলেন। অর্ধেন্দুশেখরের চালচলনও যেন আভিজাত্যসূচক বলিয়া বোধ হইত। খুলের শিক্ষক হাইড্ সাহেব ছেলেদের নামের শেষ অংশটা ডাকিতেন; যথা,—অমৃতলাল বহু না ডাকিয়া ডাকিতেন—লাল বহু; অর্ধেন্দুর নাম তিনি কখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই; মুক্তকি না বলিয়া সাহেব বলিতেন,—ম্যাষ্টিফ্। অর্ধেন্দুকে ছেলেরা বড় জালাতন করিত; আমিও অনেক সময়ে তাহাদের সহিত যোগ দিতাম; কিন্তু যখন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিত, আমি তাঁহার পক্ষ লইতাম। আমাদের সহিত দুই বৎসর কথুলিয়াটোলায় খুলে লেখাপড়া করিয়া অর্ধেন্দু পাইকপাড়ার খুলে চলিয়া গেলেন।

“ইহার পরে প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। অর্ধেন্দুর সহিত আমার দেখাশুনা হয় নাই; তাঁহার নাম পর্বস্ত আমি বিন্দুত হইয়া গেলাম। আমি ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারিতে তখন অধ্যয়ন করি। আমি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দ্বিবার পূর্বেই প্রাইভেট্ থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা ছেলেমহলে খুব হইত। কোথায় কোন নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা সমাজের কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া ছেলেরা জল্পনা কল্পনা করিত। এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি যে ‘হুতোম প্যাচার নক্সা’ রচনার পর হইতে নাটক বা উপজ্ঞান সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত। আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও থিয়েটার দেখিতে যাই নাই; সন্ধ্যার পরে বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিবেদন ছিল। তুলিলাম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ‘বুঝলো কি না’র জবাব ভুলু মথুয্যো (আহেরীটোলায় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) খুব দিয়াছে; তাহার জবাবের নাম, ‘কিছু কিছু বুঝি’। ছেলেমহলে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমরা তুলিলাম জোড়াসাঁকোর কল্যাণাটায় উহা অভিনীত হইবে। বন্ধুরা আসিয়া আমাকে ধরিয়া বলিলেন—‘চল, থিয়েটার দেখতে হবে।’ আমি বলিলাম, ‘আমার যাওয়া হবে না; সন্ধ্যার পরে কখনও বাড়ীর বাহিরে থাকি নাই।’ তাঁহারা বলিলেন,—‘তবে না হয় দিনের বেলায় চল, ঠেক দেখে আসবে।’ আমি সময় হইলাম। সেখানে আমার প্রথম থিয়েটারের ঠেক দর্শন হইল। নান্ন বড় বেশী ছিল না; দেয়ালের গারে একথানা ‘স্ট্রীন্’ অঙ্কিত দেখিলাম। কোঁতুলনবশবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কে অভিনয় করিবে? তুলিলাম,—খরদাস আছেন, আর আছেন—অর্ধেন্দু! নাম তুলিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ‘অর্ধেন্দু! কোন্ অর্ধেন্দু?’ কে একজন বলিল—‘অর্ধেন্দুশেখর মুক্তকি। চমৎকার প্লে করে।’ এ নাম শুনি আর কাহারও



হইতে পারে না ; ইনি নিশ্চয়ই আমার সেই কল্লিয়াটোলা জ্বলের সহপাঠী ! কিন্তু তখন ত সে অত্যন্ত অরসিক ছিল ; এখন চমৎকার আঁই করে ! জিজ্ঞাসা করিলাম—‘একবার তাঁর সঙ্গে দেখার সুবিধা হয় না । সে কোথায় ?’ দেখা হইল না ; কিরিয়্যা আসিলাম ।

“কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন অর্ধেন্দুর দেখা পাইলাম । আমাদের বাড়ীর দরজার বলিয়া আছি ( বাড়ীর সম্মুখে খোলা ড্রেন ছিল, সেই ড্রেনের উপর সাঁকো ছিল, দরজার সামনে বাঁধান সাঁকোর উপরে বসাতাই দরজায় বসা বলা হইত ) এমন সময়ে অর্ধেন্দু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । আমাকে দেখিয়া তাহার ভারি আনন্দ হইল ; আমি কি করিতেছি, থিয়েটার দেখিতে ভালবাসি কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া সে বলিল—‘তুমি একদিন আমাদের থিয়েটার দেখতে যাবে ? টিকিট এনে দোব ।’ আপনাতা এখন বৃষ্টিতে পারিবেন না, কিন্তু তখন থিয়েটারের টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল ; অনেক খোঁসামোদ করিয়া তবে টিকিট যোগাড় করা হইত । আমি বলিলাম—‘না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাক্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, আর এ বছরে আমি এন্ট্রান্স একজামিন দোব ।’ আমার যাওয়া হইল না । দেখুন, নিজে থিয়েটার করিবার আগে আমি ঝামাপুকুরে দুই বার মাত্র শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়াছিলাম, অভিনয় আমার পিসীমার বাড়ীতে হইয়াছিল বলিয়া আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল ।

“১৮৬২ সালে ‘সধবার একাদশী’ অভিনীত হইল । তৎপূর্বে আমি ঐ নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম । কেবলই মনে হইত, আমি ছাড়া জগতে এমন মাত্রা নাই যে নিম্নে দস্তুর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে । রামচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে অভিনয় হইল ; চারিদিকে খুব সূখ্যাতি শোনা গেল । আপনাকে এইখানে আমি একটি কথা বলিতে পারি—That play was the unconscious germ of the public stage.

“আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে আনাগোনা করি । একদিন অর্ধেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল—‘সধবার একাদশী’ দেখতে গেলে না ?’ আমি বলিলাম,—‘কি করে যাই ?’ পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলাম—‘আচ্ছা, তোমাদের নিম্নে দস্ত কে লাজে ?’ অর্ধেন্দুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । সে বলিল—‘গিরিশ ঘোষ ।’ আমি জ্ব কুণ্ঠিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—‘গিরিশ ঘোষ ? কোন্ গিরিশ ঘোষ ?’ সে বলিল—‘বোস পাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে ; চমৎকার আঁইব ।’ আমি বলিলাম—‘ওঃ, নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই ? সে ত ফেরাগিসরি করে ! সেক্ষণীয়র আঙড়াবে কি করে ? কলাপাতার প্রকাণ্ড ঠোঁড়ার মুড়ে লাজা পান নিয়ে তাঁকে রোজ আপিল যেতে দেখি । দিগম্বর দে’র কাঁছে Book-keeping শিখে, সে আপিলে খুব ভাল Book-keeper হয়েছো জানি ; কিন্তু সেক্ষণীয়র সে কি বোকে ? ব্রজ ( গিরিশ বাবুর বড় সখা, চুলালালের পিতা ) কিছু বোকে ; সে বরং চৌকী কলসে পাগড়ে পারে ; কিন্তু……গিরিশ ঘোষ !’ হারি রে মুফ আত্মাভিমান !

ঘরে বলিয়া ‘সধবার একদশী’ পড়িয়া যে স্বপ্নের জাল চারিদিকে বুনিয়াদিলাম, আজ কোথা হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর একটা দম্কা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া আমার সেই স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া দিল? আমি ছাড়া জগতে অন্ততঃ আরও একজন মানুষকে পাওয়া গিয়াছে, যে নিম্নে দস্তের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দশকনের নিকট হইতে বাহবা লইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—‘তা নয় হে, তা নয়। নিম্নের পাঠ সে বেশ প্লে করে; তুমি একাদন চল না, দেখ্বে।’ আমি আন্তে আন্তে বলিলাম—‘তা হ’তে পারে।’ অভিনয় দেখিতে গেলাম না।

“দেখুন, সোজা কথায় আপনাদের নিকটে আমার এই পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি, psychological analysis করিতে বসি নাই। দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করিব, এমন সময় বা সামর্থ্য আমার নাই। বলিতে পারেন, যে তরুণ যুবক কখনও রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া কোনও নাটক পূর্বে অভিনয় করে নাই, তাহার এমন চিত্তবিকার হয় কেন? এ ঈর্ষার কারণ কি? অল্প দিন পরে ঐহার নিকটে আমাকে নত মস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, ঐহার প্রথমে মধুর সম্ভাষণে আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত হইতে হইবে, ঐহার প্রথম স্থখ্যাতি পরের মুখে শ্রবণ করিয়া আমার মেজাজ খারাপ হইয়া গেল কেন?”

\*কিন্তু সে সকল কথা পরে বলতেছি। নটবর চৌধুরীর বাড়িতে আমাদের সেই জিমগ্রাস্টিক দল খেলাধুলা করত। সেই সময়ে একটি লোক সেখানে আনাগোনা করিতে লাগিল; তাহার নাম গিরিশচন্দ্র মিত্র। লোকটি বাস্তবিকই একটা genius। দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলের মত ভাল করিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু মহেন্দ্র চাটুয্যের বহু পূর্বে তিনি ক্ল রিয়নেট বাতায়ন বাজাইতে শিখিয়াছিলেন, একটা সুন্দর মডেল এঞ্জিন তৈয়ার করিয়া গেলেন, ঢাকার শুক্লালের প্রসিদ্ধ সেতারের অঙ্ককরণে একটি সেতাব আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। তাহার কাছে বলিয়া তাহার কার্য-প্রণালী দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। তিনি কাহারও সাহায্য লইতেন না, কাঠ চেরা হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তদস্তের বিচিত্র কারুকার্য পর্যন্ত বাতায়নের আগাগোড়া তিনি নিজে করিতেন। খুব ভাল ছাঁটকাট সেলাইয়ের কাজ উত্তম দক্ষতাকে হার মানইয়া দিতেন। তিনি বলিলেন,—লোহার ডাঙার উপর খেলা করার দরকার নাই, মাটিতে নানা প্রকার ব্যায়াম করা যাউক। নৃত্য ধরণে ব্যায়াম শিক্ষা চলিতে লাগিল।—মাঝে অনেক গণ্য মান্ত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যায়াম-নৈপুণ্য দেখাইতাম। সেই দিন আমাদের উৎসব। প্রহসনের ব্যবস্থাও করা হইত। উহা আমাদের উৎসবের অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই শূন্যে গিরিশচন্দ্র বোয়ের সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

\*নটবরের—(আমরা তাঁহাকে চিরকাল নটুবালা বলিয়া ডাকিতেছি, নটবর বলিতে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে)—নটবরের বাড়ীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর ঘন ঘন আসিতে

লাগিলেন ; হাশু পরিহাসের তুফান উঠিত । অর্ধেন্দু ছিলেন আমাদের সভার মধ্যমণি ;  
 • বিজ্ঞপাত্তক কথাবার্তার ও অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্য তিনি আমাদের ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন ।  
 একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন , আমরা সব রোগী সাজিলাম—  
 ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি ; Caricature-এর চূড়ান্ত করা হইত । ক্রমশঃ এই  
 রকমেই যেন অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল । আমাদের মনে একটা অভিমান ছিল, যা-তা  
 সাজতে আমরা রাজি হইতাম না ; অর্ধেন্দুশেখরের সে একম কোনও অভিমান ছিল না ।  
 এমন করিয়া Caricature করিতে শিখিলাম ; কিন্তু farce রচনা করিয়া নিমজ্জিত  
 ভ্রমশূলীর সম্মুখে অভিনয় করা কিছু শক্ত ব্যাপার । রচনা করিতাম বটে , কিন্তু এখন  
 ইচ্ছা হইল, একজন পাকা ওস্তাদের কাছ থেকে একটা ফার্স লিখিয়া লইতে হইবে ।  
 লেখের যাত্রার মণের জন্ত গিরিশ ঘোষ পালা রচনা করিয়া দিতেন, গান বাধিয়া দিতেন ;  
 একবার তাঁহাকে ধরিলে হয় না ? এক রবিবারে আমি একাকী গিরিশবাবুর বাড়ী  
 গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম । গিরিশবাবু বলিলেন—‘তুমি কে গা ! তোমার  
 নাম কি ?’ উত্তর হইল—‘আজ্ঞে, আমার নাম অমৃতলাল বসু ; আমি কৈলাশচন্দ্র  
 বসুর ছেলে ।’ ‘ওঃ, বুঝছি, বোসো ; তুমি কি করছ ?’ ‘সম্প্রতি আমি এন্ট্রান্স  
 দিয়েছি, আপনার কাছে এসেছি একটু কাজে ; আমরা acrobatic performance  
 করছি ; একটি farce যদি আপনি লিখে দেন তা’ হ’লে বড়ই ভাল হয় ।’ ‘তোমাদের  
 কি রকম ফার্স দরকার তা’ ত আমি জানি না । ফার্স তোমরা যদি করে থাক, আর  
 একদিন সেই থানা নিয়ে আমার কাছে এস ।’.....কিছুদিন পরে একথানা বই লইয়া  
 তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম । তিনি বইখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—‘এখানা  
 কে করেছে ?’ আমি বলিলাম, ‘আজ্ঞে, আমি ।’ ‘তুমি ত মন্দ করনি, তুমিই লেখ  
 না,—আমি দেখে দোষ ।’ সেই থেকে তাঁহার বাড়ীতে আমার যাওয়া আসা  
 আরম্ভ হইল । তাঁহার মুখে সেকপীরর-আবুস্তি শুনিতাম ;—তাঁহার সে Grand voice  
 আপনারা শুনিতে পান নাই ; ‘সধবার একাধনী’ও তিনি আবুস্তি করিতেন ।

‘তাঁহার পরে আমি কাশী চলিয়া গেলাম । কাশীর কথা পূর্বে আপনাকে  
 বলিয়াছি । কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতার আসিতাম । এখানে অবস্থান কালে  
 আমাদের এই কল্লুগিয়াটোলায় স্থলে শিক্ষকতা করিতাম ; বেতন লইতাম না ।  
 ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চুণীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র । অর্ধেন্দুশেখর ও ধর্মদাস  
 সুর তখন এই স্থলে মাঠারি করিত । আমার বাবা, কাকা, মামা, সকলেই ইন্সল  
 মাঠারি করিয়াছিলেন ; আমিও মাঠারি করিতাম । অর্ধেন্দু বলিলেন—‘তুমি এসেছ,  
 ভালই হয়েছে ; ‘দীলাবত’র অভিনয় করতে হবে ।’ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত  
 ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন । এই নগেন্দ্রনাথই অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের মিলন  
 সংঘটিত করিয়াছিলেন । কথা হইল, এবার আমরা টিকিট বিক্রয় করিব ; বিক্রয়লব্ধ  
 পরসর আমরা নিজেরের ঠেক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব । তখন গড়ের মাঠে  
 লিউইস থিয়েটারের বাড়ী ছিল ; কাণে মাকড়ী-পর্য্যন্ত ললতানা-নামধারী একটা লোক ঐ

কার্টের বাড়ী নির্মাণ করা হইয়া দিয়াছিল। অবস্থাতে ঠিক সেই বাড়ীর ম্যানে ভুবন নিয়োগীর বিয়েটর-বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন, কেবল দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের তফাৎ হইয়া ছিল মাত্র। সে কথা পরে বলিব।

“লীলাবতীর বিহার্গাল চলিতে লাগিল। অর্ধেন্দু আমার বলিল—‘দেখ সব পাওয়া গেছে, উড়েটা পাচ্চি না, কি করা যায়?’ আমি বলিলাম—‘তোমাদের আমি একটা ভাল টেডে দিতে পারি।’ এই বলিয়া শশীকে লইয়া গেলাম। তার পরে অনেক দিন শশীর নাম ‘বিসাডি’ হইয়া গিয়াছিল। অর্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথবাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা বত কাহুতি মিনতি করিলেন, তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ঠেজে দাঁড়ান হইল না।

“আমাদের বিহার্গাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন। বেশ সৎ লোক; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আমরা কিছু কিছু হাসিঠাট্টা করতাম। একদিন আমাদের পুরা মজলিস বলিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যোগমন করিয়া অত্যন্ত গভীরস্বরে আমাদেরিকে বলিলেন,—‘দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, মত্যা মিথ্যা বলতে পারি না লর্ড্ মেরোকে নাকি আন্দামান দীপে খুন করেছে?’ সে দিন মজলিস বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই সহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধুমধামের আরোজন সর্বত্রই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। দেশময় বিবাদের কালিমা লক্ষিত হইল।

“লোকনাথবাবুর সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলাম। ১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে এই যে বাকিপুর ছাড়িলাম আর সেখানে ভক্তারি করিবার জন্ত ফিরিয়া যাইতে হইল না।

“কলিকাতায় আসিয়া যে দিন প্রথম আমি আমাদের ফুল দর্শন করিতে যাই, অর্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড্ মাস্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগ্-বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকধানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই সুন্দর অষ্টাসিকার কোনও চিহ্ন এখন নাই। পোর্ট ট্রেষ্টের কল্যাণে সেটা লুপ্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্ধেন্দু আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরিশবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে। অনেকের একটা ফুল ধারণা আছে যে টিকিট বিক্রয় করিবার কথা শুনিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন; তাঁহার আরো ইচ্ছা ছিল না যে টিকিট বিক্রয় করিয়া পরশা লওয়া হয়; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন টিকিট বেচা সকলের ইচ্ছা, তিনি বিয়েটরের সহিত সন্ধ বিজ্ঞির করিয়া দিলেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, ‘বিয়েটরের জন্ত এক

খানা ভাল বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না ; আগে ভাল-ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর ; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন ?' অর্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যো বলিলেন—‘আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোট খাটো ষেজ্ করি ; একেবারে বড় বাড়ি বড় ষেজ্ কোথায় পাওয়া যাবে ?’ এই কথা লইয়া দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না, আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরীশবাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটার করতে হইবে। বাড়ীর দোতালায় আমাদের রিহার্সালের বন্দোবস্ত। ভুবন আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, একটি হার্মোনিয়মও কিনিয়া দিয়াছে। তাহার চাকর হুঁকো টিকে তামাক রাখিয়া যাইত, আমরা নিজে নিজে তামাক সাজিতাম।

“রসিক নিয়োগার ঘাটের উপরে ভুবন নিয়োগার সেই বাড়ীটি এখন আর নাই ; তাহার সোপানাবলী কলবাহিনী ভাগীরথীর জলে ধৌত হইয়া যাইত। দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নোলদর্পণের রিহার্সাল চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল ; বলিল—‘তুমি সৈরিক্সীর পার্টটা নাও, বেশী নয়, দু এক রাত্রি তুমি প্লে কর, তা’র পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেবো।’ সেই দু এক রাত্রি করিতে করিতে আজ চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়া গেল।”

## আট

২৬এ ফাল্গুন, ১৩২২

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনারা ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে নীলদর্পণের রিহাঙ্গাল করিতে লাগিলেন ; আপনি সৈরিক্কীর ভূমিকা লইলেন , আর কে কি ভূমিকা লইলেন ; নীলদর্পণের প্রথম অভিনেতৃদলের নাম কলিকাতার ষ্টেজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকি উচিত ।” অমৃতবারু বলিলেন,—

“অর্ধেন্দু

উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু,  
একজন চাষা রায়ৎ ।

নগেন্দ্র

...

নবীনমাধব ।

কিরণ ( নগেন্দ্রের ভাই )

...

বিন্দুমাধব ( নবীনমাধবের ভাই ) ।

শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

...

গোপীনাথ দাওয়ান ।

মতিলাল সুর

...

রাইচরণ ও তোরাপ । ( মতিলালের মত  
তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে  
পারিল না । )

মহেন্দ্রলাল বসু

পদী ময়রাণী ।

শশিভূষণ দাস ( বিসাদী )

...

আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ ।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

...

লাঠিয়াল । ( ইনি বেশী দিন অভিনয়  
করেন নাই । )

গোপালচন্দ্র দাস

...

আতুরী, একজন রায়ৎ ।

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

...

একজন রায়ৎ ।

অবিনাশচন্দ্র কর

...

রোগ্ সাহেব । ( এই একটা পার্ট্ সে প্লে  
করিল ; তেমনটি আর কেহ পারিল না ।  
আমিও রোগ সাহেবের পার্ট্ প্লে করিয়াছি,  
কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই । )

গোলোক চট্টোপাধ্যায়

...

খালান্দী ।

ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী

...

সরলা । ( চমৎকার প্লে করিতেন । )

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

...

ক্ষেত্রমণি ।

( ওয়কে বেলবারু বা কাপ্তেন বেল )

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়

...

রেবতী । ( এমন চমৎকার রেবতী আর  
কেহ কখনও হইতে পারিল না । বেচার  
শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল । )

আমি

...

সৈরিক্কী ।

ধর্মদাস হর ও যোগেন্দ্রনাথ }  
মিত্র (একিনীয়ার ) }

ঠেজের অধ্যক্ষ ।

( ইংহারায়ে পরে ঠার থিয়েটারের বাড়ী  
তৈয়ারি করিয়া দেন । )

কার্তিকচন্দ্র পাল ...

Dresser ।

নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...

কমিটির সেক্রেটারী ।

বেণীমাধব মিত্র ...

কমিটির প্রেসিডেন্ট । ( ইনি থিয়েটারের  
বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে । আপিলে  
চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুকুন্নি হইবার  
উপরন্তু বলিয়া বিবেচিত হইলেন । তাঁহাকে  
থিয়েটারে সাজিবার জন্ত কখনও অস্বস্তি  
করা হয় নাই । )

“খুব উৎসাহের সহিত আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল । আমি তখন  
থিয়েটারে গা ঢালিয়া দিয়াছি । একদিন রাত্ৰিক নিয়োগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি  
একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটা ভক্তলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেদিন  
আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেন এখন আমার ঠিক মনে  
নাই । বোধ হয় সেদিন তাঁহারা মেটেবুকজের নবাবের পণ্ডশালা দেখিতে গিয়াছিলেন ;  
আমি একাকী তামাক সেবন করিতেছিলাম । আগন্তুকদ্বিগকে দেখিয়া আমি সসম্মানে  
দাঁড়াইয়া উঠিলাম । একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভূবন নিয়োগীর এই বাড়ীতে থিয়েটারের রিহার্সাল হয় ?’

‘হাজে ই ।’

‘তুমি কি সেই দলের একজন প্রেরার ?’

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম ।

‘আজ তোমরা এখনও রিহার্সাল আরম্ভ কর নাই কেন ?’

‘আজ আমাদের রিহার্সাল বন্ধ ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত  
নাই ।’

‘তাই ত ; আমরা এলুম তোমাদের রিহার্সাল দেখতে—’

‘আমুন, ভেতরে বসুন, তামাক খান ।’

‘ধাক, আর তামাক খাব না । আমাদের তুমি চিনতে পারছ না । আমার নাম  
শিশিরকুমার বোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারিমোহন রায় ।’

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদগুলি লইলাম, অক্ষয়বাবুকে ও প্যারিমোহনবাবুকে  
নমস্কার করিলাম ।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার নাম কি ?’

‘অমৃতলাল বসু ।’

‘তুমি কি লাজবে ?’

‘সৈয়দী’।

‘আচ্ছা সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাট হল, তুমি সৈয়দীর পাটটা একটু আমাদের শোনাবে ?’

‘আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম। আমি জানিতাম চুঁচুড়ার অক্ষয় সরকারের দল ‘লীলাবতী’র বিহারীল দিয়াছিলেন, তখন আমাদের লেখের দলে ‘লীলাবতী’ হইয়াছিল। অক্ষয়বাবুর নাম শুনিয়াই আমার মনে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল ; এ সময়ে আমাদের হাতের তাস কি দেখান উচিত ? যাহা হউক, আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—‘আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি খুব বেশী, আপনি যখন বলছেন তখন আমি আমার পাট একটু আপনাকে শোনাতে পারি।’

‘আমি নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সৈয়দীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

‘সেদিন ফিরিয়া যাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—‘এখন আমি বোঁবাঝারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে থাকি ; তুমি আমার বাগার আমার সঙ্গে দেখা কোরো।’ তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। দেখুন সেদিন যুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে আমি শিশিরবাবুর লম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—‘তিনি একজন আস্ত বাঙ্গালী।’ একথাটা যে কত সত্য তা’ আপনারা বোধ হয় আজকাল উপলব্ধি করিতে পারিবেন না ; তিনি দেশের সমস্ত অচ্যুতের ভিতর দিয়া স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নতুন থিয়েটার খোলা হইল<sup>১</sup>, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম ক্রান্তনাল\* থিয়েটার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন,—ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙ্গালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না ? এই যে democratic টেন্ডেন্স, ইহা ত আর খনী গৃহস্থের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না, বাঙ্গালীর সর্বাকীর্ণ ভাবপুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন ? ইহারা ত সাহস করিয়া ‘নীলমণ্ডপ’ লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মৰ্ম্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার সহিত সমবেদনার জন্ত লং সাহেবের কারাবাস হইল,<sup>২</sup> সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সৰ্ব্বদুর্ভি প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে। শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটারের একজন ডাইরেক্টর হইলেন।

১ ডিসেম্বর, ১৮৭২। (ডঃ ব্রজেননাথ বসু্যাপাণ্ডার কৃত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস) —সঃ

\* কেহ কেহ ইহার নাম Calcutta National করিবার কথা তুলিয়াছেন। অবশ্যবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন—Calcutta এবং National এ দুটো শব্দের সাবঙ্গত হয় না, Calcutta শব্দটা বাদ দেওয়া হইল। —লেখক।

২ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। —সঃ



“এখন যে বাড়ীতে শিশিরবাবুর ছেলেরা বাস করিতেছেন, ঐ বাড়ী আমরা শিশিরবাবুর জন্ত ভাড়া করিয়া দিই। তিনি আমাদের পক্ষিতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কারণ আমাদের নিকটে থাকিতে পারিলে তাঁহার আত্মার পরিচাৰা থাকিত না। অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা যাহাতে বৰ্দ্ধিত হয় উক্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কাগজ অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রিকার কাজে আমি যে কিয়ৎ পরিমাণেও নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলাম তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম। আমার চিন্তাবৃত্তি উদ্বোধনের জন্ত ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র নিকটে আমি কত ঋণী তাহা কিছুতেই বিন্ধিত হইতে পারি নাই। কোনও প্রকারে যে সে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর তাহা তখন মনেই হইত না। বরং শিশিরবাবুর সংশ্রবে থাকিয়া একটা মাহুস হইয়া উঠিতে পারিব এই আশা করিতে লাগিলাম।

“শিশিরবাবু আমাদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন ; মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রথম হইতেই আমাদের সঙ্গে কাজ করিতে আনন্দবোধ করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ আমাদের থিয়েটারের অন্ততম ডাইরেক্টর ছিলেন। গিরিশবাবুও ডাইরেক্টর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু গিরিশবাবুর অভিমান তিরোহিত হইবার পূর্বেই আমরা পবলিক থিয়েটার খুলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলাম।

“নবেম্বর মাসে আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্জুন্দু ছিলেন আমাদের General master, কিন্তু সব বিষয়েই প্রধান উত্তোঙ্গী ছিলেন নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার মত organiser বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিমাইচরণ সান্যালদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার\* বাহির্কাটার নীচেটা ভাড়া করা হইল ; চল্লিশ টাকা মালিক ভাড়া স্থির হইল। মহাশয়, তখন আমরা চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়া যে অংশটুকু পাইয়াছিলাম, এখন তাহার চল্লিশ টাকা মুনিসিপ্যাল টেক্স দিতে হয়। সে বাড়ীতে আমাদের টেক্স হইবে। আব্দুল মিজাকে পইরা টেক্স তৈয়ার করিতে বলিয়া খেলায়, কাজ বড় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ধর্মদাস না থাকিলে স্ব্যবস্থা হইবে না ; কিন্তু সে ত সমস্ত দিন আমাদের কবুলিয়ারাটোলায় ফুল মাঠারি করিয়া বেলা চারিটার সময় অব্যাহতি পাইত ; তাহারই কথা অহুযায়ী টেক্স গঠিত হইতেছিল। গতক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—‘দেখ, এক কাজ করা যাক ; তোমার বদলে আমি ফুলে পড়াব ; মালিকাবারে তোমার পুরো মাইনে তোমার হাতে দোব ; তুমি সমস্ত দিন টেক্স নির্মাণে আব্দুলকে খাটাইও।’ হেডমাষ্টার আমাকে পাইয়া অনন্দিত হইলেন। আমি ঐ বিভাগেই তাহার ভূতপূর্ব ছাত্র ছিলাম। ফুলের ছুটি হইলে পর আমি ধর্মদাসের সঙ্গে যোগ দিয়া রাত্রি এগারটা পর্যন্ত কাজ করিতে লাগিলাম। কাজ যখন অনেকটা অগ্রসর হইল, আমরা স্থির করিলাম যে ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমাদের

\* বোড়ালীকো বাড়ি ওয়ালার বাড়ীটা।—লেখক

প্রথম অভিনয় এই টেজে করিতে হইবে। খর্খাস টেজ করিয়া গিলেন ; নোটশ ও টিকিট ছাপান এবং গ্যাস-ব্যবহার তার নগেন্দ্রর উপর ন্যস্ত হইল।

“সহরের গণ্যমান্ত ভদ্রলোকেরা, আমাদের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন ; প্রায়ই কাহারও মুখ হইতে আখাস-বাণী শুনিতে পাওয়া যাইত না ; বরঞ্চ অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। পরশা কড়ি নাই, মুকুর্ষি নাই, অথচ এতদূর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক ইহা হ্রস্পন্ন করিতে হইবে। নগেন্দ্র ট্যান্‌হোপ প্রেস হইতে থিয়েটারের নোটশ মুদ্রিত করিয়া আনিল। তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইল,—দুই টাকার, এক টাকার ও আট আনার। প্রথম শ্রেণীর জন্য জানবাজার হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হইল ; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দানানের সিঁড়ির উপর ও রকে বসিবার আসন দেওয়া হইল।

“৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ১৮৭২ খৃঃ অব্দ বাঙ্গালার পাবলিক টেজের একটা স্মরণীয় দিন। অপরাহ্নকালেও আমাদের আয়োজন করা অনেক বাকী ছিল। অনেক লোক লাক্ষ্য করিয়া গ্যাস লাগাইয়া দিবার জন্য গৌরমোহন ধরকে রাজী করান হইল। লক্ষ্যার কিছু পূর্বে গ্যাস বসান হইল ; লক্ষ্যার পর খবর আসিল যে অবিনাশ কর আরে পড়িয়াছে, রোগ সাহেব সাজিবে কে ? তাহার কাছে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হইল ; সে বলিল—‘যে বকম করিয়াই হউক আমি প্লে করিব।’ পাকী চড়িয়া সে আসিল।

“একটা জানালার টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। দলে দলে দর্শক আসিতে লাগিল। এত ভিড় হইবে আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। সকলে টিকিট পাইল না। জাঙ্গা-জোঙ্গা-পর্য্য ভদ্রলোকেরা চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলোক বোস ও উড্ সাহেব রূপে প্রথম দুই দৃশ্বে অর্জেন্দু দর্শকগণের মন আধিকার করিয়া বসিলেন।

“করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্বে লীন উঠিল ; আমি লৈরিঙ্কী বেশে টেজের উপরে উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুহানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহুর্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লক্ষ্যার তার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারীবিশেষ উপবিষ্ট হইয়াছি ; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, বংশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিষ্করণ। আমার তখনকার মনের তাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ বন্ধন ছিল, সমাজস্বাধিতার শাস্তি ছিল। মুহুর্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল ; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ বা’ হ’বার তা’ত হ’ল ; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গল্পনা লক্ষনার সীমা থাকিবে না।

কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিক্তী হইলাম। বাহবা ধনির তালে তালে ‘দীন’ পরিবর্তিত হইয়া গেল।

“আজ আমি একটুও অভিরক্তি করিয়া আপনাকে বলিতেছি না। প্রত্যেক আক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’কে নিজের মনের করিয়া প্রেমের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষ ভাবে সূচ্যাপ্তি করিব জানি না। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্তসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বহু পরীক্ষারোগীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাছুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিক্তীর বিচিত্র রোমন্থননি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজস্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণী-কণ্ঠের আর্দ্রনাদ সম্প্রতিভাবে ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ সৈরিক্তীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন—‘তাহার রোমন্থনের অপূর্ণ বলিতে হইবে।’

“রাত্রি বারটার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। লোকের মুখে সূচ্যাপ্তি আর ধরে না। আবার শনিবারে ‘নীলদর্পণ’ অভিনয় করা হইল। একদিন একটা ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—‘ওহে, গিরিশ ঘোষ তোমাদের নামে একটা গান বেঁধেছে, তোমাদের খুব ঠাট্টা করেছে।’ আমরা বলিলাম, ‘বটে, কই সে গান, দেখি।’ আমাদের গালাগালির গানটা পড়িয়া আমাদের এত ভাল লাগিল যে আমি বলিলাম,—‘ওহে, চমৎকার গান! এস গাওয়া যাক।’ আমরা সকলে গান ধরলাম,—

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।

তাতে পূর্ণ অর্ধ ইন্দু ক্রিয়ণ সিঁদুর মাখা

মতির হার।

নগ হ’তে ধারা ধার,

সরস্বতী স্নানকার,

বিধির বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায় ;—

শিব শঙ্কর মহেশ্বরি যদুপতি অবতার।

কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান,

অলক্ষেতে বিকু করে গান,

অবিনাশী মুনি ঋষি কবুছে বলে ধ্যান ;—

সবাই মিলে ডেকে বলে ‘দীনবন্ধু’ কহ পার।

কিবা বালুময় বেলা,

পালে পালে রেতের বেলা,

ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা ;—

মিলে যত চাষা, কোয়ে আশা, নীলের

গোড়ার দিকে লার।

কলঙ্কিত শশী হ্রবে, অমৃত বহবে,  
বুঁকি বা দিনের পৌরব ঘায় খসে,  
জানমাহাত্মো হাড়ি শুঁড়ি পরলা দে  
দেখে বাহার ।

গানটীর ব্যাখ্যা এই—

লুপ্তবেণী—বেণী মিজ ; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাধ্যম উপরে  
প্রতিষ্ঠিত । গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-সঙ্গম ।

ভেরোধার—জিধারা ।

পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ।

অর্দ্ধ ইন্দু—অর্দ্ধেন্দু ।

কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মতি—মতিলাল সুর ।

নগ হতে ধারা ধার—বাস্তবিক নগেন্দ্রই organiser ছিল ।

সরস্বতী ক্ষীণকায়—মূৰ্খ ।

বিগ্রহ—একটা মন্দ গালাগাল । 'আবার অল্পপক্ষে জিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্তি ।

ধর্মক্ষেত্র স্থান—ধর্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন ঠেজ তৈয়ার করিয়াছিল ।

বিষ্ণু—ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ; নেপথ্যে গান করিতেন ।

অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর ।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীরে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা বাটীতে ।

চাষা—অভিনেতৃদলের মধ্যে অনেকগুলি সদগোপ ছিলেন ।

দানবন্ধু—নীলদর্পণ রচয়িতা ।

পালে পালে—পালপদবীধারিগণ ।

শশী—শশিভূষণ দাস ।

অমৃত—অমৃতলাল বসু ।

“গিরিশবাবুর এই গানটী আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে গাইলাম । তাহার ফলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইল ; তিনি বোধ হয় আমাদের উপর কতকটা প্রসন্ন হইলেন । কিন্তু সেই সময়ে ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিজ্ঞপ-পূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল ।<sup>১</sup> লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরিশবাবু লিখিয়াছেন । তু’ এক ছত্র আমার মনে আছে,—Up goes the red rag, and appears in view rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি ! সৈরিন্ধীর বিকৃতী গুণ্ঠবিকৃতির (Sairindhri with her upper lips curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল । কিন্তু গিরিশবাবুর অভিমান বেণী দিন টিকিল না । ১৮৭৩ সালের

১ ‘A spectator’ বাক্যবৃত্ত একটা পত্র ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ‘ইতিহাস বিহার’ (ইংলিশম্যান নহে) এ প্রকাশিত হয় । (জঃ বন্দ্যায় নাট্যালাল ইতিহাস) —সঃ

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে আমরা ‘জামাই বারিক’<sup>১</sup>, ‘নবীন তপস্বিনী’<sup>২</sup> প্রভৃতি অভিনয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ‘নবীন তপস্বিনী’র জলধর-ভূমিকায় অর্ধেন্দু শঙ্কর-মিত্রের ক্ষমতা জয় করিয়াছিল।

“কেবলমাত্র ‘নীলদর্পণ’ নাটকখানি লইয়া আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। শুধু একখানা নাটক কতদিন লোকের ভাল লাগিতে পারে? ‘নীলদর্পণ’ দুই দ্বাত্রি অভিনীত হইবার পরই<sup>৩</sup> আমরা ‘জামাই বারিক’র বিহার্দাল আরম্ভ করিয়া দিলাম। থিয়েটারের প্র্যাকার্ড আমরা এবার ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকার প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া লইলাম।

ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত নাটক অভিনয় করিলাম। এক এক সপ্তাহে এক এক নূতন বই প্লে করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একখানি মাত্র বই লইয়া আমরা থিয়েটার আরম্ভ করিয়াছিলাম; মাইকেলের ‘কৃষ্ণকুমারী’<sup>৪</sup> ও ‘বুড়োশালিকের ঘাড়ে রে’<sup>৫</sup> এবং ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, শিশিরবাবুর ‘নয়শো রূপেরা’,<sup>৬</sup> ও পণ্ডিত রামনারায়ণের ‘নবনাটক’<sup>৭</sup> ও মনোমোহন বহুর ‘প্রণয়পরীক্ষা’<sup>৮</sup> এই বাড়ীর টেঙ্গে দেখান গেল। ‘কৃষ্ণকুমারী’তে গিরিশবাবু নামিলেন। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘কৃষ্ণকুমারী’ অভিনীত হইল।\*

ভীম সিংহ	...	গিরিশচন্দ্র বোষ
বলেন্দ্র সিং	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধনদাস	...	অর্ধেন্দুশেখর মৃত্তিকি।
অগণ্য সিং	...	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	...	গোপালচন্দ্র দাস।
কৃষ্ণকুমারী	...	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী।
রাণী	...	মহেন্দ্রলাল বসু।
বিলাসবতী	...	বেলবাবু।
স্বমনিকা	...	আমি।

১ ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২।—সং

২ ৪ জানুয়ারী ১৮৭৩।—সং

৩ ‘নীলদর্পণ’ নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ত্রাশানাথ কর্তৃক ‘জামাই বারিক’ অভিনীত হয়। পরবর্তী কালে দ্বিতিকথা বিবৃত করিতে গিয়া অন্ততলাল বহু এ-বিনয়ে ভুল করিয়া দিয়াছেন। (ঐ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।—সং

৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, ৫ ৮ মার্চ ১৮৭৩।—সং

৬ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, ৭ ২৫ জানুয়ারি ১৮৭৩।—সং

\* গিরিশবাবু সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিতে পাই—গিরিশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ার কৃষ্ণকুমারী নাটকের হাওবিলে এইরূপ লিখিত হইল—‘A distinguished amateur’.—লেখক

“একটা গান গাহিবার জন্য নট আবশ্যক ছিল। আমরা মালিক বেতন চাঙ্গী টাকা ধার্য্য করিয়া হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিলাম। বঙ্গের সর্বাধিক নাট্যশালায় ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী। তিনি পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে পূর্বে অভিনয় করিতেন। তিনি কেবল ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গোড়াতেই একটি গান গাহিয়া যাইবেন। গানের অংশ ধর্য্য করিয়া অ্যাক্টিংকে বড় করিয়া তুলিব ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের দ্বৈত যাত্রার গানই প্রধান, এই জন্য যাত্রা ‘গুনিতে’ হয়; থিয়েটারে অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ ‘অ্যাক্টিং’ প্রধান, এইজন্য থিয়েটার ‘দেখিতে’ হয়। নট ও অ্যাক্টর মূলতঃ একই অর্থবোধক। নট নৃত্য করিবেন; এই যে নৃত্য করা, ইহার অর্থ কেবল মাত্র dancing নহে; তিনি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন; এই জন্য ইংরাজিতে dancing-কে poetry of motion বলে। তাঁহার মুখে যদি কথা বসাইয়া দেওয়া যায়, সেই কথা তাঁহার ভাব-ব্যক্তির সহায়তা করিবে মাত্র। অ্যাক্টরও প্রধানতঃ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবেন। দেখুন, লক্ষ্যতের সুরই প্রধান, শব্দগুলি মনের ভাব দর্শককে বুঝাইবার জন্য সহায়ক মাত্র। যাত্রার অনেক উৎকর্ষ আমাদের দেশে হইয়াছিল, কিন্তু এমন দাঁড়াইয়া পেল, যে বক্তৃতার মধ্যে যেই গুনা যাইত ‘আহা নথি, সে কেমন? প্রকাশ করিয়া বল’—অমনি ছেলের পন্টন গান ধরিয়া দিত! ঐ ‘প্রকাশ করিয়া বল’ গুনিলেই সকলে অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু সমজদার শ্রোতা অস্থির হইতেন না। কারণ গানের ভিতর দিয়াই ত যাত্রা ‘প্রকাশ করিয়া’ বলিবে; গান বন্ধ করিয়া দিলে তাহার সমস্তই অবাক্ত রহিয়া গেল। থিয়েটার কিন্তু গানকে ছোট করিয়া দিল, অ্যাক্টিংই ড্রামার স্বার্থ। তাই আমরা কেবল মাত্র একটি গানের ব্যবস্থা করিলাম।

“অনেক বাঙ্গালী ও ইংরাজ ভদ্রলোক আমাদের উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। ৬উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় আমরা চার টাকার একটি নূতন শ্রেণী খুলিলাম। বলাইচাঁদ মল্লিক আসিতেন। ভাস্কর হন্টার (পরে স্তর উইলিয়ম হন্টার) ও মেজর বেয়ারিং (এখন লর্ড ক্রোমার) আসিতেন ত বটেই; অনেক সময় আমাদের হৃদয়ঙ্গমও দিতেন। শিশিরবাবু ‘নয়শো রূপেরা’ অভিনয় করিতে গিয়া আমরা কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন আমরা স্বাধীনভাবে কোন অংশ পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতাম না; গ্রন্থচরিত্রের সফোভাষ্যকারী কাজ করিতাম। একস্থানে ছিল ‘চূষন’। আমার মনে একটু খটকা লাগিল। ভাস্কর হন্টারকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া স্ত্রীকথা করিলাম, এটা পাব্লিক থিয়েটারে দেখান উচিত কি না? তিনি বলিলেন—‘তোমাদের সমাজে উচিত কি না বুঝিত পারিতেছি না। আমাদের থিয়েটারে স্ত্রী-পুরুষে অভিনয় করে, দেখানে ওটা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরুষ এখানে নারী লাঞ্ছিত; বোধ হয় এখানে উহা ভাল হইবে না। তোমরা—বাহ দিয়া যাও।’ ভাস্কর হন্টার তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন। আমরাও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলাম।

“নীলদর্পণ অভিনীত হইবার সময় একরাজিতে<sup>১</sup> পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জাইন্স সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে তিনি দু’চারজনকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। তাহাতে কেহই ভয়িরা গেল না বরং সকলেরই ফুষ্টি বাড়িয়া গেল ; তোরাপ বেশে মতিলাল আশ্ফালন করিয়া বলিল—‘ধরে নিয়ে যায় যাবে, আমি এই লুক্কি পরেই যাব।’ পুলিশ সাহেব যখন শুনিলেন যে এই রকম ধারণা দাঁড়াইয়াছে, তিনি হাসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ‘দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল ; তাই আমি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছি। আপনারা আর কিছু মনে করিতেছেন কেন?’

“এতদিন পরে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায়<sup>২</sup> আমার স্বভিকথা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ; ইহাতে আমি যথেষ্ট গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি। নাটোরের রাজবংশের সহিত এই ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়ের সময়ে আমার ঘনিষ্ঠ সন্ধর্ষ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রাজা চন্দ্রনাথের মত সহৃদয় বন্ধু আমাদের আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বাঙ্গালী Attaché বোধ হয় তাঁহার পূর্বে এবং পরে আর কেহ করেন নাই। বড় লাট নর্থব্রক বাহাদুর ব্যারাকপুরে যাইবার সময়ে মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিজের গাড়ীতে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি অগ্নানবদনে আমাদের থিয়েটারের গ্রীণরুমে প্রবেশ করিয়া আমাদের পোষাক পরাইয়া দিতেন। হয় ত তাড়াতাড়ি নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে রক্তমঞ্চে দেখা দিতে হইবে ; রাজা চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অভিনেতার পায়ের মোজা খুলিয়া দিতেন। আজ ভক্তিপূর্ণ প্রাণে তাঁহাদের কথা স্মরণ করিতেছি।”

১ ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী (২১ ডিসেম্বর, ১৮৭২)-তে। (স্রঃ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’)—সঃ

২ মানসী ও মর্যাদা—সঃ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

অমৃতবাবু বলিলেন—“বিশ্বকোষ অভিধানে ‘রঙ্গালয়’ শীর্ষক প্রবন্ধে একটু-আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম দেখুন—রেবতীর ভূমিকা লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মাত্রা নহে। তিনকড়ি মুখ্যোকে আমরা ‘ঠাকুর্দা’ বলিয়া ডাকিতাম, যদিও তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। আবার, দেখুন গিরিশবাবুর গানে আছে—‘কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে’; এখানে বিশ্বকোষের লেখক টীকা করিয়াছেন—‘অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল, একজন অভিনেতা’। অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ ‘অমৃত’ সৈরিক্সীবেনী অমৃতলাল বহু। সৈরিক্সীর অশ্রুবর্ণনের উল্লেখ করিয়া ‘অমৃত বরষে’ লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনওকালে ‘অভিনেতা’ অথবা থিয়েটারের ভাবুকও ছিলেন না। এই সকল ছোটখাট অনেক ভুল উক্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক একস্থলে বলিতেছেন,—নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দৃষ্টে সৈরিক্সীকে যে ‘মড়াকান্না’ কান্দিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্ব একটা খালি ভাঙ্গাবাড়ীতে প্রত্যহ দুপ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার অন্ত সাধনা করিতেন। অর্ধেন্দুবাবু দেখানে গিয়া কান্দিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনার অমৃতবাবু মড়াকান্না আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পরীক্ষ জীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটনা গেল যে ভাঙ্গা বাড়ীতে ভুতে রোজ কাঁদে।—এই বর্ণনার কিছু গলদ আছে। ব্যাপারটা এই :—আমি ত সৈরিক্সীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পাটটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক দিন অর্ধেন্দুবাবু বলিলেন, ‘তোমার পাটটা কেমন হল দেখি?’ তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—‘না হয় নি।’ এই বলিয়া সৈরিক্সীর প্রথম দৃষ্টে চুলের দড়ি বিনানর সময় কথার ভক্তি কেমন হওয়া উচিত, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেরেলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবে না; আসল ব্যাপার হইতেছে ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের বসিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস লাম্বাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; স্বয়ংটাই মেরেলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotion-এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখি, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়া বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম; অর্ধেন্দু বা অন্ত কেহ আমার দোশর ছিলেন না। কয়েক দিন পরে আমি অর্ধেন্দুকে বলিলাম,



‘একবার আমার কান্নার জারগাটা শোনো দেখি।’ মড়া কান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি ‘আনন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—‘বহৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।’ আমার নাট্যজীবনে অর্ধেক আমার প্রথম গুরু বটে; কিন্তু এই কান্না সাধনায় আমি গুরুকে সুকাইয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার নাট্যগুরু অর্ধেক শেখরের আশীর্বাদে সফলপ্রায় হইলাম। তাঁহার নিকটে আমি যে কত খণী তাহা স্বীকার করিতে আমি কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। সঙ্কোচ বোধ করাটাই অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দাঁড়াইয়া যাইবে ইহা বাহ্যনীয় নহে। তিনি বাস্তবিক যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অশ্রু কীতি থাকিয়া যাইবে। আমার সঙ্গে সেট পোড়ো বাড়ীতে গলা সাধেন নাই বলিয়া তাঁহার কৃতিত্বের কিছুমাত্র খর্বতা হইবে না।

‘নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের কথা বলিতেছিলাম। কানীতে অবস্থানকালে আমি তাঁহার মহাব ও সৌজন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা চন্দ্রনাথ attaché পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমি তখন কানীতে ছিলাম। লোকনাথবাবু বলিলেন, রাজাকে অভিনন্দন দিতে হইবে। তাঁহার কথায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উজ্জল রত্ন, রাণী ভবানী কুলতিলক প্রথম বাঙ্গালী attaché-কে কানীধামে পাইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি উপযুক্তরূপে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে না পারে তাহা হইলে অত্যন্ত লজ্জার কথা। লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের উত্তোগে উদারপ্রকৃতি বিজ্ঞানাগ্রামের মহারাজ ও কানী-নরেশ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; ডাক্তার ল্যাক্সারস্ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ নিৰ্ম্মিত হইল। তদ্রত্ন কলেজের আইনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয় কৰ্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচিত হইল; গিরীন্দ্রবাবু তখন লোকনাথবাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কল্পজনে মিলিয়া একটি বাঙ্গালী রচনা খাড়া করিলাম। আরোজনের ক্রটি হইল না। আমার কিন্তু মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। রাজা চন্দ্রনাথকে আমি তখনও চোখে দেখি নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে এই প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে নানা দেশবিদেশের রাজা মহারাজা সমবেত হইবেন, আমাদের এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত রাজটীকা লইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন ত? মনে হইল যেন তাঁহার চেহারার উপর সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মান-ইজ্জৎ নির্ভর করিতেছে। আমার যেন ছট্‌ফটানি ধরিল। সন্ধ্যা হইল। দেব-মন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীপালোকে সভাখল ঝলমল করিতে লাগিল। রাজা চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। আমি বিস্ময়িত নেড়ে দেখিলাম—হাঁ, রাজা বটে! কানীপ্রবাসী বাঙ্গালীর সৌরভমুখী বটে। রাণী ভবানীর ঝলসে উজ্জল প্রদীপ আজ বিশ্বনাথের চরণতলে রীপ্ত হইয়া অলিঙেছে। কেশের অক্ষুত পরিপাটি ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্যের বাহ্যিক ছিল না। আনন্দে আমার চোখে জল আসিল।

অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। তিনি বিনীতভাবে তৎপ্রদর্শকে কয়েকটি কথা বলিলেন। সত্যতঃ হইল।

“কলিকাতায় পাবলিক ষ্টেজের প্রথম অবস্থায় তাঁহার আত্মকূল্যে ও সৌজন্মে আমরা কৃতার্থ হইয়া গেলাম। তিনি যে কখনও আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এমন কথা আমি বলিতেছি না। বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থ ভিক্ষা করি নাই। তাঁহার অসুগ্রহ করিয়া আসিবেন, যদি ভাল লাগে, দুটি ভাল কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না, সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন,—ইহার অধিক আমার কিছু আশা করিতাম না। এখানে আপনাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে; যেন পাঠকপাঠিকার ভুল ধারণা না হয় যে আমরা অভিজাতবর্গের অন্ততঃ moral patronage-এর ভিত্তারী ছিলাম। ক্রাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজ বাস্তবিকই democratic ছিল; দেশের আপামর সাধারণের আনন্দের সামগ্রী হইবে, ইহাই তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার বিষয় ছিল। আমাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া পুণ্যতন শিশিরবাবুর মত বোধ হয় মহাত্মা উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণগ্রাহী রাজা চন্দ্রনাথ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভৌমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবুর রিহার্সাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে গিরিশবাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন। আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি অবলীলাক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বলিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সগজ্ঞ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। রাজা চন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে তিনি ‘শশিষ্ঠা’য় যযাতি সাজিবেন; কিন্তু তাহা ঘটয়া উঠিল না।

“মাইকেলের ‘শশিষ্ঠা’র উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের কথা মনে পড়িল। সে সময়ে আমার দু-একটি কথা বলিবার আছে। দেখুন ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। যুরোপীয় ধরণে উৎকৃষ্ট ট্র্যাভেডি যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে পারে, তাহা মাইকেল বাঙ্গালীকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরবর্তী বাঙ্গালী নাটককারগণ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নিকটে আমাদের নাট্যসাহিত্য যে প্রভুত পরিমাণে ঋণী ইহা সর্বাবাক্যী নয়। ‘নীলমণ্ডপ’ বাঙ্গালী সমাজের সমসাময়িক চিত্র লইয়া বাঙ্গালী করণবসায়ক নাটকের আদর্শ দেখাইয়া দিল, মাইকেল বিলাতী classic ধরণের ট্র্যাভেডির আদর্শ ‘কৃষ্ণকুমারী’তে দেখাইলেন। প্রহসন রচনার পন্থাও মাইকেল দেখাইয়া দেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী সাহিত্য-ঐতিহ্য বোধ হয় অনেকে তাহা জানেন না। গিরিশবাবুর পঙ্কের ছন্দ গিরিশবাবুর নিজের আবিষ্কৃত মছে। ঐ ছন্দের আবিষ্কর্তা আর কেহ নহেন—স্বয়ং কালীপ্রসন্ন

সংহ।<sup>১</sup> সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরিশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক ‘রাবণবধ’-এর title page-এ হুতোম প্যাটার ঐ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া দিয়াছিলেন ; ছন্দ হিসাবে তাঁহারই প্রদর্শিত পদ্য অমূল্য করিয়াছেন। এ সকল কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

“কিন্তু মজা এই যে, গতিক দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে বড়ই unlucky ; কেহ বোধ হয় উহা লইয়া সামলাইতে পারে নাই। দেখুন, পাইকপাড়ার উহা অভিনয় হয় নাই। হইবার উত্তোগ করিতেই রঙ্গমঞ্চে মজলিলি দল ভাঙ্গিয়া যায়।<sup>২</sup> শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে ভাঙ্গা দল লইয়া অভিনয় হইয়াছিল।<sup>৩</sup> অভিনয় হইবার পূর্বেই কিন্তু শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কি কারণে জানি না, উক্ত নাট্য-লভার সহিত নিজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। আরও অনেকে চলিয়া গেলেন। এক রকম করিয়া অভিনয় করা হইল বটে, কিন্তু পূর্বের দল ভাঙ্গিয়া গেল। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক অভিনয় করিবার কিছু দিন পরেই আমাদের গ্রাম্যনাট্য থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।<sup>৪</sup> ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের উপর নারদের একটু অমূল্যতা আছে। কিসে গোলমাল বাধিল ঠিক এখন বলিতে পারিব না ; টাকা কড়ির খরচ পত্র লইয়া মনো-মালিন্য দাঁড়াইয়া গেল। ভৌমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবু নিজেকে a distinguished amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন আমরা সকলেই amateur, তবে গিরিশবাবু অবশ্যই ‘distinguished’ ছিলেন। কেহই মাহিনা লইতেন না। আমরা পেশাদার-ই ছিলাম না। ভাল থিয়েটার নির্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্ত টাকা আবশ্যক, আমাদের সকলেরই কোঁক ছিল যে ঠেজের উন্নতি করিবার জন্ত যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে! এই কারণে থিয়েটারের জন্ত যখন আমরা প্র্যাকার্ড ছাপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্র্যাকার্ডের শিরোনামে লেখা থাকিত—‘For the benefit of the stage’ (ঠেজের উন্নতির জন্ত)। এই কয়টি কথা আমিই বলবৎ করিয়া প্রথম প্র্যাকার্ডের উপর বসাইয়া দিয়াছিলাম। গিরিশবাবুর কাছে একজন গ্রাম্যনাট্য

১ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাটার নম্বা’ (১৮৩১-৩২) প্রকাশের পূর্বে মধুসূদন দত্ত তাঁর ‘পদ্মাবতী’ (১৮৩০) নাটকে কিছু কিছু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে, তিনি ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৩১) নাটকের মজলারূপে লিখিয়াছেন ‘অমিত্রাক্ষর পড়ই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্বত প্রচলিত হয় নাই যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।’ (জঃ ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ ২য়-ভঃ কুমার সেন)।—সঃ

২ ‘শর্মিষ্ঠা’র অভিনয়ের (১৮৩৩) পর (পাইকপাড়ার রাজাদের) বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নাই।<sup>৩</sup> (বঙ্গীর নাট্যশালায় ইতিহাস)।—সঃ

৩ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৭।—সঃ

৪ প্রথম অভিনয় : ২২এ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ ; ৭ই মার্চ ১৮৭০ সালে (কৃষ্ণকুমারী’র) যে অভিনয় হয় উহাই সে বারের মত নাট্যশালা থিয়েটারের শেষ অভিনয়।<sup>৫</sup> (বঙ্গীর নাট্যশালায় ইতিহাস)।—১৫

থিয়েটারকে পেশাদারী থিয়েটার বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,—‘তুনেটা \* বাচিয়ে দিয়েছে রে,—পেশাদারী নয়!’ দেখুন, গিরিশবাবু সঙ্গে আমাদের একটা তখনকার মনোমালিগ্জের কথায় পরমহংসদেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেথরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কেশববাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামাজিক নানা প্রশ্ন লইয়া তখন সভা-সমিতিতে ও পত্রিকার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বাদান্ধবাদ চলিতেছিল। ঠাকুর আনিতে উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘দেখ তোমাদের দুজনের ঝগড়া যেন রাম-শিবের লড়াই। রাম শিবের গায়ে বাণ মারুছেন, শিবও রামের গায়ে বাণ মারুছেন, আবার তখনই রাম শিবকে স্তব করুছেন, আর শিব রামকে স্তব করেছেন, কেন না রামের গুরু শিব, আর শিবের গুরু রাম। দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবার কিছু বাধা নাই, কিন্তু যত গোল বাধিয়ে দেয় রামের বাদরগুলো আর শিবের ভূতপ্রতগুলো। তোমাদেরও ঝগড়া সহজেই মিটমাট হয়ে যায়, কিন্তু যত গোল করছে ঐ বাদর আর ভূতপ্রতগুলো।’...গিরিশবাবু সঙ্গে ক্রান্তনাল থিয়েটারের প্রণয়ভঙ্গের জন্য ভূতপ্রত-বানর যে কতকটা দায়ী ছিল না এমন কথা বলা যায় না। সে যাহা হউক, টাকার কথা বলিতেছিলাম। আমরা কেহই বেতনভোগী ছিলাম না। অর্ধেকদুই কিছু টানাটানি ছিল; তাঁহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। নৌদর্পণের তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্ধেকদুই অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম; কোনও রকম করিয়া যোগেশনাথ মিত্রকে দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্ধেকদুই বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পিতা ৮শ্রামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় চাক্ষুশ টাকা দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গোল মিটিয়া গেল। ইহার জন্য অর্ধেকদুইকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ উন্নাত করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃকপাত করিবার অবসর পান নাই। তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাবর মাসে মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, ‘কিছু কিছু বৃষ্টি’ প্রহসনের অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়।<sup>১</sup> সুতরাং থিয়েটারের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। যদি

\* আত্মীয়-বন্ধনের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনন্তলাল বসু তুনি বোস বলিয়া পরিচিত।—লেখক

১ ১৮৬৭ সনের ২রা নবেম্বর মংগলি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যোতীর্গাকো, কল্যাণাটার বাড়ীতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘কিছু কিছু বৃষ্টি’...প্রহসনের অভিনয় হয়।.....প্রহসন থানির সর্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর প্রতি প্রহসন কটাক ও আক্রমণ ছিল।.....অর্ধেকদুইয়ের সবচেয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ‘নটচূড়ামণি অর্ধেকদুইয়ের’ পুস্তিকার বলিয়াছেন, ‘কিছু কিছু বৃষ্টি’তে অর্ধেকদুই অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গবন্ধে পদার্পণ। উক্ত প্রহসনে তাঁহার ভিনটি অংশ ছিল। তাহার একটি অংশ রাজবাড়ীর কোন সম্রাট ব্যক্তির বিক্রম। ইহাতে তিনি তাহার পিতৃস্বা-পুত্র বিরক্তিকাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যানোবী অর্ধেকদুই কান্দ হইলেন না, তাহাতে তাঁহার পিতৃস্বা (মহারাজ বতীন্দ্রসিংহ ঠাকুরের জমীদার) পুত্র পরিভাষণ করিতে হয়।’ (বঙ্গীয় নাট্যশালা ইতিহাস)—সং

আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইত। সে যাহা হউক, টিকিটলব্ধ অর্থ আমাদের খরচ চলিয়া গেলেই হইল; সে টাকা যে আবার বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে এমন কল্পনা আমাদের কাহারও ছিল না। তাই বলিতেছিলাম, কেন যে আমাদের মধ্যে গোলযোগ বাধিয়া থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল, তাহা ঠিক আপনাকে বলিতে পারিব না; কেন না, যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটারে আমাদের অভিভাবক স্থানীয়গণ সকলকে সম্ভাবজনকরূপে টাকার হিলাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। থিয়েটারের শেষ অভিনয়রজনীতে যবানিকা পতনের পূর্বে ‘জ্যাঠা’ বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরিশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন :

‘কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।

সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলো না আমার ॥

এ সত্তা রসিকমিলিত,

হেরিয়ে অধিনী চিত

আধ পুলাকিত

আধ হ্রতাসে শুকায় ॥

অন্তগামা দিনমণি

যেমতি হেরি নলিনী

আধ ধনি বিমলিনা,

আধ হাসি চায় ॥

যম প্রাতি স্বতুপতি

হয়েছে নিদ্রা অতি,

হাসাইছে বসুমতী,

আমারে কাদায় ॥

নির্মাইয়ে নাট্যালয়

আবিস্তব অভিনয়,

পুনঃ যেন দেখা হয়

এ মিনতি পায় ॥’

‘গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আশ্চর্যশোভিত করিতে লাগিলেন। মঞ্চচক্রে লোটুক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুণ গুণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী অক্ষুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—‘কেন তোমরা বন্ধ করবে? কেন তোমরা বিহার ছাড়? তোমাদের জীবন কেন? যেখানে অভিনয় করবে আমরা আমরা বৈকি!’ যোধ

হয় সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা তাঁহার খাতা খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতাম, তাহা হইলে একটা নাট্যালয় নির্মাণের খরচ তখনই সহি করাইয়া লইতে পারিতাম।

“১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যমামিনীর সেই করুণ বিলম্বগীতি আজিও থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে গুঞ্জনিত হইয়া উঠে। আমার সেই উদ্দাম যৌবনের বসন্তোৎসবে সেই ‘আধ-পুলকিত আধ-ছত্যাশে-সুকায়ে’ হৃদয় আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তা’র পরে কত বসন্ত আসিল ও গেল; কত হাসি কান্নার ভিত্তর দিয়া আমার জীবন-নাট্য লীলায়িত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই যাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্মৃত হই নাই। তখন যৌবন ছিল, মনে সাহস ছিল ‘পুনঃ যেন দেখা হয়’ বলিয়া মিনতি করিতে পারিয়াছিলাম; কায়মনোবাক্যে সাধনা করিয়াছিলাম; সিদ্ধিলাভও হইয়াছিল। সেই সাধনা ও সিদ্ধির কথা পরে বলিতেছি।”

২১এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

অনুভবাবু বলিলেন, “শ্রাশনাল থিয়েটার ডাকিয়া গেল। দলদলির নৃত্যপাত পূর্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল। ঠেজের মালপত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক বলা হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, শ্রাশনাল থিয়েটারের ঠেজ গিরিশবাবুর বাড়ীতে রাখা হইবে।

“অল্প দিনের মধ্যেই সেই ঠেজ টাউন হলে বাধা হইল। আমাদের সহিত এই নৃত্তন থিয়েটারের কোনও সম্পর্ক রহিল না। তাঁহারা ‘নীলদর্পণ’ অভিনয় করিলেন।<sup>১</sup> দেশী হাসপাতালের সাহায্যার্থ এই অভিনয় হইবে। এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল।

“এই কথাটা একটু ভাল করিয়া বলা আবশ্যক। আমি আমার শ্রুতিকথা বলিয়া যাইতেছি; ঠিক যে থিয়েটারের ইতিহাস দিতে বলিয়াছি, তাহা নহে। তবে আমার শ্রুতিকথার অনেকটাই আমার নাট্য-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই নাট্য-সাহিত্যের ও রসমঞ্চের বিবরণ হয় ত কিছু বেশী হইয়া পড়িতেছে। আবার নিজের শ্রুতিকথা বলিতে হইতে First Person Singular-এর উপর কিছু বেশী জোর পড়িয়া যায়; সেই যে ছেলেবেলায় I by myself I কর্তৃক করিয়াছিলাম, আজও তাহার হাত এড়াইতে পারি নাই। তাই মাঝে মাঝে বোধ হয় একটু চেষ্টা করিয়া সেই কেন্দ্রস্থ ‘I’-এর অন্ত বিবরণ দেখিবার অবসর করিয়া লইতে হয়।

“এই যে টাউন হলের থিয়েটারের দল, ইহারা আমাদের সেই শ্রাশনাল থিয়েটারের ডাক দল; আমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরই গিরীশবাবু এই ভগ্নাংশটিকে শ্রাশনাল থিয়েটার নামে রেজিষ্টারি করিয়া লইলেন।

“এই সঙ্গে আমাদের আর একটি দেশীয় অনুষ্ঠানের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। ডাক্তার ম্যাকনামারা নামে তখন কলিকাতার চক্ষুরোগের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গিরীশচন্দ্র দাস ও অন্যান্য কয়েকটা বাক্সলী ভদ্রলোককে ধরিয়া বলিলেন,—যেমন করিয়া হউক একটা দেশীয় হাসপাতালের জন্য কিছু টাকা তুলিয়া দেওয়া চাই। বৃন্দাবন পালের পুত্র রাজেন্দ্র পাল সে সময়ে সখের থিয়েটারের একজন টাই ছিলেন। তাঁহারই বাড়ীতে পূর্বে ‘নীলাবতী’ অভিনীত হইয়াছিল।<sup>২</sup> ডাক্তার সাহেবের অনুরোধে গিরীশ দাস, রাজেন্দ্র পাল ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক টাউন হলে এই থিয়েটারের ব্যবস্থা করিলেন।

১ ২৩ মে মার্চ, ১৮৭৩।—সং

২ ১৮৭২ সনের ১১ই মে রাজেন্দ্রনাথ পালের স্বামবাক্যের বহির্বাটর প্রাঙ্গণে ‘নীলাবতী’র প্রথম অভিনয় হয়।—সং

‘নীলদৰ্শন’ অভিনীত হইল। আমি দুই টাকা দৰ্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, গিরিশবাবু নবীনমাধব লাভিয়া ছিলেন, মতিবাবু ভোয়াপ, গোবি ( ভক্তার রাধাগোবিন্দ কব ) সৈরিক্সী—মাধু ( শ্রীবক্ত রাধামাধব কব ) লাভিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমার এখন মনে পড়িতেছে না।

‘এইখানে মাধুর কথা কিছু বলিয়া রাখি। আমরা যখন সান্যালদের বাড়ীতে অভিনয় করি’, তখন মাধু আমাদের দলে ছিলেন না, বিশেষে শোভমাষ্টারি করিতেন। শোভা আফিলে চাকরি লইবার পূর্বে লখের দলের অভিনেতৃগণের মধ্যে মাধু প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমার যখন নাট্য জীবনের আরম্ভ হয় নাই, তখন ‘সধবার একাদশী’র রামমাণিকা ভূমিকার মাধুর খ্যাতি আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। তাঁহার অভিনয় দেখিবার বাসনা আমার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইল না। ‘লীলাবতী’তে তিনি কীরোদবালিনীর ভূমিকার সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সুদূর কাশীতে বলিয়া আমি তাঁহার কৃতিত্বের কথা শুনিলাম; তাঁহার অভিনয় দৰ্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না! সান্যালদের বাড়ীতে আমি যখন সৈরিক্সীর ভূমিকার তালিম দিতাম, তখন অর্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে হুঃখ করিয়া বলিতেন—‘আহা, যদি মাধু এখানে থাকত, কি চমৎকার সৈরিক্সী হ’ত!’ গিরিশবাবু আমাকে একদিন বলিলেন,—‘বাস্তবিক যে নিজে কাঁদতে জানে না, সে পরকে কাঁদাতে জানে না; মাধুর কারা অন্তরের ভেতর থেকে কেটে বেরোর; মাধু কাঁদতে জানে।’

‘সে যাহা হউক, সে রাজির টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্তার ম্যাকনামারার হস্তে অর্পিত হইল। এমনি করিয়া মেয়ো হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনে বাঙ্গালীর খিয়েটর অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হইল।

‘আর একটি কথা আপনি নোট করিয়া লইতে পারেন। যে গোবি একদিন মেয়ো হাসপাতালের উদ্দেশে টাকা তুলিবার জন্য সৈরিক্সী বেশে টাউনহলে অভিনয় করিয়াছিল, সে এখন এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল ও কলিকাতার উত্তরাংশে আর একটি মেডিক্যাল কলেজ<sup>১</sup> স্থাপনে লক্ষ্যপ্রযত্ন হইয়াছে। সৈরিক্সীর বেশে গোবিকে আমি ঈশাকবারিত গোচনে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া বিস্মৃত ও পুলকিত হইলাম। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই।

‘আমাদের ট্রেজ ও সীন্ ছিল না। ভাঙ্গাফল যখন টাউন হলে গেলেন, আমরা পরামর্শ করিলাম ‘অপেরা হাউস’ ভাড়া লইয়া প্লে করিতে হইবে। টাউন হলে ‘নীলদৰ্শন’ অভিনয়ের কিছু পরেই আমরা লিগুসে ষ্টীটে মাইকেলের ‘শর্মিষ্ঠা’র অভিনয় করিলাম।<sup>২</sup> চুইরাজি অভিনয় হইল। অনেকগুলি প্রহসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

‘এই প্রহসন-সাহিত্য সন্দেহে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। আজ শুধু

১ ১৮৭২-৭৪।—সং

২ বর্তমান R. G. Kar Medical College & Hospital।—সং

৩ ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩।—সং



ছটি একটি কথা আপনাকে বলিতে পারি। ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে সব-ডেপুটী জৈয়ার করিবার জন্য স্থল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany, Chemistry, আইন, জরীপকরা, সংরক্ষণ, জিম্ভাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিজ্ঞা আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে সব-ডেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গভর্নমেন্টের সর্কুলার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার Cartoon বাহির হইল; কয়েকজন জিম্ভাষ্টিকের পোষাকপরা বান্দালী যুবক সার গাঁধিয়া দণ্ডায়মান,—তাহাদের কাপে চিমটে, কোমরে শিকল। সব-ডেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্জমান। আমাদের থিয়েটারের জন্য প্রহসনের সুন্দর মাল মসলা পাওয়া গেল। বেশ সম্বাদার ফার্স রচিত হইয়া গেল। চলেবেলা হইতেই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা লইয়া আমরা কত হাসি ঠাট্টাই যে করিতাম তাহা বলা যায় না; সাহেবের গলার স্বর, কথা কহিবার ভঙ্গ আমরা সুন্দররূপে অমুকরণ করিয়াছিলাম। তখন অনেক ডিম্পেলরিতে মজা বিক্রয় হইত; সমস্তই আমাদের প্রহসন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গেল।

“এই প্রহসন সাহিত্য অনেকটা আমাদের মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল। অর্ধেন্দু, গোবিন্দ, গোপাল দাস, মতি, নগেন বেলবাবু ও আমি, সকলে মিলিয়া মুখে মুখে একখানা impromptu farce শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রচনা করিয়া ফেলিতাম।

“আমাদের সেই যৌবনের প্রহসন—সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে বসিয়া আজ অর্ধেন্দুর কথা বড় বেশী মনে পড়িতেছে। ‘নব নাটকে’ অর্ধেন্দুর কর্তা ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মনে পড়ে; বহুরূপী অর্ধেন্দু শেখর এই কর্তা শাজিয়া যে অভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে; আমার দৃঢ় ধারণা, এইটিই অর্ধেন্দুর masterpiece। পূর্বে<sup>১</sup> অক্ষয় মজুমদার এই ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অর্ধেন্দু যেন ‘কর্তা’কে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। অর্ধেন্দুর মুখে তনিয়াছি যে অক্ষয়বাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিবার সাধ হয়। অক্ষয় মজুমদার তাঁহার আদর্শ ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। মনোমোহন বহুর ‘প্রথম পরীক্ষা’ নাটকে গুলিখোর জামাই নটবরের ভূমিকায় অর্ধেন্দুকে মনে পড়ে। শিশিরবাবুর ‘নরশো ক্লেশরা’য় ছাত্তলাল বেশ অর্ধেন্দুর নিলাম-ডাকা মনে পড়ে। অনেক কথা মনে পড়ে; একদিন ভাল করিয়া অর্ধেন্দুর acting সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিব; আজ নয়। আজ শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লিওনে ট্রিটে আমরা ‘বিলাতী বাবু’, ‘মডেল স্কুল’, ‘উপাধি বিতরণ’ প্রে করিয়াছিলাম; অধঃগবাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়াও সে বকবকে দেখান হইয়াছিল।

১ ১৮৬৭ সনের এই আত্মজীবনী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ‘নব নাটক’-এর প্রথম অভিনয় হয়। (বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস)—সঃ

“সেখানকার নাটালীলা আমাদের অল্প দিনের মধ্যেই লাফ হইয়া গেল ; আমরা কালী সিংহের একটা হুল্‌ ভাড়া লইয়া ষ্টেজের প্রাচীরের বাঁধিতে লাগিলাম ।

“এমন সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল । আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ । অর্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবাবু বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিশেষে যাইতে প্রস্তুত । মেয়ে সাজিবার জন্ত মহেন্দ্র সিংহ নামে একটি হুন্দর ছেলে পাওয়া গেল । ঢাকার মোহনীবোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম ।

“তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র সীমার গোয়ালন্দ হইতে ছাড়িত ; যেখানে সন্ধ্যা হইত সেইখানেই জাহাজ নোঙ্গর করা হইত । জাহাজে আহাৰাদির অল্পবিধা হইয়াছিল বটে ; কিন্তু ঢাকায় যে রান্ধুনি বামুন পাওয়া যাইবে না তাহা আমরা পূর্বে কল্পনাও করি নাই । শেষে দলের মধ্যে ঘাহারা বেচারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের উপর রন্ধনশালার ভার অর্পিত হইল । সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক কালিবাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন ; ইনি পরে ঈড্‌ন হিন্দু হোষ্টেলের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন ।

“ঢাকার আতিথ্য-সংকার আমি কখনও বিশ্বস্ত হইব না । মোহিনীবাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন ; সেই বাগানবাড়ীটি ঠিক বড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত । বড়িগঙ্গা তখন কূলে কূলে প্রবাহিত । বড় বড় সীমার ঢাকা সহরের কিনারায় গিয়া লাগিত । রবিবার দিনে প্রাতে কলিকাতা হইতে সীমার ছাড়িলে পরদিন বৈকালে উহা ঢাকায় গিয়া পৌঁছিত ।

“ঢাকা সহরে একটি বাধা ষ্টেজ ছিল । বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে ‘নীলদর্পণ’ লইয়া অবতীর্ণ হইলাম ; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদেরিগকে সাহায্য করিল ; সহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অন্তর দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট রাম্পানি, পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন । একরায়েই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম ।

“ঢাকায় অবস্থান-কালে সেখানকার বড় বড় ইংরাজ রাজকর্মচারীদিগের সহিত তত্ত্বাত্ত্ব ফুল-কলেজের ছাত্রদিগের যে প্রীতির সম্পর্ক দেখিয়াছিলাম তাহা তুলিলে আপনি অবাক হইয়া যাইবেন । ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবকে বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত রাত্তার দাঁড়াইয়া গল্প করিতে দেখিয়াছি ।

“প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম । অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করিলাম । অর্ধেন্দুক লইয়া সমস্ত সহর উন্নত হইয়া উঠিল । আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্ত কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ Honore করিয়াছে কিনা জানি না ।

“বেঙ্গল টাইম্‌স্‌ পত্রিকার আমাদের ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়ের বিজ্ঞপাশ্রক সমালোচনা বাহির হইল। আমি একটি ছোট-খাটো ফার্স রচনা করিয়া পরদিন লঙ্কার পর মুদ্রিত বেঙ্গল টাইম্‌স্‌ কাগজে পেন্টুলান, কোট টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তদ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া টেবলের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া কেম্প নাহেবকে বিজ্ঞপ করিলাম। মজা এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট রাস্পৌনি ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্‌ বাকালী দর্শকবৃন্দের হাশ্বতরঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

“আমরা ‘হিন্দু গ্রামনাথ থিয়েটার’ নাম লইয়া ঢাকার আসিয়াছিলাম।<sup>১</sup> ভাগ্যলক্ষী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পূর্বাতন বন্ধুরা ঢাকার গেলেন। তাঁহারা মোহিনীবাবু মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবুর) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসার লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকার তাঁহারা আসার জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সরিকটে লক্ষ্মী বাড়ীতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবনবাবুর বাড়ীতে থিয়েটার করিলেন।

“এইখানে আপনাকে একটা বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। আপনার মুখে শুনিতেছিলাম যে এই দলটিকে ‘বিশ্বকোষ’র লেখক ‘ধর্ম্মদাস বাবুর দল’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গ্রামনাথ থিয়েটারের কোনও ব্যক্তি যে রাজার দলের অধিকারীর মত একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছিলেন, তাহা নহে। যে দলে মহেন্দ্র বসু, গোপাল দাস, মতিলাল সুর, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি বাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন সে দলকে ধর্ম্মদাসবাবুর দল বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে কেন? বরঞ্চ তাহাকে রাজেন্দ্র পালের দল বলিলে সুশোভন হইত।

“প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অনেকেই এক একজন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কেহ কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদিগকে লইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। উভয় দলের যে ঠিক মিলন হইল, এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পরে দ্বিপাতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজা প্রেমদানীধ রায়) অগ্রপ্রাণন উপলক্ষে গ্রামনাথ থিয়েটারের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েকজন গেলেন না।

“এদিকে ছাত্তুবাবুর (৮আন্তোব দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৮শরৎচন্দ্র শোষ) ছাত্তুবাবুর বাড়ীর লঙ্ঘনের মার্গে<sup>২</sup> একটি নৃতন খোলার স্বরে বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া একটি নৃতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। সাইকেল বধুস্বয়নের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, ‘তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে

১ মে ১৮৭০।—সং

২ বর্তমানে এই স্থানে ‘বিভিন্ন ক্রীট ডাকঘর’ অবস্থিত।—সং

কিছুতেই ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎবাবু তত্ত্বাপতি Mr O. C. Dutt (৬উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস ('হরি বৈষ্ণব' নামে ইনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ভাষাঙ্গু গিরীশ), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটু বাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যাৰিষ্টাৰ ৬উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়া), প্রিয়নাথ বসু (ছাত্তাবাবুৰ ভাগিনের), অক্ষয়কুমার মল্লিকবাবু প্রভৃতি যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারি জন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগন্তাবিনী, গোলাপ (পরে শুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।

“১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাইকেলের ‘শর্মিষ্ঠা’ লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার অভিনয় আরম্ভ করে। এবারে এ ষ্টেজেও মাইকেলের নাটক জমিল না। তাঁহার রচিত ‘মায়াকানন’ লইয়া যে তাঁহারা অধিকতর সাকল্য লাভ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

“এমন সময় মোহান্ত এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হইল; পথে ঘাটে সর্বত্রই লোকের মুখে ঐ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। বেঙ্গল থিয়েটার সময় বুঝি। ‘উঃ মোহান্তের এই কি কাজ!’ নামে একখানা নাটক ষ্টেজে খাড়া করিলেন।’ সমস্ত দেশের লোক যেন সেদিন বেঙ্গল থিয়েটারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। থিয়েটারের কপাল ফিৰিয়া গেল।

“তাহার পর প্রতি শনিবার রাতে ‘মোহান্তের এই কি কাজ’ অভিনীত হইতে লাগিল। ধর্মদাসবাবু, নগেনবাবু, ভুবন নিয়োগী ও আমি একদিন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখিবার জন্ত থিয়েটারের দ্বারদেশে গিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া টিকিট কিনিতে পারিলাম না।

“অর্ধেক দু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, নানা দেশবিদেশে মিশনবির মত ঘুরিতেছিলেন। একথা আমি অকুণ্ঠিত চিন্তে বলিতে চাই যে, থিয়েটারের যদি কেহ কখনও মিশনবি হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্ধেকদুশ্বখর মুক্তি পিত্ত আর কাহারও নাম করা যায় না। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন ষ্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলান, অর্ধেক দু তখন বঙ্কর বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

“ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া ‘মোহান্তের এই কি কাজ’ অভিনয় করিয়া আসিলাম।<sup>১</sup> এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গান্ধী; নগেন, নবীন সাজিলেন; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।

“এদিকে মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট হইতে জমি তাড়া লইয়া আমরা গ্রেট স্ট্রাশফিল্ড থিয়েটার নাম দিয়া লিউইস থিয়েটারের অধিকরণে একখানি কাঠের বাড়ী তৈরী করিলাম। সেখান, আমরা তখন ছয়ছাড়া হইয়া, ভানিয়া ভানিয়া বেড়াইতাম।

লিউইস থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা পুরাতন স্থলভানার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া অল্পত্র নূতন থিয়েটার স্থাপিত করিলেন। ধর্মদাস, নগেন ও আমি স্থলভানার বাড়ীর মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্মদাস ঐ মডেলের অনুকরণে নূতন থিয়েটারের বাড়ী নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে কখনও কোথাও engineering শেখে নাই। আমি দ্বিবারত তাহার সঙ্গে থাকিতাম। আমরা ‘পিট’-এর টিকিট কিনিয়া লিউইস থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গেলাম। অতদূরে বলিয়াও ধর্মদাস curtain-এ কয়-পর্দা কাপড় লাগে তাহা ঠিক করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড়ের বহর দেখিয়া সমস্ত নিজে জোপাড় করিয়া লইল। এইজন্যই আমি বলি যে, ধর্মদাস বাঙ্গালীকে ষ্টেজ নির্মাণ করিতে শিখাইয়াছেন, অর্কেন্দু ও গিরিশবাবু বাঙ্গালীকে অভিনয় করিতে শিখাইয়াছেন। এই ষ্টেজ নির্মাণ করাইতে ভূবন নিয়োগীর ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

‘সে যাহা হউক, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার রহিয়াছে, ঐখানে আমাদের নূতন থিয়েটারের ষ্টেজ নির্মিত হইল; কিন্তু কি নাটক অভিনীত হইবে তাহা স্থির হইল না। বেঙ্গলে তখন ‘মায়াকানন’ লইয়া নাড়াচাড়া করা হইতেছে; জম্মাট বাধিতেছে না। বাজারে এমন নূতন কোনও বই নাই যাহা ষ্টেজের উপর চালনসই হইতে পারে। মহা বিজ্ঞাটে পড়া গেল। নগেন আমাকে বলিলেন—‘তুমি না হয় একটা লিখে ফেল; ঐ ‘মায়াকানন’ ডেক্রে-টেকে একটা যা হয় কিছু তৈয়ার করে দাও।’ আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া ‘মায়াকানন’ নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Tale-ই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর আমাদের গ্রেট গ্র্যান্ডনাল্ থিয়েটার খোলা হইল। মি: উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) আমাদেরিগকে বলিলেন,—‘তোমাদের এই নূতন থিয়েটারের দেয়ালের গায়ে লিখে দিচ্ছি যে স্বীলোক অভিনেত্রী বাহু দ্বিগে তোমাদের এ থিয়েটার ১৭১৮ দিনের বেশী চলবে না।’ তিনি যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই নূতন ষ্টেজে আমরা নিছক পুরুষ মাত্র লইয়া পূর্বের মত অবতীর্ণ হইলাম।

‘সে রাজ্যে আমাদের থিয়েটার-ভবন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি লেখিন ‘কাম্যকাননের’ নামকরূপে অবতরণ করিয়াছি। ষ্টেজের উপরে ভীমা কালী-মুর্তি! নৃমণ্ডমালিনীর সর্বদা লাল আলোক-রশ্মি ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সমুখে চিনির নৈবেদ্য অগ্নিয়া উঠিল। আমি জাহ্নু পাতিয়া কয়ঘোড়ে বলিতেছিলাম—‘হা কি অগ্নিমুর্তিতে আমার পূজা গ্রহণ করিলেন?’...অগ্নি চারিদিক হইতে আগুন! আগুন! ধনি উঁখিত হইল; হুপ্ হাপ্ করিয়া দর্শকগণ লাকাইয়া পড়িতে লাগিলেন। Auditorium-এর দিকে চাহিলে দেখি আমাদের কার্ভের বাড়ীর বহুখণ্ডের দেয়াল

দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ঠেকের উপরে আমি চিত্রাৰ্পিতের দ্বার দণ্ডায়মান বহিলাম। মাথা ঘুরিয়া গেল। শহসা দেখিলাম—দুইহাতে সেই চকল নোকের ভিড় ঠেলিয়া ব্যায়ামরীর অখিল সেই অনলশিখার সম্মুখীন হইয়া ঘুসি ও লাথি মারিয়া মড় মড় করিয়া তক্তা ভাঙিতেছে। আমার চমক ভাঙিয়া গেল। যে যুরোপীয় কন্ট্রোল দর্শকবৃন্দের স্বাক্ষর জন্ত সে রাস্তিতে তথায় উপস্থিত ছিল, অব্বেষণ করিয়া তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। জনকতক বাঙ্গালী যুবক অখিলকে সাহায্য করিল। কাঠের বাড়ীর এক অংশ ভাঙিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্বাপিত করা হইল।

“বাহিরে দর্শকবৃন্দ একত্র হইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, আমাদের শত্রুরা এই কাজ করিয়াছে। বাহিরের লোকেরা ‘টিকিটের পরনা ফিরিয়ে দাও’ বলিয়া চাৎকার করিতে লাগিল। মনোমোহন বহু মহাশয় তাহাদিগকে ভাল কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; তাহার কথা তাহারা উড়াইয়া দিল। অর্ধেক দুই তাহাদিগকে একটা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন মিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন—‘তুমি যা হয় একটা কিছু বল; ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা কর।’ আমার তখন সেই hero-র বেশ পরা ছিল। ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে জোড় হস্তে দাঁড়াইলাম। তাহারা চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—‘আমার একটি নিবেদন আছে; অল্পগ্রহ করিয়া শুনিবেন কি?’ তাহারা বলিলেন,—‘শুনিব।’ আমি ঠেকের উপরে হাঁটু গাডিয়া বলিলাম। বিনীতভাবে বলিলাম—‘আপনারা আমাকে দুটা কথা বলিবার অনুমতি দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; তজ্জন্ত আমি আপনাদিগকে সৰ্ব্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আজ আমাদের বড় লাখে আগুন লাগিয়াছে; আমাদের দুঃখের গভীরতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র লাখ-লাখনা করিয়া আমরা এই ঠেক গড়িয়া-তুলিয়াছিলাম, কত উৎসাহে এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া কেহ এ কাণ্ড ঘটায় নাই। বেশ দেখা যাইতেছে যে দেয়ালের গায়ে গ্যাস-বাল্বে চিমনি বসান হয় নাই; তাই উত্তাপের আধিক্য বশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমাদের সৰ্ব্বনাশ হইয়া গেল। আপনারা জানিবেন এমন শত্রুতা মাহুবে করিতে পারে না। (চারদিক হইতে ‘না, না,’ শব্দ ধ্বনিত হইল)। এখন টিকিট বিক্রয়লব্ধ পরনা কেমন করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায়? আপনারা সকলেই নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনারা নিকটে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একদিন আপনারা বিনা পয়সায়

আমাদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।'.....তাহারা সঙ্কটে হইয়া চলিয়া গেলেন।  
এখানে বলিয়া রাখা ভাল,—‘কায়াকানন’ আর কখনও অভিনয় করিবার চেষ্টা করা হয়  
নাই। সে কাজ ভালই হইয়াছে।

“পরদিন,—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে—বেলভেডিয়ায় Fancy fair  
উপলক্ষে আমরা অভিনয় করিলাম।”

## এগার

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

প্রবীণ নাট্যচর্চা \* শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর মহাশয়-বলিলেন—“আপনার ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’ পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অল্পভব করিতেছি। ১৮৭২ সালের শেষার্শেবি কলিকাতায় পাব্লিক ষ্টেজের বনিয়াদ পস্তনের সঙ্গে তুমি বোসের (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে, ইহা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। বাস্তবিকই তৎপূর্বে তুমি বাবু কোনও থিয়েটার দেখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি ১৮৭২ সালের কিছু পূর্বের কথা আপনাকে বলিতে পারি। আপনি ষ্টেজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; বোধ হয় আমি আপনাকে দু’একটি নূতন কথা শুনাইতে পারি। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের মালমসলা গত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দুই তিনটি ভদ্ৰলোক আমার নিকট হইতে লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; ‘বিশ্বকোষ’ অভিধানের লেখক তন্মধ্যে অন্ততম।”

‘বিশ্বকোষে’ রঙ্গালয়ের ইতিহাসের একটি বিশেষ ক্রটির উল্লেখ করিয়া আমি বলিলাম, “আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট হইতে নূতন করিয়া সেই সকল মালমসলা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শৈশবের স্মৃতিকথা আরম্ভ করুন।”

তিনি বলিলেন—“১৮৫৩ সালের পৌষ মাসে সাঁতরাগাছিতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর আমার চেয়ে এক বছর পাঁচ মাসের বড়। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন আমার পিতৃদেব (বর্গীর ভাক্তার দুর্গাদাস কর) বরিশাল হইতে ঢাকায় বসিল হইয়া গেলেন।

“শৈশব হইতেই সঙ্গীতের দিকে আমার কেমন একটা সহজ প্রবণতা ছিল। আমার পিতৃবন্ধুগণের মধ্যে যদি কেহ আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া গান গাহিতেন, দুই তিনবার শুনিলেই আমি তাহার সুর তান লয় আরম্ভ করিয়া লইতাম। জীবনে আমি প্রথম গান শিখি এই ঢাকা সহরে। সেটি আমার এখনও বেশ মনে আছে :—

(সুর—শঙ্কর আড়ম্বেরটা)

নবীন নাগর রসের নাগর

তুলবে কেন আমার দেখে।

তোমার মত নবীন নারী

হ’তের যদি লো হৃদয়ী,

নাগরের মন করে চুরি

কাল কাটাতাম মনের স্তখে।

\* ভারত সঙ্গীতলাভ হইতে একবার শ্রীযুক্ত কর মহাশয়ই নাট্যচর্চা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।



“ঢাকায় আমাদের একটি মুসলমান পরিচারিকা ছিল, বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া সে বাহিরে বেড়াইত। আমার বেশ মনে পড়ে আমাদের সেই মুসলমান দ্বাই আমাদের একটু ছাড়িয়া দিয়া আপন মনে গান গাহিত—

শাহজাদে আলম তেরে নিয়ে  
জঙ্গল সহর বিয়া বান ফিরে,  
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম  
দিল্লী সহর মুলতান ফিরে।

“তাহার মুখে এই গানটি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত; অতি অল্প আয়ালেই আমি উহা আয়ত্ত করিয়া গইলাম। তাহার সেই করুণ-কোমল কণ্ঠস্বর আজও যেন আমার কর্ণে বাজিতেছে।

“এই সময়ে ঢাকার সখের যাত্রার খুব ধুম। অধিকাংশ পালা কুম্ভ বিষয়ক। আমাদের বাড়িতে একবার একদল সখের যাত্রাগান করে, আজও তাহার একটা গান আমার কিছু কিছু মনে আছে—

কাল নিত্রা কেন অঙ্গে এলি।  
তোর কি এত ধার, ছিল যে রাধার,  
রাধার মূল্যধার কোথায় লুকালি।

“দীনবন্ধু মিত্র তখন ঢাকায় ডাকঘরের ইন্সপেক্টর, আমার পিতাঠাকুর ছিলেন সরকারী ডাক্তার, এ সিম্পসন ছিলেন সিভিল সার্জন; তারকনাথ ঘোষ ছিলেন সদরদালা; ভোলানাথ পাল, ঢাকা কলেজের অন্ততম শিক্ষক। দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ঢাকার একটি ছাপাখানায় ‘নীলদর্পণ’ মুদ্রিত হইতেছিল। প্রত্যহ রাত্রি ১১০ টার সময় দীনবন্ধুবাবু আমাদের বাসায় আসিতেন; বাবা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার নিজের শরন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তখনে নীলদর্পণের প্রথম সংশোধন করিতেন। ‘ভৈরবজয়ারদ্বারলী’ গ্রন্থ রচনা করিয়া বাবা বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না যে ১২৭০ বঙ্গাব্দে তাঁহার একখানি নাটক ঢাকায় মুদ্রিত হয়, উহার নাম ‘স্বর্ণশুভ্র নাটক’। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে উক্ত নাটকখানি ১২৬২ বঙ্গাব্দে বরিশালে রচিত ও অভিনীত হয়।

“শৈশবকালেই আমার লাকলাফি বোড়ায় চড়া বন্ধুক ছোড়া ইত্যাদি দেখিয়া গুরুজন যে উদ্ভয় করেন নাই এমন কথা বলিতে পারি না। লেখাপড়া আমার আদর্শ ভাল লাগিত না। তাই গোড়াতেই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে আমার মত অপণ্ডিত লোকের জীবন-কাহিনী প্রবণ করিতে আপনার কৌতূহল কেন হইল বুঝিতে পারি না। তবে আমার মনে হয় যে সেকালের সমাজের যে অংশে একটু আলোকরশ্মি ফেলিতে পারিব, বোধ হয় কোনও সুপণ্ডিত বিজ্ঞ বক্তা ঠিক তাহা করিতে পারিবেন না। বাহা হউক, আপনি যখন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিয়া যাইতেছি।

“১৮৬২ লালে বাবা, বেউরিয়া বেউকার অধ্যাপক রূপে ঢাকা হইতে কলিকাতায়

বদলি হইয়া আসিলেন। আমি ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হইলাম। বোধ হয় সে সময়ে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ স্কুলে আমাদের চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। স্কুলে পড়াশুনা যত হউক আর না হউক, বিদ্যালয়ের বাহিরে সঙ্গীতচর্চা, বিশেষতঃ বাঁশী বাজান, খুব চলিতে লাগিল। বোধ হয় ১৮৬৫ সালে আমার প্রথম সখ চাপিল—ফ্লুট বাঁশী বাজাইতে হইবে। আমার পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় ফ্লুট বাজাইতেন; তাঁহার বাঁশী আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমার আগ্রহাতিশয়া দেখিয়া মিত্র মহাশয় আমাকে একটি বাঁশী দেন, এবং নিজের শিখাইয়া দেন কেমন করিয়া সা, রি, গা, ম, প, ধ, নি ফু” দিতে হয়। স্কুলে পকেটে করিয়া বাঁশী লইয়া যাইতাম। কয়েক বৎসর পরে আমি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হই। পাথুরিয়াঘাটার বড় বাজার জামাই পুণ্ডরীকাক্ষ আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহার আর এক জামাই, চারু, উপরের ক্লাসে পড়িতেন। টিফিনের সময় পুণ্ডরীকাক্ষ মহেন্দ্র গুপ্ত, এন্. সরকার প্রভৃতি আমার সঙ্গীত বন্ধুগণ ও চারু মুখ্যো আমাকে বাঁশী বাজাইতে বলিত। চারু আমাকে সঙ্গ করিয়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া গিয়া নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন—“এই ছেলেটি আমাদের স্কুলে পড়ে; কেমন গাইতে বাজাতে পারে দেখবেন?” তিনি বলিলেন—“বটে? আচ্ছা একটি গান গাও ত? আমি কোনও সঙ্কোচ না করিয়া গাহিলাম—

(স্বর—কাফি যং)

চঞ্চল নয়ন তোর ওলো বেনে বোঁ।

জলে যাবার বেলা,

পথে কিসের খেলা,

মা'কে বোলে দেব তোর।

আমার সঙ্গ যাবি,

যোড়া টাকা পাবি,

গয়না গাঁথানে দেব তোর।

“নবীনবাবু আমার গান শুনিয়া প্রীত হইলেন। ঠাকুরবাড়ীতে তখন বাঁধা টেক ছিল; ঝিল্লের হইত। সেই দিন হইতে তাঁহারের বাড়ীতে অভিনয় দর্শন করিবার জন্ত কার্ড পাইতাম।

“কলিকাতায় আসিয়া আমার সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত একত্র বসিয়া আমি কবিতা আবৃত্তি করিতে ভাল বাসিতাম। মেঘনাদ বধ, নীলদর্পণ, স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক, বুধলা কাব্য, ভুবনমোহন চতুর্দ্বীপ রচিত ‘ছন্দকুসুম’ প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহাদের অধিকাংশ আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমার বড় ভাল লাগিত। ১২৭১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের দেবীপক্ষে পঞ্চমী দিন বেলা দশটা হইতে অপরাহ্ন তিনটা পর্যন্ত যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল, তৎসময়ে সে সময়ে ছোট বড় অনেক কবিতা রচিত হইয়াছিল। ঈশান বাবুও লিখিলেন—

কি ঝাড়ুন ঝেড়েছ বাবা একান্তরের ঝড়ে,  
চাল চুলো সব গেল উড়ে  
বাবা, ঝড়ের কি গুঁতো,  
উড়ে গেল মুতো,  
গরুগুলো হয়ে গেল বেঁড়ে ।

‘ঝড়ের চোটে মুখা ঘাস, গরুর ল্যাজ খসিরা যাওয়ার উল্লেখের পর আর কোনও কবি বাড়াবাড়ি করিয়া একান্তরের ঝড় লইয়া উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা রচনা করিতে সাহস করেন নাই ।

‘যখন শোভাবাজারের কুমার দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের বাভীতে ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক অভিনীত হইতেছিল, আমরা স্তর রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রদোহিত রাখালচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদ্বোধনে শ্রামলাল মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় ইংরাজি নাটক Beauty and the Beast অভিনয় করিলাম । সান্ নাই, পর্দা টাঙ্গান হইল ; তাহার উপরে উজ্জান, রাজবাটা ইত্যাদি শব্দ লিখিয়া Garden ও Palace বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল । অনেক ভক্তলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন । বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এই ইংরাজি অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন ।

‘এই সময়ে দাদামহাশয়ের মুখে হিন্দী গান ‘গোরি বদনপর’...ইত্যাদি শুনিয়া আমি সেই গানটি বাজালায় অনুবাদ করিলাম—

গলায় পলার মালা

সোনা-মুখেতে তোর উকি ।

দেখাইয়ে রূপের রাশি,

গলায় দিলি প্রেমের ফাঁসি,

বাজিকরের বাজির মত

লাগিয়ে দিবে ভেঁকি ।

‘তখন কলিকাতায় যাত্রাগানের খুব ধুম । সর্বত্রই যাত্রার আদর ছিল । গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, বোঁ মাষ্টারের দল, কোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল ( গোপাল উড়ের দল<sup>১</sup> নামে প্রসিদ্ধ ), মদন মাষ্টারের দল, লোকা খোপার দল<sup>২</sup> প্রভৃতি যাত্রার দল তখনকার বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । গোবিন্দ অধিকারী রাজশিবে আসরে নামিতেন ; তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বলিতেন । তৎপূর্বে রাজি নয়টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম গানের ব্যবস্থা ছিল । গোবিন্দ অধিকারীর গোবাক জুয়ি-কান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল । বাহারী স্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহার কলাপাতার গহনা পরিত । অধিকাংশ গানের পালা কৃষ্ণবিষয়ক । প্রধান বাস্তব্য ছিল তানপুরা, খোল ও করতাল ।

১ বিশ্ব বিদ্যরশের লক্ষ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত’ উক্ত্য ।—সং

রাজার 'কোরসের' ব্যাপারটার খুব গোল হইত। কিন্তু প্রত্যেক দলই নাচ গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দ্বুতী সাজিয়া আসরে নান্নিতেন, অথচ কিছুমাত্র বেমানান বলিয়া মনে হইত না। অতি মধুর কীর্তনাদে তিনি সকলকে মোহিত করিয়া দিতেন। মধুরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অধিবর্ণে আসিয়া বিন্দে দ্বুতী গান ধরিল—

জামন্তক নামে প্রিয় পাখী

এদেশে এসেছে উড়ে,

সাধের গোকুল আধার করে

রাধারে দ্বিগ্নেছে ফাঁকি।

দেখেছ কেউ দেখার দেখা ?

পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,

তা'তে রাধার নামটি লেখা,

বাঁকা ঠায় বাঁকা আঁখি।

বিধি যদি পাখা দ্বিত,

পাখী হয়ে উড়ে যেতাম ;

যে বনে সে পাখী আছে

সেই বনে খুঁজিয়া নিতাম ;

পাখীর বরণ চিকণ কাল,

হেরব না আর কত কাল,

বুন্দাবনে পাখী ছিল,

না হেরে তার সুরে আঁখি।

এলাম পাখীর অধিবর্ণে,

দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,

জানে না সে রাই নাম বিনে,

রাই নামেতে লড়া হুখী ॥\*

“এই লকীতের তালে তালে এক পা, দুই পা, তিন পা অগ্রসর হইয়া, আবার এক পা, দুই পা পশ্চাতে হট্টিয়া বিন্দে দ্বুতীর নৃত্য তাহার গানকে অধিকতর মধুর করিয়া দ্বিত।

“বদন অধিকারী বদন গান ধরিত—

“রাই, মিছে গাঁথ মিনি স্ত্রীতোর হার।

বার জন্তে গাঁথ হার,

\* এই গানটির কয়েক চরণ রাধামাধবাবুর সুধর ছিল। সম্পূর্ণ গানটি মহারাজ বতীপ্রসাদেব ঠাকুরের রাজবাড়ীর ভূতপূৰ্ব চিকিৎসক শ্রীকৃষ্ণ ঈশানচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি। আরও একটি সম্পূর্ণ গান তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি।—লেখক।

সে করেছে পরিহার,

আর ত ব্রজে আসিবে না সে ব্রজবিহার—

“তখন দর্শক মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া আহা, আহা, করিয়া রাইয়ের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিত। নাচ গানের উপর যাত্রার দল খুব ঝোক দিত। ঝোড়োর দল ‘কমলে কামিনী’ পালায় জন্ত সর্বত্রই বাহবা পাইত। ঝোড়ো নিজে চমৎকার নাচিতে ও গাইতে পারিত। বোঁ মাষ্টারের দল ‘ফ্রবচরিত্র’ পালা গাইয়া আপামর সাধারণের মনোরঞ্জন করিত। আমার মনে পড়ে দুই রাগীর নাচ ;—তাহাদের অপরূপ নৃত্যভঙ্গী তখনকার কলাকুশলীর বিশ্বয়োৎপাদন করিত। রাগী গান ধরিলেন,

রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা কোরো না।

জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ কোরে,

জন্মাইতে পারো যদি মম উদরে,

তবু হয় কি না হয়,—

আমার উত্তম কুমার আছে জান না।

“আমি এত নিবিষ্ট চিন্তে সেই গান শুনিলাম যে তৎক্ষণাৎ স্বর তান লয়-স্বন্ধ সেই গান আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল।

“ঝোড়োর ‘কমলে কামিনী’র গানগুলিও খুব মিষ্ট ছিল। কুবুড় রাগিণীতে সে গাহিত—

শুন নৃপমণি

না দেখি, না শুনি,

এমন কখনও রূপসী রমণী।

কালীদহ মাঝে,

সরোজে বিরাজে,

উগারিছে গজে গ্রাসিয়ে অমনি।

আবার ললিত রাগিণীতে সকলকে চঞ্চল করিয়া সে গান ধরিত—

এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী।

লোক লাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশিবদনী।

কোথা গেল সেই কদ্বী,

কোথা গেল সে সুন্দরা,

এ মায়া বুঝিতে নাহি,

হবে এ কা’র রমণী।

“মহাশয়, যাত্রাগানের সে দিন এখন আর নাই।<sup>১</sup> গানের স্বরের সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় পর্দায় যেন আমাদের মনচ্চক্ষুর সম্মুখে নব নব সৌন্দর্যের উন্মেষ হইত ; আসরের

১ যাত্রা এসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ অল্পকাল মল্লিকানাথ বস্তুর স্মৃতিবধা স্তব্ধ—‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ (১ম সং), পৃ ২৩-৩২ এক্ষ ৩৮-৩৯।—সং

প্রত্যেক ঝাড় লঠন যেন সেই শব্দের তরঙ্গে রণে রণে করিয়া বাজিয়া উঠিত, নর্তকের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী যেন সেই ধ্বনিভরঙ্গে লীলায়িত হইয়া যাইত। সে বিচিত্র নৃত্যকলার অস্তিত্বজিহ্বা বোধ হয় আমাদের দেশে হইয়া গিয়াছে। প্রজলিতদীপশীর্ষ পিস্তলের পিলুহুজ মাথায় লইয়া প্রকাণ্ড আসরের মাঝখানে নটবরের বিস্ময়কর নৃত্যলীলা আজকালকার বঙ্গ সমাজে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ফুলের ডালি হাতে লইয়া বিজ্ঞানস্বল্পের মালিনীর চোঁতালে নাচ আবালবৃদ্ধবনিতার চমক লাগাইয়া দিত। আবার মহেশ চক্রবর্তীর দলের ‘দক্ষযজ্ঞ’ অভিনয়ে যজ্ঞস্থলে সতীকে না দেখিতে পাইয়া ভৃগুহনির স্ত্রী গান গাহিল—

কই গো প্রস্রুতি, তোমার সতী ভবনে।

এ যজ্ঞ হবে না পূর্ণ সে কন্তা বিনে।

জাননা তনয়া গুণ, আমি জানি বিশেষ গুণ,

ত্রিগুণে ত্রিতাপহরা তাপিত জনে।

“তাঁহার গানের রেশ পর্য্যন্ত যখন মিলিয়া গেল, সহসা নৃত্যকুশলা নাপুতিনী আসরে অবতীর্ণ হইয়া পুটলিটি হাতে লইয়া তাহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর লীলাভরঙ্গে দর্শকমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া গান ধরিত—‘আলতা পরাব মার রাঙ্গা চরণে।’ পূরবাসিনীর ভূমিকায় বেশবিন্যাস করিয়া সুসজ্জিত নট তাহার ঘনবিলম্বিত কেশের উপরে স্থাপিত তিনটি কলম লইয়া যে অদ্ভুত poetry of motion-এর সৃষ্টি করিত, তাহা আপনারা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। নাচ-গানের সে দিন এখন আর নাই। এখন আপনারা কথায় কথায় আঁট লইয়া আলোচনা করেন, কিন্তু আজকাল দেখিতেছি, আপনারা—কারমনোবাক্যে কিনা বলিতে পারি না—অন্ততঃ বাক্যে, অত্যন্ত puritan ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ;—কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ সরসে সন্ধোচে আপনারদের নালিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠে। যে সঙ্গীতের আসরে ভক্তসমাজের পিতা-পুত্র একত্র বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না ; পক্ষীর আডালে স্বাতা স্ত্রী কন্টার অধিষ্ঠান কাহারও কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ হইত না ; সে সঙ্গীত আপনারা বোধ হয় আজকাল আপনারদের মোটা purist মাপকাটিতে পরিমাপ করিয়া পুরিটান দরজিয় দোকান হইতে কাটিয়া ছাটিয়া ভক্তসমাজের উপযোগী করিয়া বাহির না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। আপনারা বোধ হয় ভুলিয়া যান যে, তখনও আমাদের সমাজে পুতচরিত্র পুণ্যলোক নরনারীর অভাব ছিল না, কিন্তু তখনকার সেই সঙ্গীত-কলার আমর করিলে কোনও নরনারীর মনে কোনও প্রকার মলিনতা যে আসিতে পারে, ইহা তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিতেন না। পৌরাণিক ঘটনাবিশেষ তখনকার দিনে রাজাগানের বিষয়ীভূত হইত। রাজার আসরে অথবা কবির লড়াইয়ে সেই ঘটনাটিকে ফুটাইয়া তোলা হইত মাত্র। এখন এমনটি দাঁড়াইয়াছে যে, অসঙ্কোচে কবির লড়াই লইয়া আলোচনা করা শক্য। কিন্তু তখন ভক্তসমাজে কাহারও মনে কোনও খটকা লাগিত না। সত্যবতী অক্ষয়িনীচক্ৰ বঙ্গল বংশরক্ষার জন্য ব্যালমবেবর নিকট

যাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তখন কোনও ভদ্রসন্তানই সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন না ; বরং সকলেই অশালিকার উত্তর শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন । সত্যবতীর কথার পর ঢুলী উঠিয়া ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিল ; সেই অবসরে অশালিকা তাহার উত্তর রচনা করিয়া লইল । কিছুক্ষণ পরে ঢুলী ধামিলে অশালিকা দাঁড়াইয়া গান ধরিল—

আমার ঘটল আজ এ কি জালা,  
 ঠাকুরণ গো,  
 ভেবে মরি করব কি উপায় ।  
 ছিল ঠেকুরো সিংহি ধীবৎ রাজা,  
 জানি তা'র ফরাসডাকায় ধাম,  
 তা'র জ্যোষ্ঠা কন্যা মাত্ৰা তুমি  
 সত্যবতী মৎস্তগন্ধা-নাম ।  
 কাশীরাজার কন্যা মোরা সামান্তা কেউ নই,  
 তোমার পুত্রবধু হই ।  
 চিত্রসেন পতি ছিল,  
 সে আমারে ছেড়ে গেল গো,  
 সেই পতির শোকে মনোহুখে  
 মর্মে মরে রই ।  
 ক'রে ধর্ম্মে ধর্ম্মে ধর্ম্মরক্ষা  
 প্রাণ রেখে সেই পতির পায় ॥  
 তোমার জ্যোষ্ঠ পুত্র যিনি,  
 ঐ ছাথ ব্যাসযুনি বড় ঠাকুর যিনি,  
 দেখে তার মন্নি লাজেতে,  
 তিনি কোন্ সাহসে ঢুকলেন এসে আমার ঘরেতে ।  
 সে যে মস্ত বেড়ে, দাড়ী নেড়ে, অন্দরে ঢুকে,  
 গিয়ে বসল তাল ঠুকে ।  
 আমি তা' দেখতে পেরে,  
 চলে যাই বোমটা দিয়ে গো,  
 সে যে পথ আগুলে  
 দাঁড়ায় লক্ষ্মখে ;  
 করে আঁচল ধরে টানাটানি আঁচল ছাড়ে না  
 তোমার কথার ভাবে বোকা পেছে,  
 এ ঘটন ভূমি ঘটিয়েছ,  
 এমন রাজ্যরক্ষের বংশরক্ষের দায়,

বল কি ফল হবে তার  
 ছি ছি লঙ্কার মরে যাই,  
 আমরা সতীর মেয়ে সাধা সতী পতিব্রতা হই,  
 বরং আত্মহাতী হ'তে পারি এমন কর্ণে দ্বিষ্ট না গায় ।  
 “সত্যবতী অনেক নজির দেখাইলেন । অঘালিকা সোজা উত্তর দিলেন—  
 যদি করতে হয় ত আপনি কর, ঠাকুরণ,  
 ও কথা আমার ব'ল না ।  
 অমন সত্ত্ব ছেলে বিইয়ে দিতে  
 অল্প কেউ ত পারবে না ।  
 বালাকালে নদীর তীরে বাইতিস তরগী,  
 কথা লোকমুখে শুনি,—  
 দেখে তোর রূপের ডালি, অফুট' কমল কলি'  
 তা'তে জল বসায় জ্বল বাঁধালেন পরাশর মুনি ।  
 তুমি একবার ক'বে পার পেয়েছ নাইক কিছু ভয়,  
 এখন যত ইচ্ছে তত কর কেউ ত কিছু বলবে না ।  
 যদি করতে হয় ত আপনি কর, ঠাকুরণ,  
 ও কথা আমার ব'ল না ॥

“তখনকার ভদ্র সমাজের আসরে পুরাণের এই শাস্ত্র-বধূর কথাকাটাকাটি, আজকাল একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে । কবির লড়াইয়ের একটি খাটি নমুনা পর্বাক্তও আজকাল আপনাদের বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার হইতে অব্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ । তাই আজ তখনকার কবির লড়াইয়ের নিদর্শন স্বরূপ এই পৌরাণিক শাস্ত্র-বধূর কথাকাটাকাটি আপনাকে লিপিবদ্ধ করিতে বলিতেছি ।

“কবি আবার অনেক সময়ে ধনী গৃহস্থকে মুখের উপরে কড়া কথা শুনাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না । গৃহস্থও নিজের জটিল স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না । কলিকাতায় একটি বড়লোকের বাড়ীতে ঈশ্বর গুপ্ত একবার আহুত হইয়াছিলেন । তাঁহাকে একটি খেলো হুকায় তামাক দেওয়া হইয়াছিল ; সে হুকো আবার লঙ্কিত ! কবির দল গুপ্ত মহাশয়কে বলিল—‘এইবার আপনি যদি অল্পমতি করেন তবে আমরা গান আরম্ভ করি ।’ কবি বলিলেন—‘দাঁড়াও ; এই গানটা আগে গাও ত,—

নাইক আর তেলের কেঁড়ে,  
 এখন বেড়ে তেতলা ।  
 পেয়ে রাম গোস্বালের গোস্বালগান  
 বেড়েছে খুব বোলবোলা ॥  
 এরা ছিল নদী, বেচ্ছ চুড়ী,  
 হিন্দুর বাঁকী খেত না ।



এখন বাড়ছে rank পাচে thank,  
 ট্যাঁকে ব্যাঙ্ক-নোট ধরে না ।  
 কবির হাতে থেলো হুকো,  
 বাবুর নাম্নে আল্‌বোলা ।

“গান শুনিয়া বাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া গুপ্ত কবিকে ভামাকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া  
 তাঁহাকে নিজের পাশে বসাইলেন ।

“আর একজন ধনীকে লক্ষ্য করিয়া যাদব কবি সম্ভার মাঝে গান ধরিলেন,—

গায়ে মানে না আপনি মোড়ল  
 এন্ন গাডুর গুম  
 ছি, ছি, লঙ্কারম নাইক সেটার  
 আস্ত হুখুম থুম ।

কিবা রংটি চমৎকার,  
 হুকোর নলচে বা কোন ছার,  
 আবলুশ আল্‌কাংরা হেখা কল্‌কে পাওয়া ভার ।  
 দেখে কোলের ছেলে আঁৎকে ওঠে

ছটকে ছুটে পালায় ঘুম ।

“বাক্সালী কবির এই তাঁত্র সমালোচনার কাছে অসংযত হিন্দুগৃহস্থকে নতমস্তক  
 হইতে হইত ।

“কবির লড়াইয়ের কথা বলিতে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রমোদনের মনে পড়িতেছে । প্রসঙ্গ  
 হইল,—শ্রীকৃষ্ণের বৃকোতে তৃণপদচিহ্ন আছে, শ্রীরাধার বৃকোতে কি আছে ?—তৎক্ষণাৎ  
 অপর দল হইতে উত্তর হইল,—নবনারীকৃষ্ণর যখন হয়, শ্রীরাধা সেই নবনারীকৃষ্ণরের  
 মেরুদণ্ডরূপে বিগমিতা হইয়াছিলেন ; সেই কৃষ্ণরপৃষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ আরোহন করিলে,  
 তাঁহারই পদচিহ্ন শ্রীরাধার বক্ষে অঙ্কিত হইয়া যায় । তাই, শ্রীকৃষ্ণ যেমন তৃণপদচিহ্ন  
 বক্ষে ধারণ করিতেছেন, শ্রীরাধাও তেঁর শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধারণ করিতেছেন ।

“এমনই করিয়া পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়া তখন বাক্সালী জঙ্গলমাজ যাত্রাগানের,  
 কবির লড়াইয়ের, তত্ত্বজ্ঞান প্রমোদনের ভিতর দিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিত ।

“শুধু যে বিশিষ্ট জঙ্গলোকেয়াই এ আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা নহে । যে  
 গৃহস্থের প্রাক্ষণে যাত্রাগান, কবির লড়াই প্রভৃতি হইত, তাঁহার গৃহে সেদিন  
 সকলের অব্যবহিত্য ; দ্বারে টিকিট দেখাইতে না পারিলে এই সামাজিক আনন্দ  
 হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এমন কল্পনা তখন কাহারও মনে উদ্ভিত হয় নাই ।  
 এখন আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে দেখুন । আপনি নিমন্ত্রণ পাইলেন, তথাপি  
 আপনার আমন্ত্রণকারীর গৃহে যথাসময়ে প্রবেশলাভ করা দুর্ঘট ; সেখানে গিয়া একখানি  
 টিকিট দেখাইতে হইবে ! তখন হিন্দু গৃহস্থের জিয়ারতের আপামর সাধারণ সকলেই  
 নির্বিচারে আনন্দে যোগদান করিতে পারিলে ।

“তবে, আনন্দ সব সময়ে অনাবিল ছিল না। শতাধিক ইয়ার-পরিবেষ্টিত হইয়া বাগ্‌বাজারের শিবকৃষ্ণ যুথোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষীর মনের নেতৃত্ব করিয়া তাহাদের সমস্ত সংসারিক ব্যয়ভার নিজের স্বর্কে লইয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন গম্ভীরা-আর্টিস্টে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই নীরব গম্ভীরালেবকদিগের আসরে একদিন এক ভিথারিগী আসিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিলে পক্ষিরাজের চমক ভাঙিল। তিনি অমনি গান ধরিলেন—

উঃ, মাগীর ঠ্যাং ছুটো কিবা লম্বা যে,  
 চৌট ছুটো পাকা রজা ;—  
 পেচক জিনিয়া স্তম্ভধর ধনি,  
 কোকিল পোড়ায় খেয়েছ লো ধনি,  
 পেটেতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী  
 করিতেছে হাষা হাষা রে।  
 পক্ষরাজ বলে, আর ভাবিলে হবে কি,  
 মানব আকৃতি এক বয়্যার পেয়েছি,  
 এরে নাও মা জগদম্বা !

“বোধ হয় আপনি ভুলিয়া যান নাই যে, যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, তখন আমি বিভাগলের ছাত্র ছিলাম। আমার মত স্থূল বালককে ছাত্ররূপে পাইবার ভাগ্য হয় আপনার কখনও হয় নাই। হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় ইন্সুলে ইন্সুলে দাঙ্গা হইত। সে রকম মারামারি প্রায় প্রতি শনিবারে ও বড় বড় ছুটির পূর্বে হইত। জেনারল আসেবির ছেলেদের সঙ্গে হেয়ার, হিন্দুর ছেলেদের দাঙ্গাটাই বেশী হইত। আমি একটি দলপতি ছিলাম ; খবর পাইলেই আমার কুস্তিগির পালোয়ান বন্ধুগণ আসিয়া পড়িত ;—অখিলচন্দ্র, বসন্ত বর্ধন, প্রসন্ন গাঙ্গুলী, ভুবন ছতোর, কড়ি ভট্টাচার্য্য, উমেশ দে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো, ভুবন মিত্র, বিনোদ হালদার,—ইহাদিগকে re-inforce করিবার জন্য জাহাজ হইতে গোরা খালসী ভাড়া করিয়া আনা হইত। তাহারা Fighting Charlies নামে পরিচিত ছিল ; কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে boomerang-এর মত অস্ত্র। হেয়ার স্কুলের সম্মুখের নর্দমাঘর কাছে বেলা সাড়ে দশটার সময় দুইজন ইংরাজ প্রব্রুত হইয়া চলিয়া গেল। বেলা এগারটার সময় ইন্স্পেক্টর কের সাহেব তিন চারি শত কন্‌ষ্টেবল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবার ছেলেদের সঙ্গে পুলিশের ভীষণ মারামারি হইল। কতক্ষণ লড়াই হইল বলিতে পারি না ; অবশেষে ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমি ভ্রাম বিখালের বাড়িতে পলাইয়া গেলাম। ইন্স্পেক্টর সাহেব জোর করিয়া স্কুলের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। হেডমাষ্টার গিরীশচন্দ্র দে ও দ্বিতীয় শিক্ষক নীলমণি চক্রবর্তী তাহার সম্মুখীন হইলেন। কোনও বাধা না মানিয়া পুলিশ ত্রিশ-চত্রিশ জন বালককে

ধরিয়া লইয়া গেল। হেডমাষ্টার মহাশয় ছেলেদের জন্য জামিন হইতে গিয়া কলুটোলার ধানার আলামী বলিয়া প্রেস্তার হইলেন। শ্রাম বিখালের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড সভা হইল। বিভাসাগর মহাশয় ও পাখুরিয়াবাটার বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে সভায় কিংকর্তব্য স্থির করিলেন। তাঁহারা জামিন হইয়া ছেলেদের মুক্তি দেওয়াইলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় খালাস পাইলেন। পরিণামে পুলিশেরই অপষণ হইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে এই ঘটনা হইয়াছিল।

“হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াই আমি হিন্দু স্কুলে চলিয়া গেলাম। তখন ভোলানাথবাবু স্কুলের হেড মাষ্টার। আমার মত কয়েকটি ছাত্রের সৌজন্যাতিশয়ো ব্যাধিত হইয়া তিনি আমার বাবাকে বলিলেন—‘আপনার ছেলেটিকে আমার ইন্সুল থেকে সরিয়ে নিন, নইলে আমার ইন্সুল যায়!’

“হিন্দু স্কুল হইতে ডফ সাহেবের স্কুলে চলিয়া গেলাম। যথাসময়ে এন্ট্রান্সের ফী জমা দিবার জন্য টাকা লইয়া, ভাল দেখিয়া একটি বাঁশী কিনিয়া ফেলিলাম। বিভাগলয়ে অধ্যয়নের পালা শেষ হইল।

“এমনই করিয়া বাবাকে ফাঁকি দিয়া চলিতে চলিতে, একদিন পিতৃহস্তে বিষম লাক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া একেবারে বিলাত পলাইবার ব্যবস্থা করিলাম। বন্ধুগণের ও দাদার সহিত গোপনে পরামর্শ করিলাম। মাতাঠাকুরাণীর চোখে ধূলী দিয়া, বাবার লোহার সিঁদুক হইতে পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়া বাহির করিয়া লইয়া হাণ্ডভার ট্রেণে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গান ধরিলাম—

সে কি আমার অযতনের ধন।

মনপ্রাণ শূন্যতল করে যেই জন।

তবে যে অপ্রিয় বলি,

নিতান্ত জ্বালাতে জ্বলি,

নতুবা তার ও সকলি প্রেমেরই কারণ।

“আহার নিদ্রা তুলিয়া সমস্ত রাত্রি গান করিলাম। জামালপুর ষ্টেশন গাড়ি খামিলে, ষ্টেশন-মাষ্টার, গার্ড ও পাহারাওয়ালারা প্রত্যেক কামরা অবেষণ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। আমার আর বিলাত যাওয়া হইল না।”

## বার

৩রা মার্চ, ১৩২৩

শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর মহাশয় বলিলেন—“আমার পড়াশুনা শেষ হইয়া গেল, আমিও বাচিলাম ; বই ফেলিয়া বাঁশী ধরিলাম । বাল্যকাল হইতে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের আবহাওয়ায় আমার গুরুজনদিগের চক্ষুর অন্তবালে ধীরে ধীরে পড়িয়া উঠিতেছিলাম ; সরস্বতীর কমলবনে আমার সতীর্থ-বন্ধুগণের কলকোলাহলে আমার কণ্ঠ মিলাইতে না পারিয়া দেবী বীণাপাণির বীণাটির উপর মুগ্ধনেত্রে নির্ঝাঁক হইয়া চাহিয়াছিলাম । যখন আমার বুলি ফুটিল, সঙ্গীতের আনন্দে মাতিয়া উঠিলাম ; আমি বুঝিতে পারিলাম যে সে আনন্দ কেবলমাত্র আমারই হৃদয়ের আনন্দ ; আমার সতীর্থ-বন্ধুগণের মধ্যে তখন এমন কাহাকেও পাইলাম না যিনি আমার বুলি শুনিতে চাহেন ; মধ্যে অনেকেই সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া আমার নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন । আমার নতুন সঙ্গী, নতুন শ্রোতৃমণ্ডলী লাভ হইল । বাঁশী আমার প্রেমসা হইল । আমার যত কিছু মান-অভিমান সেই বাঁশীটিকে লইয়া । মহাশয়, বাল্যকালে আমি একখানি বই পড়িয়াছিলাম, তাহার নাম—‘বনিতা মরণ, খেদের কারণ’ । সেই কবিতা পুস্তকের কয়েক চরণ মনে মনে আবৃত্তি করিয়া আমার এই মান-অভিমানের পালার সহিত মিলাইয়া লইতাম ,—

আর এক দিন ছলে বলিলাম তারে ।

প্রেমসি, তুমি ত ভাগবাস না আমারে ॥

উত্তর করিল ধনি মুহু মুহু হাসি ।

তুমি মনে জ্ঞান ভালবাসি কি না বাসি ॥

ভালবাসি মুখে মাত্র বলিলে কি হবে ।

ভালবাসি কি না বাসি কায়ে বুঝে লবে ॥

—আমার বাঁশী আমাকে কায়ে বুঝাইয়া দিত সে আমাকে কত ভালবাসে ।

“সে কথা যাক্ । আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের আবহাওয়ায় কথা বলিতেছিলাম । বিদেশী সঙ্গীত যে কি রকম তাহা কি তখন জানিতাম ? শ্রামপুত্রে, সিম্ভার, ঘোড়াসাঁকোয়, কালীঘাটে, বেনেটোলায় যে ভিন্ন ভিন্ন পাচালীর দল গান করিত, সঙ্গীতরসজ্ঞ এমন কোনও ব্যক্তি তখন ছিলেন না, যিনি তাহাতে প্রচুর আনন্দ না পাইতেন । শুধু দাত্তায়েয় পাচালীর কথা বলিতেছি না ; তাহার কবিত্ব ও ভাব-সম্পদ বঙ্গসাহিত্যে অতুল । বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বোষ বলিতেন—যদি কবি হইতে চাও, তবে বাল্যকাল সর্বশ্রেষ্ঠ চারিজন কবির লেখা ভাল করিয়া পড়,—কালিদাস, কুস্তিবাস, ভাবতচন্দ্র ও দাত্ত রায় ।’ আমাদের বাল্যকালে কলিকাতার পাড়ার পাড়ায় অনেক ছোট বড় পাচালীর কবি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন ; শ্রামপুত্রের কেদারনাথ বহু তাঁহাদের অন্ততম । তাঁহার একটি গান আমার বেশ মনে পড়ে,—

কা'র ওপরে খেদ কর লো  
 গুলো বিনোদিনী,  
 মিছে ভাবনা ভেব না ভেব না,  
 এ জালা রবে না  
 দিবা রজনী ।  
 প্রেমভঙ্গ হয়েছে,  
 গিয়েছে,  
 সে আশার বাসা ভেঙেছে,  
 সে গতশোচনা ধনি,  
 কেন কর লো মিছে ।  
 থাক' স'য়ে সহি,  
 রসময়ী  
 তোমায় কই  
 এতে অশান্ত হ'য়ো না লো ধনি ।

বিনোদিনী গাহিলেন—

চতুরঙ্গে দুখে জলে জীবন ।  
 কখন হবে সখি, তা'র সঙ্গে  
 সুখ সাধ মিলন ।  
 গ্রাণ গেল, নাহি হ'ল আলাপন,  
 এ কি জালাতন,  
 আর সহিব বল কত,  
 নাহিক বুঝি মরণ ।

“বাগবোজারের মোহনচাঁদ বহুর রচিত পাচালির বিনোদিনী লৈলিত বিভাস রাগিণীভে  
 গান ধরিত—

বল, কোন্ কামিনীর সহবাসে যামিনী পোহালে ।  
 লারা নিশি সুখে ত ছিলে ?  
 অরুণ নয়ন, অর্ধনিম্বীলন,  
 পীযুষপানেতে যেন  
 পড়িতেছ ঢলে ঢলে ঢলে ।  
 না জানি কেমন মেয়ে,  
 তা'র কেমন পাষণ হয়ে,  
 পয়েরই পরাণ পেয়ে  
 নিশি আগালে ।

নব অঙ্গুরাগে  
সারা নিশি জেগে,  
অলস অবশ অঙ্গ

পড়িতেছে ঢলে ঢলে টলে ।

“এই রাধাকৃষ্ণলীলায় আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ওতপ্রোত হইয়াছিল। ছাত্তুবাবুর (৮ আশুতোষ দেব) বাড়ীতে পাথুরিয়াঘাটার বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই গানটি শুনিয়া আসিলেন—

কি কর কি কর, শ্রাম নটবর, ঘাই সর নিজ কাজে ।  
অবলার প্রতি, এ কেমন রীতি, পাইয়ে পথেরই মাঝে ।

আমরা ব্রজের গোপ ললনা,  
তুমি তা’কি শ্রাম জেনেও জান না,  
সর না, সর না, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,  
মরি হরি মোরা লাজে ।  
ওহে কালা চতুর ত্রিভঙ্গ,  
কখনও করনি রমণীসঙ্গ,  
সর না, সর না, লাগে অঙ্গে অঙ্গ,  
হেন কি তোমারে লাজে ।

“রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বড় রাজা ইহার পাণ্ডা জবাব রচনা করিলেন,—

কেমনে বা সরি, বল না কিশোরী,  
পড়েছি রূপেরই ফাঁদে,  
এ পথে আসিয়ে, তোমারে হেরিয়ে,  
পড়েছি লো পরমাদে  
কি করি এখন কবিত্তে গমন, চরণে চরণ বাধে ।  
অতি ধরতর নয়নেরি সর,  
তাহে শরীর করে জরজর,  
এবে যে বলিছ—সর সর সর,  
কি জানি কি অপরাধে ।

করি নে বটে রমণী সঙ্গ, তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,  
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ, এ রীতি কি রীতি রাধে ?

“এখন বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, এই খাটি বাঙ্গালা সঙ্গীতের আবহাওয়া কোন্ দিক হইতে বহিতেছিল। শুধু বসন্তের অথবা বর্ষার সঙ্গীত নহে, চৈতম্ভ প্রভাত-সঙ্গীত অথবা সন্ধ্যা-সঙ্গীত নহে, শুধু কৈশোর-সঙ্গীত অথবা যৌবনসঙ্গীত নহে;—অন্যাকাল হইতে এই করুণ অথচ মধুর ধ্বনিভরক বিশ্ব-সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের চারিদিকের আকাশ ও বাতালের মধ্য দিয়া আমাদের

সর্বোচ্চের স্বাস্থ্যরঞ্জে হিজোলিত হইয়া বাঙ্গালী-জীবনের সমস্ত অপূর্ণতাকে কাণায় 'কাণায় পরিপূর্ণ' করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণব-শক্তি-সৌর-গাণপত্য নিবিশেষে বাঙ্গালী বালক-বালিকা, নবান্না-প্রৌঢ়া, স্থবির-যুবক, অধিকারী-অনধিকারী নিবিশেষে সকলেই এই শাস্ত-দ্বাস্ত-সখা-মধুর-রসায়িত আকর্ষণ পান করিত। রুচিবিকারের অবসর ছিল না। এই সমস্ত সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ নরনারী যে নিবিকার ছিল, এমন কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু তাহাদের আর যাহাই থাকুক, রুচিবিকার ছিল না; রাধাকৃষ্ণ লীলায় পানে তাহাদের কখনও অর্কচ্যুত হইত না।

“যাক্ ও সকল বিষয় আপনায় অবসর মত আলোচনা করিয়া দেখিবেন। আপনাকে পাইয়া আমি আজ এত কথা বলিতেছি, তাহার কারণ আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা নিঃশেষ করিয়া শীঘ্রই কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি। কালীবালা করিব স্থির করিয়াছি। আমার অতীত-স্মৃতির ভ্রমস্থল হইতে সন্নিহিত যাইবার পূর্বে আপনি আপনার কলমের খোঁচা দিয়া কেন সেই ছাই উড়থেনে চেপ্ত করিলেন? অমৃতবাবুর প্রসঙ্গে আমার কথা কেন পাড়িয়াছিলেন? কথায় আছে এটে—

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই,

পেলেও পেতেও পার লুকান রতন,—

কিন্তু যদি রতন না মেলে ?

“১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সাখর থিয়েটারের খুব ধুম পড়িয়া গেল। শিবপুত্রে বাঁধা টেজে ‘রামাভিষেক’ নাটক অভিনীত হইল। বাগ্-বাজারে ‘নলদময়ন্তী’<sup>১</sup> বউবাজারে ‘সাবিত্রী সত্যবান’<sup>২</sup> নাটক লইয়া আসক্ত করিয়া মনোমোহনবাবুর ‘হরিশ্চন্দ্র’<sup>৩</sup> ও ‘প্রণয়-পরীক্ষা’ নাটকের অভিনয় করা হইয়াছিল। আরপুলি লেনে যাত্রা ও থিয়েটার মিশ্রিত করিয়া এক বকম দাঁড় করান হইল। আমাপুকুরের দল ‘প্রণয়-পরীক্ষা’ নাটকের অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করিল। কাঁসারিপাড়ায় বাঁধা টেজ ছিল, সে দল ‘শকুন্তলা’<sup>৪</sup> ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে’<sup>৫</sup> লইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিল। কিন্তু যিনি ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে’<sup>৫</sup>র কর্তা সাজিলেন তিনি এমন একটি কলেঙ্কারি করিয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনও টেজে তিনি পদার্পণ করিতে সাহস করেন নাই। মদের বোঁকে তিনি নিজের বক্তব্য তুলিয়া গিয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে ডাকিলেন—‘গদা’! টেজের রাজস্থানের সম্পাদক ও অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক গোপাল মজুমদার গদা সাজিয়াছিলেন। কর্তা ডাকিলেন—‘গদা’! উত্তর হইল—‘আজে’! ‘একসা থড়কে নিয়ে আর!’ ইহার অন্ত গদা একবারেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কি করিবে; তৎক্ষণাৎ দর্শার বেড়া হইতে একটা কাঠি তালিয়া কর্তার হাতে দিয়া বলিলেন—‘আজে, এই নিন’! কর্তা টলিতে টলিতে আলোর কাছে আসিয়া কাঠিটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন—‘আ্যা, এই তোমর থড়কে কাঠি!’—এই বলিয়া পুরাকালে ভূতপ্রোভগণ যে শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দক্ষয়জ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল, কর্তা আজ তাহার

পুনরুজ্জ্বল করিয়া বুড়ো শালিকের দফা দফা করিলেন। দর্শকগণ মার মার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; কর্তা খড়ম ফেলিয়া টেবলের তলায় লুকাইলেন। গোপাল মজুমদার গুরুত্ব গদা-গোপাল ভবিষ্যতে অভিনয়-কার্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কাঁসারিপাড়ার দল এ ধাক্কা সামলাইতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিল। ভবানীপুরের দল বিভাগাগরের ‘সীতার বনবাস’<sup>১</sup> নাটকাকারে পরিণত করিয়া বিভাগাগরের ভাষা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া আসর মজাইতে চেষ্টা করিল। আহিরীটোলায় জনায়ের পূর্ণ যুথ্যের বাড়ীর বাধা টেজে ‘নবীন তপস্বিনী’র অভিনয় হইল। শুভী পাড়ায় জনার্দন সা’র বাধা টেজে ‘পদ্মাবতী’ নাটক বেশ উৎরাইয়া গেল। যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে গ্রামনাট্য থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি এই নাটকে অভিনেত্বরূপে প্রথম আসরে নামিলেন। যোড়াসাঁকোর গ্রাম মল্লিকের বাড়ীতে নীচের হলে বাধা টেজ ছিল; সেখানে হরিমোহন কর্ণকর বিরচিত প্রথম বাজালা অপেরা অভিনীত হয়। এইখানে বলিয়া রাখি যে, গ্রামনাট্য থিয়েটারের পূর্বে আর কোনও বাধা টেজ অপেরা হয় নাই। কোল্লগরে ‘নবীন তপস্বিনী’ প্লে করা হইল। আগড়পাড়ায় ‘কাদম্বরী’ অভিনীত হইল। এইখানে এই সমস্ত থিয়েটারের গান রচনা সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। ষাঁটি দেশী ওস্তাদের, হিন্দুস্থানী গানের স্বরের অনুকরণে বাজালা থিয়েটারের গান রচিত হইত। ‘মৈথিলীমিলন’ যাত্রার একটা গান লইয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি,—

কি কব চারুবদনে,

কি কষ্ট তব বিহনে,

বনে,

আজও জাগিছে মম মনে।

তুমি ত হে ধনি, সদা স্মৃথ মনে,

ধাকি হরষে অশোকবনে,

ভ্রমে তুলে চন্দ্রাননে

ভাব নি এ প্রিয়জনে ॥

যে হিন্দী গানের স্বর লইয়া এই গানটি রচিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক চরণ শুনিবেন কি?

দোলায়ে লাল রক্তে সো।

দোলায়ে লাল নগলো সারি, ব্রজতুলালী,

ঝুলে শ্রামলকে।

সরল ভাটি জড়িত ধারা,

মারোয়া বারে’য়া অতি-স্বরঙ্গা,

১ ১৮৮৬ সনের জুন মাসে ভবানীপুরে নীলমণি মিত্রের বাড়ীতে উন্মেষচন্দ্র মিত্র এগীত ‘সীতার বনবাস’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। (বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস)—সং



## চৌকি লাগিল জগমগতে

সরলা তনয়া সুল।

“চারিদিকে গথের থিয়েটার হইতে লাগিল। আমি তখন স্কুলের ছাত্র বটে ; কিন্তু এই সমস্ত থিয়েটার দেখিয়া বেড়াইতাম। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের দুর্গাপূজা উপলক্ষে শোভা-বাজারের রাজবাড়ীতে পীটার সাহেবের জিম্নাস্টিক দেখিয়া আমাদের কয়েকজনের মনে হইল,—এ রকম একটা কিছু আমরা কবিত্তে পারি না কি ? যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,\* শ্রামাচরণ বোষ ও আমি,—আমরা তিন জনে আমাদের এই শ্রামবাজারের ১০৭ নম্বর বাড়ীর একটা ঘরের কডিকাঠে দড়ি টাঙ্গাইয়া জিম্নাস্টিক আরম্ভ করি। যোগেন্দ্র হেয়ার স্কুলে তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, শ্রামাচরণ কোন্ ক্লাসে পড়িতেন এখন আমার ঠিক স্মরণ নাই। রুটলেজ-এর *Manual Exercises* নামক পুস্তক ক্রয় করা হইল। শ্রামবাজার ষ্ট্রীটের ৫০ নম্বর বাড়ীর উঠানে ভাল করিয়া ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা গেল। ওস্তাদ শিক্ক কেহই আমাদের ছিলেন না ; তবে মধ্যে মধ্যে কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটির overseer ডিসেন্ট সাহেব আমাদের ব্যায়ামকৌড়া দেখাইয়া দিতেন। পাড়ার অনেক ছেলে আমাদের সঙ্গে যুটিয়া গেল। জলপূর্ণ বড় ঘড়ার দড়ি বাঁধিয়া আমি দাঁতে করিয়া সেই ঘড়া ভূমি হইতে তুলিতে পারিতাম ; একটা জলপূর্ণ গেলাম আমার কপালের উপর স্থাপিত করিয়া তিনটে লোহার চাকা দুই হাতে লইয়া প্রত্যেক চাকার ভিতর দিয়া আমার মর্কান্ড গলাইয়া দিতে পারিতাম ; horizontal bar-এ পা লাগাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হাত-পা ছড়িয়া দশ হাত দূরে ভূমিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম। মহাশয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি যে একজন বলিষ্ঠ যুবক ছিলাম ব্যায়াম শিকার ওস্তাদ হইতে পারিয়াছিলাম, আজিকার আমার এই চেহারা দেখিয়া আপনি তাহা অসম্ভব করিতে পারেন কি ? উইলসন-এর সার্কাল দেখিয়া আমি অনেকগুলি কৌড়া আয়ত্ত করিয়া লইলাম। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের প্রথম public performance হইল ; বাজনার আয়োজন করা হইল, এই সূত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন ; কৌড়ার অবসরে নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও আমি একটা কন্সার্ট খাড়া করিলাম ;—নগেন্দ্রের ঢোলক, যোগেন্দ্রের বেহালা, আমার ঝাঁপী। ব্যায়ামকৌড়া দেখান শেষ হইল। আমরা ভাবিলাম, একটা কন্সার্ট করিলে হয় না ? ৫৭ নম্বর রায়কান্ত বোসের স্ট্রীটে Bagbazar Amateur Concert নামে একটি দল গঠিত হইল। কবুলিয়া টোলার গিরীশ মিত্র আমাদের কন্সার্টের মাস্টার ছিলেন। তাঁহার মত অভুত কারিকর প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তিনি গং তৈয়ার করিয়া দিতেন। এখনও তাঁহার রচিত গং অনেক জায়গায় শুনিতে পাই। স্কুলের ছুটির পর আমরা নিজেদের পোষাক তৈয়ারি করিতাম ; জল খাবারের পরলা বাঁচাইয়া আমরা এই কার্যটি সম্পন্ন করিয়াছিলাম। আমাদের কন্সার্টের প্রথম public performance হইল জন্-

\* স্বতি কথার এই অংশ বিবৃতকালে যোগেন্দ্রবাবু রাখাধনবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে থিয়েটারের ইতিহাস ইহা। রুজনে মিলিয়া আমাদের বসিয়া দিয়াছেন।—লেখক

অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডুরিয়াঘাটার বাড়ীতে ; তাহার পরে জগদ্বানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ও হেমচন্দ্র করের বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম । প্রিয়নাথব ঘোষের বাড়ীতে ‘রত্নাবলী’ নাটক অভিনীত হইবার সময় আমরা বাজাইয়া ছিলাম । ‘রত্নাবলী’ পরেই একট প্রহসন দেখান হইল ; প্রিয়নাথ বহু মজিক সেই প্রহসনের গান বাঁধিয়া দিয়াছেন ; তুলো মুখুয্যেকে গালি দেওয়া সেই প্রহসনের উদ্দেশ্য । পাণ্ডুরিয়া-ঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । আপনি জানেন বোধ হয়, বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ‘বুঝলে কি না’র উত্তরে তুলো মুখুয্যে ‘কিছু কিছু বুঝি’ রচনা করিয়া বড় রাজাকে বিক্রপ করিয়াছিল । এবার তুলো মুখুয্যেকে গালি দেওয়া হইল । সেই রাত্রে ধর্মদাস সুর ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আমাদের সঙ্গে মিশিলেন । পাছে রাজ্রিতে কন্সার্টের দলে গিয়া মিশি, এই জন্ত বাবা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । আমি আমাদের গৃহের বহিঃপ্রাচীর-সংলগ্ন একটা বটগাছের উপরে উঠিয়া একটা উচু ডাল থেকে লাফাইয়া পড়িতাম । নীচে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র আমাকে ধরিয়া ফেলিত ; শেষরায়ে প্রাচীরের বহির্দেশে হইতে ঝিলের কাণিগে উঠিয়া নিঃশব্দে ঠাকুরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার শযায় শয়ন করিতাম ।

“আমরা যখন জিম্নাস্টিক করি, তখন আমাদের ভলন্টীর হইবার খুব সখ হইয়াছিল । ইয়ুরেশিয়ানরা তখন সবোমাত্র সখের সেনা হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমাদের বোঁক হইল । আমরা পঞ্চাশ-ষাট জন বাঙ্গালী মুবক সেনাপতিকে আবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম । উপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রাম লিং, রাধা-গোবিন্দ কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্রামাচরণ ঘোষ ও আমি সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম । আর কাহারও নাম আমার এখন মনে পড়িতেছে না । তখন ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত কেশবচন্দ্র সেন ও নব-গোপাল মিত্র সিমলা পাহাড়ে যাইবেন স্থির হইয়াছিল । ইহাদের হস্তে আমাদের আবেদনপত্র দেওয়া হইল । ইহারা সেনাপতির নিকটে পত্রখানি পেশ করিবার ভার লইলেন । রাজেন্দ্রলাল মজিক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মুক্ফি হইলেন । অনেক দিন পরে গভর্মেন্ট হইতে উত্তর আসিল—‘আবশ্যক হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করা যাইবে ; এখন নয়কার নাই ।’ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । এতদিন পরে ইংরাজ গভর্মেন্ট আমাদের দেশীয় সেনা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন ।

“তখন বোসপাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল ; ‘শর্মিষ্ঠা’ অভিনয় করিয়া তাহারা বেশ সখ্যাতি অর্জন করিল । গিরিশবাবু তাহার গোটা কতক গান বাঁধিয়া দেন । একটি গান আমার কিছু কিছু মনে আছে ;—

আহা মরি মরি !

অহুশমা ছবি,                      দেবী কি মানবী,  
ছলনা বুঝি করে বনদেবী ।

রঞ্জিত রোদ্দনে বদন অমল, নয়ন কমলে নীর ঢল ঢল,

নিতম্ব চুষিত বেগী আলোড়িত,

বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী।

“উমেশচন্দ্র চৌধুরীও ‘শশিষ্ঠা’র গোটা কতক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। একটি ছোট গান আমার মনে পড়িয়া গেল :—

কি করি, সখি,

ভুলিয়া রহিল আঁখি,

ও কপ হেরি চলিতে না পারি।

জন্মধরে হেরিয়ে যেমন চাতকিনী

তেমতি মানস আমার ॥

“নগেন পাললেন—‘ওর যাত্রা করেছে, এস আমার থিয়েটার করি। তাহার কথায় আমরা সবাই ন্যাচিয়া উঠিলাম। নগেন থিয়েটারের সবই জানে, কারণ সে যে ‘পদ্মাবতী’ নাটকে নিজে অভিনয় করিয়াছে। গরাশবাবুর পরামর্শে ‘সধবার একাদশী’ অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। শনি রবিবারে তালিম দেওয়া আরম্ভ হইল। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া মঙ্গলী পূজার দিন ‘সধবার একাদশী’ অভিনয় হইল।<sup>১</sup> অভিনয় ভাল হইল না। তবু আমাদের এই প্রথম অভিনয়ে কে ক সাঁজিয়াছিল শুনিবেন ?

নমচাঁদ	...	গরাশচন্দ্র বোষ
ঘটিরাম	...	অদ্ভুতশেখর মুস্তফা
নকুড	...	মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন	...	ঈশানচন্দ্র নিয়োগী
কাঞ্চন	...	রাধামাধব কর
কেনারাম		অরুণচন্দ্র হালদার
রামমাণিক্য	...	নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলী
কুমুদিনী	...	আপালচন্দ্র বিশ্বাস
সৌদামিনী	...	মহেন্দ্রনাথ দাস
নটী	...	নগেন্দ্রনাথ পাল

“কোজাগর পূর্ণিমার নশীথে শ্রামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে পুনরায় অভিনয় করা হইল। এবার আমাদের অভিনয় দেখিয়া সকলে খুসী হইলেন। অন্নদিনের মধ্যেই ষ্টেজ ও গিন্ তৈরী করা হইল। এটর্নি দীননাথ বসুর বাড়ীতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় হইল। সে রাত্রিতে মহাশয় কালপ্রসন্ন সিংহ আমাদের অভিনয় দেখিয়া বলিলেন—‘তোমরা বেশ প্লে করেছে, কিন্তু তোমাদের ষ্টেজ ভাল নয়। কিছুদিন পরে গিরিশবাবু আমাদের থিয়েটারের ষ্টেজ তাঁহার স্বত্ত্ব বাড়ীতে পাঠাইয়া

দিয়া আমাদের দল হইতে সরিয়া গেলেন। আমরা তখন গদা-গোপালকে ধরিয়া তাঁহার স্থানে বসাইয়া rehearsal দিতে লাগিলাম।

“১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের ভবনে আমাদের অভিনয় হইবে, স্থির হইল। ষ্টেজ পাওয়া যায় কোথায়? শিবপুরের সখের দলের ষ্টেজ শোভাবাজারের রাজ বাটীতে ‘বেণী সংহার’ নাটক অভিনয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সায়দাচরণ মিত্র মহাশয় আনাইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ত্রায়স্ক মহাশয়ের উদ্যোগে সমস্ত টোল হইতে ছেলে বাছিয়া লইয়া এই সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করান হইয়াছিল। সেই ষ্টেজ আনাইয়া আমরা মিত্র মহাশয়ের দালানে খাটাইলাম। তখন আমার বাবা সেখানে দর্শকরূপে গিয়াছিলেন; দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও বহুপরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। গিরিশবাবু নট-নটীর একটি prologue রচনা করেন; কয়েকটি নৃতন গানও সন্নিবেশিত করিয়া দেন। এবার—

নিমচাঁদ	...	গিরিশবাবু
অটল	...	নগেন বন্দ্যো
কর্তা	...	অর্ধেন্দু
নট }	...	মহেন্দ্র বন্দ্যো
ঘটিগ্রাম	...	অবনাস মুখোপাধ্যায়
ইন্সপেক্টর	...	ফেলু বোস
দামা		যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য
রামমাণিক্য	...	রাধামাধব কর
গোকুল	...	শিবচন্দ্র
কাঞ্চন	...	নন্দ ঘোষ
সৌদামিনী		সায়দা দাস
কুমুদিনী	...	বিনোদ দাস
নর্তকীদ্বয়	...	{ শীতল দাস নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

“কর্তা ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর ক্রোধবশে অটলকে যখন পদাঘাত করেন, দীনবন্ধু বাবু সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—“There you have improved upon the author!”

“আমাদের গানে স্বর দিতেন একটি মূলমান ওস্তাদ; তাঁহার নাম হিজুল খাঁ।

১ অর্ধেন্দুশেখরের ‘জীবনচক্রে’ অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্ধেন্দুকে বলিলেন, “আপনি অটলকে যে লাথি বারিরা চলিয়া গেলেন উহা improvement on the author. আমি এবার সখার একাধিনীর নৃতন সন্ধরণে অটলকে লাথি বারিরা গবন লিখিয়া দিব।”

তাঁহার স্বর অন্তসারে গিরিশবাবু গান বাঁধিতেন। আমাদের স্থখ্যাতি শুনিয়া ‘শশ্মিষ্ঠা’-  
 ওয়ালারা বিজ্ঞপ করিয়া বলিল—‘ওঃ, ভারি ত বাহাদুরি করেছ। ছবি এঁকে, পর্দার  
 আড়ালে গুরুম নাচ-গান ত সকলেই করতে পারে। আমাদের মত খোলা আসরে যাত্রা  
 করতে পার ত বুঝি।’ আমদপুর হইতে যাত্রার সাট মিলাইয়া পনের দিনের মধ্যে  
 আমরা যাত্রাগানের আসরে নামিলাম। ‘উষা-অনিরুদ্ধ’ পালায় আমি উষা সাজিলাম ;  
 হিন্দুল খাঁর স্বরে গিরিশবাবু গান বাঁধিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ  
 সাজিলেন। মণ্ডিলাল স্বর হইলেন বাণরাজ। আমার একটি গানের দুই ছত্র মনে  
 পড়িতেছে,—

যামিনীতে একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন,

হেরিহ্ন স্বপনে সখি পুরুষ রতন।

“কলিকাতার একটি গলির ভিতরে একই দিনে দুই পৃথক আসরে ‘শশ্মিষ্ঠা’ ও  
 ‘উষা-অনিরুদ্ধ’ যাত্রা গাওয়া হইল। উভয়ের মধ্যে ৩।৪ খান বাড়ীর ব্যবধান ছিল মাত্র।  
 আমাদের পালা খুব জাকিয়া উঠিল। আমরা দুটোমী করিয়া কয়েক টুকরা কাগজে দুই  
 ছত্রে একটি কবিতা লিখিয়া ‘শশ্মিষ্ঠা’-ওয়ালাদের আসরে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম,—

মাগর পার বোলে তার বড় ছিল আঁটনি,

সে বোল ফুরাল, এখন কি বলে তা শুনি।

“তাঁহারা হিন্দুল খাঁর সম্পর্ক লইয়া একটা বিজ্ঞপাত্মক গান রচনা করিল। গানটি  
 আমার মনে নাই; তার ভাবার্থ এই যে আমরা অত্যন্ত অপদার্থ, যেহেতু আমরা  
 মূলমানের হস্তে উষাকে সমর্পণ করিলাম। গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—

ভেলা রে ধনটা আমার জাহিয় করলি কাবুদানি।

নিই নি উষার বিয়ের ভার, করেছি হরণ,

হরণ করলে পাওনা ঠাণ্ডর ধন্ত তোরে বাখানি ॥

“ইহার উত্তরে ‘শশ্মিষ্ঠা’-ওয়ালারা গিরিশবাবুর উদ্দেশে ‘ঘরে তোর স্নাতা দিগম্বর’  
 বলিয়া যে তীব্র শ্লেষপূর্ণ গান রচনা করিলে, তাহাতেই আমরা হটিয়া গেলাম।”

## ভের

২৩শে মার্চ, ১৩২৩

শ্রীযুক্ত রাধামাধব কব মহাশয় বলিলেন,—“যখন, আমরা ‘উবা-অনিরুদ্ধ’ যাত্রা করিলাম তখনও আমাদের ‘সধবার একাদশী’ চলিতেছিল। এমন সময় দীনবন্ধুবাবুর ‘লীলাবতী’ প্রকাশিত হইল। লীলাবতী গইয়া আমাদের আশ্চর্য্য বসিল,—গোবিন্দ গাঙ্গুলীর স্বত্ত্ববাবড়ীতে। কিছু দিনের মধ্যে কিন্তু গৃহস্থামীর সহিত মনান্তর হইল। আমরা ‘উবা-অনিরুদ্ধ’ যাত্রার বাড়ীতে rehearse করিতে আরম্ভ করিলাম। সেখান হইতে আমরা রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। ‘লীলাবতী’র অভিনয় হইবে। এইখানে আমরা কেমন করিয়া ষ্টেজ তৈয়ার করিলাম, তাহা আপনি এই যোগেন্দ্রবাবুর মুখে আনুপুঙ্গবিক শ্রবণ করুন।”

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন—“পালেদের বাড়ীতে ‘লীলাবতী’ অভিনীত হইবার পূর্বে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ষ্টেজ ও সীন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাবার্তা হয়। তিনি বলিলেন, ‘তোমাদের এই গুটান সীনএ সব ঘটনা ভাল করিয়া দেখান হয় না; সরান’ সীন আবশ্যক। যদি ভাল করিয়া ষ্টেজ করিতে চাও, ময়দানে গিয়া অলিম্পিক থিয়েটার দেখিয়া আইস।’ আমি তখন এলিনিয়ারিং কলেজে সার্ভে ক্লাসে পড়িতাম। ময়দানে সার্ভে করিবার জন্য আমাদের তাঁবু পড়িল। অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন অভিনেতা ময়দানে ঐ থিয়েটার প্রতিবৎসরে শীতকালে চালাইত। তাহাদের দলের একজন মার্কিন অভিনেতা ম্যাক্বেথ’ সাজিত। যথারীতি টিকিট কিনিয়া ময়দানের থিয়েটারে আমরা ম্যাক্বেথের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। সেই মার্কিন যুবক অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতা হইতে চলিয়া গেল। আমার ঐক হইল উহাদের ষ্টেজের অঙ্কুরণে আমি সান্ করিতে শিখিব। আমাদের সাবেক ধরণের গুটান সান্-এ দরজা খোলা দেওয়া ইত্যাদি দেখান সম্ভবপর ছিল না। আমি ময়দানে আমাদের তাঁবু হইতে অলিম্পিক থিয়েটার-ওয়ার্ল্যাডগকে পত্র লিখিলাম, তাহাদের ষ্টেজের ভিতরে আমাকে অহুগ্রহ করিয়া যদি প্রবেশ করিতে দেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। তাহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমি সমস্ত শিখিয়া লইলাম। কেমন করিয়া নৌকা ভাসান দেখাইতে হয়, আকাশপথে মাহুচ অন্তর্হিত হইতে পারে, বিদ্যুৎ, বজ্রনির্ঘোষ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সমস্তই আয়ত্ত করিলাম। রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে ষ্টেজ রচিত হইতে বিলম্ব হইল না।”

রাধামাধব বাবু বলিলেন—“ষ্টেজ নির্মিত হইল। প্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ গায়ক মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, ‘এইবার আমাদের টিকিট বিক্রয় করা উচিত।’ পরামর্শটা মন্দ বলিয়া মনে হইল না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। স্ত্র রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র রূপলাল মিত্র

মহাশয় ইংরাজি ভাষায় একটি আবেদন পত্র লিখিয়াছেন। যোডার্সাকোর যোগেন্দ্রনাথ বসুর একটি ছাপাখানা ছিল; সেইখানে আমাদের prospectus মুদ্রিত হইল; উক্তপত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে আমরা যাতায়াত করিলাম, বিজ্ঞপ ও টিটকারী ভিন্ন আমাদের বেশী কিছু লাভ হইল না। অনন্তোপায় হইয়া চাঁদার খাতায় তখন প্রত্যেকে ২০।২৫ টাকা লই করিলাম। এখনও বোধ হয় সেই prospectus ও সেই চাঁদার খাতা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসুর নিকট আছে।”

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের স্থলে ভোলানাথ আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। যখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম, বিজ্ঞাসাগর মহাশয় সহসা একদিন আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করিয়া ভোলানাথকে বলিলেন,—‘তোমার মত ছাত্রকে আমার স্থলে রাখতে পারব না; তুমি চলে যাও।’ শিক্ষকদ্বিগকে তিনি একটু অন্তরালে গিয়া বলিলেন, ‘ভোলা ঠাকুরবাড়ীতে বিজ্ঞানন্দর থিয়েটারে ‘বিজ্ঞা’ সেজেছিল, ‘রক্তাবলী’ যাত্রাতেও ‘সখী’ সাজে। কথাগুলি স্পষ্ট আমাদের কানে গেল। ভোলানাথ চলিয়া গেল। আজকাল আপনাদের সকল কলেজের ছেলেরা কলেজেই থিয়েটার করিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে বাহবা লইতেছে। বিজ্ঞাসাগর জীবিত থাকিলে আজ আপনারা এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে পারতেন কি?’

রাধামাধববাবু বলিলেন—“ব্রজবাবুর বাড়ীতে গৈজের প্লাটফর্ম ও অগ্নাত্ত মালপত্র কিছু ছিল। তিনি তখন অত্যন্ত পীড়িত। আমরা তাঁহার বাড়ী হইতে ঠেজ সরাইয়া লইয়া যাইতে অল্পমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি সম্মত হইলেন। আমরা সেই রাত্রিতে সমস্ত মালপত্র ঘাড়ে করিয়া লইয়া স্থানান্তরিত করিলাম। বিশ্বকোষের লেখক বলিয়াছেন যে আমরা অর্থাভাবে নিজেরা ঘাড়ে করিয়া জিনিষগুলি হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা গোলযোগ না করিয়া চুপি চুপি কাজ সারিব মনে করিয়া ঐক্লপ করিয়াছিলাম। বিশ্বকোষের ‘রক্তালয়’ প্রবন্ধের এই অংশে কত ভুল আছে দেখিবেন? এই ভলুমের ১২০, ১২১ ১২২ পৃষ্ঠায় আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।

(১) গোবর্দ্ধন রাজপথ সীন-এ আঁকিয়াছিল, এইরূপ লেখা আছে। ‘লীলাবতী’তে রাজপথের সীনই ছিল না।

(২) ধর্মদাস তুলি ধরিলেন। ঠিক কথা, কিন্তু একা নয়; ক্ষেত্র ও আর্ট-স্থলের অন্ত্যস্ত ছাত্রেরা সীন আঁকিয়া দিয়াছিল।

(৩) মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু অর্জেন্দ্রবাবু কেহই টাকা দিয়া দল বজায় রাখেন নাই।

(৪) অর্জেন্দ্রবাবু এ সময় টিকিট বেচিবার প্রস্তাব করেন নাই; মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা এ প্রস্তাব পূর্বেই উপস্থাপিত হইয়াছিল।

(৫) শুধু অর্ধেন্দুবাবু নয়, দলের অন্যান্য সকলেই ষ্টেজ ত্রুটিবাবুর নিকট হইতে প্রার্থনা করেন।

(৬) অর্ধ-কণ্ঠের জন্ত আমরা জিনিষগুলি নিয়েয়া ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহা মিথ্যা কথা। ধর্মদাস স্তরের বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট মাঠ ছিল, সেইখানে ঐ কাঠগুলো আমরা রাখিলাম। সেই প্লাটফর্মের উপরে আমাদের ষ্টেজ খাড়া হইল।

(৭) ধর্মদাস ও রাজেন্দ্র মার্কান্ডেকে সাথে নাই, রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তখনও আমাদের দলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

(৮) বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে ষ্টেজের জিনিষগুলি লইয়া যাইবার সময় অর্ধেন্দু বাবু কোনও কথাই বলেন নাই, এককল ব্যাপারে তিনি মোটে কথাই কহিতেন না।

(৯) রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া আমাদের টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হয় নাই।

(১০) ইহার বহুপূর্বে নবগোপাল মিত্র আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

(১১) Calcutta National Theater নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই, নবগোপালের মূখ হইতে একরূপ অসঙ্গত নাম বখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

(১২) হিজুল খাঁর দ্বারা উড়িয়ার ভূমিকা স্ববিধাজনক হইল না এমন কথা লেখকের কলম হইতে বাহির হইল কেমন করিয়া? উড়িয়ার ভূমিকায় হিজুল খাঁ অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৩) শশী বশাদীকে অর্ধেন্দু এখন কোথা হইতে পাইবেন? কয় বৎসর পরে সে স্তম্ভাশনাশ বিয়েটরে আসিয়া যুটিল, লেখকের তাহা নিশ্চই অজ্ঞাত।

(১৪) শশীকে অর্ধেন্দু উড়িয়া ভাষা শিখাইবেন কি, শশী এমনি ওস্তাদ ছিল যে সে অর্ধেন্দুকে শিখাইতে পারিত।

(১৫) ষ্টেজও পচে নাই, দলও ভাঙে নাই। রাজেন্দ্র পালের দালানে ওরকম চারটে ষ্টেজের সরঞ্জাম রাখিবার জায়গা ছিল।

(১৬) অর্ধেন্দুবাবু দল গড়িবেন কি? নগেনবাবুই দল গড়িলেন। অর্ধেন্দুবাবু দলের শিক্ষকতা করিতেন; ওলব ভাঙ্গাগড়ার দিকেই যাইতেন না।

(১৭) এই সময়ে গিরিশবাবু কোনও সন্ধের যাত্রার দল বসান নাই, কোনও সঙ্কল্পের পালা বীধেন নাই। উনি আপিসে বসিয়া ‘লুপ্ত-বেগী’ গানটি রচনা করিয়া আমাদের এই বাড়ীতে আসিয়া গানটি আমাদেরিগকে গাইতে বলেন; এই বাড়ীতে বসিয়া ঐ গানের সুর ধরা হয়।

(১৮) আমি গিরীশবাবুর দলে যোগ দিব কি, তাঁহার দল কোথায় ছিল? ‘দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ’ যাত্রায় দুইটা স্বেচ্ছা হইয়াছিল,—সাপুড়ে ও বাউল। নটবর, ওরফে নাটুদাশ, সাপুড়ে সাজিয়াছিল; আর আমি বাউল। বাউল সাজিয়া আমি ঐ গানটি গাইয়াছিলাম।



(১২) ‘অমৃত বরষে’—অমৃত পাল নয়, তুনি বোস।

‘হাক্, আর ছোট বড় কত তুল আপনাকে দেখাইব? পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে বিখ্যাত লেখক ঐ ‘রক্তালয়’ প্রবন্ধের জন্য মালমসলা আমার নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, বাঙ্গালার রক্তমন্ডের ইতিহাসে অর্ধেন্দুশেখরের আবির্তাবের পরবর্তী অংশটা লেখকের হস্তে বিকৃত হইয়া গেল।

‘লীলাবতী ও ললিতের কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে থাকার দরুণ অনেকেই পশ্চাৎপদ হইলেন। শেষে গিরিশবাবু আসিয়া যখন ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন আর কোনও বাধা রহিল না। পাত্রপাত্রী নির্বাচন স্থির হইয়া গেল।

লীলাবতী	..	...	সুরেশচন্দ্র মিত্র
ললিত	...	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হেমচাঁদ	...	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নদেরচাঁদ	...	...	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
যজ্ঞেশ্বর	...	...	গোপালচন্দ্র দাস
বঘুউড়ে	...	...	হিজুল খাঁ
ক্ষীরোদবাসিনী	...	...	রাধামাধব কর
সারদা, সুন্দরী	...	...	বেলবাবু
স্বি	...	...	অর্ধেন্দুশেখর

‘স্বির মুখে ষাট মেদিনীপুরের ভাষা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, কানাইলাল দে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

‘১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে ‘লীলাবতী’ অভিনীত হইল। মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। লঙ্ঘার সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়া গেল। সেই ভিজে চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন।

‘এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি, ‘উবা-অনিরুদ্ধ’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘লীলাবতী’ পর্যন্ত যতগুলি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম, সমস্তগুলির স্রীলোকের ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই করিতে হইত। আমি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর লীলাবতী অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ আমার নামের উল্লেখ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—‘শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর থিয়েটারের শিক্ষকতার দাবী রাখেন।’

‘দীনবন্ধুবাবু তখন পোষ্ট অফিসের বড় কর্মচারী;—Personal Assistant to the Postmaster General of Bengal. তিনি তখন সবষাত্র পৌরপৈতি দাঙ্গিলিং ও দাঙ্গিলিং-আলাম ডাক পথের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে পৌরপৈতিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছুটি করাইয়া ‘লীলাবতী’ অভিনয়ের জন্য আমাকে

কলিকাতায় আনিলেন। ভঙ্গলোক হইতে হইলে মত্তপান করা উচিত, এই ধারণা তখন আমাদের মজ্জাগত হইয়াছিল। কিন্তু থেজের উপরে মদের বোতলে লাল জল পুরিয়া মত্ত পানের অভিনয় করা হইত। ‘সধবার একাদশী’তে নিমটাদের ভূমিকা লইয়া গিরিশবাবু বলিলেন,—‘রাতিয়ে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গলায় সর্দি বসে যাবে, আসল মদ নইলে চলবে কেন?’ অতঃপর আমাদের নিমটাদকে আর মত্ত পানের ভান করিতে হইত না। অনেক দিন পরে স্বনাম-ধন্য ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারী একজন অভিনেতাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—‘আমি কখনও থিয়েটার দেখি না। তোমাদের পাবলিক থিয়েটার কিন্তু সমাজের একটা উপকার করেছে। আমাদের পাড়ায় রাস্তায় মাতালদের বেলেলাগিরি একেবারে কমে গেছে।’

“১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূজার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের চোরবাগানের বাড়ীতে ‘সধবার একাদশী’ ও ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ অভিনীত হইল। গিরিশবাবু একটা নটনটীর Prologue রচনা করিয়া দেন। এই অভিনয়ের জন্য আমাকে মালম্হ হইতে আসিতে হইয়াছিল। এসময়ে বিশ্বকোষের chronology আগাগোড়া ভুল। ইহার অব্যবহিত পরের ইতিহাস আমি দিতে পারিব না, কারণ আমি কলিকাতায় ছিলাম না। বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ এখন আপনাকে বলুন।”

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন—“অধিক কিছু বলিবার নাই আমরা কয়েক জনে শ্রাশনাল থিয়েটার হইতে সরিয়া দাড়াইলাম। গিরিশবাবুর ইচ্ছা যে ভাল লাজ সরঞ্জাম ষ্টেজ প্রভৃতি না হইলে পাবলিক থিয়েটার খোলা চলিবে না। নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ অনেকেই কিন্তু পাবলিক থিয়েটারের পক্ষপাতী। রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড হলে তাঁহাদের rehearsal হইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নগেনবাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের dress rehearsal হয়। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বোস আসিয়া এই দলে যোগদান করেন।”

## চৌদ্দ

দোল পূর্ণিমা ১৩২৭

আজ সন্ধ্যার প্রাকালে আচার্য্য শ্রীব্রত বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃথ হইতে পুরাতন কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া কুশল-প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন, “এখন আর আমি সকালে-সন্ধ্যায় বেড়াইতে পারি না ; শরীর বড় দুর্বল। তুমি আমার কাছে আমাদের দেশের পুরাতন কথা শুনিবার ইচ্ছা কর ; কিন্তু আমি কখনও বাহিরে কাহারও সঙ্গে মিশি নাই ; বিশেষ কিছু বলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না ; তবে বাঙ্গালী হিন্দুলম্বাজে যে খুব বেশী পরিবর্তন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি।

“তখন একারবর্তী পরিবার খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। ভাই-ভাই যে শুধু একত্র থাকিত, তাহা নহে ; বেশ সম্ভাবে থাকিত। প্রীতির বন্ধন বাস্তবিক খুব শক্ত ছিল। পরস্পর কলহ করিয়া আদালতের আশ্রয় লওয়া কাহারও কল্পনায় স্থান পাইত না। বিষয়-সম্পত্তি লইয়া যে দিন প্রথম আদালতে মোকদ্দমার কথা শুনিলাম, সে দিন আমার প্রাণে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। আমারই আত্মীয়দিগের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছেদ প্রথম দেখিলাম।”

আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আন্তে-আন্তে ইংরাজি-ভাষায় তিনি এই পুরাতন সমাজের অবস্থার বিবৃতি করিতে লাগিলেন ; কারণ, আমাদের কথোপকথনের প্রায়স্তই মিঃ এণ্ড্রু আলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মিঃ এণ্ড্রুও নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার পিতামহকে মনে পড়ে কি ?”

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—“মনে পড়ে বৈ কি ! আমি তখন ছয়-সাত বছরের ছেলে ছিলাম। সে বয়সে তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনও নিজের অজ্ঞিত জ্ঞান নাই ; তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত যাহা কিছু জানি, তাহার অধিকাংশ পয়ের নিকট হইতে শোনা। তিনি ইয়োরোপে গিয়া ফরাসী অভিজাতবর্গের মধ্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

“বিলাসিতা আমাদের দেশের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে খুব বেশী ছিল। বড় লোকদের যেন একটা ধারণা ছিল যে, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া খুব খরচ করিতে পারিলেই সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। কে কত বেশী খরচ করিতে পারে, এই লইয়া যেন পরস্পরের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তখনকার সমাজ-চিত্রের এই অংশটাই মন্দ ছিল। এখন সে রকম বিলাসিতা নাই বটে, কিন্তু এমন অনেক নূতন দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা তখন ছিল না। পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে যে উৎসব দেখিয়াছি, সে রকম উৎসব পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আমাদের প্রতিমা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর হইত। পূজার অনেক

আগে হইতেই আমাদের বাড়ীতে দর্জী বলিয়া বাইত ; জহরীর আগমন হইত । দর্জী ও জহরী মিলিয়া বাড়ীর সকলের পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিত । গৃহ-প্রাক্ষণে যে যাত্রা প্রভৃতির আয়োজন হইত, তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার আপামর সাধারণ সকলের ছিল । দরজা বন্ধ করিয়া কড়া পাহারা রাখিয়া, কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেওয়া অভ্যস্ত গর্হিত বলিয়া বৈবেচিত হইত । ধনী গৃহস্থের বাড়ীর পূজার আয়োজন কেবল মাত্র সেই পরিবারের ও নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট সংখ্যক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের জন্য করা হইত না । প্রত্যেক গৃহস্থের পূজার উৎসব একটা বৃহৎ সামাজিক উৎসব ছিল, সমাজের ছোট-বড় সকলেই অবধে সে উৎসবে মাতিবা উঠিত । আমার পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মাচরণ বশতঃ পূজার সময় বাড়ী থাকিতেন না । তিনি কিছু আগে হইতেই বিদেশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন ।” আচার্য্য মহাশয় একটু চূপ করিলেন । মিঃ এণ্ড্রুজ ও শ্রীমান সন্তোষকুমার তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইলেন । অতঃপর তিনি বাঙ্গালার বলিতে আরম্ভ করিলেন । অনেকক্ষণ ইংরাজীতে কথা কহিয়া বোধ হয় তিনি কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন । আমি একটু অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কথার সূত্র ধরাইয়া দিলাম,—“আপনার পিতৃদেব সে সময়ে বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন ?”

“হাঁ । তিনি অনেক যায়গায় বেড়াইতেন । কিন্তু তাই বলিয়া বাড়ীর পূজার উৎসবের কোনও ত্রুটি, কোনও ব্যতিক্রম হইত না । ভিড়ের মধ্যে কোনও কারণে কখনও পুলিশকে কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত না । একবার আমাদের বাড়ীতে আমাদের এক বন্ধুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল । গাড়ী শীলমোহাবাসিত ছিল দেখিয়া এক জন পুলিশ-প্রহরী গাড়ীখানা আটক করিবার চেষ্টা করিল । আমাদের বাড়ীতে তখন অনেকগুলি ভদ্র-সন্তান আমাদের পরিবার মধ্যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত বাস করিতেন ; তন্মধ্যে গাজুলী মহাশয় বোধ করি সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কনেটবলকে প্রহার করিয়া হাঁকাইয়া দিলেন । কলিকাতা সহরে পুলিশ পাহারাওয়ালাকে বড় একটা কেহ ভয় করিত না । এবং এই পুলিশের প্রতি বল-প্রয়োগের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের কোনও বেগ পাইতে হয় নাই ।

“আমাদের দেশে এই পূজা ও এই উৎসব একেবারে ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য ছিল না । বিদেশীরা না জানিয়া শুনিয়া যাহাকে idolatry বলিয়া অবজ্ঞা করিত, তাঁরা বাস্তবিক idolatry নহে । ব্রাহ্মণাদি ভদ্র-সন্তানের কথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি । কোথাও কোথাও যে bigotry ছিল না, তাহা নহে ; বাস্তবিক ভদ্র-মানস সমাজের মধ্যে ছিল, সংখ্যায় অবশ্যই অল্প । সেই সকল ঝাঁট ভক্তদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা খুব ঠিক যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণতন্ত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান কিছু না কিছু নিহিত ছিল । ছিল বলিয়াই তখনকার প্রতিমা-পূজাকে কিছুতেই আমি superstition বা idolatry বলিতে প্রস্তুত নহি । সমাজের এই ভাবটাকে যদি ধর্ম্মতাব বলা যায়, তাহা হইলে আমি অস্বীকৃত চিন্তে বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের সমাজের ধর্ম্মতাব

এই ধর্মভাব কিছু ছিল না কিছু ছিল, এবং এখনও আছে। এ হিসাবে আমাদের দেশের নিম্ন-শ্রেণীর লোক ও ইয়োরোপের নিম্ন-শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। এই ধর্মভাব আছে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী এত সহজে জন-সাধারণকে ধর্মে মতি রাখিয়া প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

“আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে যে এই ধর্মভাব, এই সহজ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল এবং আছে, এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল। দূর পল্লীগ্রাম হইতে অনেক লোক মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহার। আমাদের বাড়ীর তেতালার উপরে থাকিতেন। সেই সমস্ত খাটি পল্লীবাসীদের কথা-বার্তা, আচরণে, ব্যবহারে তাঁহারা কেমন ধর্ম-ভাবাপন্ন, কেমন cultured, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইত। তোমাদের ইন্সল-কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর ও হষ্টেল-বাসের ফলে সেই খাটি ধর্মভাব, সেই আমাদের স্বদেশী culture, ও সঙ্গে সঙ্গে একান্তবর্তী পরিবারের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইন্সল-কলেজগুলো উঠিয়া গেলে যে বাস্তবিক আমাদের সমাজের লোক-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হইবে, এমন ত মনে হয় না। বরং সমাজের কল্যাণকর হ্রাশকার প্রবর্তনে সফল ফলিতে পারে। নহিলে আমরা যতই কেন ‘স্বদেশী’ ‘স্বদেশী’ বলিয়া চীৎকার করি, আমরা কিছুতেই স্বদেশী হইতে পারিব না। এ কথাটা বোধ হয় তোমাদের ভাল করিয়া বুঝাইতে পারা শক্ত। তোমাদের মনের গতিক এত বদলাইয়া গিয়াছে যে, তোমরা সহজে ধারণা করিতে পারিবে না, কেন আমি এ কথা বলিতেছি। বিদেশী শিক্ষায় বালাকাল হইতে পরিপুষ্ট হইয়া এখনকার বাঙ্গালী সম্ভান যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহারা কেমন করিয়া স্বদেশী হইবে? তাই ওটা কেবল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমার পিতামহের সঙ্গে আমার ছোট-ফাকা-বিলাত গিয়াছিলেন। ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বিলাতী বেশ-ভূষা চাল-চলন সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন; তাঁহার বিলাত-প্রবাসের কোনও চিহ্ন লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। ইউরোপের সভ্যতা তখন এতই বিজাতীয় বলিয়া গণ্য হইত, যে, তখন উহা কিছুতেই আমাদের হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারে, এ কথা কাহারও মনে হইত না। তবে ভি রোজিও যে সকল বাঙ্গালী যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে তখন ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে অভিহিত করা হইত, তাহাদের কথা শুনি।” আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের যে দল ছিল, তাহার বাহিরে হিন্দু-সমাজের যুবকগণের মধ্যে মতপান কি সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত?” তিনি বলিলেন, “না; উহা সমাজে দৃশ্যীয় বলিয়া গণ্য হইত। মতপানাসক্তি চিরকাল নিন্দনীয় ছিল। ঐ যে রাজনারায়ণ বসুর কথা বলিতেছ, তিনি ঐ ইয়ং বেঙ্গল দলভুক্ত ছিলেন। সেই দল ছাড়িয়া তিনি আমার বাবার কাছে আসিলেন। আজ তিনি জীবিত থাকিলে তোমাকে অনেক কথা বলিতে পারিতেন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাজনারায়ণ-

বাবু যখন আপনার পিতৃদেবের কাছে আগিলেন, তখন কি তিনি ইঙ্কল-মাটার ?” উত্তর হইল,—“না ; যতদূর স্মরণ হয়, তখনও তিনি কলেজের ছাত্র। তাঁহার শিতার<sup>১</sup> সহিত রামমোহন রায়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে তিনি আমাদের বাড়ীর সহিত পরিচিত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজনারায়ণবাবু ও আমি, আমরা পরস্পর উভয়ের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি সদ্গানন্দ পুরুষ ছিলেন। আজ আমার সমবয়স্কদিগের মধ্যে কেহই জীবিত নাই। বয়ঃকনিষ্ঠদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই গিয়াছেন, একা কৃষ্ণকমল এখনও আছেন।<sup>২</sup> তাঁর কাছ থেকে ত অনেক কথা তুমি শুনিয়া লইয়াছ। তাঁর মত সুপণ্ডিত প্রায় দেখা যায় না। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। রাজনারায়ণবাবু আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কৃষ্ণকমলকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম। একবার বোধ করি বাঁচন সোলাইটির এক অধিবেশনে আমি একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। কৃষ্ণকমল সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—‘আমাদের বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন ?’ আমি বলিয়াছিলাম যে নিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাব পরিবর্তন না করিলে আমাদের বিদ্যা কিছুতেই ফলবতী হইবে না।’ কৃষ্ণকমল বলিলেন—‘বক্তা আমাদিগকে বিদেশীয় ভাব পরিবর্তন করিতে বলিলেন। ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কিছু স্বদেশী রীতির পরিহরণ আবশ্যক। শুধু আলো চাল আঁচা কলায় চলিবে না।’ পরিহরণ শব্দটা এই আমি প্রথম শুনিলাম। সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক করা ত চলে না ; ইচ্ছা হইয়াছিল বাহিরে আসিয়া বলি যে, ইয়ং বেঙ্গলের বীক্ষত্রাণ্ডির চেয়ে আলো চাল আর কাঁচকলা ঢের ভাল। কিন্তু সমালোচক যে স্বয়ং কৃষ্ণকমল ! আমার আর কিছুই বলা হইল না।

“একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যে প্রীতি ও সম্ভাব ছিল, এখন আর তাহা দেখা যায় না। আমার খুল্লতাগুণ সংসারে ও বিষয়-কর্মে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না ; আমার পিতৃদেব সমস্ত দেখাশুনা করিতেন ; কোনও প্রকার গোলযোগ ছিল না। আমরা সব খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাই ঠিক সহোদর ভাইয়ের মত পরস্পরের প্রতি অহুস্ক ছিলাম। সামাজিক রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে এই প্রকার পারিবারিক বাবস্থা খুব হিতকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম, রীতি, নীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইয়া চলিলে কোথাও কিছু বাধে না। কিন্তু যদি কেহ ধর্ম-সম্বন্ধে নূতন মত অবলম্বন করিবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই একান্নবর্তী পরিবার বাধা দেয়। সে কিছুতেই ব্যক্তিবিশেষের মত মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে চায় না ; অথবা তাহার মত মানিয়া না লইয়াও, তাহাকে বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকিতে দিয়া, স্বাধীন ভাবে তাহাকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে দেয় না। এইখানে এই joint family system-এর সর্কারীতা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার পর হইতে যে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিতে আরম্ভ হইল, নানা কারণে সে ভাঙা আর জোড়া দেওয়া পেল না। যে

১. লক্ষ্মিণেশ্বর বহু, ইহা রামমোহন রায়ের সেক্রেটারি ছিলেন।—স

২. বিজ্ঞানবাথ ঠাকুরের ন্যায় কৃষ্ণকমলের জন্মসাল ও ১৮৪০।—স

Individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়া উঠিল, তাহা সমাজের মধ্যে একায়বর্তী-পরিবারকে কিছুতেই টিকিতে দিতে চাহিল না। আজ সর্ব্বদেই সেই disintegration-এর লক্ষণ দেখিতেছি। আমি যে সময়ের ও যে সমাজের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহার কোনও চিহ্ন এখন আর বর্তমান নাই; তাহা এত পুরাতন যে, রবি তাহা দেখে নাই।

“ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে পরস্পরের খুব প্রীতি ছিল। একের বেদনায় অন্ত্রে কষ্ট বোধ করিতেন। Orthodox সমাজ হইতে তাঁহারা একটু দূরে সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বিদেশীয় আক্রমণ হইতে স্বদেশের মানরক্ষা করিবার সময় সকলে একত্র হইয়া কাজ করিতেন। যখন ‘কাল-আইন’, black-act-এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চকল হইয়া উঠিল, স্ত্রী রাধাকান্ত দেব ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিলেন। আমার বাবা যখন সেই সভায় উপস্থিত হইলেন, স্ত্রী রাধাকান্ত তাহাকে সাহসে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—‘আপনি না এলে শিবহীন যজ্ঞের মত এ সভা পণ্ড হতো।’

“একায়বর্তী পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীন চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাধা পাইত, এ কথা আমি বলিতেছি না। সে সময়ে সমাজের এক প্রকার toleration বরাবর ছিল। শুধু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে পারিত; কিন্তু সামাজিক রীতি-নীতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলিতে চেষ্টা করিলে সমাজ তাহা সহ্য করিত না। কলিকাতায় তখন সমাজ-বন্ধন অনেকটা দৃঢ় ছিল। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল,—ধনী অভিজাত বংশ ও মধ্যবিত্ত সাধারণ নিম্ন-শ্রেণী গৃহস্থ। আমার পিতামহকে কলিকাতার সকল গৃহস্থই মানিয়া চলিত। সকল পক্ষের দোষ-গুণ বিচার করিয়া তিনি সমাজ-শাসন করিতেন। এ যে ঠিক মধ্যযুগের ইয়েরোপীয় ফিউডাল ব্যবস্থার মত ছিল, তাহা নহে। সকল গৃহস্থই সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন; কেহ কাহারও বশতাপন্ন vassal ছিলেন না। অথচ কেহ সমাজের মধ্যে অত্যাচার বা অন্যায় আচরণ করিলে তাহার প্রতীকার সমাজের নিজের হাতেই ছিল। এখন এই উৎকট individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিনে তোমরা পুলিশ ও ইংরাজের আদালতের আশ্রয় কইরা তোমাদের নিজের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা কর। এখন সমাজের নিজের কোথাও এমন শক্তি নাই যে, সে নিজের ভিত্তিকার দোষ সারিয়া লইতে পারে। তখন সমাজের মধ্যে সে শক্তি ছিল, এবং অনেক সময়ে সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহা নিয়োজিত হইত। আমার পিতামহের কথা বলিয়াছি; তাঁহাকে সকলেই মানিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় একাধিক সমাজশাসক দলপতি দেখিতে পাওয়া গেল। সকলেই অভিজাত শ্রেণীর বড়লোক। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক কলিকাতার সমাজের এক-এক অংশের উপর বিস্তৃত ছিল। স্ত্রী রাধাকান্ত দেব, ছাত্তাব (আভতোব দেব) প্রত্যেকেই এক-এক দলপতি ছিলেন। আমাদের যে অধেশী সভ্যতা culture পুরুষ-পরম্পরাগত চলিয়া আসিতেছিল, ইংহারা

তাহার পোষকবরূপ ছিলেন। ইংহারা প্রত্যহ রীতিমত সভা করিয়া বলিতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কত সুসিঁটি শ্লোকের আবৃত্তি হইত, রস-সাহিত্যের কত চোটে খেলিয়া যাইত, তাহা তোমার আর কি বলিব। ভাল-ভাল গায়ক ও বাস্তবক সভায় যে গান-বাজনা শুনাইতেন, তাহা সভাস্থ সকলেই উপভোগ করিতে পারিতেন। কারণ, এই সকল সংস্কৃত রস-সাহিত্যের আখ্যান-বস্তু, এই সমস্ত গান বাজনা আমাদের স্বদেশী সভ্যতার মর্মস্থান হইতে উৎসারিত হইয়াছে; আর স্বরণ রাখিও যে, সেই স্বদেশী culture সমাজের সকল স্তরেই ছিল। ছিল বলিয়াই সকলের স্বভাব-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইত। ছিল বলিয়াই এই সমস্ত গান-বাজনা ও রসসাহিত্যের সকলেই সমজ্ঞদার ছিল। অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণের লোকের মধ্যে যে বিনয়, নম্রতা ও অস্ত্রান্ত সঙ্গুণ ছিল, তাহাতেই বুঝা যাইত যে, সেই স্বদেশী সভ্যতার প্রভাব কত বেশী ছিল। আসল কথা এই যে, সর্বত্রই authority মানিয়া চলার অভ্যাস এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, দলপতির সমাজ-শাসন-কার্য্য খুব সহজেই নিষ্পন্ন হইত। তবে দলপতিদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কখন-কখনও দলাদলির ও বিরোধের লক্ষণ দেখা যাইত। ছাত্তুবাবু দলের সঙ্গে আমাদের দলের বিরোধ মাঝে-মাঝে প্রকাশ পাইত; কিন্তু দু'এক জন ভদ্রলোক দুই সভাতেই যাতায়াত করিত; ক্রমশঃ হয় ত তাহারা এক দল ছাড়িয়া অন্য দলভুক্ত হইয়া পড়িত। এই অভিজাত-শ্রেণীর বড়লোকদের চরিত্রে যে কোনও দোষ ছিল না, তাহা নহে। একটা মহৎ দোষ ছিল; অনেকেরই উপপত্তী ছিল। কিন্তু তখনকার সমাজ তাহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত না; এবং তৎকাল্য তাঁহাদের authority-র কিছুমাত্র লাঘব হইত না; সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। তাঁহাদের চরিত্রে অল্প অনেক ভাল গুণ ছিল; হুতরাং কেহ তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিতে কিছুমাত্র বিধাবোধ করিত না।

“আজকালকার ডিমোক্রেনির দিনে কেহ কাহারও authority মানিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। সকলেই চরিত্রে যেন একটা ঐক্য প্রকাশ পায়, সেইটাকে তাঁহারা স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন; এবং সেই কল্পিত independence-এর গর্ব করেন। এই স্বাধীনতা তাঁহারা দেখান,—কোথায়? গৃহের মধ্যে। জ্যেষ্ঠের authority মানিয়া চলিলে এই স্বাধীনতা বজায় রাখা চলে না—অতএব যত কিছু স্বাধীনতা প্রকাশ কর ঘরের মধ্যে, বয়োজ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে। ঘরের বাহিরে অকার্য্যে অথবা সামাজ্য কারণে বিদেশীর পদানত হইতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ কর না; সেখানে তোমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা দেখাইবার চেষ্টা নাই; যত তোমার independence of spirit ঘরের মধ্যে। তুমি স্বদেশী হইবার স্পর্শ কর কিসে? তোমার স্বদেশ বলিয়া কোনও কিছু জ্ঞান থাকিলে তবে ত তুমি স্বদেশী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতে। তুমি patriotism-এর আদর্শন কর! তোমরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-প্রধান; স্বদেশের সঙ্গে কোথায় তোমাদের সংযোগ আছে? দেশের সমাজের কোনও স্তরের কাহারও বৈদ্যনা



কখনও বাধা বোধ করিয়াছ কি? স্বদেশী সভ্যতাকে প্রচার চক্ষে দেখিয়াছ কি? তোমাদের এই ভিমোকেলির যুগের পূর্বে বাহারা স্বদেশী culture-এর মধ্যে গড়িয়া উঠিতেন, বাহারা সমাজের ভিত্তর authority মানিয়া চলিতেন, আভিজাত্যের সম্পর্কেও তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা খর্ব হয় নাই; তাঁহারা খাটি স্বদেশী ছিলেন; patriotism তাঁহাদের শুধু কথাই ছিল না। তোমরা এখন স্বদেশী ফলাও, patriotism ফলাও! কোনও কিছু বিশেষ পড়াশুনা না করিয়াও বিজ্ঞা ফলাও! এই ফলানো তোমাদের একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। আর মজা এই যে, তোমরা স্থির লিঙ্কাস্ত করিয়া বলিয়া আছ যে, তোমরা খুব স্বদেশী, খুব patriot, খুব পণ্ডিত! কেন তোমরা এমন করিয়া আত্মবঞ্চনা কর, এইটাই আশ্চর্য! সমাজের disintegration-এর দক্ষণ তোমরা দায়ী না হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ করিবার জায়গা কি ঘরের মধ্যে? যেটা উচ্ছৃঙ্খলতা, সেটাকে স্বাধীনতা, independence of spirit বলিয়া জাহির করিতে লজ্জাবোধ কর না কেন? দেশের হাওয়া যে কত বদলাইয়া গিয়াছে, লোকের মতিগতি কতদূর বিকৃত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি; এবং বুঝিতে পারি বলিয়াই বেদনাবোধ করি। তোমরা সহজে বুঝিতে পার না যে, তোমাদের পক্ষে স্বদেশী হওয়া, patriot হওয়া কত শক্ত। ইহার জন্ত তোমাদের ইন্সুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা দায়ী, তাহাও তোমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

“ইন্সুল-কলেজের গঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প। লেখাপড়া বাড়ীতেই করিতাম। কিছুদিন বাঙালী পড়িয়া একেবারে সংস্কৃত মুখ্যবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তখন ছোট-ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযোগী বাঙ্গলা বই বড় বেশী ছিল ছিল না। একখানা বইয়ের নাম আমার মনে আছে, ‘নীতিকথা’<sup>১</sup>। বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম। ক্রমশঃ মুখ্যবোধ পার হইয়া রঘুবংশ, কুমারসম্ভব শেষ করিলাম। আর বাড়ীতে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার জন্ত লেখা-পড়া করা, ইহা আমার কখনও ভাল লাগিত না। দুই বছর সেন্ট পল্‌স্ ইন্সুলে পড়া হইল। স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন কি নাম ছিল মনে নাই;<sup>২</sup> বাহা হোক সেই কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ হইল। পাস করিবার জন্ত পড়িতে হইবে, এ আমি কিছুতেই স্বীকা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইতিহাসের পুস্তকখানা এত নীরস ছিল, সে বইখানার একটি পাতাও উটাইয়া দেখিলাম না। অঙ্ক আমার ভাল লাগিত; কিন্তু ক্লাসের বাধাধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কলা ও গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

১ ‘কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি’র অনুমোদিত ত্রিভাষ্যে স্মিত, বাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ইংরেজী ও আরবী হইতে একত্রিংশটি কাহিনী বাংলায় অনূবাদ করিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশ করেন। (ত্রয়োদশ বন্দোপাধ্যায়ের ‘কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত’)—সং

২ হিন্দু কলেজ; হিন্দু কলেজ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু স্কুলের রূপ নেয়।—সং

আমার ভাল লাগিত Trigonometry ও Mensuration, বাড়ীতে ইচ্ছায়ত আমি তাহাই আলোচনা করিতাম। মেটাক্‌ হু হইতে যত ইচ্ছা বই লইতে পারিতাম; কারণ ঐ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের বাড়ী হইতে অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এখন আর সে রকম বই আনা বোধ করি চলে না, লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্ভবতঃ গে'ডার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার যাহা ভাল লাগিত, আমি তাহা বাড়ীতে বলিয়া পড়িতাম; হয় ত কোন-কোনও দিন স্থল কামাই করিতাম। ইংরাজ যখন আমাদের বলে, 'তোমাদের home বলিয়া কোনও জিনিষ নাই; আমাদের home sweet home, আমাদের fireside-এর সমান তোমাদের কিছু নাই,'—তখন আমার মনে হয় যে, এরা বলে কি। আমাদের home নাই, ত কার আছে? অন্ততঃ আমার কাছে আমার বাড়ী যে কি আনন্দের জিনিষ ছিল, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমার বাড়ী আমার কাছে স্বর্গ ছিল। কিন্তু কলেজের পড়া একেবারে না করিয়া পবীক্ষা দিয়া উপরের ক্লাসে উঠা দ্রুত, বাঙ্গালার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র আমাকে বাঙ্গালার বেশী নম্বর দিয়া সে যাত্রা উদ্ধার করিলেন। এই রামচন্দ্র মিত্র একটি character। সে যে কি রকম character তা' আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না; ভাঁড় বলিলেও ঠিক হয় না, অথচ সে এক কিছুত-কিমানকার ব্যাপার। তিনি মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে কর্তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। ভাগ্যে কোন রকম করিয়া প্রোমোশন পাইলাম, নইলে বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত হইত। কিন্তু পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে কলেজ পরিত্যাগ করিলাম। উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। আর একজন আমার সহপাঠী ছিলেন,—রমেশচন্দ্র মিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের বছর দুই পূর্বে আমি কলেজ ত্যাগ করিলাম।

“সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার ‘মেঘদূত’ প্রকাশিত হইল।’ আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল; তা'র মধ্যে হয় ত হালকা রকমের রক্তরসের কবিতাও ছিল। বাল্যকাল হইতে ছবি আঁকার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল আমি painter চিত্রকর হইব, কিন্তু ভাল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করার অভাবে আমার সাধ পূর্ণ হইল না। মেঘদূতে আমার নাম ছিল না। অনেকেই নিজের নিজের কবিতাপুস্তকে একটু-আধটু করিয়া লইয়া বেমালুম চালাইয়া দিতে লাগিলেন; এমন তা'বে চালাইলেন যেন উহা তাঁহাদের স্বরচিত জিনিষ। কেহ একটু চেষ্টা করিলেই যে আমার নাম জানিতে পারিতেন না এমন নহে। বিভাগাগর কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি প্রশংসাও করিয়াছিলেন।

“এই যে পরের জিনিষ বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইয়া দেওয়া, এ দোষ আমাদের দেশে আছে। অর্জনশালী অধিক হইয়া গেল, আমার ‘তত্ত্ববিদ্যা’ বাহির

হইয়াছিল।<sup>১</sup> আমাদের দেশে আমি যে ভাবে বাঙ্গালার দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে রকম আমার পূর্বে আর কেহ করেন নাই। ‘তত্ত্ববিজ্ঞা’ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে কালীবর বেদান্ত-বাগীশের লেখার সমালোচনা করিয়া, ‘তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক?’ নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ‘তত্ত্ববিজ্ঞা’ সকলের পূর্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর নবগঠিত সমাজের জন্ত একটা philosophy আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। কি করিয়া সেই philosop y দাঁড় করান যায়, তাহা লইয়া অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি তাঁহাদিগকে ‘তত্ত্ববিজ্ঞা’ পড়িতে বলেন। ‘সাধারণের’ দল যাহা খুঁজিতেছিলেন পাইলেন; তাঁহাদের নূতন philosophy প্রকাশিত হইল। বেশ; তাহা লইয়া কোনও বাদবিস্বাদের কথা হইত না, যদি সব দিক বজায় রাখিয়া কাজ করা হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাস-পুস্তকে কোথাও ঋণ স্বীকার করেন নাই! অথচ এত বেশী মিল আছে,—তুধু যে ভাষার তাহা নহে, আগাগোড়া তর্কের ধারার—যে তুমি দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইবে। আমার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্তটা আমি ধরাইয়া দি। তবে ও-সব কাজ আমার কখনই ভাল লাগে না, তাই কিছু করি নাই। আমি আপন আনন্দে লিখিয়া যাই; কে কোন জিনিষটা না বলিয়া গ্রহণ করিল, সে সব খোঁজ রাখা কি আমার কাজ! তবে কথাগুলো ক্রমশঃ আমার কাণে আসিলে আমি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি যে ঠিক বটেই ত! কিন্তু সে কথা লইয়া আর গোলমাল করিতে ভাল লাগে না।

“তবে ঋণ স্বীকার না করিয়াও এমন ভাবে একটা idea নিজের রচনার মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহাতে বিস্ময় হইতে পারে কিন্তু রাগ হয় না। আমি যখন প্রথম ‘স্বপ্ন-প্রয়াণ’ রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বক্ষিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশ করিবার জন্ত। তখনকার ‘স্বপ্ন-প্রয়াণ’ আর এখনকার ‘স্বপ্ন-প্রয়াণে’ অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বক্ষিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই।<sup>২</sup> কিন্তু তাঁহার ‘বিষয়বস্তু’ মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বলিলেন। তফাতের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থ-চিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু গৃহস্থচিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে; কিন্তু বাড়ার মধ্যে গৃহস্থ-বধু গাড়ী হাঁকাইলেন, এ চিত্র

১ ১ম খণ্ড : ১৮৬৬, ২য় খণ্ড : ১৮৬৭, ৩য় খণ্ড : ১৮৬৮, ৪র্থ খণ্ড : ১৮৬৯।—সং

২ ১৮৭৫ খ্রষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়, ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮৮০ সালের (১৮৭৩ খ্রঃ) প্রাথম সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত হয়। (ডঃ ব্রজেননাথ বসুচৌপাধ্যায়ের ‘ব্রজেননাথ ঠাকুর’)—সং

একবারেই স্মৃশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র-সমাবেশের idea-টা যে তিনি আমার স্বচনা হইতে পাইতেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম ও ধর্শন সম্বন্ধে বন্ধিমবাবু অগ্নজ্ঞ গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বলিলেন, তাহার বহু পূর্বে ঠিক ঐভাবে ঐরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম।<sup>১</sup> বন্ধিমবাবু স্বক হইয়া উঠিলেন যখন তাঁহার ‘কৃষ্ণচরিত্রে’র সমালোচনা আমি ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র করিলাম। তিনি তখন ‘প্রচারে’র সম্পাদক, আমি ‘পত্রিকা’র সম্পাদক। পত্রিকার সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে; কিন্তু তিনি দোতালার শয়্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন—‘দেখ, বন্ধিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করচে, তা’র একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।’ তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় কর্তার কোনও হাত ছিল না, আগাগোড়া আমার নিজের।

“কেন বন্ধিম দুটো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বন্ধিমচন্দ্র শেষোশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া পাকা positivist ছিলেন। Positive Philosophy যাহাই হোক কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন grand man মহাপুরুষ। বন্ধিমবাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন grand man রহিয়াছেন; যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকোস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে Positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে grand man করিলেই সর্বোৎকৃষ্ট হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বন্ধিমের কৃষ্ণচরিত্র।

“আর্য্য সম্ভ্যতার অতি প্রাচীন তথ্যগুলি সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া আবশ্যক। নানাদিক হইতে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইলে একদিন আলল সম্ভ্য বাহির হইয়া পড়িবে। এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও সেই রকম আলোচনার জিনিষ।”

আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। বারান্ডার বাহিরে কানন প্রাস্তর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। আমি বলিলাম, “ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীনন্দন বাসুদেবের উল্লেখ দেখিতে পাই; বোধ আন্ধিরস ঋষি দেবকীনন্দন বাসুদেবকে অশ্বত্থের আশ্রয় দিয়াছিলেন।”

তিনি বলিলেন, “দেবকীনন্দন বাসুদেব আছে? তা’ হবে; আমার ঠিক স্মরণ

<sup>১</sup> ‘অধ্যায় বিভাগ প্রথম প্রস্তাব’ (‘ভারতী’, আধুনিক ১২৮৭) এবং ‘ঐতিহ্য ও অধৈতন্য’ (‘ভারতী ও বালক’, ভাগ ১২৩৩)। (অঃ ‘বিশ্বকোষ নাথ ঠাকুর’—ব্রহ্মকোষ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)—সঃ

নাই। অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণের যে tradition গড়িয়া উঠিল, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই এই দেবকীনন্দন বাহুদেব ঢুকিয়া গেল। অতি প্রাচীন tradition এই রকমেই গড়িয়া উঠে। বাহা হোক, কেন যে দুইটি শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে তা' ত আমি বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহাত্মারতের শ্রীকৃষ্ণকে মিলাইয়া লওয়া যায় না কি? আমার মনে ত কোনও জায়গায় বাধা লাগে না। এ সম্বন্ধে আমার একটা খিওরি আছে। আমার মনে হয়, কোন এক অতি প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মীয় গোপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মিশিয়াছিলেন। রাজার অহুচর তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তিনি পুতনা রাক্ষসী, কালীয় নাগকে নষ্ট করিলেন। গোড়া হইতেই তাঁর একটি বড় গোছের দল ছিল। তাই তিনি উৎপীড়িত প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুষ্তের দমন করিয়া জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন। তিনি নিশ্চয়ই আত্মীয় গোপ-পল্লীমধ্যে সকলের সঙ্গে খুব মিশিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় রাজবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে নানা অপবাদ রটাইতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার চরিত্রে নানাপ্রকার কলঙ্ক দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভণ্ড তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। তিনি তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। রামচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেন, যাহাতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতেন; দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ত সে রকম কিছুই করিলেন না; তিনি বরং দুই ক্ষত্রিয় রাজগণকে দমন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণের আদেশমত চলা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; নিম্নশ্রেণীর আত্মীয় গোপ প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রারম্ভে ভিউক অভ অর্লিন্স্ যদি জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিতেন, তাহা হইলে ফরাসি বিপ্লব অত জোরের সহিত হইত কি না সন্দেহ। আর শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যদি খারাপ হইবে, তাহা হইলে সহসা অত সহজে একেবারে বৃন্দাবন ত্যাগ করা যাইত কি? মথুরা হইতে দূত আদিল, 'আর অমনি চলিয়া গেলেন! একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না। মথুরায় তিনি রাজা হইলেন। বৃন্দাবনে আবার তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই যে ফিরাইবার চেষ্টা, ইহা কি কোন দুশ্চরিত্র লম্পটের জন্য সম্ভবপর হয়? পরবর্ত্তী যুগের বুদ্ধ অবতারের পথ শ্রীকৃষ্ণ অবতার প্রশস্ত করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমাজের নিম্নশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুই ক্ষত্রিয়ের দমন করিলেন; ব্রাহ্মণের ক্রোধ উদ্দীপিত করিলেন; জনসাধারণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই। দুষ্তের দমন করা তাঁহার জীবনের ব্রত; বিশেষতঃ দুই ক্ষত্রিয়ের দমন আবশ্যক। শিশুপাল পেল,

জরালঙ্ঘ গেল, কুরু-কুল ধ্বংস হইল। তিনি স্বয়ং মহাপরাক্রান্ত ছিলেন। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সখ্য লাভ করিবার জন্য সকলের খুব চেষ্টা হইল। দুৰ্য্যোধনকে তিনি তাঁহার নারায়ণী সেনা দিয়া কতকটা সন্তুষ্ট করিলেন, নিজে পাণ্ডবের কথা হইয়া রহিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ দুই ক্ষত্রিয়ের নিধনে সহায়তা করিলেন, এমন কি দ্বারকায় যদুবংশের ধ্বংস পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে হইল। বৃদ্ধ অবতারেব আবির্ভাবে আর কোন বাধা রহিল না। ব্রাহ্মণের যজ্ঞরক্ষা করার আবশ্যকতা আর নাই; দুই ক্ষত্রিয়ের দমন হইয়া গিয়াছে, এখন যিনি অবতার হইবেন, তিনি সমগ্র জনসাধারণকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন। হয় ত তাঁহাকেও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রাজার দুৰ্গতির বিচার-ভার তাঁহাকে লইতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও একটু ভাবিয়া দেখ। মুক্তির জন্য ভক্তের কোনও যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা-গায়ত্রীর প্রয়োজন নাই। শুধু নামকীৰ্ত্তন করিলেই মুক্তি হইবে। মুক্তির এমন সহজ উপায় না করিয়া দিলে ব্রাহ্মণেত্তর সমস্ত জ্ঞেয়ীর পক্ষে স্বাধা হইত না।

“এই ত মোটামুটি আমার খিওরি। হয় ত সব দিক হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করিলে নূতন আলো পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে ব্রহ্মের কৃষ্ণ ও মহাতারতের কৃষ্ণকে ভজন সম্পূর্ণ ‘আলাদা’ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অনাবশ্যক। যদি বাস্তবিক কোনও এমন বিষয় অসামঞ্জস্য থাকে যে, কিছুতেই দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য সম্ভাবিত হইতে পারে না, তাহা হইলে অবশ্যই জোর করিয়া মিলাইবার চেষ্টা করা বুধা। কিন্তু আমার ত মনে হয় না যে, দুইয়ের মধ্যে এমন কিছু অনৈক্য আছে। *Positivist religion*-এর জন্য যদি আদর্শ পুরুষ দরকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবশ্যক মত শ্রীকৃষ্ণকে কাটিয়া-ছাটিয়া দাঁড় করান কেন চাই, ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বন্ধিমবাবু রাগ করিলেন, এবং অকারণ কণ্ডার নাম করিয়া গ্লেব করিবার চেষ্টা করিলেন।”

রাজি ক্রমশঃ অধিক হইল, অথচ উঠিতে ইচ্ছা করে না। এ সকল কথা শুনিবার স্বেযোগ সহজে হয় না। অথচ বুঝিতে পারিতেছি, বক্তা ক্লান্ত হইয়াছেন। তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় কেমন করিয়া হইল ?

তিনি বলিলেন, “সে আমি কেমন করিয়া বলিব? বহু পূর্বে হইতেই তিনি আমাদের বাড়ী আনাগোনা করিডেন; কবে যে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি, সে কথা আমার স্মরণ নাই। অনেক দিন শুদ্ধবোধিনী পত্রিকার তিনি একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানিতাম। ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া বিজ্ঞানাগরের দলে মিশিলেন। বিজ্ঞানাগরের কথায় তিনি চারুপাঠ প্রভৃতি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইল।”

প্রশ্ন করিলাম—“বিজ্ঞানাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?” উত্তর হইল—

“ঐ এক বকরের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেরবাদী। এই অজ্ঞেরবাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞের বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পার; কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞের বলিব কেন? যেটা আমার অহুত্বের সামগ্রী, সেটাকে হয় ত আমি বাহিরে present করিতে পারি না; খানিকটা represent করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। সব জিনিষই কি বাহিরে আমরা present করিতে পারি? Represent করা ছাড়া আমাদের উপায় কি আছে? তোমার বেদনা হইয়াছে, সেটা তুমি কেমন করিয়া আমাদের কাছে present করিবে বল দেখি? তোমার অশ্রু তাহা represent করে মাত্র। কিন্তু তোমার বেদনা তোমারই অহুত্বের সামগ্রী হইয়া রহিল; তাহার presentation হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার বেদনাকে অজ্ঞের বলিব? ইউক্লিডের লাইনকে present করিতে পারা যায় কি? কাগজে কলি টানিলেই তাহার breadth থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তবুও ত আমরা সেটাকে represent করিবার চেষ্টা করি। ইউক্লিডের লাইন কি আমাদের অজ্ঞের রহিয়া গেল? Materialism চাও? আচ্ছা; ক্ষতি নাই; একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি। আমাকে, তোমাকে, প্রত্যেক sentient being-কে বাদ দিয়া শুধু material জগৎ একবার খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর দেখি। কিছু কোথাও থাকে কি? জর্ষণ পণ্ডিত কাণ্ট বুদ্ধির সাহায্যে এই জগৎ-তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া একটা vicious circle-এর বিষম আবর্তে ঘোরপাক খাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার অন্ধকার কিছুতেই ঘুটিল না। শব্দর কিন্তু যে পথ ধরিলেন, সেখানে অন্ধকার নাই, পরিকার আলো। তিনি বলিলেন,—ঐ প্রকৃতির লীলা দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞান পাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। প্রকৃতির লীলার কোন্‌খানে সত্য আছে, আজও তোমরা বলিতে পার কি? Electricity, space, atom প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা কিছু বুঝাইবার চেষ্টা কর, আজ পর্য্যন্ত তাহা ঐক্য এবং সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কি? প্রকৃতির কোন জিনিষটা শেষ পর্য্যন্ত খাঁটি, অভ্রান্ত, সৎ বলিয়া দাঁড়াইয়াছে? শব্দর বলিলেন,—প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না; ওকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই জগৎ ওকে আমি অবিশ্বাস বলিতে চাই। বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, উহা অবিশ্বাস, মায়। মায়, illusion তোমাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। কাণ্ট যে ভিমিরে সেই ভিমিরেই রহিয়া গেলেন। শব্দর ও-পথ একেবারেই ধরিলেন না। প্রমাণ ও প্রমেয় উভয়ের সত্তা এক বলিয়া তিনি ধরিলেন। আগাগোড়া বিচার করিয়া তিনি যেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন সেখানে আর কিছুমাত্র অন্ধকার নাই। আসল কথাটা শব্দর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে পাবেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না, সৃষ্টি মিথ্যা হয় সে-আমি কি একটা accident? সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটা কি একটা accident-এর উপর নির্ভর করিতেছে? তা যদি না হয়, তবে?”

আমি বলিলাম—“যখন শব্দের কথাটা উঠিল, তখন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। উপনিষদে যে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান আছে, তাহাতে লেখা আছে ‘নাহ্মেতদ্ বেদ তাত যদগোত্রমসি বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে স্বামলভে সাহ্মেতত্ত্ব বেদ যদগোত্র মসি’, শব্দ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—জবালা বলিলেন, বৎস, যৌবনে দরিদ্র স্বামিগৃহে বহু অতিথির পরিচর্যা করিতে হইত, সেই সময় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম; গোত্র জানি না। কেন জানি না? এই প্রশ্ন যদি উঠে, তদন্তরে শব্দ বলিতেছেন, অতিথিসেবার দিন-রাত এত ব্যস্ত থাকিতে হইত যে, স্বামীকে গোত্রের কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্যই আসল text-এর ভিতর এ সকল কিছুই নাই। কালীবর বোদ্ধবাসীগণও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার যেন মনে হয়, এটা একটা white-washing-এর চেষ্টা। আপনার কি মনে হয়?”

কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে তিনি উত্তর করিলেন—“আমার কি মনে হয়? শব্দ ঐ রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াই কি তাহা নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে? দরিদ্র স্বামিগৃহে জবালার যদি পুত্র জন্মিয়া থাকে, তবে অত সুখাইয়া আভাসে সে কথা জানাইবার আবশ্যকতা কি ছিল। উপনিষদের ভাষায় ত কোথাও বিশেষ ঘোরপ্যাচ নাই। সমস্তটার context-ছাড়া একটা মানে করিলে চলিবে কেন? যৌবনে দরিদ্র পরিচারিকার একটি ছেলে হয়েছিল; এটা ত কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। স্বামিগৃহে পরের সেবা করিতে এত ভুল হইয়া গেল যে, গোত্র পর্য্যন্ত জানা হইল না? ও-ব্যাখ্যা আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। সত্যবাদী জাবাল সত্যকামের ব্রাহ্মপন্থের বিশিষ্টতা উপনিষদের ভাষায় যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কিছুতে হইতে পারে না। বাস্তবিক যদি বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা খুব সহজেই বুঝান যাইতে পারিত। হোক উহা শব্দের ব্যাখ্যা, তবু ও-ব্যাখ্যা আমি মানিতে পারি না।

“শব্দের কথা আলোচনা করিতে-করিতে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে reform-এর কথা আমার মনে আসে। পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, আমাদের সেকালের সমাজের একটা প্রধান দোষ ছিল; ঐ সব reform-এর বিকল্পে সে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কি এ দেশের ধর্মে বা সমাজে সংস্কারের movement হয় নাই? সে সকল movement সমাজের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তবে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। একেবারে পুরাতন সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিলে তাহা নিঃসন্দেহ বার্থ হইবে। ফুলকে ডালহুন্ড গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া কাচের ফুলদানির মধ্যে জল দিয়া তিজাইয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা হয়, আমাদের গত শতাব্দীর বাঙ্গালার reform movement-এর সেই অবস্থা হইয়াছে। রামবোহন রায়ের সময় কিং কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এ-রকমটা দাঁড়াইবে। সমাজের ভিতর হইতে সমাজকে সংস্কার না করিলে, কিছুতেই



সকল-প্রিয় হওয়া যাইবে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাই তিনি অনেকটা সকলতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরে ঘটনা-পরম্পরায় যাহা দাঁড়াইল, তাহার জন্ত অন্তশোচনা করা বুধা। ছেলেবেলায় আমার মনে কত আশা, কত আনন্দ, কি enthusiasm ছিল! ভাবিতাম, দেশ ক্রমশঃ প্রবুধ হইবে, উন্নত হইবে, আপনাকে চিনিতে পারিবে। তাহা হইল না। কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত reform movement-টাকে এমন একটা twist, এমন একটা মোচড় দিলেন যে, সব গোলমাল হইয়া গেল। সে সব কথা স্মরণ করিলে মনে বড় ব্যথা পাই। কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোনও ধার ধারিতেন না, ভারতবর্ষের প্রাচীন culture-এর ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুও পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন; নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতি ছাঁচে তাহার নাম দিলেন New Dispensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি attitude লইলেন,— এইখানেই সমস্ত reform movement-টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল। তিনি উপনিষদ ছুইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি হিব্রু অথবা গ্রীক শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন? নব্য ইংরাজি-শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় দলে-দলে তাহার অমূল্যবর্তী হইল। তবুও তাহার সঙ্গে আমার দেখা-ভাষা বন্ধ হয় নাই। কিছুদিন বেশ কাটিল। ক্রমশঃ তিনি একটা অভাব অনুভব করিলেন। Music না থাকিলে কিছুতেই চলে না। একদিন আমার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন,—‘আমি একটু music শিখতে চাই; তুমি আমাকে হার্মোনিয়ম শেখাও।’ আমি বলিলাম—‘বিলাতি হার্মোনিয়ম শিখে তোমার কি হবে? দেশী কীৰ্ত্তন বরং একটু শেখো, যাতে তোমার একটু কাজ হবে।’ কথাটা তাঁর মনে লাগিল। তিনি কীৰ্ত্তন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁর নববিধানে কীৰ্ত্তনের প্রসার বাড়িয়া গেল। এ দিকে তিনি স্বাস্থ্যকর পরমহংসের কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। যাক সে সকল কথা। পরিতাপের বিষয় এই যে, কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না; অথবা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না যে, reform movement-এর গলদ কোথায় হইল। আমি কিন্তু গোড়া হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে কোথায় একটা মন্ত ভুল করা হইয়াছে। বহু দিন পুর্বেই বুঝিতে পারিয়াছি; এবং যাহারা বড় গোছের চাই হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদিগকে ‘মহাত্মা’ বলিয়া বন্দরল করিতাম। কিন্তু তাহারা উন্টে ঐ শব্দ সকলে মিলিয়া আমার উপর এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, ক্রমশঃ তাহাদের কাছে আমার নাম শুধু ‘মহাত্মা’ হইয়া গেল। কেশবচন্দ্রকে লইয়া কিন্তু কখনও আমি বন্ধ-বহুত করি নাই। মতের অমিল হইলেও তাহার সঙ্গে আমার মনের অমিল কখনও হয় নাই। বাবা যখন প্রথম হার্মোনিয়ম আনাইলেন, সহরের মধ্যে বাদ্যালী-সমাজে তখন আর কোথাও ঐ বাস্তব-যন্ত্রের চর্চা হইত কি না সন্দেহ। সতু (সত্যেন্দ্রনাথ) ও আমি হার্মোনিয়ম বাজাইতে শিখি। বাদ্যালার প্রথম-বয়লিপি যে আমার রচিত, তাহা

একেবারে নিঃশব্দেহ। সৌরীন্দ্রবোহন তাহার পরে ডাড়াডাড়া একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল। দেখ এখন বুঝিতে পারিতেছি যে কতকগুলো বিষয়ে আমি pioneer-এর কাজ করিয়াছি; আমার পরে কেহ-কেহ সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না; কঁসার গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে<sup>১</sup> তিনি বলিলেন, ‘আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালার ভাল করিয়া কবিতা রচিত হোতে পারে না, ‘মেঘদূত’ প’ড়ে দেখেচি, সে ধারণা ভুল।’ মাইকেল বাঙ্গালা কাব্য-রচনায় মন দিলেন। ঐ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি লিখিলেন, ও আমার কিছুতেই ভাল লাগিল না। রাজনারায়ণ-বাবুর কিন্তু খুব ভাল লাগিত। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর খুব অল্পরাগ ছিল কি না, তাই তাঁর ঐ ছন্দ অত পছন্দসই হইয়াছিল। আমি অনেক লিখিয়াছি; এই লেখা-পড়া ছাড়া আর আমি জীবনে বড় একটা কিছুই করিতে পারিলাম না; কখনও আমি বিষয়-কর্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না,—বাবা ইমানীং আমাকে কোনও বিষয়-কর্মে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদ্ভিত হয়, তাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাবের প্রকাশ করা যায়,—তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনও ও-পথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কি না জানি না; কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে। এক-একবার বক্তৃতা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আমার লেখাতেও যে কোনও বিশেষ ফল হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না। জ্যোতির ষোড়শক হইল, একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’কে ভাল করিয়া জঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্ঠায় ‘ভারতী’ প্রকাশিত হইল।<sup>২</sup> বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শনের’ মত একখানা কাগজ করিতে হইবে এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না। আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাবা আমার দু-চক্ষের বালাই। এইজন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে। স্ত্রী স্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না; কিন্তু আমার বরাবর ভয় হয়, পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গোড়া থেকে সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বলিয়া আছি; স্বয়ের মধ্যেই বলিয়া আছি। আমার

<sup>১</sup> সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়; স্বর্ধ্বির বিজয়া কল্যাণী সৌদামিনী দেবীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়।—সং ২ আশ্বিন ১২৮৪—সং

ঘর, আমার home যে কি জিনিষ, তা' তোমাকেই পূর্বেই বলিয়াছি। সেন্ট পল্‌স স্কুলের ইংরাজ হেডমাষ্টার একদিন শনিবারের ছুটির পর আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই যে সকলের সঙ্গে বাড়ী যাওয়া হইল না, তা'তে আমার যে কি ছটকটানি ধরিল, সে আমি বলিতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে হেডমাষ্টারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য দৌড়িয়া তাঁহার bath-room—স্নানাগারের দরজা খুলিয়া বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—“আমাকে ক্ষমা করুন।” সাহেব তখন মুখ খুইতেছিলেন, চমকিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন; বলিলেন—“এ কি? তোমাদের বাড়ীর ঘরে কি দরজা নেই? তুমি এই দরজার টোকা দিতে পারলে না?” আমি কাতর স্বরে বলিলাম—“আমাদের বাড়ীর ঘরেতে খুব বড়-বড় দরজা আছে; আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি; আপনি আমাকে বাড়ী যেতে দিন।” তিনি আমার please let me go home শুনিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিলেন। আমি বাড়ীতে আসিয়া বাঁচিলাম।

“কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোনও একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না। যবি তখন কবিতা লিখে বেশ স্খ্যাতি পাইতেছিল; তাহাকে বলিলাম—“তুমি বেশ মিষ্ট ভাষায় লিখিতে পার; আমাদের স্বদেশী সভ্যতার ভিতরকার কথাটা আমাদের দেশের লোককে ভাল করিয়া শুনাইতে পার? আমি ত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিছুই হইল না। তোমার কথা তাহার মন দিয়া শুনিতে পারে।” দেখে একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রক্তলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল! নবগোপাল একটা শ্রাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তা'র মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; হস্তি, জিম্ভাষ্টিক, প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তা'র খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁড়ি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—“ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার?” সে এক painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বলিয়া আছে। আমি বলিলাম—“উটে রাখ, উটে রাখ; এই তুমি দেশী painting করিয়াছ? আর আমাদের শ্রাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?” ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তা'র ষোঁক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে বিব্রত করাইলাম। সে বড়-বড় ইংরাজ কর্ণচারীদিগের ও দেশী রাজাদের কাছে খুব বাতায়ানত করিতে পারিত। একখান্দা

জ্ঞানদাল কাগজ বাহির করিল<sup>১</sup>; একেবারেই সুপাঠ্য নয়। কিন্তু নবমোপাগের সময় থেকে এই ‘জ্ঞানদাল’ শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। জ্ঞানদাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।

“এই সব বেশিয়া তুমিয়া আনি ত’ একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছিলাম। এখন আমার আর কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু এখন একটু আশা হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের মধ্যে patriot-এর আবির্ভাব হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী। ইনি আমাকে আমার মত patriot হইতে বলেন; তোমার মত, বিদেশীর মত নয়, বেশি কি হয়।”

---

<sup>১</sup> ১ই আগস্ট ১৮৯৫ তারিখ হইতে ‘The National Paper’ প্রকাশিত হইতে শুরু করে।—সং

## তৃতীয় পর্য্যায়

এক

২৮শে মার্চ, ১৩২০

লক্ষ্যভিত্তি ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় “পুরাতন প্রসঙ্গে বিভাগাগর” শীর্ষক একটা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তৎসম্বন্ধে আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। তিনি বলিলেন,—

‘লেখক মহাশয় ‘অনুভূতাপের ঘটা’ বলিয়া আমাকে একটু টিটকারী দিয়াছেন। আমি কিন্তু বুড়াপি বিভাগাগর মহাশয়কে উদ্ধৃত-স্বভাব বলি নাই। আমার বলিবার অভিপ্রায় এই,—আমরা চুনো পুঁটি আমরা তাঁহার দেখাদেখি চলিতে গেলে উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনা। সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে বড়লোকের অনুকরণ করা আহাম্মুকি মাত্র; কিন্তু যে ব্যক্তি বড়লোককে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করে, সে অনেক সময়ে সেই আহাম্মুকি করিয়া ফেলে। আমারও যৌবনাবস্থায় তাহাই ঘটিয়াছিল। এই কথাই কেবল আমি বলিয়াছি। তাঁহার পক্ষে যেটা তেজস্বিতা, আমার পক্ষে তাহা শুদ্ধত্যা দাঁড়াইয়া গেল।

‘বিভাগাগর মহাশয় যে বন্ধিমের লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। তাঁহার একজন গোড়া ভক্ত প্যারী কবিরত্ন এই সম্বন্ধে একটা ছড়া বাধিয়া গিয়াছেন। সেই ছড়াটি সিকদারপাড়া লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যতুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখস্থ আছে। বন্ধিমের অপরাধ,—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগরের কিছু নরম গরম, সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকেই ইহাতে চটিয়া গেলেন। ‘হালিসহর পত্রিকা’ লিখিল,—

“কতু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে,  
নাচিতেছে যাদুঘনি হাততালি দিয়ে।  
যা’রে পায় তা’রে ধরে দিগাদিগ নাই,  
বাহবা বুকের পাঠা বলিহারি ঘাই।  
আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস,  
‘সাগরে’ সীতার দিতে করেছে সাহস।  
কাল চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল,  
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।  
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,  
সে দিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা।  
ভারতের যশুমাখা কবিতালহরী,  
অনা’লে ফেলিল ছিঁড়ে আশ্বাস করি।

এখন 'ছি'ড়ি'ব' বলি পাড়িয়াছে হুয় ।

আয় আয় আয় 'বঙ্গদর্শনের' হুয় ।

প্যারীঃকবিরত্নঃগাহিলেন,—

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,

এঁদের দর্শনে যোষ হয় না কা'র ?

অঙ্ক যে জন, নাইকো লোচন,

সমালোচন কেন তা'র ?

পদে পদে দেখতে পাই,

কণ্ঠ কর্তা বোধ নাই,

ভাবরসের মা গোঁসাই,

কেন লেখার ছল ধরে ?

ছুটো একটা গল্প লিখে,

রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে,

ধরাটাকে সরাসর জান করে ।

এ আশ্পর্ক ক'ব কা'রে

গোপদ বলে না যা'রে

ভাগ্য সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হোলো না তা'র ?

হ'তেন যদি কুপ কি ডোবা,

তা' হোলেও ত পেতো শোভা,

নদ নদী মধ্যে খুঁজে মেলা তার ।

মরি আপশোষে

কোন সাহসে,

কি জিনিস বেরুলো দেশে,

কিষেব এত অহকার ?

ভারতচন্দ্র গুণাকরে,

নিম্নকোষাই নিন্দা করে,

সে রূপ রসমাধুরী ভাবায় কি বেরুলো আর ?

অস্ত্রাপি কবি সকলে,

মুক্তকণ্ঠে কে না বলে,

কবিকুলে ছিলেন কণ্ঠরত্নহার ।

সমকক্ষ নর,

মেলা স্বত্বকর,

ভারতে 'ভারত'ভূম্য কবি কেউ হবে না আর ।

'চ্যাংড়া' কৃষ্ণচন্দ্র রায়,  
 তখন শরীর জ্বলে যায়,  
 এর চেয়ে চ্যাংড়ায় করা বোধ হয় হোতে পারে না আর  
 দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য,  
 প্রভায় প্রভাহীনাদিত্য,  
 যে যশ অতাপি ধরায় ধরে না ।  
 তাঁর দোষ ধরা,  
 ক্যাপাম করা,  
 বাণেশ্বর শঙ্করাদি সত্যায় ছিলেন সত্য বাঁ'র ।  
 এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে,  
 Editor বহু নরে,  
 কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে তা' অনেকে জানে না ।  
 ভূবিমাল গদ্যভরা,  
 ভেতরেতে ময়লা পোরা,  
 কাগজগুলা কেবল ভাল,  
 Binding পদ্ধিপাটি ;  
 একখানা বিকোয় না দেশে,  
 মসলা বাজে অবশেষে,  
 তবু কত সর্বনেশে,  
 কলম ধরতে ছাড়ে না ।  
 যা' দেখতে পাই,  
 'সাগর' বৈ কে লিখতে জানে,  
 কা'র লেখায় কি উপকার ?  
 'হুতোম প্যাচা' বলেছিল,  
 ( বলতে বলতে মনে হোলো )  
 বেওয়ারিস বাঙ্গালা ভাষা,  
 যা'র যা' ইচ্ছা তাই করে । -  
 ওয়ারিস কেউ থাকলে পরে,  
 অনেকে বুঝঝুনি পোরে,  
 লেখার গুণে প্রায় যেতো দীপান্তরে ।  
 কেউ শত্রু নাই,  
 এরা বাচে তাই,  
 যে যা' করে তাই শোভা পায়,  
 মগের মুদ্রক অবিচার ।

Gunny cloth যা'রা বোনে,  
তা'রা ভাবে মনে মনে,  
কিংখাপ কান্নার শাল, সে অতি সহজে হয় ।  
শাল যে কি বস্ত্র বোকা,  
তা'দের পক্ষে বিষম বোকা,  
কবিরস বলে কথা সোজা নয় ।  
বামন হয়ে হার,  
চাঁদে হাত বাড়ায়,  
কালে কালে হোলো কবি-  
কব্বের হাটবাজার ।

“চিঠির উপর শ্রীহরি লেখা থাকিলে লোক নাস্তিক হয় কি না ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য ; তবে আমি শপথ পূর্বক বলিতে পারি যে, কোনও কোনও সময়ে বিভাগাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন,—‘ঈশ্বর যদি থাকেন ত তিনি ও আর কামড়াবেন না ।’ একথা আস্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায় তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন । আর *Cannot bear a brother near the throne*<sup>১</sup> এ দুর্বলতা অতি তুচ্ছ ; বিস্তার বড়লোকের শুনা যায় ; ইহাতে কাহারও বড় কিছুমাত্র হ্রাস পায় না ; এবং আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, এটুকু কিষ্কিন্দ্রাভার তাঁহার ছিল ।<sup>২</sup> ইহার প্রমাণ এই যে, আমি কখনও তাঁহাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Revd. K. M. Banerjee প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষদিগকে সমুচিত প্রশংসা করিতে শুনি নাই ; এমন কি তিনি ‘সাহেব’দিগের সংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে অনেক সময়ে অসন্তুষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন । Goldstucker-এর একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে কি একটু ভুল করিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া তিনি কখনও কখনও একপভাবে কথা কহিতেন যে সংস্কৃতজ্ঞতাসম্বন্ধে Goldstucker যেন মাহুকের মধ্যোই নহে ; ইহা স্মরণ করিলে আমাদের ত গা শিহরিয়া উঠে ।

“বিভাগাগরের রচনা-পদ্ধতির প্রতি আমি যে স্বভাবতঃই পক্ষপাতী হইব ইহাও আমার Education-র ফলস্বরূপ । আঠার বৎসর বয়সে ‘বিভিজীবী’ নামে একখানি বাঙ্গালা বহি লিখিয়াছিলাম ।<sup>৩</sup> সে বহি বড় একটা কেউ পড়ে নাই, আরও করে নাই ; কিন্তু বহি বাবু তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—‘এ ত বাঙ্গালা না, এ ত সংস্কৃত’—তাতেই

১) Should such a man, too fond to rule alone,  
Bear, like the Turk, no brother near the throne,  
View him with scornful, yet with jealous eyes,  
And hate for arts that caused himself to rise

—Alexander Pope (Epistle to Dr Arbuthnot)—স

২ পৃ ২৬-২৮ ও পৃ ৪৫ ক্রীড়া ।—স  
৩ পৃষ্ঠা ১০৭ ক্রীড়া ।—স



বুঝিয়া লইবেন যে রচনাপদ্ধতিসম্বন্ধে আমি বিভাগাগরের চেলা কি বিষয়ী। তবে আমার এই বিশ্বাস যে, ভাষার বিকাশ সম্বন্ধেও একটা Natural selection আছে। কেন যে বিভাগাগরের ভাষাই দাঁড়াইয়া গেল আর কেনই বা লোকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ভুলিয়া গেল, ইহার কারণ নির্ণয় করা ভার; নতুবা ইহার দ্বন্দ্বনে বাস্তবালোকে বিশ্বাস লেখা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কই, আজকাল কেহ তাহা পড়েও না জানেও না। তবে আমি এখন ইহাও দেখিতেছি যে, বক্ষিম বাবুর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিভাগাগরের ভাষাপদ্ধতি অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে; এখন বাস্তবালোচনা চলিত হইয়াছে, বিভাগাগরের কাছে তাহা ধরিলে তিনি ‘ছি ছি’ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেন।

“আমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটু কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন প্রসঙ্গের বিস্তার জায়গায় তাঁহার প্রতি যে প্রকার দেবতার স্থায় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কথা কহিয়াছি সে সবগুলি এই পত্রের লেখক চাপিয়া রাখিয়াছেন; কেবল দুই একটি সামান্য কথা ধরিয়া আমাকে টিটকারি দিয়াছেন। অবশ্য কাহাকেও গালি দিতে হইলে এই নিয়মেই চলা উচিত। ইহাতে আমার কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। স্ত্রীমাচরণ বাবুর ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিভাগাগর অবজ্ঞা প্রকাশ করাতো তাঁহাকে নীচপ্রকৃতি কিরূপে বলা হইল ইহা ত বুঝিতে পারিলাম না; তিনি বাস্তবিকই বহিঃখানি আমার ভাবিয়াছিলেন এবং সেই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমাদের এক্ষণে যে জ্ঞান জন্মিয়াছে সাহায্যে সে মতের পোষকতা করিতে পারি না।<sup>১</sup> অতএব এখন বুঝিতেছি যে, তখন তাঁহার সন্দেহ সার্য দেওয়াতে ভাল করি নাই; কিন্তু ইহার চারা কি আছে? তখন আমাদের যেরূপ বিভাবুদ্ধি ছিল, আমরা সেইরূপ কাজই করিয়াছি। বহিঃখানি কিন্তু অপ্রচারিত রহিয়া গেল; এখন তাহার এক Copy খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, তবে আমার একটু একটু মনে হয় যে, সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি Copy কেনা হইয়াছিল। যদি আমার এ ধারণা সত্য হয়, তবে বোধ হয় সেই সময়ে বিভাগাগর সংস্কৃত কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। লেখক আমার প্রযুক্ত ‘অকৌশল’ কথাটি যেন অচল ও অপ্রয়োজ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন; কিন্তু ‘অকৌশল’ বলিতে ব্রহ্মসংস্কৃত যে চলিত আছে সেটা কি তিনি মানেন না?

“রঘুনন্দনমোহনের সহিত বিভাগাগরের মনোমালিঙ্গের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে; তবে লেখকের কোঁতুহল নিবৃত্তির জন্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিভাগাগরের প্রতি লোকের সন্দেহ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে। আর সেনেটে তিনি কেন বাইতেন না, এ বিষয়ে সঠিক আমি কিছু বলিতে পারি না। তবে আমার একটা অনুমান হয় যে বিভাগাগর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা কখনও অভ্যাস করেন নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার কথার ধরণে বোধ হইত যে, এ প্রকার বক্তৃতা করা তিনি যেন একটা নূরুজ্জামান মত

জান করিডেন, এই জন্তই তাঁহার বোধ হয় সংস্কারে ইচ্ছা হইত না। ফলতঃ কোনও বিশেষ গুরুতর বা দরকারি কাৰ্য সস্তা-সমিতির দ্বারা যে ভালরূপ হয় ইহা তিনি বিশ্বাস করিডেন বলিয়া বোধ হয় না। ওগর তিনি কেবল ডেপোজিট ও নিজেদের বাহাদুরী দেখানর উপায় বলিয়া মনে করিডেন। তিনি যে কখনও বড় একটা কোনও সস্তা-সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন এমনও আমার মনে পড়ে না, তবে Bethune Society-তে পঠিত হইবার জন্ত ‘সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’<sup>১</sup> নামে একটি প্রবন্ধ বাঙ্কলার রচনা করিয়াছিলেন; নিজে কতকটা তোল্লা বলিয়া স্বয়ং পড়েন নাই, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পড়িয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি ঐ বিষয়ের অভাববিধি চূড়ান্ত রচনারূপ হইয়া আছে।

“যাহা হইক, ‘হিতবাদী’তে আমার পুরাতন প্রসঙ্গ লইয়া এই যে আলোচনা হইয়াছে ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয়। কারণ হিতবাদীর জন্মের সময় আর পাঁচজনের সঙ্গে আমি ধাত্মীয় কার্য করিয়াছি এবং প্রথম লালনপালনের তার আমারই উপর স্তম্ভ হইয়াছিল।<sup>২</sup> ইহার পিতার কার্যটা যে আমার কর্তৃক স্বেচ্ছাক্রমে নির্বাহিত হইয়াছিল, আমি জানপূর্বক সে অহঙ্কার করিতে পারি না। এত দিনের পর ‘হিতবাদী’ সেই প্রথম পালয়িতাকে যে স্বরণ করিয়াছে ইহাতে আমি ধন্যমন্ত। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাত্যহিক স্মরণের জন্য যে লোকখণ্ডটি বাছিয়া দিয়াছিলেন সেই ‘হিতঃ মনোহারী চ হৃদঃ ভঃ বচঃ’—তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা যেন চিরকাল চলে, ইহাই প্রার্থনীয়।”

১ ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব’ (মার্চ ১৮৭০)।—সং

২ পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ প্রবন্ধ।—সং

১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩

অনেক দিন পরে আজ আবার গুজাপাড় আচার্য্য ত্রীমুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণবন্দনা করিবার লোভাগ্য আমার হইল।

“আপনি কেমন আছেন?”

“সন্দ নয়।”

“যে বৃষ্টি!”

“দেখেছ! খনার বচন ফলিল কই? ভাদ্র মাসে এত বৃষ্টি বড় সুবিধার নয়। জান ত’—

কর্কটে ছরকোট, সিং শুকনো, কক্সা কানেকান,

বিনা বায়ে তুলো বর্ষে, কোথা রাখবি ধান?

—অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে জলে কাড়ায় সব ছরকোট, সিংহ রাশি অর্থাৎ ভাদ্র মাসে শুকনো, কক্সা রাশি অর্থাৎ আশ্বিনে সমস্ত জলাশয় কানায় কানায় জলে পূর্ণ, তুলা রাশি অর্থাৎ কার্তিকে ছিটা-ফোটা বৃষ্টি, তবে ত প্রচুর ধানের সম্ভাবনা! কিন্তু তাদ্রের লক্ষণ বড় ভাল নয়।”

“আপনার মখে অনেক দিন পুরানো কথা শুনি নাই; যখনই আসি, কিছু শুনিতে ইচ্ছা করে।”

“কি আর শুনিবে? হরেন্দ্র, রাসবিহারী, সকলে চলিয়া গেল; থাকিবার মধ্যে রহিলাম আমি আর শ্রামাচরণ গাঙ্গুলী। এই সেপ্টেম্বর মাসে আমার ৮৬ বৎসর পূর্ণ হইল। খুব পুরানো কথা শুনিবে? যতই বয়স বাড়িতেছে, অতীতের কথাগুলি উজ্জলতর ভাবে আমার মানসপটে প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু ধারাবাহিক বলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। নিজের স্মৃতি কথা কতকটা autobiographic হইলে কতি কি? গোড়ার কথা একটু বলি, শোন।

“জীবনের প্রত্যয়ে যে জিনিষটি আমার প্রথম মনে পড়ে, সে আমার পিতার গঙ্গাবাদ্য! তখন আমি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করি নাই। বেশ মনে পড়িতেছে মাতা-ঠাকুরাণীর জন্মন;—কেন কান্নিতেছেন, তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না। বিবরণটির গুরুত্ব লক্ষ্যে কিছুমাত্র জ্ঞান আমার ছিল না, তবে মাতাঠাকুরাণীর বোদনে একটু বিষমভাব আসিল। উর্ধ্বে আকাশমার্গে ঘুড়ি উড়িতেছিল, অন্তমনস্ক ভাবে তাহাই দেখিতেছিলাম।... তিন চারি দিন পরে পিছুবে গঙ্গালাভ করিলেন; দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমার অগ্রজ গৃহে ফিরিলেন, সঙ্গে ছিলেন নীলাধর মুখোপাধ্যায়ের পিতা দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। দেবনাথ বাবু আমার পিতার ছাত্র; তিনি আমাদের বাড়িতে থাকিতেন, আমাদের অগ্রজ-স্বানীয়। এই জন্ত নীলাধর ও স্ববির আমাকে শেষ পর্যন্ত ছোট খুড়ো বলিয়া ডাকিতেন। সে যাহা হউক, অতি কষ্টে জন্মনবেগ লবরণ

করিয়া দাড়া। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, চাঁৎকার করিয়া কাঁদবার অন্ত ছুটিয়া ঘরে ঢুকিতে গেলেন, দেবনাথ দাড়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। সেই সময়ে হরপকানন নামে এক প্রবীণ ভ্রূলোক সময়ে উপস্থিত ছিলেন ; ইনি পিতার বন্ধুও বটেন, ছাত্রও বটেন। তিনি বলিলেন—‘আচ্ছা উহাকে যাইতে দাও, একটু ভাল করিয়া কাঁটুক।’... সমস্ত ব্যাপারটি আমার চক্ষুর সম্মুখে দেখীপায়মান। মানানমান অপরাহ্নে পিতৃদেবের সেই গলাযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত করণ ব্যাপারটি আমাকে শিতব্রতের অঙ্কিত হইয়া গেল।

‘পিতৃদেবের গলাযাত্রার পর আমরা দুই সহোদর, এক জোষ্ঠা ভগিনী ও মাতা-ঠাকুরাণী, এই কয়জন মাত্র পরিবারভুক্ত রহিলাম। দেবনাথ দাড়া আমাদের অভিভাবক রহিলেন। বাল্যকালে বাড়ীর সকলে আমার জোষ্ঠ ভ্রাতাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন। আমিও সকলের অল্পকরণে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতাম। পরে ক্রমে পাঁচজনে ইহা ভাল দেখায় না বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন যে, আমি আমার অগ্রজকে বড়দাদা বলিয়া ডাকিব। একা আমার নিকট তাঁহার সেই সংজ্ঞা চিরকাল ছিল। তিনি আমা অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। তখন আমাদের উপজীবিকা ছিল মাধাঘসা গলির ধনাঢ্য বসাক বাবুদিগের নির্দ্ধারিত একটি মাসিক বৃত্তি। তাঁহার প্রতি মাসে আমাদিগকে ২৩ টাকা করিয়া দিতেন ; তন্নিয়ম বহুকাল যাবৎ বহু সামগ্রী, অলঙ্কার বস্ত্রাদি তাঁহার আমাদিগকে দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইতিহাস একটু শুনিবে কি ? তখনকার হিন্দু-সমাজে ধনী গৃহস্থের সহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, ইহাতে তাহার একটু নিদর্শন পাইবে।

‘বহুপুত্র যাবৎ আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। প্রপিতামহ কৃষ্ণকিঙ্কর, পিতামহ ঘনশ্যাম, পিতা রামজয়, সকলেই অধ্যাপক ছিলেন। ঘনশ্যামের না কি কিছু কিছু occult knowledge ( অতীন্দ্রিয় জ্ঞানশক্তি ) ছিল। তিনি নাকি নখদর্পণে সমস্ত জানিতে পারিতেন। বসাক-বাবুদিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বসাক তখন Treasury-র দাওয়ান। তাঁহার বিমাতার নাম ভাগ্যবতী দাসী। ঘনশ্যাম নখদর্পণ দ্বারা বলিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহাদের বাগান হইতে ঠাকুর উঠিবেন। বাস্তবিক সিংহবাহিনী ঠাকুরের আবির্ভাব হইল। ভাগ্যবতীর যথেষ্ট ভ্রীখন সম্পত্তি ছিল। তিনি প্রায় সমস্তই সিংহ-বাহিনীর স্বেযোস্তর করিয়া দিলেন, এবং ঘনশ্যামকে কলিকাতার সিমলায় মালির বাগানে মধ্যে চার কাঠা জমির উপর একখানি ষিডল বাড়ি কিনিয়া দিলেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মথুরানাথকে ভিকাপুর গ্রহণ করিলেন। এই মথুরানাথ না কি পরম স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ভিকাপুর মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ; যে সকল মাটির পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্টাংশ আমরাও দেখিয়াছি, বিলক্ষণ মূল্যবান বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু অবশেষে মথুরানাথের মৃত্যু হয় ; সেই পোকে ঘনশ্যাম কলিকাতা পরিভ্রমণ করিয়া লপরিবারে কাশীবাস করিতে গেলেন। ভাগ্যবতী পত্রাদি দ্বারা অনেক বুকাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় কিরাইয়া আনিলেন, এবং রাধামাধব নামে এক

বিএছ ঠাকুর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“ই”হাকে তোমার যতপুত্রহানীর জান কর।’  
 ঐ ঠাকুরের মাসিক বৃত্তি ২৩ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত যত দিন  
 ভাগ্যবতী জীবিত ছিলেন, নানা প্রকারে তিনি এত দিতেন যে, তাহা বর্ণনা করিয়া  
 শেষ করা যায় না। ফলতঃ আমরা বলাকহাবুদের অগ্রে প্রতিনিধিত্বিত; এবং যতদিন  
 আমার জ্যেষ্ঠের চাকরি না হইয়াছিল, আমরা উহাদিগেরই আশ্রিত ছিলাম বলিলে  
 কিছুমাত্র অত্যাক্তি হয় না। ভাগ্যবতীর নিজ গর্ভজাত দুইটি পুত্র,—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ;  
 সর্বজ্যেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সপত্নী পুত্র। প্রাণকৃষ্ণ পর পর দুইবার বিবাহ করেন।  
 প্রথম পক্ষের সন্তান,—উদয়চাঁদ। দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া তিনি মাতার জীবদ্দশাতেই  
 বিবাহী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। জয়কৃষ্ণ পাগল ছিলেন। ভাগ্য-  
 বতীর দেহান্তে উদয়চাঁদ বলাক, এবং তাঁহার দেহান্তে তাঁহার বিমাতা সিংহবাহিনী  
 ঠাকুরানীর সেবারেং হইয়াছিলেন। ঐ বিমাতার দেহান্তে রাধাকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র  
 তারিণীচাঁদ এবং তৎপরে রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র নির্ঝলচাঁদ বলাক সেবারেং হন। এখন  
 নির্ঝলচাঁদ নাই। সেবারেংসত্ত্ব লইয়া মোকদ্দমা প্রিন্সি কাউন্সিল পর্য্যন্ত গিয়াছে।  
 সমস্ত ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক হইল, কারণ আমাদের রাধামাধব  
 ঠাকুরের পূর্বোক্ত তেইশ টাকা বৃত্তি উদয়চাঁদের আমলে কমিয়া গিয়া মশ টাকা হয়;  
 এবং বোধহয় ১৮৫৩/৫৪ খৃষ্টাব্দে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

“কিন্তু অর্থাভাবে আমরা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িলাম না। তখন আমার  
 জ্যেষ্ঠ সংস্কৃত কলেজে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, আমিও কিঞ্চিৎ পাইতে আরম্ভ করিয়া-  
 ছিলাম। আমাদের পিতা তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন।  
 তাহাতেই একপ্রকার আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। তখন সত্তাগণ্ডার দিন  
 ছিল। ইহা ব্যতীত, উপরিউক্ত তারিণীবাবুর মাতা আমার অগ্রজকে ভিক্ষাপুত্র লন।  
 পুত্রের মত প্রচুর না হইলেও তিনি যে সকল সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন, তাহাই আমাদের  
 পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পিতৃদেবের দেহাবসান কালে আমার অগ্রজের বয়স এগার বৎসর মাত্র ছিল।  
 পিতার নিকটে তিনি যুদ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্ট ও অভিধান পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।  
 ঐ অল্প বয়সে সৎ পরামর্শ দ্বিবার লোক বড় কেহ ছিল না; তথাপি তিনি স্বভাববিন্দু  
 হৃদয় প্রভাবে আপনা হইতেই সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন।  
 সেই শ্রেণীর অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়,  
 তখন মাসিক ছাত্রবৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তানদিগকে অধ্যয়ন করিবার জন্য তথায়  
 আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা ছিল। দাদা যখন ভর্তি হইলেন, তখন সে প্রথা রহিত হইয়া  
 গিয়াছিল বটে, কিন্তু ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না। পড়িবার পুস্তক কলেজের  
 লাইব্রেরি হইতে পাওয়া যাইত। বোধহয় তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলেজে ভর্তি হন।  
 তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা-প্রণালী কিরূপ ছিল জান? প্রথম চার পাঁচ বৎসর  
 যুদ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান হইত। পরে এক বৎসর অভিধান ও ভট্ট; তদনন্তর সাহিত্য-

শ্রেণীতে রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবী প্রভৃতি কাব্য নাটক যথালভব অধ্যাপিত হইত। পর বৎসর সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ, এই দুই অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠের জন্য অলঙ্কারের শ্রেণী ছিল। তাহার পর দুই শ্রেণী,—স্বতি ও দর্শন। কেহ বা স্বতিতে যাইতেন, কেহ বা দর্শনে যাইতেন। কেহ কেহ আবার সাহিত্যাদি শ্রেণীতে দুই দুই বৎসর করিয়া পড়িতেন। আমার দাদা রামকমল সাহিত্যশ্রেণীতে দুই বৎসর, অলঙ্কার শ্রেণীতে নিশ্চয়ই দুই বৎসর, এবং দর্শন শ্রেণীতে একাদিক্রমে চারি বৎসর পড়িয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও চার পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে ইংরাজি সাহিত্যে, গণিতে ও ইতিহাসে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এক বৎসর কাল তিনি ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট স্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার সময়ে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ; দর্শনের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধ্যাপিত শাস্ত্রে দীর্ঘগজ পণ্ডিত ছিলেন। দাদার মুখে শুনিয়াছি তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ‘বিজ্ঞানরাশি’ বলিতেন। ঐ শব্দটি ম্যুরারাক্স নাটকে কোনও এক আয়র্কেদোক্ত ভিষকবরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। দাদা আমাকে ঐ শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য একদিন বলিলেন,—‘বিজ্ঞানরাশি কা’কে বলে জানিস? যেমন মনে কর আমাদেয় তর্কপঞ্চানন মশাই। ঠেকে ঠিক ‘বিজ্ঞানরাশি’ বলা যেতে পারে।’ —তর্কপঞ্চাননের বিজ্ঞানরাশিও রামকমলই প্রকৃতরূপে অহুত্তব করিয়াছিলেন, কারণ তিনি একাদিক্রমে চার বৎসর তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করেন। সে আবার যেমন তেমন চার বৎসর নহে। গ্রীষ্মাবকাশের দুই মাস কালও রামকমল পাঠের ছুটি লইতেন না। ঐ সময়ও তিনি প্রত্যহ দশটায় আহার সমাধা করিয়া প্রায় দুইকোশ পথ অতিক্রম করিয়া নারিকেলডাঙার তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ন পাঁচটা পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। ফলতঃ একাদশ বৎসর বয়স্ক্রমে সংকৃত কলেজে প্রবেশ করা অবধি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অধ্যয়ন ব্যতীত আর কোনও কার্য তাঁহার ছিল না। কখন বাটার বাহিরে খেলাধুলার জন্য যাইতেন না। অন্তান্ত কার্যের মধ্যে প্রথম প্রথম কিছুকাল বাটার ঠাকুরদ্বিগের সেবা-আরতিতে তিনি কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সতের আঠার বৎসর পর্যন্ত সন্ধ্যা, আত্মিক, পূজা, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ, এই সকল ধর্ম্মাহুতানে তাঁহার বিশিষ্ট নিষ্ঠা ছিল। পরে কিন্তু ইংরাজী অধ্যয়ন ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং বিজ্ঞানগণ্য মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল, তত হিন্দুধর্মে শৈথিল্য জন্মিল। অবশেষে তিনি সন্ধ্যা-আত্মিকও ত্যাগ করিলেন, ঠাকুরসেবা হইতে পরাশ্রয় হইলেন। তখন আমি ঠাকুরসেবা করিতে লাগিলাম। তোমার মুখে ঈশ্বর হামির দেখা দেখা যাইতেছে? আমার মত ঐকদর্শনবাদী (Positivist) যে কখনও দেবসেবার যত থাকিতে পারে, ইহা বোধ করি তুমি কল্পনা করিতে পার না। কিন্তু আমিও কায়মনোবাক্যে পূজা, ধূপদান, আরতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিধি লম্পন করিতে লাগিলাম। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ ও সন্ধ্যাত্মিক করিতাম। সমস্ত চণ্ডী আমার সুখই ছিল। পরে কিন্তু আমিও জ্যোতীর পশ্চাতে

অল্পগমন করিলাম। বিভাগসাগর মহাশয়ের প্রভাব আমাদের দুই ভাইয়ের উপর বড় লামাজ ছিল না। আমি এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, কলিকাতা অঞ্চলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে বৈদিকশ্রেণী সর্বাধিক বহুসংখ্যক, এবং মুন্ডবোধ ব্যাকরণ এই অঞ্চলের প্রচলিত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি সর্বব্যাকরণ শিরোমণি বটে, কিন্তু তারতবর্ষের নানা স্থানে পাণিনির বাচ্ছাস্বরূপ নানা ক্ষুদ্র ব্যাকরণ আটপোরে ব্যবহার নিমিত্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোথাও কলাপ, কোথাও স্পন্দ, কোথাও সংক্ষিপ্তসার, কোথাও সারস্বত, কোথাও লঘুকৌমুদী,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ পরিগৃহীত হইয়াছে। মুন্ডবোধ ত বোপদেবের রচিত, আর বোপদেব বোম্বাই অঞ্চলে দেবগিরির নগরের লোক ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণখানি এত বড় বড় জেলা ও প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে কিরূপে প্রচারলাভ করিল, ইহা একটি সমস্যা কথ্য। ঠিক এইরূপ আর একটি সমস্যা কথ্য স্বতিশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের মত বাঙ্গালাদেশ ব্যতীত আর কোথাপি চলে না; অথচ ঐতিহাসিক প্রবাদে যে প্রকার পাওয়া যায়, তাহাতে জীমূতবাহন গুজরাট অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়। এই সকল সমস্যা মীমাংসাকল্পে আমি নিজে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব না।

“বিভাগসাগরের প্রভাবের কথা বলিয়াছি,—এত বর্ষ পরে আশা করি আমার কথায় কাহারও ক্ষোভের উদ্রেক হইবে না। ১৩১৪ বৎসর পূর্বেও এ সম্বন্ধে হিতবাদী পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু বিভাগসাগরকে আমি যত ঘনিষ্ঠভাবে জানি, তেমন আর কেহ জানে না, ইহা আমি স্পষ্টতার সহিত বলিতে পারি। বিভাগসাগরের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধার কথা পূর্বে তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। জানি, শিক্ষিত সমাজ বিভাগসাগরের ভাবার অথবা জীবনের কোনও প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা কখনও লক্ষ্য করিতে পারে নাই। বঙ্কিম তাঁহার ‘বঙ্গদর্শনে’ তারত-চন্দ্রের ও বিভাগসাগরের সমালোচনা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। ‘হালিসহর পত্রিকা’ বঙ্কিমকে নাস্তানাবুহ করিল :

কতু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে  
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে ।  
যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগ্‌ নাই,  
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি স্বাই ।  
আবোল তাবোল বকে লকলই নীরল,  
সাগরে সীতার দিতে করেছে লাল ।  
কাল চোখে কটি খোঁকা পরিয়া কাকুল  
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল ।  
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,  
সে দিন সহরে আলি দিয়াছিল দেখা ।

ভারতের মধুমাধা কবিতা লহরী  
 অনা'লে ফেলিল ছিড়ে আশার করি ।  
 এখন 'ছিড়িব' বলি পাড়িয়াছে ধুম ।  
 আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম ।

“প্যারী কবিরত্ন বঙ্কিমের নামে ছড়া বাঁধিয়া নানাস্থানে কবির আসরে পাইয়া  
 বেড়াইলেন—

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,  
 এ ঘোষ দর্শনে ঘোষ হয় না কা'র ?  
 অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন  
 সমালোচন কেন তা'র ?<sup>১</sup>

...        ...        ...        ...  
 ...        ...        ...        ...

“এ সব তুমি পূর্বে অনেকবার শুনিয়াছ। বিভাগের সহিত ভবিষ্যতে আমার অগ্রণয়ের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজেই তাবিয়া ছিলেন, আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি<sup>২</sup> যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। কি কৃষ্ণে আমি অল্পকাল পরেই তাঁহার বিরাগ ভাজন হইলাম! যখনই মনে হয় তখনই আমি লজ্জিত ও অসুতপ্ত হই। প্রভাতকুমারের ‘সিন্দুরকোঁটা’ পড়িয়াছ? প্রভাত দেখছি মনোগ্যামিষ্ট নয়। ও প্রভুটা কি প্রভাত আমার জীবন-কাহিনী হইতে লইয়াছে? পাইল কোথা হইতে? কিন্তু বাহাই হউক, সিন্দুর কোঁটার মিঃ বোসের প্রশংসা আমি করি না। আমার অসংযত চিন্তাবৃত্তি কিসের নেশায় নাচিয়া উঠিয়াছিল? পরিণীত শিক্ষিত যুবক কেন দ্বারান্তর গ্রহণের জন্য আত্মহার্য হইল? আমার সম্বন্ধে চারিদিকে অনেক কথা রটিল; শেষে বিভাগাগর একদিন আমায় বলিলেন—‘আমার বন্ধুবান্ধব আমায় কি বলে জানিস? তুই আমার কথা শুনি, চিরকাল তুই আমার বাধ্য, আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বাধ্য করি, তা’ হ’লে তুই শুনি আমার কথা’। আমি অগ্নান বধনে উত্তর দিলাম—‘আপনি কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার কথা না শুনেতে পারি; আমি আপনার অবাধ্য।’ তিনি আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দৃঢ়প্রতীতি অগ্নিল, আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পরে আমি বদ্যাব বলিয়া আসিতেছি—বিভাগাগর বন্ধুর মত, উপদেষ্টার মত, সোজা কথা বলিয়াছিলেন; বাস্তবিক সমস্ত ঘোষ, সমস্ত ভুল আমারই।

“এখন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিতেছি, ও বাড়ী তখন ছিল

১ সম্পূর্ণ কবিতাটি ২৭৭-২৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিত হইয়াছে।—স

২ পৃষ্ঠা ২৩ ব্রহ্ম—স



না। রাস্তার অপর পারে পুঁথাতন এলবার্ট্ হলে কলেজ বসিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর স্থান হইয়াছিল সংস্কৃত কলেজের দুইটি কক্ষে; তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী এলবার্ট হলে স্থান পাইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বোস প্রথম বি. এ. পাশ করেন; ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৮৬০ সালে রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রামাচরণ গাঙ্গুলী, কালিকান্দাস হস্ত ও আমি বি. এ পাশ করি। কালিকান্দাস প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। আমি সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল। এই জগতই বোধ হয় আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এ সব কথা অনেকবার তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ। খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর ইচ্ছা ছিল কিছুদিন শিক্ষকতা করিতেছিলাম, একদিন প্রসন্নবাবুর চিঠি পাইলাম, আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের জুনিয়র বাঙ্গলা অধ্যাপক মনোনীত করা হইয়াছে। তিনিই আমাকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলাম।

“তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালার সীনিয়র অধ্যাপক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। কয়েক মাস পরে ইনি কর্ণ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছু দিন আমি একা কার্য চালাইতে লাগিলাম। বিভাগাগর মহাশয়ের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব আত্মীয়তা ছিল। রাজকৃষ্ণ কখনও ইচ্ছা কলেজে পড়েন নাই; পণ্ডিতদিগের সাহচর্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহাকে নিযুক্ত করাইবার অল্প বিভাগাগর সচেষ্ট হইলেন। তখন স্ত্র সেন্সি বীভন বাঙ্গালার লেক্‌চরার গভর্নর। বিভাগাগরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালার জুনিয়র অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে আমাকে সম্ভব্য প্রকাশ করিতে হয়। আমি সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিয়া প্রিন্সিপ্যাল লটক্লিফ্‌কে একটি পত্র লিখি। বোধ করি সে পত্র এখনও প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে আছে। ইতিহাসের অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েলকে লটক্লিফ্‌ সেই পত্র দেখান। কাউয়েল আমাকে বলিলেন—“your scheme is too ambitious; তুমি কাঙ্ক্ষারী প্রভৃতির নাম করিয়াছ?” কাউয়েল সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; গঙ্ক্‌ সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া তিনি ‘কুহ্মাঙ্কলি’ অম্ববাদ করেন। কুহ্মাঙ্কলির রচয়িতা উষ্মনাচাধ্যায় কালনির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি লিখিলেন—a fixed star whose distance in time cannot be measured। রাজকৃষ্ণ প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন। আমিও এই দুই ক্লাসে কিছু কিছু পড়াইতাম। মাঝে মাঝে একটু একটু খিটমিটি লাগিত। মনে পড়ে এক দিন ‘মুনিপুঙ্খ’ শব্দটির সন্ধান আমি পানিনির নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম—মুনি: পুঙ্খ ইব; ছেলেদা আবার রাজকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন—মুনিবু পুঙ্খঃ। ছেলেদা একটু

কৌতুক অল্পভব করিল। কয়েক দিন পরে তিনি ছেলেদের বলিলেন—‘না তোমরা ঐটেই বোলো, মূনি: পুত্রব ইব।’ কলেজে ছাত্রসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইল, সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হরিশ বিজ্ঞানস্বকে আমি তৃতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করাইয়া দিলাম।

‘সংস্কৃত প্রবর্তনের পূর্বে আমাকে বাক্সলা পড়াইতে হইত। কালীদাস কৃত্তিবাস হইতে কিছু কিছু বাছাই করিয়া পড়াইতাম। যতদূর মনে পড়ে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ত্রৈলোক্যানাথ মিত্র পড়িত। সে পরে হুগলিতে ও কলিকাতার হাইকোর্টে একজন বড় উকিল হইয়াছিল; যদি আরও কিছু দিন বাঁচিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে হাইকোর্টের জজ হইত। আলফ্রেড্ ক্রফট্ মর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া প্রথম প্রথম কিছু বিপন্ন হইয়াছিলেন; ত্রৈলোক্য তাঁহাকে ফিলজফির ধরুতা ধরাইয়া দিল। দেবেজ ঘোষও বোধ হয় ক্লাসে পড়িত। ইংরাজি হইতে বাক্সলার অনুবাদ সে অতি সুন্দররূপে করিতে পারিত। স্পেক্টেটরের কোনও কোনও অংশ অনুবাদ করিতে দিতাম। আমার মনে আছে সে ‘eccentric’ শব্দটার বাক্সলা প্রতিশব্দ দিয়াছিল—‘সৃষ্টিছাড়া’। সে পরে আলিপুরের বড় উকিল হইয়াছিল। শুনিয়াছি, তাহার একটি ছেলে হাইকোর্টের জজ হইয়াছে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে রাসবিহারী ঘোষ ছাত্র ছিল। ‘মেঘনাদ বধ’ প্রকাশিত হইলে আমি উহা কলেজে ধরাইয়া দিলাম। ‘সম্ভাবশতক, পঠিত হইত। বাক্সলা কবিদিগের রচনা হইতে অলঙ্কারের নানা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া একখানি পুস্তক লালমোহন ভট্টাচার্য্য রচিত করিলেন।’ সেটি পড়াইতে হইত। আমার দ্বাদশ ‘বেকনের সন্দর্ভ’ রাসবিহারী কর্তৃক করিয়াছিল। মুখস্থ করিবার শক্তি তাহার অসাধারণ ছিল। ক্লাসে পরীক্ষার সময় একবার সে জর্জ পেনের মেট্যাল ফিলজফির ভাষা এমন ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিল যে, পরীক্ষক মনে করিলেন সে চুরি করিয়া লিখিয়াছে। তখন সে দাঁড়াইয়া সমস্তটা অনর্গল বলিয়া গেল। মুখস্থ করিবার শক্তি সারস্বতচরণ মিত্রেরও খুব ছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতির আন্তবোধ ব্যাকরণখানা সে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

“বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময় জর্জ পেন ও জ্যাকব ক্রফি আমরা পড়িয়াছিলাম। তখন তাইন্স চ্যান্সেলার ছিলেন একজন ব্যারিষ্টার,—মি: রিচি। প্রিন্সিপ্যাল সট্‌ক্লিফ্ লাহেব দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত অধ্যাপনা করিতেন। তিনি তাঁহার বৎসরের নবম ব্যাংগার ছিলেন। অধ্যাপক বীবি উপর ক্লাসে পড়াইতেন; তাঁহার ডবল অনার্স ছিল। সট্‌ক্লিফ তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিতেন। সট্‌ক্লিফ ছুটি লইলে অধ্যাপক ক্লিষ্ট অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে ছেলেরা বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি তাঁহার বৎসরের সপ্তত্রিংশতম ব্যাংগার ছিলেন। বিবম দুর্ভাব্যহারে অস্থির হইয়া কয়েক জন ছাত্র তাঁহার মাথায় টুপি দিয়া তাঁহার মুখ চাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। ভবিষ্যতে যিনি প্রথম বাক্সালী ব্যাংগার হইবেন, সেই আনন্দমোহন বস্তুকে অধ্যাপক

বাবি বড় ভালবাসিতেন। তিনি আদর করিয়া আনন্দমোহনকে ডাকিতেন ‘My Mymensing boy’। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক লাগার্স বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে টনি সাহেব আসিলেন; কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি একটু বেকায়দার পড়িয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্রেনেল মিন্টনের ভাষা পরিবর্তন করিয়া নিতুল ছন্দে কবিতা রচনা করিতেন; কোথাও কোনও *solecism* দেখিলে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। Adam the goodliest of men his sons since born, and the fairest of her daughters Eve<sup>১</sup> লইয়া তাঁহার তর্ক-বিতর্ক আমার বেশ মনে পড়ে। বোধ হয় গ্রেনেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্টার হন।<sup>২</sup>

“এলবার্ট হলের মিডির ধারে একটি কক্ষে অধ্যাপকদিগের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজদিগের সহিত আমরা মেলামেশা সমানভাবে করিতাম বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে যেন একটু উচ্চনীচভেদ তাঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যবহারে প্রকাশ পাইত। বাঙ্গালী বলিয়া একটু মনস্তাপ পাইতে হইত। একটা দুষ্টান্ত দি। তখন রাস্তায় কোনও ফুটপাথ ছিল না। এলবার্ট হল-এর সরু সদর দরজার সম্মুখেই ক্রক্‌টের বগি গাড়িখানা প্রত্যহ দাঁড়াইয়া থাকিত; এমন ফাঁক ছিল না যে, বাহির হওয়া যায়। অথচ প্রত্যহ আমাদের এলবার্ট হল-এ কার্খ সারিয়া সংকুত কলেজে পড়াইতে যাইতে হইত। শুষ্ক প্রাচীর লাফাইয়া আমি বাহির হইতাম, অথচ গাড়িখানা সরান হইত না।

“১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া আমি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। ঐ বৎসরে আমি সেনেটের সভ্য হইলাম।<sup>৩</sup> এখন জীবিত ফেলোদিগের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যুক্তিসিদ্ধির ফেলা হইলাম বটে, কিন্তু এই সময় আমার জীবন এত জটিল হইয়া গেল যে, আমি খুব অল্প মিটিং-এ উপস্থিত হইতাম। আজ তোমাকে একটি মিটিং-এর কথা বলিব, যেটির উপর তোমাদের রিপণ কলেজের জীবন মরণ নির্ভর করিয়াছিল। তখন আমি রিপণ কলেজের সঙ্গে লগ্নহুই।

“স্বরেন্দ্রনাথ আমা অপেক্ষা আট বৎসরের ছোট ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। আজ তাঁহার স্মরণে অল্প কোনও কথা বলিবার শোভা সম্বরণ করিব। কোনও কিছুতেই তাঁহার ক্রক্ষেপ ছিল না। কলেজ করিলেন। দেবশব্দর ধ্বংস আমলে কলেজ বেশ সুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু ঋতাপত্রগুলি যে অত্যন্ত ময়লা ও অপরিষ্কার, সে বিষয় তাঁহার আদৌ দৃষ্টিপাত ছিল না। কেবল

১ Adam the goodliest man of men of since born

His sons, the fairest of her daughters Eve. Paradise Lost, IV (—সং)

২ ১৮৭৭ খ্রী: Col. W. Grappel কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্টার নিযুক্ত হন।

৩ প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ জ্ঞাপ্ত করেন এবং ১৮৭৩ খ্রী: বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।—এস

নেহারের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বেশ নিশ্চিত ছিলেন। আমি রিপন কলেজে তখন ল' লেকচারার ; আর্টস বিভাগে সংযুক্ত ও ফিলজফি অধ্যাপনা করিতাম। মহা বজ্রপাত হইল—রিপন কলেজ disaffiliate করা কেন হইবে না তাহার কারণ লক্ষ্যইতে হইবে! নানা কার্যের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ সকল খুঁটিনাটি দেখিবার চেষ্টা করিতেন না। অথচ কলেজের উন্নতির জন্য তিনি কি না করিয়াছিলেন! অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলম নিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। মানসিক ও শারীরিক গ্রানিবশতঃ তিনি কয়েকদিন শয্যাগত হইলেন। আমি তখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইরাছি।<sup>১</sup> সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু কটন, হারিসন প্রভৃতি ইংরাজদিগের সহিত আমি দেখাভা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা সুর কোমার পেথেরামকে দলে টানিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু বিকল্প পক্ষ অত্যন্ত প্রবল। ভাইস্ চ্যান্সেলর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেনেটের বৈঠক বলিল। তোমরা জান, আমার প্রতি গুরুদাসের ভক্তি অনন্তাধারণ ছিল। যেখানে দেখা হইত সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া সে আমাকে প্রণাম করিত। সুরেন্দ্রনাথের আশা ছিল, আমি প্রিন্সিপাল হইলে ভাইস্-চ্যান্সেলর প্রসন্ন হইবেন। দরজা বন্ধ করিয়া সেনেটের কার্য আরম্ভ হইল। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিতে লাগিল। ম্যাকডোনাল্ড বলিলেন,—সুরেন্দ্রনাথের কলেজ কি না, তাই বাচাইবার চেষ্টা হইতেছে! সভাপতির নিকট ধমক খাইয়া বক্তা বলিলেন। সুর কোমার পেথেরাম প্রস্তাব করিলেন—That the question of the disaffiliation of the Ripon College be postponed sine die। প্রায় সমান সমান ভোট হইল, ফলি কলেজের গ্রিকিংস্ যদি উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের সর্বনাশ হইত। দু'তিনি মিনিট পরে গ্রিকিংস্ আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু তখন আমাদের জিৎ হইয়া গিয়াছে।

“বহু বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। গুরুদাস এখন পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যত্ননাথ সরকার এখন তোমাদের ভাইস্-চ্যান্সেলর। বোধ হয় ১৮৯৩ খ্রষ্টাব্দে যত্ননাথ রিপন কলেজেই প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন। তোমার মুখে শুনিতেছি, তোমরা তাঁহার কাছে স্পেন্সরের ‘ফেমারি কুইন’ পড়িয়াছ। A gentle knight was pricking on the plain, Yclad in mighty arms and silver shield মনে আছে ত? সেই gentle knight-এর মত অস্ত্রের বিরুদ্ধে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া প্রবীণ যত্ননাথ সরকার জয়ী হইলেন। তোমাদের প্রিন্সিপাল নরেন্দ্রনাথ রায়ও বেশ সুখ্যাতির সহিত আমার কাছে কায় করিয়াছিলেন। তোমাদের জয় হউক।”

## ভিন

৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৫

অনেক দিন পরে আজ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণবন্দনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইল। দুই একটি কথা'র পর তিনি বলিলেন, “মানসীতে মায়ে'র ছবি সব দেখিলে আমার ইচ্ছা করে ঐ ছবিগুলি তুলিয়া ধরিয়া মেয়ে বিবির<sup>১</sup> ‘মাদার ইণ্ডিয়া’র (Mother India) জবাব দিতে। ...বিজ্ঞানাগরের মা'র চেহারা দেখিলে?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মাকে আপনি কখনও দেখিয়াছিলেন?” তিনি বলিলেন, “না। বিজ্ঞানাগর কলিকাতায় একলাই আশিতেন, মা দেশে থাকিতেন। এখন যেখানে কিং কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান, এখানে একতলা বাড়ীতে বিজ্ঞানাগর লোকজন লইয়া থাকিতেন; তাহার পূর্বে বোঁবাজারে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয়োর পৈতৃক বাড়ীতে অনেক দিন ছিলেন। রাজকৃষ্ণ পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লইয়া দাদা নীলকমলের নিকট হইতে পুথক হইলেন এবং স্বাক্ষরাষ্ট্রে নৃতন বাড়ী করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানাগর অধিকাংশ সময় এখানে অতিবাহিত করিতেন।<sup>২</sup> ঐ বাড়ীতেই প্রথম বিধবাবিবাহ হয়। আমি তখন কলেজে পড়ি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিজারত্বের বিবাহ;—লোকে লোকারণা, ভয়ানক গোলমাল,—কিন্তু বিধবাবিবাহ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইল।<sup>৩</sup> কয়েক বৎসর পরে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ হইল, তোমরা জ্ঞান না বোধ হয় যে এই বিধবাবিবাহ প্রচলন সিপাহী বিদ্রোহের অন্ততম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল। শুধু দাঁত দিয়া টোটা কাটা নয়,—বিধবাদের বিবাহ দিয়া ইংরাজ হিন্দুর সর্বনাশ করিতেছে, এইরূপ একটা রব উঠিয়াছিল। এই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আজকাল দেখিতে পাই সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মাতার আগ্রহে এই বিধি প্রচলিত হয়; কিন্তু আমি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মুখে একটু অন্তরূপ শুনিয়াছি। যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “মা, আমি একটা কায় করতে যাচ্ছি, তাতে তুই কি বলিস্?” (বিজ্ঞানাগর শেষ পর্য্যন্ত মাকে “তুই তোকারি” এই ভাবে কথা কহিতেন)। আমার বোধ হয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি তাই বিধবাবিবাহের আইন পাশ করার চেষ্টা করব ভাবছি; কিন্তু আগে আমি তোর একটা মত নিতে ইচ্ছা করি। এ কায় তুই ভাল বলিস্ কি না?” মা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, “তুই কি ঠিক বুঝেছিস্ যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত?” আমি বলিলাম—“হ্যাঁ। আমি অনেক

১ ভারত পরিভ্রমণান্তে মার্কিন মহিলা Miss Katherine Mayo ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে Mother India নামে ভারত সম্পর্কে এক কুৎসার্পূর্ণ বই প্রকাশ করেন।—সং

২ ১২৯৫ হুজিরা স্ট্রীট (বর্তমান মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট)।—সং

৩ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিজারত্বের সহিত পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাবশববীরা বিধবা কস্তা কালীমতীর বিবাহ হয়।—সং

বিবেচনা করে দেখলাম যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত,—এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।’ তখন তিনি বলিলেন, ‘তবে আমি তোকে বারণ করি না, তুই এ কাৰ্য করগে যা;—যে যা বলে বলুক।’

“বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিজ্ঞানাগরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, অত বড় দ্বিগুণ পণ্ডিত কুত্ৰাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন্ দেশে একজন পাণ্ডিত একখানি এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করিয়াছিলেন? বল দেখি? কিন্তু বহু-বিবাহ আন্দোলনের সময় তারানাথ বিজ্ঞানাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগরের সমস্ত বিজ্ঞপত্র তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। আমরা তখন ফরাসীবিপ্লব সাহিত্যে মগ্ন; বিজ্ঞানাগরের বিজ্ঞপত্রক রচনা পাঠ করিয়া ভুল্‌চ্যেয়ারকে মনে পড়িত। তারানাথ বিজ্ঞানাগরের উপর রাগ করিয়া সমগ্র কায়স্থজাতিব উপর চটিয়া গেলেন। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বিজ্ঞানাগরের পরম বন্ধু ছিলেন কায়স্থ কুলতিলক শ্রামাচরণ বিশ্বাস। শ্রামাচরণের উপর রাগ হইলে বিজ্ঞানাগরের জন্ত, এবং সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর রাগ হইল শ্রামাচরণের জন্ত। বাচস্পত্যভিধান রচনার তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম। কতক কতক প্রফ আমাকে দেখিতে হইত। কায়স্থ শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যায় মানিসূচক শ্লোক দেখিবা আমি তাঁহাকে অনেক অল্পনয় বিনয় করিয়া সেই শ্লোকটি এবং আত্মবিশ্বাসিক অপব্যাপ্যটুকু বাদ দিতে প্রবৃত্ত করাইলাম।

“সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা জানি না, তারানাথের বিষয়বুদ্ধি কিন্তু অনন্তসাধারণ ছিল। শালওয়ালাদের নিকট হইতে শাল আনিয়া তিনি ধনী গৃহস্থ বাড়ীতে ‘ফিরি’ করিয়া বিক্রয় করিতেন। বোধ হয় তাঁহার ধারণা ছিল যে পণ্ডলোমজাত বস্ত্র পণ্য হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় করিতে ব্রাহ্মণের কোন বাধা নাই। একবার এক সভায় তর্কস্থলে তর্কবাচস্পতি বলিলেন, ‘আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।’ প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ বিক্রয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোন ব্যবসা মহাশয়? —শাস্ত্রব্যবসা না শালের ব্যবসা?’ তাঁহার নিজ গ্রাম অধিকা-কালনায় তিনি একটা স্বরকির কল বসাইলেন, গ্রামবাসীরা আস্তর হইয়া উঠিল, কেহ তখনও স্বরকির কল দেখে নাই। সংস্কৃত পুঁথি সম্পাদন (edit) করিয়া প্রকাশিত করিতে অনেক সময় লাগিবে, তাই তিনি বহুসংখ্যক পুঁথি যেমনটি ছিল তেমনই ভাবে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশিত করিলেন। পুত্র জীবানন্দ অনেকস্থলে কিছু কিছু পাণ্ডীকা লম্বোজিত করিয়া দিতে লাগিলেন। জীবানন্দের সংস্করণ মার্কিনে ও ইউরোপে এমন লম্বাদর লাভ করিল যে একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক টনি লাহেব হতাশ ভাবে বলিয়াছিলেন, ঐ জীবানন্দ লোকটার (That fellow Jibananda) সঙ্গে পান্না দেওয়া অসম্ভব। তারানাথ তর্কবাচস্পতির আন্তবোধ ব্যাকরণ সর্বত্র সমাদৃত ছিল। সেই

নামের অল্পকরণে জীবানন্দের পুত্রগণের নামকরণ হইয়াছিল। বাচস্পতি অভিধান দ্বারা কন্নিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

“মানসীর একজন লেখক রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইহা তিনি কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। আমি কখনও এ কথা শুনি নাই। এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার কৌতুহল হয়। রামমোহনের পুত্র রমাশ্রমাদ খুব বড় উকিল ছিলেন; সকলেই আশা করিয়াছিল তিনি জজের আসন অলঙ্কৃত করিবেন; যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, তিনি রোগশয্যা পড়িলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্মরণার্থিত বাইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হরিমোহন ও পার্শ্বমোহনকে আমি কিছুদিন পড়াইয়াছিলাম। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুদিন তাহাদের শিক্ষক ছিলেন। বিভাগাগর মহাশয়ের কথায় আমি অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হই। রমাশ্রমাদ রায়ের বাড়ীতে পড়ানর ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্কুলের একটি ঘরে ছেলে দুটি পড়িতে আসিত। লোকে বলিত যে, রামমোহন রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র রমাশ্রমাদ রায় হইলে ভাল হইত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি character ছিলেন। শুনিতে পাই, যখন হিন্দু কলেজে তিনি পড়িতেন, তখন সত্যর্থদের সহিত পাক্ষা দিয়া অনেক সময় কাণ্ড করিয়া বলিতেন যাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ অস্থির হইয়া উঠিত। একদিন কথা হইল যে ক্লাসের মাঝখানে সম্মুখে জামা ও চাদর পরিত্যাগ করিতে হইবে,—কে পারে? বাগক জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যতীত আর কেহই পারিল না। ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন একবার জজের সম্মুখে অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন, *If the authors of Hindu Law knew anything about it, I would not have to stand before your lordships to expound it.* পিতার সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেন ঐ ওকালতির টাকা আমি স্পর্শ করিব না। পরে কিন্তু ঐ সম্পত্তি লইয়া শ্রদ্ধা অনেকদূর গড়াইয়াছিল। বিপত্তীক জ্ঞানেন্দ্রমোহন যেভাবেও কৃষ্ণমোহনের কণ্ঠার পাণ্ডিত্য করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর দানপত্রে যে বিলাতী entail-এর ব্যবস্থা করিলেন, আদালতে তাহা টিকিল না। এখানে স্যার বার্নস পিকক বলিলেন যে, কেবল একজনকে দিব না এই কথা ক্রমাগত বলিয়া উঠিল করা মোটেই ঠিক হয় নাই; বিলাতের আদালত বলিলেন যে, কোনও একজন হিন্দু সমগ্র হিন্দু আইনকে উল্টাইয়া দিতে পারেন না; বিলাতী entail হিন্দু আইনে কিছুতেই খাপ খায় না। কাজেই বাহারা এখনও অন্ময় নাই, তাহাদের উল্লেখ করিয়া কোন হিন্দু উঠিল করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টে অকারণ আদায় কিছু প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। আমার টেম্পোর বেকচার লইয়া কিছু নাড়াচাড়া হইল। মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি বলিলেন, ঐ যে *unborn generations*, ওটা আগে কেহই জানিত না, তুমিই উহার জন্মদাতা। আমি খাড়া নাড়িয়া অস্বীকার করিতাম। তিনি বলিতেন *I know, I know—you*

are the Father of unborn generations ।’<sup>১</sup> এডভোকেট জেনারেল পল সাহেবের মুখেও একদিন ঐ লম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত স্খ্যাতি লাভ করিলাম । অশচ বাক্যবিক্রম আমি এ স্খ্যাতি পাইবার উপযুক্ত পাত্র কি না সে লম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল । তাঁরপর যখন স্মার লৈরঙ্গ আমোদের পুত্র জটিল মামুদ তাঁহার রায়ের মধ্যে আমার লেকচার হইতে প্রায় ষেড় পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া এলাহাবাদে আমার নাম জাহির করিয়া দিলেন, তখন আমি অবাক হইয়া গেলাম ।

“মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জিকে একবার বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল যে ব্যানার্জি সাহেব জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বুঝাইয়া তাঁহার স্বত্বটুকু বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত করাইবেন । ব্যানার্জি সাহেবের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবামাত্রই জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিলেন, ‘কেন আমার স্বত্ব বিক্রয় করিব ? আমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি ; নগদ কতকগুলো টাকা পাইলে ইহার অধিক আমার আর কি হইবে ?’ পিতার উপর তাহার আকোশ ছিল বটে, কিন্তু একবার তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিছু খায়াপ হওয়ার জন্য তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে তাহাদের পিতামহের নিকট পাঠাইয়াছিলেন । প্রসন্নকুমারের দুই চন্দ্র জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে চলিয়া যাঁইতে ইচ্ছিত করিলেন । পূর্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি character । তারক পালিত ও ডব্লু. সি. ব্যানার্জির সহিত তিনি মুকবির মত ব্যবহার করিতেন । পালিতের পিঠ চাপড়াইয়া একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন ‘after all you have a mind’ । ব্রাহ্মধর্মের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, ‘Religion ? Religion is not for men. It is for women.’ শেষ বয়সে তিনি পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন ও প্রবালে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

“রামমোহন রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলে ঠিক মানাইত একথা লোকে বলিত বটে কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথও উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা ছিলেন । তাঁহার দানশীলতা লম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল । একবার একটি ধনী গৃহস্থ ঋণের দ্বারে পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রয় করিতে বাধ্য হন । বাড়ীটি যেদিন বিক্রয় করা হইবে, দ্বারকানাথ সেইদিন সেই বাড়ীর প্রাক্ষণে উপস্থিত ছিলেন । একটা শিশু তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মা এরা কা’রা ?’ মা বলিলেন, ‘এই বাড়ী এখন এরা কিনবেন ।’ ‘তবে আমরা কোথায় যাব ?’ ‘ভগবান আছেন, আশ্রয় দেবেন ।’ দ্বারকানাথ সব শুনিলেন ; কর্ণচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঐ ছেলেটি কে ?’ উত্তর হইল, ‘এই গৃহকর্তারই পুত্র ।’ প্রিন্স দ্বারকানাথ ছেলেটিকে কাছে ডাকিলেন, লম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, ‘তোমরা কোথাও যাবে না বাবা, এই বাড়ীতেই থাকবে এ বাড়ী তোমারই রইল ।’

“জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বিলাতে বাকালার অধ্যাপক ছিলেন কি না ঠিক জানি না,



তবে বোধ হয় মিডিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীগণকে তিনি কিছু দিন বাতলা শিখাইয়া ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রীতিমত বাতলা অধ্যাপনা আরম্ভ হইল, আমার সময় হইতে। মিনিয়র অধ্যাপক রাম মিস্ত্রির একটি character ছিলেন। নিরীহ ছাত্রকে সামান্য ত্রুটির জন্য হয়ত শাসন করিতেন, কিন্তু হুট ছেলের কাছে জব্দ হইতেন। তারক পালিত তখন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ে, পণ্ডিত মহাশয় যে বই পড়ান তাহার এক সত্যার্থ বন্ধু সে বই সেদিন ক্লাসে আনে নাই; রাম মিস্ত্রির তাহাকে একটি চড মারিলেন, তারক বলিল, ‘পণ্ডিত মহাশয় আপনি ওকে মারলেন?’

‘হ্যাঁ মেরেছি, ও বই আনে নি কেন?’

‘আমিও ত বই আনি নি—আমাকে মারুন দেখি?’

অতি কোমল স্বরে পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন, ‘তুমিও বই আন নি। আচ্ছা বাবা, পাশের ছেলেটির বই দেখে পড়।’ এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট ড্রিকওয়ার্টার বিটন সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে; এনসাইক্লোপিডিয়া হইতে বিটনের বংশ সম্বন্ধে তিনি কিছু পড়িয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে কার্ডিনাল বিটন সম্বন্ধে আলাপ করিয়া রাম মিস্ত্রির বলিলেন, ‘আহা, আর একজন পণ্ডিত আপনাদের বংশে ছিলেন। তিনি গ্যালিলিওর জীবন চরিত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারও নাম ড্রিকওয়ার্টার বিটন।’ ‘তিনি আমার পিতা; তোমার দেখিতেছি অনেক জানা শুনা আছে।’ এই বলিয়া সাহেব রাম মিস্ত্রির পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত ও বাতলা সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিবার পূর্বে তিনি একটি স্কুলে ইংরাজী পড়াইতেন সেখানে তাঁহার সুশ্রব ২০০০০ মাসিক তিন শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, অধ্যাপক রাম মিস্ত্রির আমার জন্য একটু স্বত্ত্ব ব্যবস্থা করিলেন। এক ভাষা হইতে অল্প ভাষার অল্লাবাদ করিবার তার বিশেষ ভাবে আমার উপর গুরু হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নাম ছিল গিরিশ, তিনি তাহাকে ‘বাবা গিরিশ’ বলিয়া ডাকিতেন, কলেজের সব ছেলেরাই ক্রমে তাহাকে বাবা গিরিশ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

‘জোড়ালোকের ঠাকুর বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের একটু প্রতিপত্তি ছিল।

‘ধর্ম সম্বন্ধে জানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতব্য তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ত ভবু বিলিজনটাকে বিশেষ জীলোকের সামগ্রী বলিয়া নির্দ্বারিত করিয়াছিলেন; সম্ভ্রুতি সোভিয়েট রুশিয়ার কি ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজে দেখিয়াছ কি? সরকার নাকি হুকুম জারি করিয়াছেন যে, তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে গড ও বিলিজন উপস্থিত করা চলিবে না; ভগবানে ও ধর্মে বিশ্বাস তাঁহাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। দেখ, অনেক পূর্বে কারলাইল যীশু খৃষ্টের প্রতিষ্ঠিত সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, ‘The game is played out’। আজ তিনি জীবিত থাকিলে কি বলিতেন? আর্থানীর ব্যবস্থা দেখিয়াই বা তিনি স্থির থাকিতেন কি।’

## চার

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“গত মাসের প্রবন্ধটা পড়িয়া আমার একটা কথা মনে হইতেছে, ঐ ‘Father of unborn generations’ কথাটা হয়ত অনেক পাঠক ভুল বুঝিবেন। আমি টেগোর ল’ লেকচার দিই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু প্রশ্নকৃত্যর ঠাকুরের উইলের মকদ্দমা কলিকাতা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল প্রায় শতম-আঠার বৎসর পূর্বে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করি। কিছুদিন আগে হইতেই আমি ঐ কলেজে ব্রীতিমত ছাত্রহিসাবে ল’ ক্লাসে আইন পড়িতাম। ব্যারিষ্টার মনট্রিও ছিলেন আমাদের অধ্যাপক। একদিন তিনি ক্লাসে আসিয়া বলিলেন, ‘আমি শুনিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক আমার ছাত্র; সে ব্যক্তি কে?’ অগত্যা আমি পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বলিলেন, ‘বেশ হইল, রেজিষ্টারির খাতাখানা লইয়া তুমি ছেলেদের নাম ডাক; ওটা তোমার অভ্যাস আছে, আমার পক্ষে একটু কষ্টকর।’ হিন্দু ল’ সম্বন্ধে সংস্কৃত পুঁথি হইতে নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা তিনি আমার মুখ হইতে শুনিতে চাইতেন। তখনকার দিনে একটু আধটু খ্যাতি আমার ছিল বটে, কিন্তু ঐ উইল সম্বন্ধে unborn generations-এর কথাটা তুলিয়াছিলেন স্বয়ং বার্নস পিকক্। কেহ তাঁহাকে ওকথা বলিয়া দেয় নাই। দায়ভাগের সশ্রম পর্যাগোচনায় তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অনেক পরে ডব্লিউ. সি. বনার্জি আমার ঘাড়ে উহা জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া নহে, আমার বিশ্বাস তিনি ভুল করিয়া ঐ কথা বলিতেন। আবার কখনও কখনও তিনি কতকটা ভ্রমবশতঃ, কতকটা পরিহাসের ছলে ‘বিজ্ঞানবুধি’র পরিবর্তে আমাকে ‘দীর্ঘাভি’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঐ ‘বিজ্ঞানবুধি’র উপাধিটি আমি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। মন্দির সাহেবের জন্ত দুঃখ হয়। তাঁহার মত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যবহারজীবী কলিকাতা হাইকোর্টে তখন বিরল। পাগল স্ত্রী লইয়া তাঁহাকে ঘর করিতে হইত। একটি ইংরাজ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি পেট্রন ছিলেন। তাঁহার এমন পদস্থলন হইল যে, সমাজে তিনি আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। নিজের অতীত কাহিনী বিবৃত করিতে বলিয়া একদিন তিনি অত্যন্ত যত্নেরে বলিলেন, ‘Well, I just drifted.’ সে যাহা হউক, কিছুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্ত আমি পরাণের সংহিতা অল্পবাক্য করিয়াছিলাম; রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহাটা মার্জিত করিয়া দিয়াছিলেন।

“রামমোহন রায়ের তির্য্যকভাষ্যান সম্বন্ধে অজ্ঞতা স্বীকার করার আমি দেখিতেছি একটু চাঞ্চল্যের স্রষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বিন্দিত হইবার কিছুই নাই। ভালই হইয়াছে। নানাবিক হইতে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে; সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারিলে তবে খাটি চরিতাখ্যান রচিত হইবে। অথচ তাঁহার গৌরব স্তম্ভ হইবার আশঙ্কানাই। বালক রাজারামের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল? পোস্তপুত্র? তবে কি মিশনারিহুল্লভ বিবেচনায়: রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথাই সন্দেহ প্রকাশ করিতেন? হরেন্দ্র হোম্যান্ উইলসন রামমোহন রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি সম্বন্ধে রামকমল সেনকে চিঠি\* লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনও গবেষণা হইয়াছে কি? যদিই ধরিয়া লওয়া যায় যে, রামমোহন রায়ের সমস্ত ইংরাজি রচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ইংরাজ প্রাইভেট সেক্রেটারি রচিত, তাহাতেই বা আসে যায় কি? সমস্ত তর্ক-বিতর্ক আলোচনা প্রসঙ্গ তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিশ্চয় তিনি ভাল রকম ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, নহিলে শুধু সেক্রেটারির সাহায্যে অত তর্ক-বিতর্ক চালাইতে পারা যাইত কি? আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের তিনি প্রবর্তক, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই;—অথচ এ সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে স্কন্ধ হইবার কিছুই নাই। সাহিত্য ও সমাজ হিসাবে ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। রামমোহন রায় আজ আপন গৌরবে দ্বৈতীপ্যমান। অথচ খাটি মাল্লবটিকে চিনিতে হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা আবশ্যক। চরিতাখ্যান রচনায় যে প্রণালী অবলম্বন করিলে মাল-মশলা

\*In a letter dated 21-12 1833 Dr. Wilson (Boden Professor of Sanskrit at the Oxford University) writes to Ram Comul Sen :

In a letter I wrote to you I mentioned the death of Ram Mohun Roy. Since then I have seen Mr. Haic's brother, and had some conversation with him on the subject. Ram Mohun died of brain fever, he had grown very stout, and looked full and flushed when I saw him. It was thought he had the liver, and medical treatment was for that and not for determination to the head. It appears also that mental anxiety contributed to aggravate his complaint. He had become embarrassed for money and was obliged to borrow of his friends here, in doing which he must have been exposed to much annoyance, as people in England would as soon part with their lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary, importuned him for the payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Ram Mohun, if not paid to do what he was done since his death, claim as his own writing all that Ram Mohun published in England. In short, Ram Mohun got amongst a low, needy unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late, which preyed upon his spirit and injured his health. With all his defects, he was no common man and his country may be proud of him. (Vide pp 14-15 of Peary Chand Mittra's Life of Dewan Ram Comul Sen)—লেখক

সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার পরিচয় শ্রীমান মন্থনাথের<sup>১</sup> লেখায় কতকটা পাওয়া যাইতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠতাত অবিনাশ আমার ছাত্র ছিল, পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষ আমার প্রকৃষ্টপদ বন্ধু ছিলেন।

“খুব বাল্যকাল হইতে গিরিশ বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। মালীর-বাগানে তাঁদের বাড়ীর কাছে একটি গলির ভিতর আমাদের বাড়ী ছিল। গিরিশ বাবুর পিতামহ কাশী ঘোষ কায়স্থসমাজে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। অনামখ্যাত রামজলাল সরকারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। মালীরবাগানে তিনি একখানি বড় বাড়ী নির্মাণ করাইলেন; বোধ হয় তৎক্ষণাৎ কিছু বেশী টাকাকড়ি ব্যয় হইয়া গেল, এবং কিছুদিন খরচ-পত্তরের একটু টানাটানি করিতে হইয়াছিল। অবিনাশের মুখে শুনিয়াছি যে, এই ব্যাপার লইয়া কাশী বাবুর এক অহিন্দু আত্মীয় পরিহাসছিলে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—‘দাদা খাম পানে চান, ছন দ্বিগে ভাত খান।’ সে যাহা হোক, ছেলেবেলায় এই বাড়ীতে ঝুলনের সময় পাঁচ দিন যাত্রা গান শুনিতে যাইতাম, আমার অগ্রজের কঠোর শাসন কিছুতেই আমাকে বাধা দিতে পারিত না। দাদা যাত্রা গান শুনিতে ভাল বাসিতেন না; কিন্তু কাশী ঘোষের তিন পৌত্রের সহিত তিনি সখ্যস্থজে আবদ্ধ ছিলেন। কেহ, শ্রীনাথ ও গিরিশের বিদ্যাচর্চার খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পাঠ্য বক্তৃদের ও ঘোষদের পাশ্চাত্য বিদ্যাভূমিলন খ্যাতি যেমন দাঁড়াইয়া গেল, তেমনটি আর কাহারও হইল না। বিশ্বাসের বিষয় এই যে, পারদর্শিতা হিসাবে তিনটি ভাইয়ের মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা নুন নহেন।

“আজ গিরিশচন্দ্রের কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে পড়িতেছে। সত্য বটে তাঁহার অগ্রজ শ্রীনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী ভাইস চেয়ারম্যান হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহার খুলতাত পুত্র জীবন ঘোষ কলিকাতা ছোট আদালতে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকিল হইয়া বংশ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার জীবন বাবুর খুলতাতপুত্র প্রিয়নাথ একজন বড় এটর্নি; সম্প্রতি প্রিয়নাথের জামাতা কুমার মন্থনাথ মিত্র রায় বাহাদুর ও পুত্র এটর্নি শৈলেন্দ্র নাথ স্বতন্ত্র কলিকাতার শেরিফ ও ডেপুটি শেরিফ হইয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের দীপ্তি দেশের ও দেশের কাছে যেভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি আর কাহারও হয় নাই। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত বর্ষ পরে তাঁহার কথা প্রকার সহিত স্মরণ করিবার বিশেষ কারণ আছে। তোমরা তাঁহার কোন পরিচয় জান না। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেযুগের বাঙ্গালী যে করজব কর্মী ইতিহাসে রেখা-

১ মন্থনাথ ঘোষ এম. এ., এক. এস., এক. আর. ই. এস.। ইনি রাজা দ্বিপ্রসাদসিংহ সূর্য্যপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিস প্রিন্সের সচিব, বনবিদ্য জেনারেল চন্দ্র, মহারাণী কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেবলড, রমলাল প্রভৃতি প্রমুখের লেখক।—স

পাত করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্ততম; অথচ তাঁহার নাম একেবারে মুছিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে হিন্দু প্যাট্রিস্ট প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তাঁহারা তিন ভাই<sup>১</sup> (এবং প্রধানতঃ তিনি নিজে) হরিশ মুখোজ্জের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, সে প্যাট্রিস্ট সম্পর্কে হরিশ মুখোজ্জের নাম চিরস্মরণীয় হইল, গিরিশবাবুর নাম সকলে ভুলিয়া গেল। যে ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং দশ বৎসরের অধিক কাল তিনি যাহার সম্পাদক ছিলেন, ‘বেঙ্গলী’ হইতে তাঁহার নাম একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল, ইদানীং তাহার শিরোনামে দেখিতে পাওয়া যায়—Founded by Surendranath Banerjee, অথচ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ‘বেঙ্গলী’ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স দশ বৎসর মাত্র।<sup>২</sup> হিন্দু প্যাট্রিস্টের প্রথম সংখ্যা বাহির হওয়ার কথা আমার মনে নাই; কিন্তু বেঙ্গলীর গোড়ার কথা আমার বেশ মনে পড়ে।

“অধ্যাপক লব্ সাহেবের অমুরোধে গিরিশ বাবু তাঁহার ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় ধ্রুব দর্শন (Positivism) সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিতে বলেন। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোঁৎ সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচনা করেন, ইহা জানিবার জন্য লব সাহেবের বড় কৌতূহল হইয়াছিল। তাঁহার মত ধ্রুবদর্শনবাদী একনিষ্ঠ কোঁৎ-শিষ্য তখন এদেশে বিরল ছিল। কোঁৎ-এর প্রভাব আমার অগ্রজ রামকমলের উপর বড় কম ছিল না, তাই তিনি অল্প বয়সেই, পূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি আমার উপরে তুলত করিয়া নিজে কতকটা মুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লব সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় বড় বেশী ছিল না। খর্বাকৃতি মানুষটি,—কিছুদিন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুও যে ধ্রুব-দর্শন সাহিত্য শ্রদ্ধার সহিত অতশীলন করিতেন, ইহা প্রথম প্রথম আমি জানিতে পারি নাই। অথচ খাটি ব্রাহ্মণ-হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পাদরীর আক্রমণ হইতে ধ্রুব-দর্শনকে রক্ষা করিতে তিনি তৎপর হইতেন।

“গিরিশ বাবু ও তাঁহার অগ্রজদ্বয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বিদ্যালাত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের ছাত্র না হইয়াও তাঁহারা তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাপ্তেন সাহেবের কাছে বোধ হয় তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। বিদ্যাহরণ তাঁহাদের শেষ পর্য্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। সরকারি কাজ করিয়াও পত্রিকা পরিচালনে গিরিশ বাবু যে দক্ষতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজকাল তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না। হিন্দু-প্যাট্রিস্ট যখন কালীপ্রসন্ন সিংহের টাকায় জমিদারের মুখপত্র দাঁড়াইয়া গেল, তখনই মৃৎ মুক রায়তের বাণী স্বরূপ বেঙ্গলীর আবির্ভাব হইল। গিরিশ ঘোষ কোনও কারণে জ্বায় ও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেন না।

১ শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক ‘হিন্দু প্যাট্রিস্ট’ ৬ই জানুয়ারী ১৮৫৩ হইতে প্রকাশিত হয়।—সঃ

২ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতে সুরেন্দ্রনাথ ‘বেঙ্গলী’-র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন কিন্তু সাপ্তাহিক ‘বেঙ্গলী’র প্রথম আবির্ভাব হয় ৬ই মে, ১৮৬২।—সঃ

তাহার সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল ; অথচ তিনি তাহার কাগজে আমার ‘বিচিত্র-বীৰ্য্য’র যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আমি বিচলিত হইয়াছিলাম । ধীরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি অবিচার করেন নাই । আমার সেই সংস্কৃত ভাষাবহুল রচনাকে তিনি অগ্ৰান্ত বিশেষণের মধ্যে *turgid* আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছিলেন । কিন্তু আমার ছাত্র চন্দ্রনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে ‘বিচিত্রবীৰ্য্য’র যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় একবার অব্বেষণ করিতে, কোথাও সেই ম্যাগাজিনের সেই খণ্ডটি পাওয়া যায় কি না ।

“দীর্ঘকায় বিপুল বলিষ্ঠ গিরিশ ঘোষ অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অপস্থত হইলেন । ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি বেলুডে কিছু জমি কিনিয়া বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিলেন ; স্বহস্তে কোদাল লইয়া বাগানে ভূমি খনন করিতে ভালবাসিতেন । আমার দাদাকেও তিনি তাহার জমির নিকটে একটু ভূমিক্রয় করাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু সে বাড়ীতে যাইবার পূর্বেই আমার অগ্রজের অপয্যুত্ব ঘটিল ।<sup>১</sup> এই মাটি খোঁড়ার কথায় বিত্বাসাগরের কথা মনে পড়িয়া যায় । পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, সংস্কৃত কলেজের এক অংশে যখন তিনি থাকিতেন, তখন কুস্তি করিবার জন্ত সেইখানে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই জমিতে তিনি কুস্তি করিতেন ।<sup>২</sup> ইহাতে তাহার লজ্জা-সঙ্কোচ বিন্দুমাত্র ছিল না ; বিত্বাসাগর পাঙ্কী চড়িতেন, ঘোড়ার গাড়ী চড়িতে সহজে রাজি হইতেন না ; বলিতেন যে, পাঙ্কী চড়ায় কোন দোষ আছে মনে করি না । ঘোড়ার গাড়ী চড়ায় কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি । ঘোড়াগুলোকে তাহাদের অনিচ্ছায় আমাকে বহন করিতে বাধ্য করান হয় ; কিন্তু পাঙ্কী বেয়ারার স্বচ্ছায় অর্থের প্রত্যাশায় আমাকে বহন করে । এই জন্ত এক হিসাবে ঘোড়ার গাড়ী চড়া কতকটা *immoral* মনে করি ।

“যাক, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমি হাওড়ায় বাসা করি । তখন আমি ডেপুটী ইন্স্পেক্টর অভ্যন্তরীণ । সাহেব ইন্স্পেক্টর । গিরিশ বাবুর সঙ্গে প্রায় দেখা শুনা হইত । বাকাল বাবুর বাড়ীতে দীনবন্ধু বাবুর নাটক অভিনীত হইত ; গিরিশবাবু ও আমি একত্রে তাহা উপভোগ করিতাম । সাঁওরাগাছি স্থলের পারিতোষিক বিতরণে আমি তাহার স্থলনিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম । সুন্দর বাগান বাড়ি, অটুট স্বাস্থ্য, বিপুল ধ্যাতি ;—অথচ এই অকৃত্রিম বেশেবক তাহার কর্মক্ষেত্রে হইতে চক্ষিণ বৎসর বয়সে সরিয়া পড়িলেন ।”

১ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই আত্মহত্যা করিয়া স্বত্যাগরণ করেন ।—সং

২ পৃষ্ঠা ৭ ও ৭৪ ক্রমিক ।—সং

## POSITIVISM

বা

### ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ

যে কয়জন মনোবী বাঙ্গালী কোম্ভের সর্বপ্রথম মন্ত্রশিষ্য হইরাছিলেন, তাঁহাদের অন্ততম পূজাপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন “দেখ, যে শাস্ত্র গত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ইচ্ছা হয়, বৃত্তার পূর্বে ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করি।

“Ecstatics philanthropy কথাটা জান কি? শব্দটি হার্বার্ট স্পেন্সারের সৃষ্টি। উহার অর্থ করা যাইতে পারে, পরোপকারে আনন্দ-বিস্ময়তা। স্পেন্সার কোম্ভের গ্রন্থাদি পড়িতেন না; কোম্ভের দার্শনিক মতসমূহ তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে যে দার্শনিক প্রস্থান (School of Philosophy) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু দুই চারিজন কোম্ভের ভক্তের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল; যথা, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক লুইস এবং উহার চিরসঙ্গিনী (যদিও অবৈধরূপে) প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী জর্জ ইলিয়ট গুরুত্ব কুকারী ইভান্স<sup>১</sup> এবং বোধহয় কোম্ভের দর্শনের অনুবাদিকা কুমারী মার্টিনো<sup>২</sup>। ইহারা কয়েকজনে মিলিয়া এক্স (X) ক্লাব নামক একটি গোষ্ঠিতে মিলিত হইতেন। দশ জনের অধিক সভ্য হইবে না এই নিমিত্ত উহার এইরূপ নামকরণ হইরাছিল। বোধ হয়, হার্সলিও<sup>৩</sup> উহার মধ্যে ছিলেন। হার্সলিও কোম্ভকে অত্যন্ত ভুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; তাঁহার নামের উল্লেখ হইলেই বদ্বৎ দর্শনশাস্ত্র ও ততোধিক নিকৃষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্র (Bad philosophy and worse science) এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু এ প্রকার মতভেদ সম্বন্ধে সভ্যদিগের মধ্যে কিছুমাত্র মনোমালিন্য ছিল না। লুইস কোম্ভের একজন গোড়া ভক্ত ছিলেন; জর্জ ইলিয়ট ততদূর না হউন, কোম্ভকে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক প্রধান জ্যোতিঃ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লুইস আপনার দর্শনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, কোম্ভের প্রণালী পূর্বতন দর্শনকারদিগের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দর্শনকার-

<sup>১</sup> Adam Bede, Silas Marner প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা George Eliot (1819-80)। ইহার প্রকৃত নাম : Mary Ann Cross (née Evans)।—সং

<sup>২</sup> Harriet Martineau (1802-76)। ইহার ভ্রাতা James Martineau (1805—1900)-ও প্রখ্যাত দার্শনিক।—সং

<sup>৩</sup> Thomas Henry Huxley (1825-95)—ডারউইনের মতবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা ও অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক।—সং

দিশের মধ্যে চিরকালই একপ্রকার ঢেঁকির কচুঁকচি চলিয়া আসিতেছে, নালো মূর্খিত্ব মত্ত ন ভিন্ন; অর্ধানু দর্শনকাররা হটল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানবেত্তাদিগকে হেরজান করেন, ইহারা আবার উহাদিগকে তুর্বোধা স্বপ্নভাবী (Dreamy) বলিয়া নিকার তুলিয়া রাখিতে চাহেন। কোম্ৎ যখন তাঁহার নিজের ধরণে দর্শন গঠন করিতে বলিলেন, তখন অনেকেই মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, দেখা যাউক ইনিই বা কি করেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার দর্শনের ছয় খণ্ড শেষ করিলেন, তখন তাঁহার কৃতকার্যতা দেখিয়া লুইস যে একটি প্রশংসা-সূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেটি আমার বড়ই মিষ্ট লাগে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে কোম্ভের কৃতকার্যতা stupendous, অত্যাশ্চর্য—ভাবিলে মূণ্ড হুরিয়া যায়। লুইসকে মিল তত একটা উচ্চতরের দার্শনিক মনে করেন না, কিন্তু কোম্ভের দর্শন সম্বন্ধে মিল ও লুইসের বিশেষ বিভিন্ন মত নাই। পরে কোম্ভ যখন তাঁহার নূতন ধর্ম প্রচার করিলেন, তখন উহার কতকটা আভাস হার্বার্ট স্পেন্সার বোধ হয় লুইস প্রভৃতির নিকটই পাইয়া থাকিবেন। তিনি নিজে কোম্ভ বড় পড়িতেন না। ফেডরিক হ্যারিসন স্পেন্সারকে এক স্থলে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, হার্বার্ট স্পেন্সার সর্বদা যে Great unknown-এর উল্লেখ করিয়া থাকেন সে বস্তু হা হাই হউক না কেন, কোম্ভ কিন্তু স্পেন্সারের পক্ষে একটি Great unknown অর্থাৎ বিরাট বিপুল অজ্ঞের ব্রহ্ম (ব্রহ্ম=বৃহ+মন্=বৃহৎ)<sup>১</sup>। Religion কাহাকে বলে, এ বিষয়ে কোম্ভ ও স্পেন্সারে অনৈক্য। কোম্ভ বলেন Religion শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একতাপাশন, পাঁচটাকে একটা করিয়া বাধা; পৃথিবীর তাবৎ পূর্বতন Religion-এর ইহাই উদ্দেশ্য ও ইহাই কার্যকারিতা। এই একতাপাশন দুই প্রকার। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পাঁচটা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তিকে একটা সর্বপ্রধান মনোবৃত্তির বশীভূত করিয়া রাখা। দ্বিতীয়তঃ পাঁচজন বিভিন্ন ব্যক্তির একটা মতের অমুবর্তী হওয়া। যাহার দ্বারা এই দুই প্রকার কার্য সম্পাদিত হয়, তাহারই নাম Religion। ইহা কোম্ভের অর্থ। স্পেন্সার বলেন—তাহা নহে; মানুষের বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলির তাৎপর্যাগ্রহ করিতে যাইয়া কতক দূর কৃতকার্য হয়, কিন্তু তাহার পর আর বৃদ্ধিতে পারে না, জ্ঞানের এগারকার বাহিরে এক প্রকাণ্ড অজ্ঞের পারাবার বিস্তারিত রহিয়াছে, বুদ্ধি, যতই অগ্রসর হউক না কেন, কতক দূর গিয়া ঠেকিয়া যায়; কিন্তু বুদ্ধি কতকটা চুলবলে, ঠেকিয়াও স্থির থাকিতে পারে না; সেই অজ্ঞের পারাবারকে স্পষ্টরূপে আকলন করিতে না পারিয়াও কল্পনাপ্রয়োগ করিতে থাকে। এটি মানবচিন্তার একটি অনিবার্য বৃত্তি। স্পেন্সার বলেন, সেই সমস্ত কল্পনার নাম Religion। এই নিমিত্ত স্পেন্সার যখন বুদ্ধিলেন যে কোম্ভের Religion-এর তাৎপর্য কেবল নরজাতির হিতসাধন করা এবং কার্যমনোবাক্যে ঐকান্তিক আশ্রয়-সহকারে অনন্তকর্ম্য হইয়া পরোপকাররূপে ব্রতী হওয়া তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে Religion বল কেন? ইহাকে বরং Ecstatic philanthropy—আসক্তবিরহল পরোপকারব্রত এই লজ্জা দাও।

<sup>১</sup> ব্রহ্ম=বৃহৎ (বুদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া)+মন্ (মন্)=ব্রহ্ম+মা+ব।—স



“এইরূপে উক্ত নামটি সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহা হউক তাবিয়া দেখিলে কিন্তু বোধ হয় যে, কোম্ Religion শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত।”

আমি প্রশ্ন করিলাম—“কোম্‌তের Religion কিছু narrow হইল না?”

উত্তর হইল—“না। দেখ না, ধর্ম্মমাত্রেরই ঈশ্বরপ্রেমপ্রধান, আর সব গোণ। বৌদ্ধধর্মে দয়াবৃত্তি প্রধান। কোম্‌ও সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মাংস খাওয়া আবশ্যক, কিন্তু পশুহত্যায় নিষ্ঠুরতা পরিহার করা চাহি।

“সুপ্রসিদ্ধ জর্জন দর্শনকার কাণ্ট আমাদের মনোবৃত্তিদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা বুদ্ধিবৃত্তি (Intellect), স্বখদুঃখজ্ঞান (Feeling), চিকীর্ষা বা যত্ন (Volition)। আজ দুই শত বৎসরাধিক হইল এই বিভাগটি প্রায় সর্ব্বজনপরিগৃহীত হইয়াছে। কোম্‌ও ইহা পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই কয় বিভাগের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এ স্থলে করা যাইতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য মোটের উপর দুই প্রকার বলিলে বলা যায়—সাদৃশ্যজ্ঞান (Synthetic) ও বৈসদৃশ্যজ্ঞান (Analytic); ইহা ব্যতীত কাল ও দেশ (Time and Space) এই দুই বিষয়ের অসুভবও, বোধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির সামিল ধরিতে হইবে।—স্বখদুঃখজ্ঞান নানাবিধ। একটি একটি স্বখদুঃখজ্ঞানের সঙ্গে একটি একটি মনোবৃত্তি সংশ্লিষ্ট আছে, যেমন কাম (Sexual Instinct), ক্রোধ (Instinct of Destruction), লোভ অর্থাৎ সঞ্চয়বাসনা; ইহা ব্যতীত অহংকার (Pride), যশোলিপ্সা (Vanity), ভক্তি (Veneration), স্নেহ বা প্রীতি (Affection), ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে কোম্‌ আঠারো ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—চিকীর্ষা বা যত্ন তিনি তিন ভাবে দর্শন করেন,—সাবধানতা বা অগ্রপশ্চাত্ত জ্ঞান (Prudence), সাহস বা নির্ভীকতা (Courage) অধ্যবসার (Perseverance)। এই তিনের এক সমবেত নাম Character বা চরিত্র।

“এই সমস্ত মনোবৃত্তিকে একতাপন্ন করিবার জন্তই যখন যে ধর্ম্ম উদ্ভিত হইয়াছিল সেই ধর্ম্ম চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন যে সকল ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, অধিকাংশই দেবভক্তির উপর নির্ভর করিয়া সেই বিষয় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

“প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের অবিকশিত বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আমাদের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন কতকগুলি ব্যক্তির কল্পনা করিয়া আসিয়াছে; এবং তাহাদিগকে ভয় করিয়াই হউক কিম্বা তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্তই হউক, আমরা কার্য্য করিতে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি একজনে দাঁড়াইয়াছে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এবং প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্ম সেই একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র একজন কুত্সাপি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে নাই; ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানরা Angel এবং হিন্দুরা অনেক দেবদেবী বরাবর বজার রাখিয়া আসিয়াছেন; কেবল একজনকে সর্ব্বোপরি পদ দিয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর, বা পরব্রহ্ম বা নারায়ণ ইত্যাদি নানা আকারে চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া আসিয়াছেন। পরব্রহ্ম একেবারে আকাশের মত অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, একটি অপরিমিত পদার্থরূপে চিন্তিত হইয়েন।

“মনোবৃত্তিসমূহের একতাপত্তি বলিতে কি বুঝিলে? যখন যে মনোবৃত্তি মনে প্রবল হয়, যদি আমরা তাহাকেই তখন প্রসঙ্গ দিই, তাহা হইলে শুধু যে আমাদের নিজে মনের শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে, মনস্তত্ত্বসমাজ একেবারে উচ্ছিন্ন হয়। মনে কর, উপস্থিত অপত্যস্নেহবশতঃ আপনার সন্তানকে এক্ষণে লালন করিলাম, কিঞ্চিৎ পরে কোনও কারণবশতঃ তাহার উপর ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে তাহার প্রাণ-সংহার করিলাম। যদি সকল বৃত্তিসমূহে এই ভাবে চলা যায়, তাহা হইলে মনস্তত্ত্ব-সমাজের যে কি ভাষণ অবস্থা দাঁড়ায় তাহা বুঝিতে বড় ক্লেশ পাইতে হয় না। এই জন্তই মনোবৃত্তিদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা অত্যাৱশ্যক ও অপরিহার্য। কোমৎ বলেন যে, পরিণামে পরের প্রতি স্নেহ আমাদের যে একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সেই সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে; ইহাকে দয়া বলে, করুণা বলে, উপচিকীর্ষা বলে, বিশ্বসংগ্রাহী স্নেহও বলা যাইতে পারে। মনস্তত্ত্বের মনোমধ্যে এইরূপ একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি যে আছে সে বিধয়ে আর সন্দেহ করা উচিত নহে। কতকগুলি একদেশদর্শী দর্শনকার সেই সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরোপচিকীর্ষা আমাদের স্বাভাবিকসঙ্গী হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেটা যে ঠিক নহে তাহা, বোধ হয়, সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা যতই স্বার্থপর হই না, পরের কষ্ট উপস্থিতপ্রায় দেখিলে আপনা হইতেই আমাদের মনোমধ্যে একটা চাঞ্চল্য—ছটকটানি—আইসে। একজন যদি রাস্তার চলিতে চলিতে গাড়ির সম্মুখে পড়ে, আমাদের আপনা হইতেই শরীরের মধ্যে এই রকম একটা ভাব আইসে যেন সেই গাড়ির সম্মুখভাগ হইতে পার্শ্বে দাঁড়াই। একজন বাজিকর দড়ির উপর যখন বাজি দেখায় তখন যদি দোষি যে, সে পড় পড় হইয়াছে, তখন আমরা আপনাদের শরীরকেই এমন ভাবে নাড়াচাড়া করি যাহাতে দুই দিকের ভার সমান হইয়া বাজিকর সামলাইয়া যায়, যদি বাজিকর দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে আপনা হইতেই আমাদের দেহ বামদিকে হেলে। এইটি স্বভাবসিদ্ধ—পরদুঃখে দুঃখানুভব। এবং ইহা এই অপূর্ণ অবস্থা হইতেই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া এক্ষণকার বিশাল বিপুল বিশ্বসংগ্রাহী স্নেহে পরিণত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে জন হাইয়ার্ড কয়েদিগের ক্রেশনিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া কয়েদখানার সংক্রামক রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন; ইহারই প্রভাবে কয়েক বৎসর পূর্বে একজন ফরাসি ধর্মমাজক প্রশান্ত মহাশয়গের এক যৌনে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; ইহারই প্রভাবে কত স্থানে কতপ্রকার পরোপচিকীর্ষা-গর্ভ বহুলবায়ুসাধ্য অসুষ্ঠান সমুদ্ভূত হইতেছে। সে সমস্ত যে কেবল লোকের নিকট বাহবা পাইবার জন্ত তাহা নহে। অ্যাডাম স্মিথ নামক মনোবিজ্ঞান-বেত্তার Moral Sentiments নামক গ্রন্থের প্রায়স্তে পরোপকারিতাবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধতাসম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির আলোচনা করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিবার কথা নহে। কোমৎ বলেন এই স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিটি অতি দুর্বল। স্বার্থপরতা-বিশিষ্ট বৃত্তিগুলিই সর্বাধিক প্রবল। এই নিবন্ধ উপচিকীর্ষাবৃত্তি মনস্তত্ত্ব-  
পুরা. ২০

সমাজে অত্যাধি প্রার্থণীয়মত প্রবলতা লাভ করে নাই, এখনও নিত্যন্ত কাণ অবস্থাতেই রহিয়াছে, যে স্থলে স্বার্থের সহিত ইহার সংঘর্ষ হয়, সে স্থলে প্রায়ই স্বার্থ ইহাকে দাবিবা রাখে। কিন্তু মনে রাখা কর্তব্য যে, শারীরবিধান-শাস্ত্রের (Physiology) একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের যে যে ক্রিয়াক্রান্তি আছে, অভ্যাসদ্বারা সে সমস্তই ক্রমশঃ পরিবর্তিত করা যায়। চলিত কথাতেও বলে, আহার, নিদ্রা ইত্যাদি যত বাড়াও ততই বাড়িবে। কেবল অভ্যাস হইতেই এই বুদ্ধি সম্পাদিত হয়। মাংসপেশী-চালনা অভ্যাস কর, উহার বলবৃদ্ধি হইবে; বুদ্ধির চালনা অভ্যাস কর, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে; সেইরূপ উপচিকিৎসারূপে বুদ্ধির চালনা অভ্যাস কবিলে উহা অবশ্যই ক্রমশঃ বলবন্ত হইতে থাকিবে। যেমন অভ্যাস বৃত্তিবিশেষকে বলবন্তর করে, তেমনই অনভ্যাস উহাকে ক্ষীণতর করে। কোমৎ বলেন, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কোন কোন মনোবৃত্তিপ্ৰবণতা (Tendency) মনুষ্যসমাজকে পরস্পর বিক্লিষ্ট করে, সেইগুলিকে অনভ্যাসদ্বারা যতদূর সম্ভব ক্ষীণতর করিতে হইবে। আর যে সকল বৃত্তি সমাজকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করে, সেইগুলিকে অভ্যাসদ্বারা প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে। যশোলিপ্সা একটি সংশ্লেষক বৃত্তি। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ-ভক্তিও সংশ্লেষক বৃত্তি। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য সংশ্লেষকবৃত্তিই উপচিকিৎসা, অথচ এইটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল, অতএব বিশেষ যত্নপূর্বক অভ্যাসের দ্বারা ইহার বলবৃদ্ধি করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে ইহাই সমাজের একমাত্র বন্ধনস্বরূপ হইবে এরূপ আশা করা যায় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল প্রাচীন ধর্মই স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে এইটি বাড়াইবার দিকেই প্রবণতা দেখাইয়াছে। অবশ্য ইতিহাসে ইহাও দেখা যায় যে, ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর তামসিক অহুষ্ঠান সময়ে সময়ে ধর্মের নামে সম্পাদিত হইয়াছে, যথা ক্রুজযুদ্ধ (Crusade), নাস্তিক পোড়ান, ডাইনী পোড়ান, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে কাটাকাটি, মুসলমানের জেহাদ, হিন্দুর সতীদাহ।

“ধর্মের নামে এইরূপ অত্যাচারের কারণ আছে। কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে, স্বার্থপর বৃত্তিগুলি এত প্রবল যে, উহাদিগকে সংযত রাখিবার চেষ্টা যতই কর না কেন, সময়ে সময়ে উহারা নিজের বলবন্তর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে কখনই ছাড়িবে না। সেন্ট পল বলিয়া গিয়াছেন,—পরস্পরকে স্নেহ কর (Love ye one another)। বিস্ময়জনক বলিয়া গিয়াছেন, অস্ত্রের যে প্রকার আচরণ তোমার প্রতি তুমি ইচ্ছা কর, অস্ত্রের প্রতি তোমার সেইরূপ আচরণ করা উচিত (Do unto others as you would they should do unto you)। ইহাকে বলে ধর্মনীতির চরম সূত্র (Golden rule of conduct)। কিন্তু Inquisitor যখন বিশ্বাসকে দাঁহ করিতে বসেন, তখন তিনি এসকল কথা ভুলিয়া যান। অভিমান নামে তাঁহার যে একটি স্বার্থপর বৃত্তি আছে, সেইটিই তখন প্রবল। তিনি ভাবেন, ধর্মের বিষয় আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক, তাহার বিপরীত আর সকল মতই ভুল, ঐ সকল মতের অল্পবর্তীদিগকে ধরিয়া পোড়াইবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা ভগবানই আমাকে দিয়াছেন, অতএব

ইহা ভগবানেরও অভিপ্রেত ; বোধ হইতেছে যে, আমি বিশ্বাসীকে ধরিয়া দ্বাহ করি । যখন যখন লোক ধর্মের নামে অস্ত্রের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তখনই বোধ হয় পূর্বোক্ত প্রকার একটি যুক্তিবিদ্যাস অত্যাচারীর মনে অপ্রকাশভাবে উদ্ভিত হয়,—সে অগ্নানবন্ধনে ঘোরতর পাষাণের কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয় । ইহাতে বুদ্ধির দোষও আছে, স্বভাবের দোষও আছে । সকল স্বভাবের লোক Inquisitor হইতে পারে না । যাহারা উগ্রপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর ও নৃশংস, তাহারাই ধর্মের নামে অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয় ।

“কোমতের প্রবর্তিত ধ্রুবধর্মে এই একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় যে, তিনি দেবদেবী-বিষয়ক সর্বপ্রকার অলৌকিক বিশ্বাস একেবারে পরিহার করিয়াছেন । ইহার পূর্বতন প্রাচীন কোনও ধর্মেই অলৌকিক বিশ্বাস (supernatural belief) একেবারে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হয় না । এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম যদিও নাস্তিকের ধর্ম বলিয়া বিখ্যাত—যদিও বৌদ্ধরা একজন পরমেশ্বর স্বীকার করেন না, তথাপি ছোট খাট অনেকপ্রকার অলৌকিক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই—তাঁহারাও জন্মান্তর মানেন ; ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর ইত্যাদি দেবযোনির সত্তাও স্বীকার করেন । কোমৎ সে সকলই এক কালে বিসর্জন দিয়াছেন । ধ্রুবধর্মের প্রস্তোতর (Catechism of Positivism) নামক যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার প্রথমোক্ত এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনাও আছে । শিষ্য গুলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘আপনি যখন অলৌকিক বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আপনার প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থাকে ধর্ম (Religion) বলেন কেন ? কারণ, সকল ধর্মেই কিছু না কিছু অলৌকিক বিশ্বাস বিদ্যমান দোষেতে পাওয়া যায় ।’ গুরু উত্তর করিলেন,—‘যদি Religion শব্দের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য (connotation) কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বাস-বিশেষের সহিত সেই তাৎপৰ্য্যের কোনও সম্পর্ক নাই । Religion শব্দের ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, সেই তাৎপৰ্য্য একতাপাদন—ligo to bind ।’ এই প্রকার কহিয়া গুরু পূর্বোক্ত প্রকারের ‘একতাপাদন’ এই অর্থে religion শব্দের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিলেন । গুরু আরও কহিলেন,—‘ভাবিয়া দেখ, প্রত্যেক ধর্মের অনুবর্তী লোকদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বিরোধী লোকদিগের সংখ্যাই অধিক, অর্থাৎ খৃষ্টান অপেক্ষা বেথুটানের সংখ্যা অধিক ; হিন্দু অপেক্ষা হিন্দুঅবিরোধীর সংখ্যা অধিক, মুসলমানের চেয়ে ইসলামবিরোধীর সংখ্যা অধিক । পৃথিবীর সমস্ত নর-জাতির সংখ্যা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ কথা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন হয় ।’ অতএব কোনও একটি ধর্মের সত্যাসত্য ভোটের সংখ্যা ধরিয়া নির্ণীত হইবার নহে । কেবল যুক্তির দ্বারা এই ধর্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে । কিন্তু অলৌকিক বিশ্বাস লইয়া যুক্তি প্রয়োগ করা বড়ই দুর্ব্বল ব্যাপার । অলৌকিক বিশ্বাসের বনিয়াদ কল্পনা । কল্পনা এমন বস্তু নহে যে, যুক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে । এই নিমিত্তই প্রাচীন সকল ধর্মেরই নানা সন্দেহায় উদ্ভূত হইয়াছে । তাহার আবার পরস্পর এত বিরোধী

যে, ক্রুশের যুদ্ধে খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের যেরূপ রক্তারক্তি হইয়াছিল, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদিগের মধ্যেও সেইরূপ রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে এরূপ বিরাট হত্যা (massacre) সংঘটিত হইয়াছে—যথা Massacre of St Bartholomew<sup>১</sup>—যে, ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এবং মনে এ প্রকার সন্দেহ হয় যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠাপকগণ (founders of religion) ভুলোকের ইষ্ট কি অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা ভার।

“ঋবধর্মের আকাজক্ষা এবং অভিপ্রায় এই যে, কেবল যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া সমস্ত নরজাতিকে কালসহকারে একধর্মায়িত করিয়া তুলিবে। কোম্ৎ বলিয়াছেন, কোনও প্রাচীন ধর্মই অশ্রদ্ধের বা ধ্বংস করিবার বিষয় নহে। সকলেরই এক একটা উপযোগিতা ছিল এবং অত্যাধি আছে। তিনি কোনও প্রাচীন ধর্মকেই নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি বলিতে প্রস্তুত নহেন এবং জবরদস্তি দ্বারা কোনও ধর্মই উঠাইয়া দিতে চাহেন না। যেমন ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তিনটি কোণ মিলিয়া দুইটি সমকোণের তুল্য এ কথার প্রতিবাদ চলে না, যেমন পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ, জলের উপাদান, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, পাকস্থলির কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আর মতভেদ চলিতে পারে না, তেমনই উপচিকিৎসাই ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ, এ সম্বন্ধেও মতভেদ উঠিয়া যাইবে।

“মিলও এ কথার অন্ত্যমোদন করেন বলিয়া বোধ হয়। ‘কোম্ৎ ও ঋবদর্শন’ সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, কোম্ৎ ঋবধর্মের যে নক্সা গঠন করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে। প্রাচীন ধর্মের অল্পবস্তী লোকরা তাহা হইতে বিস্তার শিক্ষালাভ করিতে পারেন। সম্ভ্রান্তি মিলের অপ্রকাশিতপূর্ব চিঠিপত্রের যে দুই খণ্ড বহি বাহির হইয়াছে, তাহারও এক স্থলে দেখতে পাওয়া যায় যে, পরোপকার ব্রত (universal love) মহত্ত্ব-হৃদয়ের যে বৃত্তি তাহা লইয়া এমন একটি ধর্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে যে, তাহা অবলম্বন করিয়া সমস্ত-সমাজ অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। সেই ধর্ম প্রণালীর গঠন করাই কোম্ভের উদ্দেশ্য। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন; তিনি অত্যন্ত প্রধান প্রধান চিন্তনিতারা (thinkers) এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কত দূর একমত হইবেন এখনও তাহার নির্ণয় করা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার গঠিত ধর্মপ্রণালীর মধ্যে কতকগুলি রচনা এমন পরম হৃদয় ও হুমধুর বলিয়া আমার বোধ হয় যে, সেগুলির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইয়া যাই ও তৃপ্তিলাভ করি। উদাহরণ্যে একটি Positivist Calendar। এক্ষণে খৃষ্টানরা অনেকগুলি মাসের নাম গ্রীক ও রোমকদিগের দেবদেবীর নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যথা : January—Janus ; March—Mars ; June—Juno ; ইত্যাদি। কোম্ভ যে পদ্ধতির স্রষ্টা করিয়াছেন তাহাতে বৎসরকে

১ ক্যালী সম্রাট ২ম চার্লসের আদেশে ‘কিট অফ্‌ বার্ধলোমিট’ দিবসে ফ্রান্সের সর্বত্র হিউগেনোট নরনার্থক বহু খৃষ্টান (Huguenots)-কে হত্যা করা হইল ( ১৫৭২ খৃঃ )।—সং

তের মাসে বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রত্যেক মাসের দিনসংখ্যা ২৮। ইহাতে বৎসরের দিনসংখ্যা ৩৬৪ হয়। অবশিষ্ট এক দিনকে তিনি সমস্ত যুগ ব্যক্তির পক্ষাহ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। চারি বৎসর অন্তর যে এক অতিরিক্ত দিন হয়, তাহাকে তিনি সাম্বী নায়ীদিগের স্মরণার্থ পক্ষাহ ধার্য্য করিয়াছেন। আর প্রত্যেক মাসের নাম এক একজন অতি প্রধান নরজাতির মহোপকারসাধনকর্তার নামে দিয়াছেন। যথা :

“প্রথম মাসের নাম মোসেস। ইনি যিহুদি জাতির জাতীয়তার মূলীভূত যাবতীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকর্তা; খৃষ্টানরা যিহুদি জাতির শিষ্য; খৃষ্টানদিগের দ্বারাই এক্ষণে পৃথিবীর সর্বোংশে সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা বিস্তারিত হইতেছে; অতএব এ বিষয়ে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বেখৃষ্টানদিগেরও অভিমান করিবার কোনও কারণ দেখি না। এক্ষণকার বিজ্ঞান যুরোপের নিকট হইতেই সকলকে লইতে হইতেছে। যুরোপের সভ্যতার উন্নতি খৃষ্টান ধর্ম্মের নিকট যে কতদূর শৃঙ্খলিত হইয়া আছে তাহা বর্ণনাতীত। খৃষ্টান ধর্ম্ম আবার যিহুদি জাতি ব্যতীত উৎপন্ন হইত না। সেই যিহুদি জাতির জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা যদি মোসেস হয়েন তবে তিনি সমস্ত পৃথিবীর কি মহোপকার পরম্পরা সঙ্ঘে করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে মাস বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকি উচিত নহে।

“দ্বিতীয় মাসের অধিষ্ঠাতা হোমার। যুরোপে কবিতাসম্বন্ধে হোমারের সর্বপ্রাধান্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দুরা এ বিষয়ে অভিমান করিবেন; বলিবেন, আমরা বাঙ্গালীকে ছাড়িব কেন? সে সম্বন্ধে উপস্থিত অবসরে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; বলিতে গেলে হয় ত গোড়া Positivist বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। এই নিমিত্ত কোম্‌স বাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই এ স্থলে বলিয়া যাই।

“তৃতীয় মাসের অধিষ্ঠাতা আরিস্টটল। স্থলবিশেষে কোম্‌স বলিয়াছেন যে, আরিস্টটল যাবতীয় প্রকৃত চিন্তনিতাদিগের চিরস্থায়ী সম্রাট (the eternal prince of all true thinkers)। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোম্‌স যে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা যুরোপীয়দিগের উপযোগী; এবং আরিস্টটল যুরোপের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের মুর্ত্তিমান আবির্ভাব (representation) বলিলে বলা যায়। স্তত্রম মাসের অধিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম অবশ্যই স্থানলাভ করিবে। তবে মিল আরিস্টটলকে তত উন্নত পদ প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। ‘কোম্‌স ও ফ্রবদর্শন’ নামক গ্রন্থে মিল বিক্রপ করিয়া কহিয়াছেন যে, আরিস্টটল, ডেকার্ট এবং কোম্‌স এই তিন ব্যক্তিকে কোম্‌স নিজে যত বড় লোক মনে করেন আমরা ( অর্থাৎ মিল প্রভৃতি ) তত বড় লোক মনে করিতে রাজি নহি (we have not that degree of admiration for the trio) ইহাতে প্রকারান্তরে দৃঢ় হইল যে কোম্‌স আপনাকেও একজন বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অনেক স্থলে কেন তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে, কোম্‌সের আত্মপরিত্রা অতিমাত্রায় (his self-confidence was gigantic)।

“চতুর্থ মাসের নাম আর্কিমিডিস। ইনি প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতিনিধি স্বরূপ। পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে আর্কিমিডিস যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই সম্যক অবগত আছেন। আমরা তাহা উত্তমরূপে অল্পধাবন করিতে পারি কি না সন্দেহ !

“পঞ্চম মাস—সিজার। ইনি সভ্যতাসমুচিত যুদ্ধবিজ্ঞান (military civilisation) আদর্শ স্বরূপ। সিজারকেও মিল তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি বলেন যে, আপনার জয়ভূমির স্বাধীনতা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা ব্যতীত সিজারের আর কি গুণ ছিল ? কিন্তু আমাদের অল্প বুদ্ধিতে সালা, মারিয়াস, পম্পে প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিষয়ে ও দলাদলিতে রোম এবং সেই সঙ্গে তৎকালের প্রায় সমস্ত সভ্য জগৎ উচ্ছন্ন যাইতেছিল এবং শান্তি পৃথিবী হইতে প্রায় লোপ পাইতেছিল। সেই অবস্থায় সিজার স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার পর হইতে সাম্রাজ্যব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়াতে লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাচে। ফলতঃ সিজারের সময়ে রোমের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপযোগী সমস্ত গুণগ্রাম হারািয়া ফেলিয়াছিল।

“ষষ্ঠ মাস—সেন্ট পল। কোম্ব্তের মতে সেন্ট পলই খৃষ্টান ধর্মকে বিধিবদ্ধ ও ব্যবস্থায়ুক্ত করিয়া দিয়া যান।

“সপ্তম মাস—শালমান্দু<sup>১</sup>। কিউড্যাল ব্যবস্থা নামক যুরোপে যে ব্যবস্থা এক সময়ে সার্বভৌমিক হইয়াছিল, ইনি তাহার আদর্শ স্বরূপ। ঐ feudal ব্যবস্থার দ্বারা যুরোপের সভ্যতা বিশিষ্টরূপে অগ্রসর হইয়াছিল।

“অষ্টম মাস—দাঁতে (Dante)। বলা বাহুল্য ইনি ইদানীন্তন কালের কাব্য শাস্ত্রের আদর্শ স্বরূপ।

“নবম মাস—গটেনবার্গ। ইনি মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সভ্যতার উন্নতিকল্পে মুদ্রাযন্ত্রের মহোপকারিতা বোধ হয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই কারণেই কোম্ব্ত তাঁহাকে ইদানীন্তন কালের শিল্পচর্চার (modern industry) আদর্শ বলিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

“দশম মাস—সেক্সপীয়র। ইনি বর্তমান কালের নাটককারদিগের আদর্শ।

“একাদশ মাস—ডেকার্ট (Descartes)। ইনি বর্তমান কালের দর্শন শাস্ত্রের আদর্শ। ডেকার্টকে এত উচ্চপদ প্রদান করাতে ইংরাজ, জার্মান প্রভৃতি জাতিরা বোধ হয় কোম্ব্তকে স্বজাতিপক্ষপাতিন্বেদোষে অভিযুক্ত করিবে। কিন্তু অরণ্য রাখা উচিত যে যুরোপে এখন যাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে, তাহার অনেকগুলি মৌলিক কথা ডেকার্টের দোহাই দিয়াই চলিতেছে। এবং যদিও তাঁহার Theory of Vortices স্থানচ্যুত হইয়া নিউটনের Universal Gravitation সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, তথাপি ডেকার্ট Analytical Geometry-র সৃষ্টিকর্তা। আমার সামান্য বুদ্ধিতে ত বোধ হয় যে, যিনি

<sup>১</sup> Charlemagne—Charles the Great (742-814), the king of the Franks.  
কাল, উত্তর ও দক্ষিণ ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি ইহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।—স

Analytical Geometry সৃষ্টি করিয়াছেন শাস্ত্ররাজ্যের মধ্যে এমন কোন উচ্চস্থান নাই যাহা তাঁহাকে দেওয়া না যায়। শিল্পচর্চাতে বাস্তব যথেষ্ট প্রকার, গণিতমূলক বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার চর্চাতে Analytical Geometry সেরূপ অত্যাস্চর্য্য যন্ত্রবরূপ।

“দ্বাদশ মাস—ক্রেতৃত্বিক দি গ্রেট। আধুনিক রাজ্যশাসনের (modern polity) আদর্শ।

“ত্রয়োদশ মাস—বিশা (Bichat) ইনি একজন শারীরবিদ্যাবিদ। ঐ শাস্ত্রে tissue এই নামক যে নতুন একটি idea উদ্ভাবিত হইয়াছে, বিশা তাহারই উদ্ভাবক। এই উদ্ভাবনার দ্বারা উক্ত শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আধুনিক বিজ্ঞানে বিশার পদ এত উচ্চ।

“এই ত হইল মাসের অধিষ্ঠাতাদিগের নাম। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য এক এক জন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক দিবস ও প্রত্যেক সপ্তাহ এক এক জন অধিষ্ঠাতার দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং Leap-year-এর জন্য আবার এক একজন পৃথক অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় চতুঃশতাধিক মহাব্যাদিগের নাম পঞ্জিকামধ্যে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

মাস

সপ্তাহের নাম

প্রথম : জানুয়ারী, বৃহৎ, কনফার্মস, মহম্মদ ;

দ্বিতীয় : এম্কাইলস, ফিডুস, অরিস্টোফেনিস, বঞ্জিল ;

তৃতীয় : থে লস, পাইথাগোরাস, সক্রিটিস, প্লেটো ;

চতুর্থ : হিপক্রেটিস, অপলোনয়স, হিপার্কস, (বৃহৎ) প্লান ,

পঞ্চম : থোমাস্ট্রাস, আলেকজান্দর, সিপিও, ট্রাজান ;

ষষ্ঠ : সেন্ট অগষ্টিন, Hildebrand (Gregory the Great), সেন্ট

বার্ণার্ড, বসুয়ে (Bosuet) ,

সপ্তম : আলফ্রেড, গডফ্রি, তৃতীয় ইনোসেন্ট, রাজা সেন্ট লুই ,

অষ্টম : আদ্রিয়টো, রাফেল, টাসো, মিল্টন ;

নবম : কলম্বস, ভোক্যাঙ্ক, ওয়াট, মংগল্‌ফিয়ে (Montgolfier) ;

দশম : ক্যালিয়ন (Calderon), কর্ণিয়ে, মোলিয়ে, লোভার ;

একাদশ : টমাস একুইনিস, বেকন, লাইবনিটজ, হিউম ;

দ্বাদশ : একাদশ লুই, তৃতীয় উইলিয়ম, রিসলু (Richelieu), ক্রমওয়েল ;

ত্রয়োদশ : গ্যালিলিও, নিউটন, লাক্সিমিয়র ( অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-এ বিভক্ত করেন ) ।<sup>১</sup>

“এই গেল সপ্তাহের নামকরণ। দিনের নামকরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাসে নিম্নলিখিত নামগুলি আছে—



“Promætheus, Hercules, Orpheus, Ulysses, Lycurgus, Romulus, Cadmus Manu, Cyrus, Zoroaster, Semiramis, Abraham, Solomon, John the Baptist, Harun al Raschid, David ইত্যাদি।

“দ্বিতীয় মাসে—Anacreon, Pindar, Sophocles, Theocritus, Sapho, Euripides, Aesop, Juvnal, Horace, Ovid, Lucretius, ইত্যাদি।

“তৃতীয় মাসে—Herodotus, Solon ইত্যাদি।

“চতুর্থ মাসে—Galen, Avicenna, Euclid, Ptolemy, Nasiruddin, Strabo, Plutarch ইত্যাদি।

“পঞ্চম মাস—Miltiades, Leonidas, Aristides, Xenophon, Epaminondas, Demosthenes, Brutus, Hannibal ইত্যাদি।

“ষষ্ঠ মাসে—Eloisa, William Penn, St Xavier, George Fox ইত্যাদি।

“সপ্তম মাসে—Joan of Arc, Albuquerque, Charlemagne, Peter the Hermit, Thomas a' Becket ইত্যাদি।

“অষ্টম মাসে—Boccaccio, Chaucer, Rabelais, Cervantes, La Fontaine, Robert Burns, De Foe, Goldsmith, Titian, Rembrandt, Rubens, Chateaubriand, Walter Scott, Spenser, Petrarch, Byron, Madam de Stael ইত্যাদি।

“নবম মাসে—Marco Polo, Vasco da Gama, Arkwright, Dalton ইত্যাদি।

“দশম মাসে—Otway, Goethe, Voltaire, Schiller, Racine, Miss Edgeworth, Richardson ইত্যাদি।

“একাদশ মাসে—Montaigne, Erasmus, Pascal, Locke, Diderot, Adam Smith, Kant ইত্যাদি।

“দ্বাদশ মাসে—Charles V, Henry IV, Washington, Hempden ইত্যাদি।

“ত্রয়োদশ মাসে—Copernicus, Kepler, Hilley, Priestley, ইত্যাদি।

“এই সকল নামের কর্দ দেখিয়া একজন ইংরাজ লেখক পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত দেবতা ও হুজ্জদেবতা (God and God-king) দ্বিগের মধ্যে যে কত করাসীর নাম আছে তাহা বলা ভার। এ কথাটি কোমুতের স্বজাতিপক্ষপাতিতার উপর ব্যক্ত করিয়া লিখা হইয়াছে। কিন্তু লবন্ত নাম গণনা করিয়া দেখিলে কথাটি ঠিক ‘তজ্জিবে’ কি না সন্দেহ। তেরটি মাসের নামের মধ্যে ত দেখা যায় যে দুইজন রিহদি—মোসেস ও সেট পল; তিনজন গ্রীক—হোমার, আরিষ্টটল, আর্কিমিডিস্। শার্লমানকে করাসীও বলা যায়, জর্দনও বলা যায়; দাঁতে—ইটালীয়; গটেনবার্গ, ফ্রেডরিক—জর্দন, সেকপীয়র—ইংরাজ; ডেকার্ট ও বিশা—করাসী। অতএব মাসের নামে ত স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব বিশেষ দৃষ্টা হয় না। মিল এই সকল নামের কর্দ উপলব্ধ করিয়া

বলিয়াছেন যে, এই নামসংগ্রহ অতি চমৎকার ও স্বর্কসংগ্রাহক হইয়াছে। কোম্ৎ ইহাতে অসামান্য গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তির পরস্পর এতদূর বিবেচ ছিল যে, দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গলা ছেঁড়াছিঁড়ি করিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে তিনি এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ কোম্ৎ যেন প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া বলিতেছেন—তুমি আর যাহাই হও না কেন, তোমা হইতে মহত্ত্বজাতির এই উপকার সাধিত হইয়াছে অতএব তুমি আমাদের সকলের নমস্কার এবং পূজনীয়।

“এই নামসংগ্রহ দেখিয়া ভারতবর্ষবাসীরা হয়ত অভিমান করিয়া বলিবেন যে, ব্যাস, কণাদ, কপিল, বাস্করাকি, কালিদাস, ভবভূতি কোথায় গেলেন? কিন্তু তৎসম্বন্ধে পুনর্বার বলিতে হয় যে, কোম্ৎ যুরোপীয় সভ্যতার উন্নতি ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিতে চাহেন যে, গ্রীকদিগের সেই প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতার একটি স্রোত কখনও বা মন্দবেগে কখনও বা প্রবল বেগে এ কাল পর্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে, এবং এক্ষণে উহা ক্রমশঃ বিশাল ও বিপুল হইয়া উঠিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে অপৰ্য্যাপ্ত-কল প্রসবকারী বারি বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই স্রোতের বহন-কার্য্যে যাহারা অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছেন, কোম্ৎ তাঁহাদিগেরই নাম করিয়া নিবন্ত হইয়াছেন। অগ্ৰাণ্ড দেশের সভ্যতার স্রোত কতক দূর বহিয়া সরস্বতীর স্রোতের ত্রায় বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছে, অবিচ্ছিন্নভাবে একাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এটি একটি সেই সেই দেশের অদৃষ্টবৈগুণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু কোম্ৎ যে, সে বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিহীন ছিলেন তাহা বোধ হয় না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি মন্ট, বুদ্ধ, কনফুসিয়স, মহম্মদ প্রভৃতিরও নাম করিয়াছেন। এই নাম করিবার কারণও আছে। ইহাদিগের নামের সহিত এমন কতকগুলি idea সংশ্লিষ্ট আছে, যেসকল idea যুরোপীয়দিগের মনোমধ্যে সময়ে সময়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগের বুদ্ধিবিকাশের সহায়তা করিয়াছে। এই জন্য কোম্ৎ যুরোপীয় সভ্যতা-বিকাশের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে বিশ্বস্ত হয়েন নাই। বিশেষতঃ তিনি মহম্মদের বড়ই ভক্ত ছিলেন। স্থলবিশেষে তিনি লিখিয়াছেন—মহম্মদের জুড়ি মিলে না, the incomparable Mohammad। নিজে খৃষ্টানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি খৃষ্টানদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টানরা কিলের এত গর্ব্ব করেন? তিন শত বৎসর ক্রুশের যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া শেষ কালে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তিতার জন্য ভূমি পর্যন্ত মুসলমানদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন!

“এই পঞ্জিকার মধ্যে নেপোলিয়নের নাম নাই। কোম্ৎ তাঁহাকে ভয়ানক পাবণ্ড বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে নেপোলিয়ন humanity-র শত্রু।

“কোম্ভের যে পঞ্জিকার ব্যাখ্যা করা গেল, তাহাতে কোম্ৎ বলিয়াছেন, Concrete Calendar অর্থাৎ ব্যক্তিমূলক পঞ্জিকা। তদ্ব্যতীত তিনি আর একটি Calendar প্রস্তত করেন, উহার নাম দিয়াছেন Abstract Calendar—ব্যবহাঙ্গিক

পঞ্জিকা ( ব্যবস্থা = social institutions, যথা বিবাহ ইত্যাদি ) । ইহার ১ম মাসের নাম humanity , ২য় মাস—বিবাহ (marriage) ; ৩য় মাস—পিতৃত্ব সম্বন্ধ (paternal relation) ; ৪র্থ মাস—পুত্রত্ব সম্বন্ধ ; ৫ম মাস—ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ ; ৬ষ্ঠ মাস—আমি-ভৃত্য সম্বন্ধ । তিনি এই ছয়টি ব্যবস্থার সাধারণ নাম দিয়াছেন—লোকস্থিতি বা সমাজের মৌলিক সম্বন্ধ, fundamental social relations । ৭ম মাস—জড়পদার্থ পূজা (fetishism) ; ৮ম মাস—বহুদেব পূজা (polytheism) , ৯ম মাস—একেশ্বরবাদ (monotheism) , তিনি এই তিন ব্যবস্থার সাধারণ নাম দিয়াছেন—preparatory stage, সমাজ গঠনের আরম্ভকাল । ১০ম মাস—নারীজাতি । কোম্ৎ নারীজাতিকে ধর্মনীতির অধিষ্ঠাতৃদেবতাকপে—moral providence—কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । ১১শ মাসে—যাজকসম্প্রদায় (priesthood) , ইহারা বুদ্ধিবৃত্তিচালনার অধ্যক্ষস্বরূপ, intellectual providence । ১২শ মাস—সম্ভ্রান্তলোকসম্প্রদায় (patriciate) । ইহাদিগকে তিনি বাহ্যব্যাপারের অধ্যক্ষ (material providence) বলিয়াছেন । ১৩শ মাস—শ্রমজীবীগণ (proletariate) । ইহারা general providence সর্বসাধারণ তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ ।

“এ স্থলে বলা উচিত কোম্ৎ providence এই শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেন । সাধারণতঃ লোক ভগবানকেই providence বহে, অর্থাৎ যিনি আবশ্যক বস্তুসকলকে জোগাইয়া দিতেছেন । এই ‘জোগাইয়া দেওয়া’ অর্থ ধরিয়া কোম্ৎ মন্তব্যসমাজে সেই সম্প্রদায়কে সেই বিষয়ের providence বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, যে সম্প্রদায় যে বিষয়ের অধ্যক্ষতা করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে জোগাইয়া রাখেন । যথা banker, merchant, manufacturer ও farmer—এই চারি সম্প্রদায়কে তিনি patriciate করেন । ইহারা উক্ত চারি প্রকার সামাজিক ব্যাপারের অধ্যক্ষ, অধিষ্ঠাতা এবং যোগক্ষেমকর্তা ( যোগক্ষেম বলিতে অলঙ্ক বস্তুর লাভ ও লঙ্ঘনবস্তুর রক্ষা , কি রহিল, কি খরচ হইল, কি চাহি, এ বিষয় দেখা ) । নারীজাতিকে তিনি ধর্মনীতির অধিষ্ঠাত্রী করেন ; তাৎপর্য এই নারীর চারি মূর্ত্তি—জননী, গৃহিণী, ভগিনী ও ছুহিতা ; আমাদিগের প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ইহাদিগের নিকট হইতেই হয় । যাজকসম্প্রদায় (priesthood) বুদ্ধিচালনাঘটিত ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা, কোম্ৎয়ের ব্যবস্থামত ইহারাই লোকদিগকে লিখাপড়া শিখাইবেন, সর্বদা আবশ্যকমত উপদেশ দিবেন, আচরণে কোথায় কি ভুল হইতেছে দেখাইয়া দিবেন, অথবা বুদ্ধিপরিচালনা হইতে নিরস্ত রাখিবেন, ইত্যাদি । শ্রমজীবীগণ সর্বসাধারণ সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধানকর্তা , আহার, আচ্ছাদন, বসতবাটী-নিৰ্ম্মাণ, যাবতীয় অত্যাবশ্যক অপরিহার্যকার্য্য, ইহাদিগেরই হস্তে । ইহারা পরিশ্রম না করিলে সমাজকে অচিরে গ্রাসাচ্ছাদনাদির অভাবে বিলুপ্ত হইতে হয় । আমরা অভ্যাসদ্বারা এবং ভ্রমাকারে ‘আচ্ছন্ন’ বলিয়া শ্রমজীবীদিগকে নীচ জাতিমাধ্য পরিগণিত করিয়া রাখিয়াছি ; কিন্তু কিকিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যেরূপ অল্পিষ্ট কঠোর পরিশ্রমে ইহারা সমাজকে ঠাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের যাবতীয় নীচতা

প্রকাশ করাই কর্তব্য। এক্ষণকার বিবেচনামত হয়ত বলিব যে কৃতজ্ঞতা আবার কিসের? পয়সা দিয়া চাউল কিনি, ভাত খাই। শ্রমজীবীরা পেটের দ্বায়ে ক্লেশ স্বীকার করে। তাহারা কি আমাদেরকে খাওয়াইবে পরাইবে বলিয়া পরিশ্রম করে? কিন্তু এ প্রকার কৃতজ্ঞের চালনা করিলে মা বাপকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি রহিত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ তর্কবাগীশ অনেক নব্য যুবক আধ তামাসার ছলে এ প্রকার পরিহাসও কখনও কখনও করিয়া থাকেন, বাপ মা'কে শ্রদ্ধা করিতে যাইব কেন? তাহারা বৃত্তিবিশেষের বশবর্তী হইয়াছিলেন, ফলে আমার জন্মলাভ হইল, ইহাতে কৃতজ্ঞতার বিষয় কি আছে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমরা সকল সময়ে কৃতজ্ঞতাজালনাবিষয়ে অত সূক্ষ্ম বিবেচনা করি না। হিন্দুরা দুগ্ধদাত্রী গাভীর পূজা করিয়া থাকেন, খাণ্ডাদি শস্ত্রেরও পূজা করেন। আমার স্বর্গীয় বন্ধু যোগেন্দ্র<sup>১</sup> কোম্‌ পড়িয়া পড়িয়া মনোবৃত্তিকে এতদূর পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহার আবার চাষারা তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য তাহার বাটীতে কখনও কখনও আসিত। একদা তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন—‘দেখ, তোমরা আমাদেরকে খাইতে দাও বলিয়া আমরা চারটি চারটি খাইতে পাই।’ চাষারা ত শুনিয়া অবাক ও হতবুদ্ধি। তাহারা কখনও কখনও জমীদার বাবুর মুখে এ প্রকার অত্যাস্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করে নাই। তাহারা শিহরিয়া উঠিল, কিছুই তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবীগণকে এইরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য, এবং যত দিন আমাদের সে অভ্যাস না হইতেছে, ততদিন সমাজের সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যাহত হইয়া থাকিবে।

“কোম্‌ বিবাহব্যবস্থার নামে একটি মাস গণনা করিয়া ঐ ব্যবস্থা যে সমাজের পক্ষে কত আবশ্যক তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; কারণ এক্ষণে তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের প্রবাহে বিবাহব্যবস্থা ও স্বত্বাধিকার ব্যবস্থা (institutions of marriage and property) এক প্রকার যায় যায় হইয়াছে। বড় বড় গ্রন্থরচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয় যে, মণ্ডসমাজে বিবাহের আবশ্যকতা নাই। এই ব্যবস্থা পশুদিগের মধ্যে নাই, অস্ত্রান্ত ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে নাই, তাহারা কি নির্মূল হইতেছে? কিন্তু সাবধান হইয়া চালালেই বিনা বিবাহে মণ্ডসমাজ বেশ খাড়া থাকিতে পারে। এ প্রকার কুতর্কিকদিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া কোনও ফল নাই। ইহাদিগকে ঘোরতর অবজ্ঞার তলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বত্বাধিকার বিষয়েও উক্তপ্রকার বিশ্ববিপ্লাবক অনেক আন্দোলন এক্ষণে চলিতেছে,—Socialism, Communism, Nihilism ইত্যাদি মতের আবির্ভাব তাহার দৃষ্টান্ত। এই সকল কৃতজ্ঞের প্রতি কোম্‌ এককালে ঞ্জস্বাস্ত এবং অবজ্ঞাপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তবে সোশ্যালিজম দ্বারা একটি কথা তিনি ভুলেন নাই; অর্থাৎ নিতান্ত দুর্বৃত্ত না হইলে পৃথিবীস্থ তাবৎ জীবিত ব্যক্তিরই খাইতে এবং উপযুক্ত বাল্যদানে থাকিতে পাওয়া

আবশ্যক। তাঁহারা সমাজের নেতৃত্ব করেন, উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিকর্তব্য, করিতে না পারিলে তাঁহারা সর্বতোভাবে নেতৃত্ব করিবার অযোগ্য। ফলতঃ এ কথা সমাজ নেতারা অনেক সময়ে নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং তদুপায়ে কার্যও করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময় আমাদিগের গভর্নমেন্টের কার্যপ্রণালী ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহারা ত এ কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না যে অনটনবশতঃ লোক মরে, আমাদের কি ? আমি শুনিয়াছি কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তৎকালে তৎকালকার শাসনকর্তা ম্যাকডনেল (এক্ষণে লর্ড ম্যাকডনেল) অত লোক অনাহারে মরিবে ভাবিয়া পাগলের মত হইয়াছিলেন, এবং দিবারাত্র ঘোরতর পরিভ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পূর্বকালেও যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহাও নিশ্চিত বোধ হয়। ম্যাকডনেলের কথা শুনিয়া ‘শকুন্তলার’ এক পংক্তি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ স্মরিত হইয়া উঠে ; যখন কণ্ঠপ শব্দ দৃষ্টান্তকে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিতেছেন, তখন কহিতেছেন—পুনর্ধাস্তাত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্ত ভরণাং—অর্থাৎ ইনি লোকদিগকে খাইতে দিয়া ভরত ভরণপোষণকর্তা এই নাম লাভ করিবেন। এটাকে আমি ব্যবহার হ য ব র ল humdrum commonplace কথা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম ; রাজা রাজপুত্রবরা লোকদিগকে খাইতে দেন কি দুশো-পাঁচশো কান্দালী খাওয়ান ইহাতে আবার বাহাদুরি বা পৌরুষ কি ? আর খোয়নাম পাইবারই বা কি হিসাব আছে ? কিন্তু ম্যাকডনেলের কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে উদয় হইল যে, কথাটা আর কিছু নহে, দৃষ্টান্তের পুত্র বোধ হয় কোনও ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাই ‘ভরত’ এই খোয়নাম পাইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে ‘ভরত’ এই শব্দটা অতি উন্নত ও উদার্যপূর্ণ অর্থ ধারণ করে।

“এইবার Positivist Chivalry-র কথা বলিব। ইহা কোম্বোলের অপর একটি অভিপ্রেত ব্যবস্থা। Chivalry শব্দের অর্থ বাঙ্গালাতে কিরূপে ব্যক্ত করা যাইবে ? আমি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, ‘শরণাসম্প্রদায়’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে কতকটা হইতে পারে। যুরোপের ইতিহাসে যাহাকে মধ্যযুগ বলে সেই সময়ে chivalry নামক ব্যবস্থা প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মুখ্য অভিপ্রায় পরিণামে এই দাঁড়াইয়াছিল,—অন্ততঃ লোক ভাবিত, যে তাঁহারা দুর্বলকে প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং দুরাশ্বাদিগের দৌরাশ্ব্য হইতে স্ত্রীজাতির মান ও ইচ্ছা রক্ষা করিতে বন্ধপরিকর থাকিবেন। ইহাই ছিল তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। যদি বল যে, এ কার্য ত দেশের শাসনকর্তাকেই অর্পণে ; তাহার উদ্ভবে বলিতে হয় যে, দেশের শাসনকর্তা সকল স্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। কালিঘাসের শকুন্তলাকে রাজা ছ্যাস্ত নিজেই বলিয়াছেন—

অহস্তহস্তাশ্বান এব তাবৎ  
জাতুং প্রমাদ শ্লিতং ন শকৎ  
প্রজ্ঞাসু কঃ কেন পথা প্রযাতী  
ত্যাশেষতো বেদিতুমন্তি শক্তিঃ ।

অর্থাৎ “দিন দিন নিজেই কত ক্রটি হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করা ভার ; তাহার আবার প্রজ্ঞাদিগের মধ্যে কখন কে কি করিতেছে ইহা কি জানিতে পারা যায় ?” এই নিমিত্ত যে যে স্থানে Humanity কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে সেই সেই স্থানে রাজ্যাশাসন কার্যের সহিত লিপ্ত না থাকিয়াও কতকগুলি মহাত্মা আপনা হইতেই প্রবলের অত্যাচার নিবারণ ও জ্ঞাজাতির সত্যস্বরক্ষাবিষয়ে ব্রতী হইয়া থাকেন ।

“ইয়োপের chivalry ব্যবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে সার্ভান্টিন নামক স্পেনদেশীয় স্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের Don Quixote গ্রন্থপাঠে ; সত্য বটে সার্ভান্টিন্স ঐ গ্রন্থে উক্ত ব্যবস্থার হাশ্মাস্পদ মূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন । তখন chivalry-র শেষ দশা । অতিপ্রসঙ্গদ্বাৰে এবং অযোগ্য ব্যক্তিদিগের নিবুদ্ভিতাবশতঃ ব্যবস্থাটি বাস্তবিকই হাশ্মাস্পদ হইয়াছিল । কিন্তু এক সময়ে হাশ্মাস্পদ হইয়াছিল বলিয়া কোমু মনে করিতেন না যে, প্রকারান্তরে উহার পুনরুত্থাপন করা সম্ভব নহে, কিংবা উহা আবার কার্যোপযোগী করা যাইতে পারে না ।

“শাসনকর্তাদিগের দ্বারা যে অত্যাচারনিবারণ হয় বা অপরাধের দণ্ডবিধান হয় তাহা সমাধা করিতে আইন-আদালত আবশ্যক । সভ্যসমাজে অর্থব্যয় ব্যতিরেকে আইন-আদালতে সাহায্য লওয়া প্রায় সম্ভবে না । এই নিমিত্ত ফল দাঁড়ায় এই যে, ঐহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা আপন আপন স্বত্বরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ; ঐহাদের সঙ্গতি নাই তাঁহাদের প্রায়ই কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া থাকেন এবং আপন আপন স্বত্ব হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যান, পরিশেষে বংশলোপই তাঁহাদিগের শেষ দশা । সংসারের কার্য আবহমানকাল অনেক স্থলে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ; ইহাকেই ডার্কইন কহিয়াছেন—natural selection, স্পেন্সর কহিয়াছেন—survival of the fittest ; কিন্তু যে ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানভাণ্ডারের জ্ঞান কিঞ্চিৎশে ক্ষুরিত হইয়াছে তিনি কখনই এ প্রকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্যচিন্তে দৃষ্টিনিষ্কণ করিতে পারিবেন না । ইহার প্রতিকার-চিন্তা সর্বদাই তাঁহাকে ব্যধিত করে । ডার্কইন বা স্পেন্সরের মতাবলম্বী ব্যক্তিয়া বলিবেন বটে যে—ইহার আর উপায় কি ? ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই এই ; সে নিয়ম রোধ করিবার চেষ্টা করা আর Ecliptic-কে Equator-এর সঙ্গে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করা দুইই সমান । ঐহারা এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগের করুণা নামক মনোবৃত্তিটি অবশ্যই বৃত্তাবতঃ ধূর হইবে, নহিলে তাঁহারা কখনই ঐ উপায়ে মনকে লম্ভে রাখিতে পারিতেন না ।

“Positivist Chivalry—যাহাকে আমি শরণ্যসম্মত বলিতেছি—উক্ত অনর্থের প্রতীকার করিবার জন্য একটি উপায় কল্পনারূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে । যদি

ক্ষমতাপন্ন ভদ্রসন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে পরহিতব্রতী হইতে পারেন, তাহা হইলে অনেক স্থলেই সহজে প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন। তবে ইহাতে নিজের কোনও লাভের প্রত্যাশা নাই, অনেক সময়ে ঝগড়াটেও পড়িতে হয়। লাভের মধ্যে একটা সংকার্য্য সম্পাদন করিলাম—এই আত্মপ্রসাদমাত্র। এক্ষণে নরজাতির যে অবস্থা তাহাতে উক্তপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভের লোভে যে অধিক লোক ঝগড়াটে পড়িতে অগ্রসর হইবেন তাহা বোধ হয় না; তবে কালসহকারে পরহিতব্রতের চমৎকারিতা আবার বিস্তারিতরূপে অন্বেষ্য হইলে এবং অভ্যাসবশে আমাদের মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইলে আশা করা যাইতে পারে যে, শরণাসম্প্রদায়ের ব্যবস্থাটি বিশিষ্টরূপে কার্য্যকরী হইবে।

“শরণাসম্প্রদায়ের কিছু আভাস আমি বন্ধিমবাবুর একখানি উপন্যাস হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিয়া কিঞ্চিদংশে বুঝাইয়া দিতে পারি। উপন্যাসস্থানির নাম আমার এখন মনে পড়িতেছে না। বন্ধিমবাবু উহাতে লিখিয়াছেন যে, কোনও পল্লিগ্রামের এক বেলেলা সামান্য একটি গৃহস্থবাটীর বিধবা কন্ডার প্রতি অবৈধ লালসা ধারণপূর্বক কিছু কিছু অত্যাচারের উত্তোগ করিতেছিলেন। গ্রামের জমিদার একটি ভদ্রসন্তান ছিলেন, তিনি বয়সেও প্রবীণ, তিনি এ উপলক্ষে হাউচাউ করা সঙ্গত বোধ না করিয়া ছোকরাটিকে একদা আপনার বাটিতে ডাকাইলেন এবং বিলক্ষণকণে তাহার দু’টি কাণ মালিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে সে আর সে প্রকার কাণ না করে। ছোকরা অবশ্য মনে করিলে জমিদারের নামে Penal Code করিতে পারিত এবং তাঁহাকে একটু কষ্ট দিলেও দিতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় সে দুই সরস্বতী তাহার মনে উদয় হয় নাই, স্মৃতির বশবর্তী হইয়া সে চূপ করিয়া রহিল। শরণ্যব্যক্তিগণ মনে করিলে এ প্রকার সামান্য সামান্য সংকার্য্য অনেক সম্পাদন করিতে পারেন এবং তদ্বারা লমাজের বিস্তর দুর্ঘটনাস্রোত রোধ করিতে পারেন, কিন্তু তৎকালে নিজে শাস্ত স্ববোধ ও চরিত্রবান হওয়া চাহি। নচেৎ ফল দৃশ্যবাস সন্ভাবনা নাই। আমার বোধ হয় Positivist Chivalry কোম্‌স লেট সাইমন নামক একজন সমসাময়িক ফরাসী চিন্তায়িতার উপদেশ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কোম্‌সের যখন বয়স অল্প তখন লেট সাইমন বিলক্ষণ প্রসিক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। কোম্‌স ও কয়েক বৎসর তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। কিন্তু তৎপরে এই ব্যক্তির প্রতি কোম্‌সের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কোম্‌স আপনার গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—he was a sort of literary juggler অর্থাৎ তাঁহার অনেক কথা অসার বুজঝুঁকি মাত্র। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, Humanity এবং Religion of Humanity ইত্যাদি অনেক নুতন ধরণের কথা লেট সাইমনই বোধ হয় প্রথম উদ্ভাবিত করেন; এবং যে সময়ে কোম্‌স দর্শনশাস্ত্রকেই নরজাতির সর্বকার্য্যসাধন বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে লেট সাইমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রাণীব্যতীত নরজাতির কোনও মতেই চলিবে না; কেবল দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ

তৃপ্তিলাভ করে না। এই তত্ত্বটি কোম্-এ তৎকালে vague religiousness বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখা যাইতেছে যে ১০।১৫ বৎসর পরে তিনি নিজেই ঐ তত্ত্ব উপনীত হইয়া বহু বিস্তাররূপে উহা বোষণা করিলেন, Religion of Humanity সংস্থাপিত করিলেন। আমার বোধ হয় যে, Eugene Sue ( অজেন সু ) নামক স্প্রুসিঙ্ক ফরাসী উপন্যাসলেখকও ঐ সেন্ট সাইমনের শিষ্য। তৎপ্রণীত Mysteries of Paris নামক বিস্তার্ত আখ্যায়িকাগ্রন্থে রুডল্ফ নামে একটি চরিত্র চিত্রিত আছে। রুডল্ফ একজন জার্মান নরপতি। তিনি কোনও কার্য্যবশতঃ ছদ্মবেশে পারিসে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং শরণ্য সম্প্রদায়ের মত বিস্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে এমন অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল যাহা ধর্ম্মনীতি কখনও কোনও দিন অল্পমোদন করিবে না। তবে মোটের উপর এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্ব-স্থলে পরহিতব্রতই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। কতকগুলি সন্দিগ্ধ কার্য্য ব্যতীত তাঁহার চরিত্রকে শরণ্যসম্প্রদায়ের অতি সুন্দর আদর্শস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তন করা যাইতে পারে। Mysteries of Paris নামক গ্রন্থ যদিচ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি এখন পর্য্যন্ত উহার নূতন নূতন সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইংরাজী ভাষাতে উহা অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে। উপন্যাস পুস্তকের এতাদৃশ দীর্ঘ জীবন অতি বিরল। ইহাতে বোধ হয় বহিখানা দৃঢ়রূপে লোকের চিত্তকে আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছে।”



## যে মহাত্মাদের নামে সপ্তাহের নামকরণ হইয়াছে

### তঁাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পৃষ্ঠা ৩১১ জন্মাব্য)

**Numa Pompilius** ( ৭১৫-৬৭২ খ্রীঃ পূঃ ) : রোমের রাজা ( দ্বিতীয় )। রাজ্যশাসন, ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে শৃঙ্খলতা আনয়ন করেন। পাশ্চাত্য জগতের প্রথম বিধানকর্তা (lawgiver) বলিয়া পরিগণিত।

**Lord Buddha** ( আনুঃ ৫৬০-৪৮০ খ্রীঃ পূঃ ) : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক।

**Confucious** ( আনুঃ ৫৫০-৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ ) : কনফিউসিয়াস মতবাদীরা 'শিক্ষিতদের সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। কনফিউসিয়াস হঠাৎ সমাজ গড়িবার জন্য ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

**Mohammad** ( আনুঃ ৫৭০-৬৩২ ) : ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক।

**Aeschylus** ( ৫২৫-৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ ) : এথেন্সবাসী কবি এবং বিয়োগান্ত নাটকের জনক বলিয়া কথিত।

**Phidias** ( আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী ) : গ্রীস দেশীয় ভাস্কর।

**Aristophenes** ( আনুঃ ৪৪৪-৩৮০ খ্রীঃ পূঃ ) : এথেন্সবাসী নাট্যকার। সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তিদের লইয়া বহু কৌতুক নাটক রচনা করেন।

**Virgil** ( ৭০-১৯ খ্রীঃ পূঃ ) : Aenid কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

**Thales** ( খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী ) : 'সপ্ত ধর্ম'র অন্যতম দার্শনিক। প্রখ্যাত জ্যামিতিবেত্তা ও জ্যোতির্বিদ। পার্শ্ববস্তুর মধ্যে জলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

**Pythagoras** ( খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী ) : গ্রীসের অন্তর্গত সামাসের অধিবাসী। একাধারে বিখ্যাত দার্শনিক ও হৃদয় গাণিতিক ছিলেন। 'He believed transmigration of souls and evolved the ideas that the explanation of the universe is to be sought in numbers and their relations.' এ প্রসঙ্গে জ্যামিতির 'পাইথাগোরাস উপপাত্ত' স্মর্তব্য।

**Socrates** ( ৪৬৯-৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ ) : পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলিয়া স্বীকৃত।

**Plato** ( আনুঃ ৪২৭-৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ ) : সocraticদের শিষ্য। গুরুর শিক্ষা ও উপদেশকে ভিত্তি করিয়া যে dialogue-গুলি রচনা করেন সেগুলি বিখ্যাত।

**Hippocrates** ( ৪৬০-৩৫৭ খ্রীঃ পূঃ ) : গ্রীস দেশীয় প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ। কোস দ্বীপের পৃথিবীখ্যাত ভেৎজ বিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। এখনও চিকিৎসকেরা তাঁর নামে শপথ গ্রহণ করিয়া নিজ পেশা শুরু করেন।

**Pliny the Elder** ( আনুঃ ২৩-৭৯ ) : Natural History গ্রন্থের লেখক। ভিহুবিয়াসের অধ্যুপপাতে প্রাণ হারান।

**Themistocles** ( আনুঃ ৫২৪-৪৫৬ ) : প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সেনানায়ক। পারসীক নৌবাহিনীর আক্রমণে গ্রীসের সমস্ত উপস্থিত হইলে এই সমরনায়কের দূরদর্শিতা ও কৌশলের ফলে সেই পারসীক নৌবাহিনী শুধু পর্ষদেই হয় নাই—গ্রীস চিরভরে পারস্যের নৌবল হইতে ভরস্কৃত হয় ( ৪৮০ খ্রীঃ পূঃ )।

**Alexander the Great** ( ৩৫৬-৩২৩ খ্রীঃ পূঃ )।

St Augustine of Hippo ( ৩৫৪-৪৩০ ) : Pagan পিতা ও খ্রীষ্টান মাতা (St Monica)-র সন্তান। উত্তর আফ্রিকার হিপোর ধর্মবাজক হইয়া তথাকার প্রাচীন ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া, খ্রীষ্টধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। Civitas Dei (City of God) ও Confession প্রহ রচনা করেন।

Hildebrand ( ১০৭০-৮৫ ) : ইনি পরে পোপ হইয়া ৭ম গ্রেগরী নাম গ্রহণ করেন।

St Bernard of Menthon ( ১২০-১০০৮ ) : প্রথাত আলপাইন ধর্মশালায় (hospice) প্রবর্তক। আল্প পর্বতে প্রবল তুষার-ঝড়ায় পথপ্রষ্ট পথিকদের শিক্ষিত কুহুর দ্বারা উদ্ধার করিয়া এই সব ধর্মশালায় আনিয়া খাদ্য পানীয় দ্বারা এখনও স্তম্ভিত করা হয়।

Jacques Béguine Bousset ( ১০২৭-১৭০৪ ) : কন্নাসী ধর্মবাজক।

Alfred the Great ( ৮৪৯-৮৯৯ ) : পশ্চিম স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নরপতি।

Innocent III ( ১১৯৫-১২১৬ ) : বোমের পোপ ছিলেন। রাজার উপর চার্চের কর্তৃত্ব করবার অধিকার আছে—এই মতবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। ইনিই ৪র্থ ক্রুসেডের আরম্ভজন করেন।

Lodovico Ariosto ( ১৪৭৪-১৫৩৩ ) : ইতালীয় কবি। Orlando Furioso নামক বিখ্যাত রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা।

Santi Raffaello ( ১৪৮০-১৫২০ ) : রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় অস্ফুট চিত্রকর।

Torquato Tasso ( ১৫৪৪-১৫৮৫ ) : Jerusalem Delivered কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। জাতিতে ইতালীয়।

John Milton ( ১৬০৮-১৬ ) : ইংরেজ কবি।

Christopher Columbus ( আনু: ১৪৪৫-১৫০৬ ) : আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারক জেনোয়াবাসী নাবিক।

James Watt ( ১৭৩৬-১৮১৯ ) : জাতিতে স্কট্। স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারক।

Joseph Michael Montgolfier ( ১৭৪০-১৮১০ ) ও Jacques Etienne Montgolfier ( ১৭৪৫-১৮ ) : ম'গোলফিয়ার জাতীয় বেলুন প্রথম বাতাস ভরিতা তাহা আকাশে উড়ানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

Pedro Calderon de la Barca ( ১৬০১-৮১ ) : প্রসিদ্ধ স্পেনীয় নাট্যকার। ইনি শতাব্দিক নাটক রচনা করেন। 'For man's greatest crime is to have been born', 'For I see now that I am asleep that I dream when I am awake' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উক্তি।

Pierre Corneille ( ১৬০৬-৮৪ ) : কন্নাসী নাট্যকার। Le Cid, Horace প্রভৃতি শৌর্যগিক বিরোধান্ত নাটক রচনা করিয়া অমর হন।

Moliere ( ১৬২২-৭০ ) : ইনিও একজন কন্নাসী নাট্যকার। প্রকৃত নাম Jean Baptiste Poquelin।

St Thomas Aquinas ( আনু: ১২২৫-৭৪ ) : ইতালীয় নাসরিক। 'Summa Totius Theologiae' নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা।

Francis Bacon ( ১৫৬১-১৬২৬ ) : বিখ্যাত প্রবক্তাকর।

Gottfried Wilhelm Leibnitz ( ১৬৪৬-১৭১৬ ) : জার্মান গাণিতিক ও দার্শনিক। Differential Calculus-এর আবিষ্কার এবং বার্লিনের 'Academy of Science'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

David Hume ( ১৭১১-৭৬ ) : স্কট্ দার্শনিক। 'in his system of philosophical scepticism human knowledge is restricted to experience of ideas and

impressions and ultimate verification of their truth or falsehood is impossible.'

Louis XI (১৪২৩-১৪৬৩): ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সামন্ততান্ত্রিক অধিনেতাধের অধিকার খর্ব করিয়া রাজার সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

William III (১৬৫০-১৭০২): ইংলণ্ডের রাজা। ২য় জেমসের কন্যা মেরীকে বিবাহ করেন।

Richlieu (১৫৮৫-১৬৪২): ইনি রিশলিয়ার ডিউক ছিলেন। প্রকৃত নাম Armand Jean de Plessis। ইনি French Academy স্থাপন করেন।

Oliver Cromwell (১৫৯৯-১৬৫৮): ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রবাদীদের নেতা ছিলেন।

Galileo (১৫৬৪-১৬৪২): প্রখ্যাত ইতালীয় জ্যোতির্বেত্তা।

Isaac Newton (১৬৪২-১৭২৭): মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্তা।

Antoine Laurent Lavoisier (লাভোয়্যের) (১৭৪৩-১৭৮৮): ফরাসী রসায়নবিদ।  
'giving a correct explantion of the part played by oxygen in combustion.'

## সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা / পঙ্কতি

১/১৫ বীডন উত্তান বর্তমান ‘রবীন্দ্রকানন’। রবীন্দ্র সরণি এবং বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। অতীতে ইহা ‘কোম্পানীর বাগান’ নামে পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি এখানেই মহারাজা নন্দকুমার রায়ের বলত বাটি ছিল। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের শাস্ত্র ভ্রমণের স্থান ছিল এই উত্তান।

১/১৮ ‘আজ নীরবে ভুগ্নন...’ রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর ‘অন্তর্ভুক্ত’ ‘মানস স্মৃতি’ কবিতা।

২/১০ ইলবার্ট বিল লর্ড রিপন যখন ভাইসরয় (১৮৮০-৮৪), তখন মিঃ ইলবার্ট ছিলেন তাঁহার আইন সচিব। দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিবে, এই মর্মে ইলবার্ট সাহেব এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহাই ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। ইহাতে সমস্ত ইংরেজ সমাজ রিপনের উপর খণ্ডনহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

২/৩২ অনাথবাবুর বাজার—বিডন স্ট্রিটের উপর এবং বিডন স্ট্রিট ডাকঘরের নিকট অবস্থিত। সাধারণের নিকট ইহা ‘ছাত্তাবুর বাজার’ নামে পরিচিত। গ্রেট শাশনাল থিয়েটার—এখন ইহার চিহ্নমাত্র নাই।

৩/১৫ মতিচূর—মহিধানার জায় একপ্রকার দ্রুতপক মিষ্টান্ন।

৩/১৭ নিখুঁতি—অতাবধি এই মিষ্টান্নের প্রচলন আছে কিন্তু ভিন্ন নামে।

৩/২৫ কাতারি কাটিয়া শুখো দই—“দই তিন প্রকার, শুখো, চলন ও দোড়-চলন। ‘শুখো’—দুধ ঘন করিয়া জাল দিয়া দই পাতা। ‘চলন’—দহি আদং দুধে কতক কতক জল দিয়া তাহা জাল দিয়া জলটা মারিয়া দই পাতা। ‘শুখো দই’ তাঁড় উপর করিলেও পড়ে না—এক পাশ হইতে কাটিয়া পাতে দিলে বেশ চাপ চাপ থাকে। ইহাকেই ‘কাতারি কাটা’ বলে। ‘চলন দই’ কখনও কতক পরিমাণে পাতে থাকে, কখনও একটু একটু চলে; এইজন্য উহার ‘চলন দই’ নামে হইয়াছে। আর ‘দোড়-চলন,—পাতে খুব কমই থাকে, ঘেন দোড়িয়া নিয়গামী হয়; এইজন্য উহার এই নাম।”

৪/৮ রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে। কিন্তু ইহার প্রথম অভিনয় হয় নতুন বাজারে রামজয় বলাকের বাড়ীতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

৫/১৩ বাচখেলা—নৌকা-চালানো প্রতিযোগিতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বাঙালী ধনকুবেরদের মধ্যে এই খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল।

৬/২৩ এগারোজন বাঙালী—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তৎকালীন খেঁচ ব্রিটিশ কোর্সী-পোরা-খেলের বিরুদ্ধে খেলিয়া সেরেনবাগান ক্লাব আই. এক. এ. শীতল করে।

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এক ভারতীয় দল পরাধীন জাতির আত্মার প্রতীক রূপে চিহ্নিত হইয়াছিল। এই এগারোজন বাঙালীর নাম যথাক্রমে—বাজেন সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জী, মনোমোহন ঘোষ, রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জী, হাবুল সরকার, স্কুলবাবু, কান্হু রায়, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাট্টা ও শিবদাস ভাট্টা।

৭ / ২৬ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী—১২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন।

৮ / ৩৪ বিদ্যোৎসাহিনী সত্তা—মাত্র তেরো বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারের মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সত্তার প্রতিষ্ঠা করেন ( ১৪. ৬. ১৮৫৩ )। বাঙালী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এবং যাহারা এই ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা করিতেন তাঁহাদের উৎসাহ দানই এই সত্তার উদ্দেশ্য ছিল।

৯ / ৪-৫ মধুসূদন দত্ত রচিত দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল বর্ষণ’-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ ( ১৮৬১ ) ও প্রচারের দ্বारे রেভারেন্ড লন্ডের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয় ( ২৪শে জুলাই, ১৮৬১ )।

১০ / ১৩ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি রিপন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন।

১১ / ২৮ জন স্টুয়ার্ট মিল—জাতিতে মুচি। পিতা জেমস মিলের অসাধারণ মনোবল ও ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য বিশ্বকর অধ্যবসায়, তাঁহাকে বড় হইতে সহায়তা করে। কৌতেরই মত ইনিও একজন বিখ্যাত দার্শনিক। কৌতের বহু মতকে ইনি স্বীকার করিয়াছেন, আবার বহু মতের সঙ্গে তাঁহার অমিল হইয়াছে।

১১ / ৬-৭ Synthetic Philosophy—কৌতের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ।

১৩ / ১৩ পল বর্জিনিয়া—ফরাসী লেখক Jacques Henri Bernardin de Saint Pierre ( ১৭৩৭-১৮১৪ )-এর লেখা Paul et Virgine ( ১৭৮৭ )-এর অনুবাদ।

১৮ / ২ গোবিন্দ শিরোমণি—প্রকৃত নাম রামগোবিন্দ গোস্বামী ( তর্করত্ন )। ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮ / ১৩-১৪ তার সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তারী করিবেন স্থির করিয়া কোর্ট উইলিয়ম কলেজের ‘হেডরাইটার-কোবাধ্যক্ষের’ পদ ত্যাগ করেন এবং বিদ্যালয়গর মহাশয় সেই পদে পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়া আশী টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হন ( ১লা মার্চ, ১৮৪৩ )।

১৮ / পাঠটীকা : কোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেডরাইটার-কোবাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার পর বিদ্যালয়গর শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মরোন্টের অনুরোধে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং সাহিত্যের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিলে বিদ্যালয়গর অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে ৪ষ্ঠা হইতে ২১শে জানুয়ারী ( ১৮৫১ ) পর্যন্ত কলেজের কার্য পরিচালনা করেন। কলেজের সম্পাদক ডঃ সন্থ-সম্পাদকের পর দুইটি পরে লোপ করিয়া অধ্যক্ষের পদ স্থিতি

হইলে তিনি সেই পক্ষে প্রথম অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হন (২২শে জানুয়ারী ১৮৫১) এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর পর্যন্ত এই পক্ষে বৃত্ত ছিলেন।

১৯/১২ Education Despatch—১৭৮ পৃষ্ঠার পাণ্ডটাকা উল্লেখ।

২১/২৫-২৬ প্রকৃতপক্ষে ‘সর্বভুক্তকরী’ পত্রিকার (ঠানটনিয়া সর্বভুক্তকরী সভার মুদ্রণ) সম্পাদক ছিলেন রত্নলাল চট্টোপাধ্যায়। এই পত্রিকার মদনমোহন ডক্টরালকার লিখিতেন, ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৭৭২শকাব্দ) তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘স্বা শিক্ষা’ প্রকাশিত হয়।

১৯/২৮ ‘বাক্সলার ইতিহাস’ ১ম ভাগ রচনা করেন রামগতি স্মারক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে—আলিবর্দী খাঁর শাসনকাল অবধি; ২য় ভাগ রচনা করেন বিভাগাগর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল অবধি এবং ৩য় ভাগ রচনা করেন ডুদেব মুখোপাধ্যায় ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজনের শাসনকাল অবধি।

২২/৮ অবোধবন্ধু—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রচন্দ্র বোষ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্রে মিলিয়া এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হয়।

২৩/১৭ লালমোহন বিজ্ঞানিধির অলঙ্কার বিবয়ক পুস্তকটির নাম ‘কাব্যনির্ণয়’—‘অলঙ্কার নির্ণয়’ নহে।

২৩/২৩ স্রার রাসবিহারী বোষ (১৮৪৫-১৯২১) প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী এবং বঙ্কের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। আইন জ্ঞান লব্ধে ইনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্রার তারকনাথ পালিতের স্রায় ইনিও যোপার্জিত সমস্ত অর্থ দেশের বিজ্ঞান শিক্ষাকল্পে দান করিয়া যান। এই দুইজনের দানে কলিকাতার সারাস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। (২৭শে মার্চ ১৯১৪)।

২৪/৫ স্রার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় তাইস-চ্যান্সেলার, হাইকোর্টের বিচারপতি, শিক্ষাব্রতী এবং আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন।

২৪/২৪ আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৮৬২ হইতে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন।

২৪/৬-৭ ডঃ ত্রামুরেল জনসন : ইংরেজী অভিধানের সংকলক। জেমস বসগুরেল তাঁর কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়াছেন।

২৮/৪-৬ এ প্রসঙ্গে বাক্সা ভাষা ও সাহিত্য বিবয়ক বক্তৃতার রাজনারায়ণ বসুর উক্তি প্রশিধানবোধ্য :—‘অনেকে অবগত নহেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভাগাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম বিস্তর লেশোধন করিয়া দিতেন।’ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ‘অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাক্সা রচনার শিক্ষানবিশীকালে বিভাগাগর মহাশয় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অল্প অল্প

অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার “বাহু বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” গ্রন্থের আত্মোপাস্ত বিভাগের মহাশয় দেখিয়া দিয়াছিলেন।” (‘বিভাগাগর’, পৃ ১৮২)।

৩৮/২ রমাশ্রমাদি রায়—রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

৪৫/১১-১২ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদনের প্রথম রচনা ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক (৩ উহার ইংরেজী অনুবাদ) পাইকপাড়ার রাজারা মুদ্রিত করাইয়া দেন (জানুয়ারী ১৮৫২)।

৪৫/৩১ কালীশের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৬/৩ কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য উভয়েই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৪৬/১২ শব্দকল্পকর্ম—শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী যে সকল মহান কার্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, ‘শব্দকল্পকর্ম’ নামে বাংলা ভাষার এই বিরাট অভিধানটির রচনা ও সংকলন তাঁহার মহান জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

৪৮/২৩-২৫ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ‘Jesus Christ : Europe and Asia’ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; ইহার ফলে এই ধারণার সৃষ্টি।

৪৮/২৬ সোমপ্রকাশ—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত এই সাময়িক পত্রিকাটি তৎকালীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্বোচ্চশ্রেণীর পত্রিকা ছিল।

৫৪/পাদটীকা—‘সদর্থ...প্রভাবর’ স্থলে ‘সদর্থ...প্রভাকরঃ’ হইবে।

৫৭/৩ অক্ষয়কুমার দত্ত আমিষ খাত্ত অপেক্ষা নিরামিষ খাত্ত অধিকতর উপকারী বলিয়া স্থির করেন এবং নিজেও আমিষ গ্রহণ বন্ধ করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে নৌকায় করিয়া বহুদিন গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে এবং শামুক-গুগুলির ঝোল খাইতে বাধ্য হন। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া কবি ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন—

মাথামুণ্ডে বুয়ে গেল মাথামুণ্ডে লিখে।

ফিরে নদে শান্তিপুর, ফিরিয়া ছগলি।

শেষ করিয়াছ যত দেশের গুগুলি।

৬১/৮ নিক—এই প্রসঙ্গের আলোচনা ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬৪/৪-৫ রিচার্ডসনের মুখ সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া মেকলে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন : ‘I can forget everything of India but your reading of Shakespeare.’

৬৪/১১ রাঁজেন্দ্রলাল দত্ত—প্রকৃত নাম রাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬৪/২৪-২৫ সেক্সপীয়রের ২০ নং সনেটটি—

A woman's face, with Nature's own hand painted, Hast thou,

the Master-Mistress of My passion, ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন তাঁর Literary Leaves গ্রন্থে একরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন—  
'One of the most painful and perplexing (poems) I ever read...I could heartily wish that Shakespeare had never written it.'

৭৩/২৫ শ্রুত ভাষ্যা শ্রুতব...শ্লোকটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ১১১ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

৮০/১৪-১৬ ধীরাজ—বর্ধমান রাজসভার গায়ক ছিলেন। 'ধীরাজ' আসলে মহারাজ প্রদত্ত উপাধি, এই নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আসল নাম এখন ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। তিনি কলিকাতার অভিজাত মহলেও গান শুনাইতেন।

৮৩/৩ 'একটিকে লক্ষ্য করিয়া' স্থলে 'এইটিকে লক্ষ্য করিয়া' হইবে।

৮৪/২৫ প্যারীমোহন কবিরত্ন (১৮৩৪-৭৫): ইনিও ধীরাজের ছাত্র হস্তাঙ্কক কবিতা ও গান রচনায় পটু ছিলেন এবং ধীরাজের ছাত্র ইহারও 'কবিরত্ন' উপাধি বর্ধমানের মহারাজা মহতাপচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত। তাঁর আধ্যাত্মিক গানের মধ্যেও প্রচুর হস্তরল ছিল—

ওরে মন, তোমায়ে আজ বাড়ে কাল ভবে পটল তুলতে হবে।

এখনও উপায় আছে—ভেবে নে ভবানী ভবে ॥

কোথা থাকবে বাড়ি-ঘড়ি, পড়ে গড়াগড়ি যাবে।

গালপাট্টা কটা গোঁফে কে আতর মাখাবে ॥

পোমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বলে যবে।

বিধুমুখে নিধুর টপ্পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে ॥ ইত্যাদি

৮৬/৯-১০ Auld Lang Syne—ইহা স্কটল্যান্ডের একটি পরিচিত লোক-সঙ্গীত। ইহার অর্থ: 'in days gone by' অর্থাৎ ফেলে আসা দিনগুলি বা হারানো দিনগুলি। বর্তমানে ইহা ব্রিটিশ দীপপুঞ্জের সর্বত্র বিদ্যায় অল্পঠানের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত হিসাবে গীত হয়। যে গানটি অধিক প্রচলিত তাহা রবার্ট বার্নস্ (১৭৫৯-১৭৯৬)-এর রচিত। গানটির প্রথম স্তবক নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

Should auld<sup>১</sup> acquaintance be f. rgot,

And never brought to mind ?

Sould auld acquaintance be forgot,

And auld lang<sup>২</sup> syne<sup>৩</sup> !

( কোরাস ) For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,

We'll tak a cup O' kindness yet

For auld lang syne.



এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘পুরানো সেই দিনের কথা...’ এবং বিশ্বেশ্বরলাল রায়ের ‘পুরাণ প্রেমকো নহি যাও ভাইয়া হো...’ ( আৰ্য্যগাথা ২য় ) ত্রুটব্য ।

৮৭ / ১১ ঢেক ফাজিল—‘ওজনে পাল্লার ঝোঁকতা দিকের পরিমাণ কম করিয়া দুই দিক সমান করা ।’

৮৭ / ৩১-৩২ তদানীন্তন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান নীলাচর মুখোপাধ্যায়ের পিতা পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিহারীলাল চক্রবর্তীর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন ।

৯১ / ২৮-৩০ গাধের আসন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাঞ্চনদেবী বিহারী-লালের সারদামঙ্গল পাঠ করিয়া প্রকার্য্য হিসাবে একখানি আসন নিজ হাতে বুনিয়া কবিকে দান করেন । ঐ আসনে সারদামঙ্গল হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত ছিল—

‘হে যোগেন্দ্র যোগাসনে

তুলুতুলু দু নয়নে

বিশ্বের বিহ্বল মনে

কাহারে ধোয়াও ?’

এবং আসনটি প্রদানকালে আসনদাত্রী ইহার উত্তর কবির নিকট হইতে চান । কাঞ্চনদেবীর মৃত্যুর পর ( ১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৯ ), তাঁহার স্মরণে বিহারীলাল এই ‘গাধের আসন’ রচনা করেন ১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে ।

৯৩ / ১৪ কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়—ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ( ১৮৬৫-১৯৪৮ ) পিতা ।

৯৩ / ২৯ অমরকোষ—মহারাজা বিজয়াদিত্যের ‘নবরত্ন সভা’র সভ্য অমর সিংহ অমরকোষ নামে এই অভিধানটির রচয়িতা । এই অভিধানটি তিন কাণ্ডে ও অষ্টাংশবর্গে বিভক্ত । মল্লিনাথ, ভরত মল্লিক প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকাররা এর টীকা রচনা করিয়াছেন ।

৯৮ / ৭ Falstaff—লেক্সপীয়ারের Merry Wives of Windsor নাটকের একটি হাস্যোদ্বীপক চরিত্র ।

৯৮ / ২৩-২৪ উদ্ভিষ্ট ব্যক্তিটি হলেন ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন । পরবর্তী ১৫৩ পৃষ্ঠায় উমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি স্মরণ্য ।

৯৯ / ২-৫ স্রাব তারকনাথ পাণ্ডিত দুই দফার ( জুন ১৯১২ ও অক্টোবর ১৯১২ ) অর্থ ও সম্পত্তি মিলিয়ে পনেরো লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন । প্রধানত তাঁহার ও স্রাব রাসবিহারী বোষের দানে ‘University College of Science and Technology’ প্রতিষ্ঠিত হয় ( ২৭শে মার্চ ১৯১৪ ) ।

৯৯ / ২৬ টীকাকার মল্লিনাথ—একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার । ইঁহার প্রকৃত নাম কোলাচল মল্লিনাথ । ডাক নাম পেড্ড ভট্ট । খুব সস্তব ইনি দ্বাশিখাত্যবাসী ছিলেন । ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিত্তি, দর্শন, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রেরই

ইনি চাঁকা লিখিয়াছেন এবং ইহাতেই ইংহাৰ বিশেষ অভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় পাওয়া যায় ।  
চাঁকাৰ ব্যাপাৰে ‘মজিনাথ’ নামটি উপৰা হইয়া রহিয়াছে ।

১০৪/১৫ পণ্ডিত যোগাধ্যান মিশ্ৰ সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ শাস্ত্ৰের অধ্যাপক ছিলেন ( ১৮২৬-৪২ ) ।

১০৪/২২ তিনজন পণ্ডিতের অন্ততম ছিলেন নাথুৰাম শাস্ত্ৰী । অপর দুজন পণ্ডিতের নাম প্ৰেমচাঁদ ভৰ্কবাগীশ ও পানিনী শ্ৰেণীৰ অধ্যাপক গোবিন্দরাম উপাধ্যায় ।

১০৬/৩১ ‘পল-বৰ্জিনিয়া’ অম্ববাদ সম্বন্ধে যবীশ্ৰনাথ তাহার ‘জীবনস্মৃতি’ গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন—

‘অবোধবদ্ধ কাগজে বিলাতি পৌলবৰ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অম্ববাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই । আহা, সে কোন্ সাগরের তীর ! সে কোন্ সমুদ্রসমীৰকম্পিত নারিকেলের বন ! ছাপ্পল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা ! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দার দুপুরের রোদ্দে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীৰ্ণ হইত । আর সেই মাথায় রঙিন ক্ৰমাল-পরা বৰ্জিনীৰ সঙ্গে সেই নিৰ্জন দীপের শ্ৰামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কি প্ৰেমই জন্মিয়াছিল ।’

১২১/১৫ একবার হিন্দুকলেজের কতিপয় ছাত্র মিশনারীদের দ্বারা প্ৰদত্ত বাইবেল গ্ৰহণ করে । ডেভিড হেয়ার তাহা জানিতে পাবিয়া সেই সব বাইবেলগুলি হস্তগত করিয়া প্ৰত্যেককে বারো ঘা করিয়া বেজাঘাত দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেন ।

১২৩/২৬ বরাহমিহির—মহারাজ বিজয়াদিত্যের নবরত্ন সভার অন্ততম রত্ন ছিলেন পণ্ডিত বরাহমিহির । ইনি জ্যোতিষী ছিলেন ।

১২৩/৩০ বিবুৰ সংক্ৰমণ সম্বন্ধে শ্ৰীমদ্ভাগবতের মত এই—

“যদা মেঘতুলয়োৰ্ভৰ্ত্ততে তদা অহোৰাত্ৰাণি সমানানি ভবন্তি ।

যদা বৃষভক্ষিষু পঞ্চম্ চ রাশিষু চরতি তদাহোন্ত্যে বৰ্দ্ধন্তে ।

ত্বন্তি চ মাসি মাস্তেকৈকা ঘটিকা রাজিষু ॥ ৪ ॥

যদা বৃশ্চিকারিষু পঞ্চম্ রাশিষু বৰ্জতে তদাহোৰাত্ৰাণি বিপৰ্য্যয়াণি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

শ্ৰীমদ্ভাগবত—স্কন্ধ ৫ । অধ্যায় ২১ ।

অৰ্থাৎ—

সূৰ্য মেঘ ও তুলা রাশিতে উপস্থিত হইলে দিব্যরাত্রি-মান সমান হইয়া থাকে । বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, সিংহ ও কন্যা রাশিতে অবস্থান পৰ্যন্ত দিব্যমান বড় এবং বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন রাশিতে থাকা পৰ্যন্ত রাত্রিমান বড় থাকে ।”

অমরকোষ বলিতেছেন—

“সমরাত্রিক্ৰিবে কালে বিববন্ বিবুবঞ্চ তৎ ।”

—‘যখন দিব্যরাত্রি সমান, তখনই বিবুৰ সংক্ৰমণ হইয়া থাকে ।’

উপরি উল্লিখিত প্ৰমাণসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূৰ্বে বিবুৰ সংক্ৰমণের পক্ষনা

যে রূপ হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। এখন ৩১শে চৈত্র মহাবিশুব সংক্রমণ পঞ্জিকায় লিখিত হইলেও দিব্যরাত্রি সমান হয় ৮ই চৈত্র। এবং ঐ দিনটিকেই মহাবিশুব সংক্রান্তি বলা উচিত। মহাবিশুব সংক্রান্তিতে দিবা ও রাত্রি সমান হয় এবং সেই দিন হইতে দিব্যমান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়।

১২৪/১৬ মন্ত্রযুগ ও ব্রাহ্মণযুগ—বৈদিকযুগই মন্ত্রযুগ নামে পরিচিত। কারণ ঐ সময়ে ঋষিরা যজ্ঞ-ক্রিয়াদির অহুষ্ঠানে মন্ত্রের ব্যবহার করিতেন। ইহার পরবর্তী যুগ ব্রাহ্মণ যুগ নামে পরিচিত।

১২৪/২৫ বশিষ্ঠ মূনির পুত্রের নাম শক্তিদ্র।

১৫০/১২ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে ‘বিদ্যালয়’ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা ‘হিন্দু কলেজ’ বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকে। মাত্র কুড়ি জন ছাত্র লইয়া শুরু হইয়াছিল এই বিদ্যালয়তন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, পাণ্ডুরিয়াবাটার ঠাকুরবাড়ী এবং বিখ্যাত প্রাচ্যবিজ্ঞা বিশারদ ডঃ হোরেস উইলসন প্রভৃতি কয়েকজন হৃদয়বান ইংরেজ। সর্বোপরি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জাহুয়ারী প্রথম শুরু হইয়াছিল এবং ‘হিন্দু কলেজ’ রূপে ছারোন্সবাটন হয় ১লা মে ১৮২৬। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে ১০১ জন ছাত্র লইয়া ইহা ‘প্রেসিডেন্সী কলেজ’ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

১৫০/৭-৮ প্রথমে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্ত তৎকালীন শাসক-সম্রাটর মোটেই উৎসাহিত ছিলেন না। যদিও ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা বলিয়াছিলেন, ‘It is human, it is generous to protect the feeble ; it is meritorious to redress the injured ; but it is a God-like bounty to bestow expansion of intellect to infuse the Promethean spark into the statue and awaken it into a man.’—কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে এদেশে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্ত সচেষ্ট হন নাই। প্রধানত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা বেসরকারী উদ্যোগে এদেশে প্রথম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু উহা এদেশীয় (এবং শাসক-সম্রাটর) অনেকের মনঃপুত ছিল না। তাঁহার্য দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারের শিক্ষা বিভাগেও এইরূপ দুই দল ছিল (Anglicist ও Orientalist)। অতঃপর লর্ড টমাস বেবিন্সন মেকলে ভারত সরকারের আইন-সচিব হইয়া এদেশে আসেন (১৮৩৪) এবং অ্যাংলিসিস্ট দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড বেকিঙ্গের নিকট এদেশে শিক্ষার বাহন কি হইবে তৎসম্পর্কে এক মন্তব্য পেশ করেন। ইহাতে তিনি প্রাচ্য সাহিত্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করিয়া (‘a single shelf of good European Library is worth the whole native literature of India and Arabia’) ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করিবার জল্প সুপারিশ করেন। তাঁহার মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া সপরিবার লর্ড বেকিঙ্গ সরকারের নূতন নীতি ব্যক্ত

করেন ( ৭ই মার্চ ১৮৩৫ ) । নূতন নীতি অনুযায়ী স্থির হয়,—‘the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India, and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. His Lordship in Council directs that all the funds...be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literature and science through the medium of the English language.’

এই নীতি চালু হইবার পর লর্ড মেকলে তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন, ‘It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence...I heartily rejoice at the prospect.’ তিনি অল্পকাল প্রকাশে বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে এদেশে ‘a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect’-এর উদ্ভব হইবে ।

১৬০ / ২১ ১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে ( পৃ: ৪২৬ ) এই স্থানে রহিয়াছে, “আচার্য্য দত্ত মহাশয় চুপ করিলেন । আমি বলিলাম—‘বীটসনের পদে আপনি উন্নত হইলেন, এই পর্য্যন্ত কাল বলিয়াছেন ; তারপরে ?’

১৬৩ / ২৯-৩১ কোম্পানীর আমলের ও crown আমলের সাহেব কর্মচারীদের ভিন্ন প্রকৃতির জন্ত রাজনারায়ণ বসুর ‘সে কাল আর এ কাল’ ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ ) পৃ: ২-৭ এবং ১১-১২ দ্রষ্টব্য ।

১৬৯ / ২৮ হৌদল কুংকুং—দীনবন্ধু মিত্রের ‘নবীন তপস্বিনী’ নাটকের জলধর চরিত্র দ্রষ্টব্য ।

১৬৯ / ২১ হিন্দু পাট্রিয়ট—শ্রীনাথ ঘোষ, ক্ষেত্র চন্দ্র ঘোষ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই তিন ভাইয়ের সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই ইংরেজী পত্রিকাটি প্রকাশ করেন ।

১৮০ / ১৮ ‘বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিবরণ প্রস্তাব’-এর লেখক রামগতি স্মারকদ্বয় হুগলীর ইলছোবা মণ্ডলাই স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন ।

১৮৩ / ৯ রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যালয়গর সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন । ইহার রচিত পুস্তকের নাম—কুলরহস্য, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-শতকং, বর্গসভা বিলাস ও শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন ।

১৮৫ / ২৩-২৪ ভারত সরকার অভিযোগ করিল যে, বরোদার গায়কোরাড় মহারাজ ( বা মাধব ) রাজ্যের প্ররোচনার বরোদার তৎকালীন রেসিডেন্ট কর্নেল ফেরার ( Col. Phayre )-কে বিব খাজানাইবাধি দেটা করা হইয়াছে ( ২ই নভেম্বর, ১৮৭৪ ) । এই

ব্যাপারে অহুসন্ধান করিবার জন্য ভারত সরকার এক কমিশন নিয়োগ করে। বিচারের জন্য মলহার রাওকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মলহার রাও গদাঁচ্যাত হইলেন ( ২৩শে এপ্রিল ১৮৭৫ ) এবং মাদ্রাজে নির্বাসিত হইলেন। সেখানে অসহায় অবস্থায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৮৬/১৫ ভাস্কর ও রসরাজ—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ওরফে গুড়গুড় ভট্টাচার্যের প্রকাশিত ‘সংবাদ-ভাস্কর’ ও ‘সংবাদ-রসরাজ’ এই দুই সংবাদপত্রের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘পাষও পীড়ন’ সংবাদপত্রের ব্যঙ্গ-বিজ্ঞাপাত্মক রচনা ও চিত্র প্রকাশ দ্বারা সাহিত্যিক লড়াই চলিত।

১৮৯/১১-১২    স্নেহে দ্বিভেদ নেই,                    আধ-ভাবী শিশু নেই,  
পরীক্ষা-সময়ে আজি জয়ী বিদ্যাবীর।  
দুঃখনের অন্ধ আলা,                    করে দুটি চাকবালা,  
পেয়েছে পিতার বিজ্ঞা দ্বিভেদ স্নেহীর।  
স্নেহে পণ্ডিত প্রায়,                    পণ্ডিতের দুহিতায়  
ভাৰ্গাভাৰ্গে লভিয়াছে আপনার ভাগে।  
দ্বিভেদ মার্জন সাব,                    বিদ্যাসনে বৈজ্ঞানিক  
বয়সিয়াছে বয়াননী তারে অল্পরোগে।

—অমৃতলাল বসু ( লোকনাথ মৈত্র )

১৮৮/১৯ Wards' Institution :—এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারদের উন্নত ধরনের শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার ডিরেক্টর ছিলেন—প্রতিষ্ঠাতা নন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তনটি বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে ‘Wards' Institution Street’ কলিকাতার বৃক্কে ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

২৩৯/৪০ “নাইক আর...সামনে আলবোলা” : মহেন্দ্রনাথ দত্তের ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ ( ১ম সং ) পৃ ১৫-১৬ ( ‘কড়ির কথা’ ) উল্লেখ্য।

২৪০/১৯ তরঙ্গ গানের প্রথম প্রবর্তকের নাম হোসেন খাঁ। এই গানে প্রায়ই পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে হেরালির মত প্রয়োগ করা হইত। এবং প্রতিপক্ষকে তাহার চটপট উত্তর দিতে হইত। উত্তর দিতে না পারিলে তাহার পরাজয় হইত।

২৪১/২ রূপচাঁদ পক্ষী—আসল নাম রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র ( জন্ম ১৮১৫ )। ইং’হার কালের নাম ছিল ‘পংকীর দল’। আখড়ার তাহার দলের সভাপতি পাণ্ডিত্যের মত দাঁড়ে বা খাঁচার অবস্থান করিত। রূপচাঁদ ( ইংরেজীতে ইনি R. C. D. Bird নামে পরিচিত ছিলেন ) কলিকাতার লোকদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খাঁচার অল্পরূপ এক গাড়ি তৈরী করাইয়া সারা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার রচিত গান সে সময়ে খুব পরিচিত ছিল। ইংরেজী বাংলায় রচিত দ্ব্যর্থক বিরহ-বিলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য—

আমারে ব্রহ্ম করি কালিয়া ডায়াম তুই কোথা গেলি ।  
আই অ্যাম ফর ইউ ভেরি সরি গোল্ডেন বডি হোল কালি ।

হো মাই ডিম্বার ডিম্বারেস্ট,  
মধুপুর তুই গেলি কেই  
ও মাই ডিম্বার, হাউ টু-রেস্ট  
হিম্বার ডিম্বার বনমালী ।

শুনরে শ্রাম তোরে বলি ।  
পুরোয় ক্রিচার মিক্ গেল্,  
তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল,  
ননসেল তোর নাইকো আক্কেল,  
ব্রিচ অফ্ কনট্রাষ্ট করলি,  
ফিমেল গণে ফেল করলি ।  
লম্পট শঠের ফরজুন খুললো,  
মধুরাতে কিং হলো,  
আক্কেলের প্রাণ নাশিল,  
কুজার কুঁজ পেলে ডালি,  
নিলে দানীয়ে মহিবী বলি ।  
শ্রীনন্দের বয় ইয়ং ল্যাড  
ক্রুকেড মাইও হার্ড,  
কহে আর সি ডি বার্ড,  
এ পেলাকার্ড কুম্ভকেনী ।  
হাফ ইংলিশ হাফ বেঙ্গালী ।

রূপচাঁদ কেবলমাত্র হাসির গানই রচনা করেননি, ধর্ম-বিষয়ক গান রচনাতেও তিনি  
সিদ্ধহস্ত ছিলেন—

ভাঙলো না তোর মারার ঘুম ।  
বিষয় মদে চক্ষু মদে শুয়ে আছ বেমানুম ।  
ঐশ্বর্ষের মাৎসর্ঘে তুমি মনে করো বামশা-রুম ।  
এ প্রপঞ্চ একসাজ সেজেছে, ঠিক যেন তাই হাথুমথুম ।

ইত্যাদি—

২৪৯ / ৫-১০ ১৮৬৭ সনের ২রা নভেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা  
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়ীতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়  
প্রণীত “কিছু কিছু বুঝি” নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয় । এই প্রহসনটি  
পাখুগিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত “বুঝলে কি না” প্রহসনের অঙ্করণে রচিত ।  
‘এই’ প্রহসনের মূখবন্ধে লেখক বলিতেছেন, “কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষ-বুঝ

অভিনয়ার্থে ক্রোশাচার সংশোধন-বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাদের প্রস্তুত করিতে বলায় হুয়াসেবন, ইন্ডিয়নপতঙ্গতা, অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাদিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি কয়েকটি প্রস্তাবে এই ‘কিছু কিছু বুঝি’ প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম।” লেখক নিজের উদ্দেশ্য সঘর্ষে এই কৈফিয়ত দিলেও পুস্তকখানির বিষয়বস্তু বিস্তৃত সমাজ সংস্কার নয়। যে কোন কারণেই হউক, প্রহসনখানির সর্বত্র পাখুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল। প্রহসনখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত করিবার সময় এই সকল অংশের অনেক বর্জন করা হয়; বিশেষ করিয়া দস্তবকের চরিত্র ঘাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—তাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই। এই অভিনয়টি এক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য। ইহাতেই সর্বপ্রথম অর্ধ-নৃশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস স্মর, একজন অভিনেতা হিসাবে ও আর একজন রঙ্গমঞ্চ-ধ্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হন।

—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ৫ম

সং ) পৃ ৬০-৬১

২৯৬/২১-২৪ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে Captive Lady প্রকাশিত হইলে (এপ্রিল, ১৮৪২) মধুসূদন তাহার এক খণ্ড বাল্যবন্ধু গৌরদাস বলাকের মাধ্যমে বেখুনকে উপহার দেন। বেখুন ধন্তবাদ জানাইয়া গৌরদাসকে এক পত্র লিখিয়া ( ২০ শে জুলাই ১৮৪২ ), মন্তব্য করেন, ‘...It seems an ungracious return for his ( মধুসূদন দস্তের ) offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry .....he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.’

৩০৯/১৯ মাধাঘবা গলি—‘গণেশ টকীজ’ সিনেমা গৃহের পার্শ্ববর্তী তারাসুন্দরী পার্কের সন্নিহিত রাস্তাটিই মাধাঘবা গলি নামে বিখ্যাত ছিল। মাধাঘবা সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দস্তের ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ (১ম সং) পৃ ১২-২০ ( ‘সেয়েসের মাথা ঘসা’ ) ত্রুটিব্য।

৩১০/১ মালৌর বাগান—বিজন ষ্ট্রীটস্থ অনাথ বাবুর বাগান ও বিজন ষ্ট্রীট পোস্ট অফিসের উত্তরে ( অর্থাৎ হজিরাডার দক্ষিণ-পশ্চিমে ) অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলে বীশাপানি পর্ণা পাল’ন স্থল অবস্থিত।

## গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। অকল্যাণ্ড, লর্ড (George Eden, Earl of Auckland—১৭৮৪-১৮৪২) : ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের শাসনকর্তা রূপে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল এদেশে আসেন। তাঁহার শাসনকালীন ১ম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২) উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ এদেশ ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন।

২। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮) : মিহিরচন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আন্দুলে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। “ভারতী” পত্রিকার শুরু হইতে সম্পাদকীয় মণ্ডলীর অন্ততম সভ্য হন। জী, সাহিত্যিক শরৎকুমারী চৌধুরাণীও “ভারতী”র সহিত জড়িত ছিলেন। ‘উদাসিনী’ (১৮৭৪), ‘সাগর সন্ধ্যা’ (১৮৮১) ও ‘ভারত-গাথা’ (১৮৯৫) নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংহার রচিত কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র স্থান পাইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়।

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) : পীতাম্বর দত্তের পুত্র অক্ষয়কুমার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই নবদ্বীপের নিকটবর্তী বর্ধমানের চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর পিতার মৃত্যুর জন্য স্কুলত্যাগ করিতে হয়। এই সময় ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে আসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ (১৮৪০) প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বিভাগ্যবশত স্থপারিশে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ কৃত্তিষ্কের সহিত সম্পাদনা করেন। রচনাবলীর মধ্যে স্কুলপাঠ্য ‘ভূগোল’ (১৮৪১), ‘চাকরাঠ’ ১ম-৩য় ভাগ (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯), ছাড়াও ‘বাহুবল্লভ সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ ১ম ও ২য় ভাগ, ‘ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব’, ‘পঞ্চার্ঘ বিভা’ (১৮৪৬), ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৭০ ও ১৮৮৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ‘বাহুবল্লভ’ ১ম ভাগে আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং ২য় ভাগে মত্তপানের বিরুদ্ধে লেখেন। ১৮৮৬ সালের ২৮শে মে মৃত্যু হয়। ইংহার পৌত্র অনামমন্ত কবি লত্যানন্দনাথ দত্ত।

৪। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) : সাহিত্যিক গদ্যচরণের পুত্র— ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে ওকালতি শুরু করেন। ‘সাধারণী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিন বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ‘প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ’ (১৮৭৪-৭৭), ‘গোচারণের ষাঠ’ (১৮৮০), ‘আলোচনা’ (১৮৮২) ‘কবি হেমচন্দ্র’ (১৯১১),



‘রূপক ও রহস্য’ (১৯২৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১৭ সালের ২রা অক্টোবর মৃত্যুস্থলে পতিত হন।

৫। **অজিতনাথ জ্যাম্বরঙ্গ, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩২-১৯২০)**: নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের উত্তর পুরুষ। স্বভাব কবি—কৃত কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রচনাবলীর মধ্যে কাশীখণ্ডের বাংলা অম্ববাদ, চৈতন্ত শতক, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতির অন্তর্ভুক্তির নাট্য-পরিশিষ্টের টীকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক ‘বিশ্বদূত’ পত্রিকার সম্পাদক।

৬। **অমুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২২-১৮৭১)**: দেওয়ান বৈজ্ঞানিক মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া হাওড়া কোর্টদারী আদালতে নাজীর হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্রীডার হন। দায়কানাথ মিত্র পরলোক গমন করিলে পর তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। মাত্র বিয়ান্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭। **অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২২)**: কলিকাতায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা, কৈলাচন্দ্র বসু, গৌরমোহন আচ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কল্লিয়াটোলা স্কুলে (বর্তমান ‘শ্রামবাজার এ. ভি. স্কুল’) শিক্ষা শুরু হয়; ১৮৬৯ সালে জেনারেল এসেমব্লি ইনস্টিটিউশন হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। পরীক্ষা দিবার পূর্বেই পনের বছর বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতে ভাস্কর্য্যের দিকে প্রবণতা ছিল বলিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন কিন্তু মাত্র দুই বছর অধ্যয়ন করিয়া কলেজ ছাড়িয়া দেন। ইহার পূর্ব হইতে হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন এবং এ কারণ কাশীতে পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্রেয় কাছে বহুদিন ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঘটনাচক্রে শ্রাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়-রজনীতে (৭. ১২. ১৮৭২) ‘নীলকর্ণণ’ নাটকে সৈরিন্দীর ভূমিকায় অবতরণ করেন। নট-জীবনে বহু রঙ্গালয়ে অংশ গ্রহণ করেন। বাল্যকালের প্যারডি রচনা বাদ দিলে, ‘মডেল স্কুল’ নাটক তাঁহার প্রথম রচনা—ইহা শ্রাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ‘দীরকর্ষ’ নাটক’ (১৮৭৫), ‘চাটুজ্যে ও বাডুঘো’ (১৮৮৪), ‘বিবাহ বিজ্ঞাপন’ (১৮৮৪), ‘অমৃত-মদিরা’ (১৯০৩), ‘খাস-দখল’ (১৯১২), ‘যাজ্ঞলেনী’ (১৯২৮), প্রভৃতির নাম করা যায়। যিঃ স্কোবল (দীরকর্ষ), কৃষ্ণকান্ত (কৃষ্ণকান্তের উইল), নীলকমল (সয়লা), নিতাই (খাসদখল), রমেশ (প্রফুল্ল), বিহারী খুড়ো (তরুণা) প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯২৩) ছিলেন। প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ‘জগদ্রাশী স্বর্ণপদক’ পান। ১৯২৯ সালের ২রা জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

৮। **অম্বিকাচরণ ঘোষ** ( ১৮৩০-১৮৫০ ) : গদাধর ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতা-মাতা উভয়কে হারান। জের বৎসর বয়সে বিদ্যালয়শিক্ষার জন্য কলকাতার কলেজে ভর্তি হন এবং অল্পকালের মধ্যে কৃতী ছাত্র বলিয়া স্বীকৃতি পান। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৯। **অর্ধেন্দুশেখর মুন্ডকি** ( ১৮৫০-১৯০২ ) : বঙ্গালয়ের ‘মুন্ডকি শাহেব’ ১৮৫০ সালের জাহ্নগারি মাসে বাগবাঙ্গারে জন্মগ্রহণ করেন। অমৃতলাল বসুর সতীর্থ ও পাখুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিলতুতো ভাই। সন্তের বৎসর বয়স হইতে অভিনয় শুরু করেন। বাংলাদেশের সাধারণ বঙ্গালয়ের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও পথিকৃত এবং একাধারে নট ও নাট্যচার্য। কোঁতুক ভূমিকায় অতুলনীয় অভিনয় করিতেন। গুরুগম্ভীর ভূমিকায়ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশ ( প্রমুখ ), আবুহোসেন ( আবুহোসেন ), রডা ( প্রতাপাদিত্য ), বিভাদিগঙ্গ ( দুর্গেশনন্দিনী ), উড নাহেব ( নীলদর্পণ ), বিদ্বক ( জনা ) প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

১০। **অ্যাডাম, উইলিয়ম** : স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাত্রী হইয়া ভারতে আসেন। রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিতি হইবার ( ১৮২১ ) পর খ্রীষ্টীয় ত্রিশবাব্দে পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হন। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিবার জন্য উইলিয়ম বেকিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং অহুসন্ধানের ফলাফল ( এডুকেশন রিপোর্ট ) তিনখণ্ডে ( ১৮৩৫-৩৮ ) সরকারের নিকট পেশ করেন।

১১। **অ্যাডিসন, জোসেফ (Addison, Joseph—১৬৭২-১৭১৯)** : বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও প্রবন্ধকার। প্রথমে ( ১৭১১-১২ ) সার রিচার্ড স্টিলের সহযোগিতায় দৈনিক স্পেক্টেটর সম্পাদনা করেন। পরে ( ১৭১৪ ) একাই ইহার সম্পাদনা করিতেন।

১২। **আদিশ্বর** : গৌড়াধিপতি আদিশ্বর বাঙ্গলার সেন রাজস্ববর্গের আদিপুরুষ। তিনি ‘বীরসেন’ ও ‘সুরসেন’ নামেও খ্যাত ছিলেন। কান্তকূজাধিপতি সাহসান্দের সমকালে বা কিছুকালের কালে তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়াই প্রসঙ্গিত হয়। সাহসান্দের রাজ্যকাল খ্রীঃ ২০০ ( ৮২০ শক ), এবং আদিশ্বরও উক্ত সময়ের কিছুকাল পরে অর্থাৎ খ্রীঃ ২২৪ ( ৯৪৪ শক ) সম্ভবত রাজত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে রাষ্ট্রী ও বারেন্দ্র শ্রেণী এবং কারস্থগণের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় শ্রেণীবিভাগ তাঁহার সমসাময়িক কালেই প্রবর্তিত হয়। আদিশ্বর দুইবার দুই বিরাট যজ্ঞ করেন। প্রথম যজ্ঞ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে তিনি যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহারাও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে খ্যাত হন এবং পরবর্তী দ্বিতীয় বার কান্তকূজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনা হইয়া পুণ্ড্রীক যজ্ঞ সম্পাদিত করেন, তাঁহারাও গৌড়ে রাষ্ট্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে পুরা. ২২

পরিচিতি লাভ করেন। বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীহর্ষ আদিশুর কর্তৃক কাশ্যকুঞ্জ হইতে নীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্ততম ছিলেন।

১৩। **আনন্দচন্দ্র শিরোমণি** (১৮০২-১৮৮৭) : ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কানীনাথ বিজ্ঞানচম্পতিয় পুত্র। বাল্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও নাট্যশাস্ত্র যত্নের সহিত শিক্ষা করেন। গ্রাম্যশাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তৎকালীন কবি ও পাচালীকারদের অন্ততম। স্ববলসংবাদ, উদ্ধবলংবাদ, কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

১৪। **আব্দুল জব্বার, নবাব বাহাদুর** (১৮২৮-১৮৯৩) : ইংহার কোন এক পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে তুরস্ক হইতে বাংলায় আসিয়া ফরিদপুরে বসতি স্থাপন করেন। পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারজাবী ছিলেন। বাল্যে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার পুলিশ কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটরূপে যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। পরে ভোপালের প্রধানমন্ত্রী হন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, মুসলমান লিটারারি সোসাইটি প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৫। **আশুতোষ দেব (ছাডুবা)** (১৮০৫-১৮৫৬) : বিত্তশালী ব্যবসায়ী রামজলাল দেব সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলির দেবনাগরী হইতে বাংলায় লিপ্যন্তর করিবার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যালোসিয়েশনের অন্ততম সভ্য। সে যুগে সজ্ঞীত ও রক্ত-মঞ্চের একজন উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু টপ্পা গান রচনা করেন। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম জুরী নির্বাচিত হন।

১৬। **ইডেন, সার অ্যাশলী** (Eden, Sir Ashley—১৮৩১-১৮৮৭) : যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সার অ্যাশলী ইডেনের পূর্বপুরুষ ও লর্ড অকল্যাণ্ড (লর্ড ইডেন)-এর ভ্রাতৃপুত্র। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন। ১৮৬২-৭১ পর্যন্ত বঙ্গ সরকারের সচিব ছিলেন। পরে বাংলার শাসনকর্তা হন (১৮৭৭-৮২)। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মারা যান।

১৭। **ইয়ং, গর্ডন** (Young, William Gordon) : ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের Education Despatch-এর নির্দেশমত পূর্বভূমি শিক্ষা-সভা (Council of Education)-র স্থলে শিক্ষা অধিকার (Directorate)-এর স্থিতি হইলে গর্ডন ইয়ং ইহার প্রথম শিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবধি ফেলো ছিলেন। ইনি একজন সিতিলিয়ান।

১৮। **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত** (১৮১২-১৮৫৯) : জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া (নদীয়া)। অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত, পুনরায় দ্বার পরিগ্রহ করিলে জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন। যুগান্তকারী ‘সংবাদ প্রভাকর’ ছাড়াও আরো ভিন্‌ভি

পত্রিকা (সংবাদ রত্নাবলী, পাঁচও শীড়ন ও সংবাদ সাধুরঞ্জন) সম্পাদনা করেন। রত্নলাল, বক্সিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার ইত্যাদি প্রমুখের সাহিত্যিক জীবনের হাতেখুড়ি তাঁহার পত্রিকাধ। তাঁহার রচিত ‘কবির ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত’ (১৮৫১), ‘প্রবোধ প্রভাকর’ (১৮৫৮), ‘কবিতাসংগ্রহ’, রামপ্রসাদ সেনের ‘কালীকীর্তন’-এর সম্পাদনা প্রভৃতি এবং পুরাতন কবিদের (যথা রামপ্রসাদ সেন, নিখুবাবু, হর ঠাকুর, রাম বহু প্রভৃতির) জীবনী ও রচনা উদ্ধার উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৯ সালের ২৩শে জাগুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয় (বল্লভ্যাপাধ্যায়) (১৮২০-১৮৯১) : ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে পিতা ঠাকুরদাস বল্লভ্যাপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতায় আসেন এবং ১৮৩৯ খ্রিঃ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪১ খ্রিঃ পাঠ সমাপন করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন এবং উক্ত বৎসরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক হন (১৮৪৬) ; অবশ্য সম্পাদকের সহিত মতান্তর ঘটায় কলেজ ত্যাগ করিতে হয় (১৮৪৭)। পরে আবার সংস্কৃত কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং প্রথম অধ্যাপকরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কার করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাস (১৮৫৬) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যালয় কলেজ) ও হিন্দু ফ্যামিলি অ্যাসোসিয়েশন ফাও প্রতীষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭), ‘বাল্মীকির ইতিহাস’ ২য় (১৮৪৮) ‘বোধোদয়’ (১৮৫১), ‘উপক্রমণিকা’ (১৮৫১), ‘ঋজুপাঠ’ ১ম-৩য়, ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’, ‘শকুন্তলা’ (১৮৫৪), ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬০) ‘ভ্রান্তিবিলাস’ (১৮৬৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

২০। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (১২৩৮-১২৬৭ বঙ্গাব্দ) : পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাপোষিন্দ সিংহের বংশধর এবং নারায়ণচন্দ্র সিংহের অন্ততম পোস্তপুত্র। বাল্যে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন ও বহু অর্থব্যয় করিয়া ছিলেন। অস্বাস্থ্যবোধে পারদর্শী ছিলেন। বেলগাছিয়া উজানে (ইহা স্বাক্ষরনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ক্রয় করেন) অশ্ব-বিজ্ঞান স্থাপন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ পরলোক গমন করেন।

২১। উইলসন, হরেল হেম্যান (Wilson, H. H.—১৭৮৬-১৮৬০) : জন্ম ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। ১৮০৮ খ্রিঃ কলিকাতায় আসেন এবং পরে কলিকাতা টাঙ্কশালে যোগ দিয়া অ্যালে মাস্টার হন। বহু বৎসর এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিজ্ঞান প্রসারের জন্য চিরস্বর্ণধারী হইয়া থাকিবেন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনার কৃত্তি প্রধানতঃ তাঁহারই। ইংলণ্ড প্রত্যগমনের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হন এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টর

নিৰ্বাচিত হন। চাত্ৰদের মধ্যে মনিয়র উইলিয়মস্, ই. বি. কাওয়েল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পর সমস্ত রচনাবলী বায়ো গ্রাফে প্রকাশিত হয় ( ১৮৬২-৭১ ) ; উল্লেখ্য ‘অবেদ’, ‘মেঘদূত’, ‘গ্রামার অব স্তানকট ল্যান্ডয়েজ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু : ৮ই মে, ১৮৬০ ( লণ্ডন )।

২২। উইলিয়মস্, স্যার মনিয়র (Williams, Sir Monier—১৮১২-১৮৮২) : ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বোম্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিজ্ঞান-বিশারদ। অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অস্ফুট গ্রন্থ ‘হিন্দুইজম’ ( ১৮৭৭ ), ‘রিলিজাস থটস্ অ্যাণ্ড লাইফ ইন ইণ্ডিয়া’ ( ১৮৮৩ ) প্রভৃতি। মৃত্যু : ১১ই এপ্রিল, ১৮৮২।

২৩। উদয়নাচার্য ( আ: ২৪৪-১০৪৪ খ্রী: ) : মিথিলার অধিবাসী—দায়ভাগা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রায়শাস্ত্রের অধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কলাপ রক্ষিত প্রণীত ‘ঈশ্বর ভক্তকারিকা’ নামক শ্রায়গ্রন্থের ভুল প্রদর্শনের জন্য ‘শ্রায়কুহুমাজলি’ প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত লক্ষণাবলী, তাৎপৰ্য পরিমুক্তি, আত্মতত্ত্ববিবেক, কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

২৪। উপেন্দ্রনাথ দাস ( ১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ ) : হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাসের স্মৃতিপুত্র। একাধারে নাট্যপরিচালক ও সমাজ-সংস্কারক। ইণ্ডিয়ান ব্যাডিক্যাল লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। কুড়ি বৎসর বয়সে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর এক বিধবাকে বিবাহ করেন। ইহার পরে দারুণ অর্থকষ্ট ও ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। কয়েক বৎসর পরে ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য বিলাত যান এবং কোন কারণ বশত সেখানে কয়েক হন। দেশে ফিরিবার পর নাট্যান্দোলনে মাতেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের থিয়েটারের পরিচালক নিযুক্ত হন। ‘শরৎ সরোজিনী’ ও ‘সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ নামে দুইটি নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। হিন্দু রমণী কর্তৃক প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনা করার ঘটনা লইয়া ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ নামক প্রহসনটি পরিচালনার জন্য পুলিন্দী রোষে পড়েন এবং পরে তাঁহার ও অন্তর্জাল বহুর একমাত্র বিনোদন কার্যকর হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার পরই সরকার কর্তৃক “ড্রামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট” পাল করান হয় ( ১৮৭৬ )।

২৫। উমেশচন্দ্র দত্ত ( শুক্ল ) ( ১৮২২-১৯১৬ ) : দুই বৎসর বয়সে পিতৃহারা হন। কিছুকাল স্কুলে পাঠগ্রহণের পর অতি অল্প বয়সে জাকৃষ্ণি করিতে বাধ্য হন। জটনক ইংরেজ রাজকর্ণচারী তাঁহার প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া উমেশচন্দ্রকে কলকাতার কলেজে ভর্তি করাইয়া দেন। ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন তখন অধ্যক্ষ। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেন। শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়াল্ডে লাইব্রেরী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চট্টগ্রাম স্কুলে শিক্ষকতা করতঃ ৩৫ করেন। কিছুকাল বাবেই কলকাতার কলেজে চলিয়া আসেন। মধ্যে এক বৎসরের

জন্ত ঢাকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ( ১৮৬৬ ) । কিছুকালের জন্ত কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হন । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে অবসরগ্রহণ করেন । সাতাশ বৎসর বয়সে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন । ছাত্রদের মধ্যে মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণনগর কলেজ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছিলেন :

এ কলেজ একবার উন্মেষ-প্রসার

উঠেছিল সর্বোপরি বিজ্ঞা পরীক্ষায় ।

২৬। উন্মেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৪-১৯০৬ ) : ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাটর্নী ছিলেন । ১৮৬৮ খ্রীঃ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন । জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ( বোম্বাই—১৮৮৫ ) এবং অষ্টম ( এলাহাবাদ —১৮৯২ ) অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন । ছাত্রাবস্থায় লওনে ‘ইণ্ডিয়া সোসাইটি’র প্রথম সম্পাদক ছিলেন । জী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন নাই । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই প্রাণত্যাগ করেন ।

২৭। এণ্ডরুজ, চার্লস ফ্রান্সিস (Andrews, C. F.—১৮৭১-১৯৪০) : ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন । ডিগ্রিলাভের পর কিছুকাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । ১৯০৪ খ্রীঃ ভারতে আসেন এবং দিল্লীতে অধ্যাপনা শুরু করেন । রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পর শান্তিনিকেতনে যোগ দেন । গান্ধীজীর সহিতও বন্ধুত্ব ছিল । কার্যকলাপ ও মতামতের জন্ত নিজের সমাজ ও ব্রিটিশ সরকারের অপ্রীতিভাজন হন । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল কলিকাতায় পি. জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন ।

২৮। কটন, সার হেনরী জম স্টেডম্যান (১৮৪৫-১৯১৫) : জন্ম মাদ্রাজ প্রদেশে । ইংহারা পুরুষাত্মকমে ভারত সরকারের কর্মচারী । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ সরকারের অধীনে কার্যে যোগদান করেন । পরে আসামের চীফ কমিশনার হন (১৮৯৬-১৯০২) । আসামের চা-বাগানের কুলীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্ত অসহযোগের বিরাগভাজন হন । ‘New India’ গ্রন্থের জন্ত ভারতবাসীর নিকট অমর হইয়া থাকিবেন ।

২৯। কাওয়েল, এডওয়ার্ড বাইলস্ (Cowell, Edward Byles—১৮২৬-১৯০৩) : ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । ছাত্রাবস্থায় উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থাবলি দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্য তথা প্রাক্তনবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন । অক্সফোর্ডে হেরল হেনান উইলসনের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠগ্রহণ করেন । ১৮৫৬ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষত্যাগ করিলে পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এন্ডার্সনের সংস্কৃত কলেজের ভান্স গ্রহণ করেন । এই সময় হইতে এশিয়াটিক সোসাইটির কৃষ্ণ কামারক হন । ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের (১৮৭৪) পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃতের অধ্যাপক নির্বাচিত হন (১৮৬৭)। রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকাবলীর মধ্যে বিক্রমোর্বনী, জায়কুম্ভাঙ্গলি, জৈমিনীয় জায়মালাবিস্তার, সর্বদর্শনলংগ্রহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩০। কানাইলাল পাইন (১৮২২-১৮৯১) : বাল্যকালে কয়েক বৎসর মাত্র মতিলাল শীলস ক্রী কলেজে (বিদ্যালয়ে) অধ্যয়ন করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান হইয়া উঠেন। ইংরেজীতে ব্রাহ্মধর্মের এক ইতিবৃত্ত লেখেন। মস্তিষ্কের পীড়ায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩১। কার্তিকেশ্বর চন্দ্র রায় (চক্রবর্তী), দেওয়ান (১৮২০-১৮৮৫) : ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরের স্বপ্রসিদ্ধ ‘দেওয়ান’ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে উত্তমরূপে ফার্সি ভাষা রপ্ত করেন। রাজা শ্রীশচন্দ্র কর্তৃক প্রথমে সেক্রেটারি এবং পরে দেওয়ান নিযুক্ত হন। কার্তিকেশ্বরচন্দ্র রচিত ‘ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত’ এবং ‘আত্মজীবনচরিত’-এ সে যুগের বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পুত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার হিলাবে পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করেন।

৩২। কার্লাইল, টমাস (Carlyle, Thomas—১৭৯৫-১৮৮১) : প্রখ্যাত ষ্টিচ্ ঐতিহাসিক। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনা তাঁহার অমর কীর্তি। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীও উল্লেখযোগ্য।

৩৩। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (১৮৪১-১৯০৫) : গোপীমোহন ঠাকুরের ভ্রাতৃপুত্র ও গোপাললাল ঠাকুরের পুত্র—পাণ্ডুরিয়াঘাটার স্বপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগে পুত্রদ্বয়ের বিবাহে আডম্বরের জন্ত অথবা অর্থব্যয় না করিয়া সেই অর্থ মহেন্দ্রলাল সরকারের Indian Association for the Cultivation of Science-এর উন্নতিকল্পে দান করিয়াছিলেন।

৩৪। কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৩৩-১৯১০) : ভরাকর (ঢাকা) গ্রামের শিবনাথ ঘোষের পুত্র। ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভাওয়াল জমিদারের কর্মসচিব ছিলেন। ‘বান্ধব’ পত্রিকা সম্পাদনা সাহিত্যিক জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি। ‘প্রভাতচিন্তা’, ‘নিশীথচিন্তা’, ‘ভ্রান্তিবিনোদ’ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) : জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নন্দলাল সিংহ। বাল্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন, তবে কৃতী ছাত্র বলিয়া তেমন সুনাম ছিল না। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে ‘বিভোৎসাহিনী লতা’ প্রতিষ্ঠা করেন (১৪ই জুন ১৮৫৩)—‘বিভোৎসাহিনী বঙ্গবন্ধু’ এই লতার সহিত যুক্ত ছিল। এই বঙ্গবন্ধু ‘বেণীসংহার’ নাটকের দ্বারা উদ্বোধিত হয় এবং তাহাতে

কালীপ্রসন্ন শ্রয়ঃ অভিনয় করিয়া যশোলাভ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় ‘বিভোৎসাহিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ (৭ম পর্ব) ও ‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ মাসিক পত্র এবং দৈনিক ‘পরিদর্শক’ সম্পাদনা করেন। মূল মহাভারতের অনুবাদ ও ‘হুতোম প্যাচার নক্সা’ ছাড়াও ‘মালতী মাধব নাটক’, ‘বিক্রমোর্বশী নাটক,’ ‘বাবু নাটক’ প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৭০ খ্রীঃ ২৪শে জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩৬। কীৰ্ত্তিচন্দ্র রায়, মহারাজা : বৰ্ধমানের মহারাজা জগৎরামের পুত্র। পিতা ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১৭০২ খ্রীঃ) এবং স্বীয় বাহুবলে মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানের বহু জমিদারদের পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের জমিদারী নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

৩৭। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) : মালদহের অধিবাসী। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কুঠী ছাত্র ছিলেন—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্র্যান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বছর পড়েন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া কিছুকাল স্থলে শিক্ষকতা ও কলিকাতায় বিভাগীয়-সমূহের উপ-পরিদর্শকরূপে কাজ করার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এগারো বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি করিবার জন্ত কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘ঠাকুর আইন অধ্যাপক’ নিযুক্ত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ পর্যন্ত রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ‘বাচস্পত্যভিধান’ সংকলনে সাহায্য করার জন্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি ‘বিভাসুধি’ উপাধি দেন। ‘দুরাকাজ্জের বৃথা ভ্রমণ’ (১৮৫৭) ছাড়াও ‘বিচিত্রবীর্ষ’ (১৮৬২) ‘ধর্মশাস্ত্র’ (১৮৮৫) প্রভৃতি রচনা করেন। ‘দুরাকাজ্জ’ সম্পর্কে সাহিত্যরত্নী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

“...ইহাতে কাঞ্চরীর আড়খর নাই, বিভাগায়ের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরসতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে।...আমার বিশ্বাস দুরাকাজ্জের ভাষা বক্সিস্‌দের ভাষার জননী।”

৩৮। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজা (১৭১০-১৭৮২) : কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কৃষ্ণনগর রাজবংশের এক নবীরায় অসাধারণ উন্নতি হয়। শ্রয়ঃ সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শুণীর আদর করিতেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামপ্রসাদ সেন, তারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নানাতাবে সাহায্য করিতেন। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের খ্যাতির পিছনে তাঁর দান অপরিণীয়। জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তক।



৩৯। **কৃষ্ণকান্ত পাল** ( ১৮৩৮-১৮৪৪ ) : পিতা কেশবচন্দ্র পাল। শিক্ষা ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও মেট্রোপলিটান কলেজে। অসাধারণ বক্তা ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ার্ট'-এর সম্পাদক হন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

৪০। **কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**, রেভঃ ( ১৮১৩-১৮৮৫ ) : পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ডিরোজিরোর অগ্রতম ছাত্র। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার বিপ বৎসর বাক্য বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূবাদ করেন। *Inquirer* পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অন্তর্ভুক্তি বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানকল্পক্রম বা *Encyclopaedia Bengalensis* কোষগ্রন্থ সংকলন শুরু করেন। বেথুন কলেজের দক্ষিণে 'ক্রাইস্ট চার্চ' গীর্জার উদ্বোধন ( ১৮৩৯ ) হইলে কৃষ্ণমোহন ইহার আচার্য নিযুক্ত হন এবং একাদিক্রমে তের বৎসর এই পদে আসীন ছিলেন।

হেদোর এ'দো জলে কেউ যেও না তায়,

কৃষ্ণ বন্দ্যো জটে বুড়ী শিকলি দেবে পায়। —কেশবচন্দ্র গুপ্ত

৪১। **কেশবচন্দ্র সেন** (১৮৩৮-১৮৮৪) : ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর কলুটোলার বিখ্যাত সেন-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহারা ( পিতা : প্যারীমোহন সেন —১৮১৪-১৮৪৮ )। হিন্দু কলেজ ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র ছিলেন। সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে দেবেন্দ্রনাথের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ( নববিধান ) স্থাপিত করেন। এলবার্ট স্ট্রোমহাইট ( হল ও কলেজ ) প্রতিষ্ঠা ( ২৬শে এপ্রিল, ১৮৭৬ ) একটি শ্রবণীয় ঘটনা। ব্রাহ্মধর্মের অগ্রদূত, ধর্মসাধন, আচার্যের উপদেশ ১৮-৬ষ্ঠ খণ্ড, ব্রাহ্মিকাদ্বিগের প্রতি উপদেশ, সেবকের নিবেদন, ব্রহ্মোপাসনা, *Young Bengal—This is for you*, *Essential Principles of Brahma Dharma* প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকাও রচনা করেন। *The Indian Mirror*, স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞান, বালকবন্ধু প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪২। **কৌত, অগুস্ত** (Comte, Auguste—১৭৯৮-১৮৫৭) : ১৭৯৮ খ্রীঃ ক্রান্তের ৮শে জানুয়ারির এক মহাবিশু পরিবারে কৌত জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের পলিটেকনিক স্কুলে তাঁর গণিত বিজ্ঞান শিক্ষা হয়। কিন্তু জর্জেন্টন শিল্পকের বিরুদ্ধে অশান্তি বাস্তবায়ন করার ফলে তিনি এই স্কুল হইতে বিতাড়িত হন। আঠারো বৎসর বয়সে এই ঘটনা ঘটে এবং পিতাও তাঁহাকে গৃহে ফাঁদ দিতে রাজী হন না। বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নেন। কিন্তু ছয় বছর পরে বন্ধুর সহিত মতভেদ হওয়ার ফলে তাঁর নির্বাসনও তিনি

ছাড়িতে বাধ্য হন। এই সময় 'সমাজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'র একটি পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। এই একটি প্রবন্ধই তাঁহাকে খ্যাতিমান করিয়া তোলে। কৌত্তের বিবাহিত জীবন স্বকৃৎ হয় এক ভ্রষ্টা নারীকে লইয়া। কিন্তু এ বিবাহ সুখের না হওয়ায় কিছুকাল পরে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। ইতিমধ্যে তাঁহার 'পজিটিভ ফিলজফি' বা ধ্রুব দর্শন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং আলোড়ন তোলে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যাইতে থাকে। এই সময় ইংলণ্ড হইতে মিল ও অন্তান্ত বন্ধুরা তাঁহাকে নিয়মিত অর্থগাহায্য করিতে থাকেন। ইংলণ্ডে এক বিবাহিত নারীর প্রেমে পড়েন। কিন্তু এ প্রেম মিলনে সমাপ্ত হয় নাই। মহিলাটির মৃত্যু কৌত্তের জীবন-দর্শনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থ 'ধ্রুব রাজনীতি'তে এই প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। ১৮৫৭ খ্রীঃ এই কালজরী দার্শনিকের মৃত্যু হয়।

৪৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) : খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার। বাণ্যে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও হেয়ার স্কুলে কিছুদিন পড়িবার পর পিতার মৃত্যুর জন্য স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বাল্যকাল হইতেই ছিল। প্রথম জীবনে অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করেন; পরে মিনার্ভা, স্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি মঞ্চের সহিত যুক্ত হন। রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে জনা, বিষমকল, প্রফুল্ল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২২-১৮৬২) : প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বাগ্মী। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন—আদি নিবাস নদীয়া জেলায়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির কৃতী ছাত্র। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', কৈলাসচন্দ্র বসুর 'লিটারারি জনিকল', অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষের 'বেঙ্গল রেকর্ডার', শঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জীজ ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। নিজে 'হিন্দু প্যাট্রিস্ট', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকা সাফল্যের সহিত সম্পাদনা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল সোসাইটি, উত্তরপাড়া হিতকারিণী সভা প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন।

৪৫। গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন (ভট্টাচার্য) (১৮২২-১৯০৩) : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাজপুত্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া উচ্চ কলেজে অধ্যাপনা করিতেন (১৮৪৫-১৮৮৩)। মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপন করিয়া নিজ রচিত ও সম্পাদিত বহু পুস্তক প্রকাশ করেন; তন্মধ্যে বসুন্ধর, দশরূমারচরিত, শব্দসার : সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, বিধবা বিধব বিপদ, স্কুলব্যয় ব্যাখ্যার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪৬। গিরিশচন্দ্র রায়, কলিকাতা (১৮৬৬-১৮৯১) : কলিকাতা রায়ের (কলকাতার) মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পুত্র গিরিশচন্দ্র সম্প্রতি উত্তরাধিকারী হন (১৮৯২)। অপর্যাপ্ত ইচ্ছায় এরূপ সমস্ত অধিকারী হইতব্য হইত। নিজে খুব শিক্ষিত না হইলেও গভীর

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়ম খাঁ ও তাঁহার জিন পুত্র মিয়া খাঁ, হুম্ম খাঁ ও দেলওয়ার খাঁ তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগরে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

৪৭। গোপীমোহন ঠাকুর ( বন্দ্যোপাধ্যায়-কুশারী ) ( ১৭৬০-১৮১২ ) : পিতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার দর্পনারায়ণ ঠাকুর। বাল্যে গৃহ-শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী, ফরাসী, পত্নী-গীত, সংস্কৃত, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় দক্ষতালাভ করেন। হিন্দু কলেজ স্থাপয়িতাদের অন্যতম। পুত্রদের মধ্যে হরকুমার ও প্রসন্নকুমার সুপ্রসিদ্ধ।

৪৮। গোল্ডস্টেকার, থিওডর ( Goldstuecker, Theodor—১৮২১-১৮৭২ ) : জন্ম : কনিগস্বের্গ ( প্রুশিয়া )—১৮ই জানুয়ারী, ১৮২১। শিক্ষা : কনিগস্বের্গ ও বন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৪০ খ্রীঃ প্রথমোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট লাভ করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রবোধ চন্দ্রোদয়, জৈমিনীয় ছায়মালাবিস্তার, পাণিনি—হিঙ্গ প্রেস ইন স্মাংস্কট লিটারেচার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ লণ্ডনে মারা যান।

৪৯। গৌরমোহন আচ্য ( ১৮০৫-১৮৪৫ ) : ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পড়াশুনায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তৎকালে পাছে ধর্মভাব শিথিল হইয়া যায় এই আশঙ্কায় অভিভাবকেয়া খ্রীষ্টীয় মিশনারি স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাইতে চাহিতেন না। সে কারণে, গৌরমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ঝাঁর প্রচেষ্টায় ‘ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, শঙ্কুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র বোষ ( সাংবাদিক ), কৈলাসচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নৌকাডুবির ফলে প্রাণ হারান।

৫০। গৌরাধকর তর্কবাগীশ ( ভট্টাচার্য ) বা গুড়গুড়ো ভট্টাচার্য ( ১৭২২-১৮৫২ ) : বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের অন্যতম সাংবাদিক। খ্রীষ্টে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার পরলোকগমনের পর উচ্চশিক্ষার্থে নবদ্বীপে আসেন। ইহার পর কলিকাতায় আসিয়া রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের হুনজরে পড়েন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতার ‘জ্ঞানাবেশণ’ পত্রিকা পরিচালনা করেন। ইহা ছাড়া ‘সমাদ ভাস্কর’, ‘সমাদ রসরাজ’ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে জ্ঞান-প্রদীপ ১ম ও ২য় খণ্ড, নীতিরত্ন, ভূগোলসার, ‘ভগবদ্গীতা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫১। গ্রান্ট, স্যার জম পীটার ( Grant, Sir John Peter, ১৮০৭-১৮৭০ ) আই. সি. এস. : ভারত সরকারের অধীন নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। পরে বাংলার শাসনকর্তা হন ( ১৮৫২-১৮৬২ )। নীলকর আন্দোলনে রায়জদের প্রতি

সহায়ত্ব দিবার জন্য স্বদেশবাসীদের বিরাগভাজন হন। এখানকার কার্য হইতে অবসরগ্রহণ করিবার পর জ্যামাইকার শাসনকর্তা হন।

৫২। **গ্লাডস্টোন, উইলিয়ম ইউয়ার্ট** (Gladstone, William Ewart— ১৮০৯-৯৮) : ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ (১৮৬৮- ৭৪, ১৮৮০-১৮৮৫, ১৮৮৬ ও ১৮৯২-৯৪) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

৫৩। **চন্দ্রশঙ্কর বিক্রমাদিত্য** : সমুদ্রশুণ্ডের পুত্র। দ্বিতীয় চন্দ্রশঙ্কর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আহুমানিক রাজত্বকাল ৪০০-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাস প্রভৃতি ‘নবরত্ন’ সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। পরে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন।

৫৪। **চন্দ্রনাথ বসু** (১৮৪৫-১৯২১ : হুগলী জেলার কৈকালী গ্রামে জন্ম। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়নকালীন তথাকার ‘বিতর্ক সভা’র উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। অতঃপর যথাক্রমে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্মধ্যক্ষ ও বাংলা সরকারের অত্মবাদকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসরগ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন ইহলোক ত্যাগ করেন। রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে ‘সাবিত্রী তন্ত্র’, ‘পৃথিবীর স্বর্ষ দ্বন্দ্ব’, ‘হিন্দুত্ব’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫৫। **চন্দ্রমুখী বসু** : (১৮৬০-১৯৪৪) কাছিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়)-র সহিত একযোগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিলেল স্কুল (পরবর্তীকালে কলেজ) হইতে তৎকালীন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক হইবার গৌরব অর্জন করেন। পর বৎসর (১৮৮৪) দশম স্থান অধিকার করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। ১৮৮৬ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেথুন কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। উল্লেখযোগ্য যে ইহার সহোদর রাজকুমারী দাসও পরবর্তীকালে (১৯২৮-৩৩) এই কলেজের অধ্যক্ষা হন।

৫৬। **চুলীলাল বসু**, রায়বাহাদুর, সি. আই. ই (১৮৬১-১৯৩০) : দক্ষিণ ২৪-পরগনার চাংড়িপোতার অধিবাসী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল ব্রহ্মদেশে সহকারী শলা চিকিৎসক রূপে কাজ করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া সরকারের অধীন Chemical Examiner নিযুক্ত হন। মধ্যে কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনাও করেন। প্রথম নিখিল ভারত চিকিৎসাবিদদের সম্মেলন (১৮৯৪)-এর অঙ্গভূম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে কলিকাতায় শৈথিল্য হন। ‘বাক্সালীর খাত্ত’ অন্ত্যতম রচনা।

৫৭। **জগদীশচন্দ্র বসু**, মহারাজ (১৮৬৮-১৯২৬) : নাটোরের মহারাজার দত্তক পুত্র। স্বাভাবিক আন্দোলনের সহিত গুডপ্রোডভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ‘মাননী ও মর্যবাপী’ পত্রিকা দৃষ্টিভঙ্গিতে লিপ্যবলী করেন। নিজে স্বকবি ছিলেন।

এক মোটর দুর্ঘটনায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আহুয়ারি মালে দেহত্যাগ করেন। নাটোর ক্রিকেট ক্লাব গড়া তাঁহার অনন্ত কীর্তি।

৫৮। জয়গঙ্গাপাল তর্কালঙ্কার (ভট্টাচার্য) (১৭৭৫-১৮৪৬) : ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীতে পাঠ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮২৪) হইতে বাইশ বৎসর সেখানে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যালাগর, তারাপ্রসন্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কুন্তিবালী রামায়ণের ভাষা আমূল পরিবর্তন করিয়া বর্তমান রূপ দেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

৫৯। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (ভট্টাচার্য) (১৮০৫-১৮৭২) : দক্ষিণ ২৪-পরগনার মুচাদিপুর গ্রামের অধিবাসী। শালিখায় টোল স্থাপন করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের স্নায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরিয়া এখানে অধ্যাপনা করেন। ‘সর্বদর্শন সংগ্রহ’, ‘স্নায়দর্শনম্’ প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য।

৬০। জোন অক্স আর্ক, সান্সবী (১৪১২-৩১) : ফরাসী দেশে চাবীর করে জন্ম। ইংরেজের সহিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীদের যখন সন্ধীন অবস্থা তখন জোন দৈববাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের মোড় কিরাইয়া দেন। পরে কিন্তু ইংরেজদের বহু বারগুণি ডিউকের সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইয়া টংরেজদের হস্তে পতিত হন। বিচারে তাঁহাকে ডাইনী সাব্যস্ত করিয়া জীবন্ত দণ্ড করা হয়।

৬১। টমাস অ্যু কেম্পিস (Thomas a' Kempis—আহু ১৩৮০-১৪৭১) : জার্মানীর ডুসেলডর্ফের নিকট কেমপেনে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কেম্পিসের টমাস নামেই পরিচিত। আল নাম টমাস হামেরকেন (Hammerken)। অগস্টিনীয় সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। ‘ইমিটেশন ক্রিস্টি’ (De Imitation Christi) পুস্তকের প্রণেতা।

৬২। টেম্পল, সার রিচার্ড (Temple, Sir Richard—১৮২৬-১৯০২) আই. সি. এস. : বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা। তাঁহারই আমলে হাওড়ার পুরাতন ভাসমান সেতু তৈয়ারী হয়। ‘Men and Events of My Time in India’ ও ‘The Story of My Life’ তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

টাক্সো : ‘তালো’ দ্রষ্টব্য।

৬৩। ডাক, ডঃ আলেকজান্ডার (Duff, Rev. Dr Alexander—১৮০৬-১৮৭৮) : খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে General Assembly of the Church of Scotland-এর অধীন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক হইয়া ভারতে আসেন। দারুবাড়ের সন্ন্যাসকর্তা ও সন্ন্যাসিক এসেথলিচ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩০) ; কিন্তু পরে কল প্রত্যাখ্যানের সহিত সন্ন্যাসের হস্তাঙ্ক ‘ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন’ (পরে ‘জয় কলকাতা’) নামে আর একটি সন্ন্যাস

প্ৰতিষ্ঠা করেন ( ১৮৪৩ )। এই উত্তৰ কলেজ মিলিয়া বৰ্তমান ষ্টিশ চাৰ্চ কলেজৰ স্থিতি। নীলকৰ আন্দোলনে অন্যান্য বহু পাত্ৰীয় ন্যায় ৱায়ত্বেৰ পক্ষ সমৰ্থন করেন। ইনিই যেতিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐতিহ্যৰ্থে স্বীকৃত করেন ( ১৮৩২ )।

৬৪। ডিৰোজিও, হেনৰি (Derozio, Henry Louis Vivian—১৮০২-৩১) : Fakir of Jhungeera-ৰ কবি ডিৰোজিও মৌলানী দৰ্গাৰ নিকট ( বৰ্তমান ১৫৫, আচাৰ্য জগদীশ বহু ৰোডস্থিত ভবনটি যেখানে অবস্থিত ) জন্মগ্ৰহণ করেন। ভাগলপুৰে নীলকুঠিতে কাজ কৰিবায় সময় 'Juvenis' ছদ্মনামে কবিতা লিখিতে সক্ষম করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজৰ চতুৰ্থ শিক্ষকৰ পদ পান। Academic Association নামে এদেশেৰ প্ৰথম বিতৰ্ক সভা প্ৰতিষ্ঠিত করেন। নাট্যিক বলিয়া হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ কৰিতে বাধ্য হন। কলেজৰ অতি অল্প বয়সে মারা যান। ডিৰোজিওৰ শিক্ষা-প্ৰণালী বাংলাৰ নব্য যুবকদেয় মধ্যে উদ্দীপনাৰ স্থিতি কৰে। তাঁহাৰ ছাত্ৰদেয় ( 'ইয়ং বেঙ্গল' ) অশালীন ব্যবহার প্ৰাচীনপন্থীয়া হুনজৰে দেখিতেন না। এ প্ৰসঙ্গে পণ্ডিত জয়গোপাল ভট্টাচাৰ্য্যৰে প্ৰেক্ষাপট উল্লেখযোগ্য :

দক্ষিণাৱজ্জনো ৱামো ৱসিকং কৃষ্ণমোহনঃ ।

তাৱাচাৰ্য্যো ৱাধানাথো গোবিন্দচন্দ্ৰশেখৰঃ ॥

হৰচন্দ্ৰো ৱামতত্বঃ শিবচন্দ্ৰক মাধবঃ ।

মহেশোহ্মতলালচ প্যাৰীচাৰ্য্যো মধুৱতাঃ ।

কিৰীদী পুত্ৰব ত্ৰীমদ্ ডিৰোজিও কুশেশৱঃ ।

মধুপানৱতাঃ সমাগ্ বিদ্বিগ্জ্ঞানবৰ্জিতাঃ ॥

[ দক্ষিণাৱজ্জন মুখোপাধ্যায় ( ১৮১৪-৭৮ ), ৱামগোপাল ঘোষ ( ১৮১৪-৬৮ ), ৱসিককৃষ্ণ মল্লিক ( ১৮১০-৫৮ ), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮১৩-৮৫ ), তাৱাচাৰ্য্য চন্দ্ৰবৰ্ত্তা ( ১৮০৬-৫৭ ) ৱাধানাথ শিকদাৰ ( ১৮১৩-৭০ ), গোবিন্দচন্দ্ৰ বলাক, চন্দ্ৰশেখৰ দেৱ, হৰচন্দ্ৰ ঘোষ ( ১৮০৮-৬৮ ), ৱামতত্ব নাহিড়ী ( ১৮১৩-২৮ ), শিবচন্দ্ৰ দেৱ ( ১৮১১-২০ ) মাধবচন্দ্ৰ মল্লিক, মহেশচন্দ্ৰ ঘোষ, অমৃতলাল মিত্ৰ এৱং প্যাৰীচাৰ্য্য মিত্ৰ ( ১৮১৪-৮৩ ) । ]

ডেভিড হেয়াৰ : 'হেয়াৰ, ডেভিড' দ্ৰষ্টব্য।

ডাক্টৰ : 'দাক্ট' দ্ৰষ্টব্য।

৬৫। ডাক্তৰজাথ পালিড, জাৰ ( ১৮৩১-১২১৪ ) : হুগলী জেলাৰ ইলছোবা গ্ৰামেৰ অধিবাসী। কলিকাতাৰ জন্মগ্ৰহণ করেন। কলিকাতা হাইকোৰ্টেৰ প্ৰেছিডেণ্ট ব্যাৱিস্টাৰ ছিলেন। শিক্ষা বিভাগেৰ জন্তু প্ৰেতৃত্ব অৰ্থ ও লক্ষ্যপ্ৰতি দান করেন। এদেশেৰ বিজ্ঞান ও কাৰিগৰী শিক্ষা-বিভাগেৰ উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ ( বৰ্তমান কাৰবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাৰ দান উল্লেখযোগ্য।

৬৬। ডাক্তাৰজাথ ডক্টৰজাথ ( ডাক্টাৰ ) ( ১৮০৬-১৮৮৫ ) : কালনা মহকুমাৰ অধিকা গ্ৰামে-জন্ম। এক বৎসৰ বয়সে মাতৃহাৰা হন। অলাভাৱণ বীৰশাস্ত্ৰ এৱং বহু

সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধৃতি। বাল্যকাল হইতে অসম্ভব জেদী ছিলেন। বাল্যে পিতার নিকট একবার উপদেশ পাইয়াছিলেন ‘কারণই প্রত্যেক কার্যের জন্ত দায়ী’। ইহার কিছুদিন পরে ভগিনীপতি শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উত্তম-মধ্যম প্রহারলাভ করেন। ইহাতে বালক তারানাথ রাগে বাড়ির পুকুরে পড়িয়া আকর্ষিত হইয়া রহিলেন। কাহারো কথাই উঠিয়া আসিলেন না। তখন পিতা আসিয়া আকর্ষিত জলে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালক উত্তর দিল, “অনেকক্ষণ জলে থাকলে আমার জ্বর-বিকার হবে আর তাতে আমি মারা যাব—ফলে আমার মরার কারণ শিবচন্দ্র ষাঁড়ুঘোর ফাঁসি হবে।” ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়া সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, জ্যোতিষ, স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠগ্রহণের পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অধিকতর শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে কাশী গমন করেন এবং তেত্রিশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপনান্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৪৫ (২৩শে জ্যৈষ্ঠ) খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এবং ১৮৭০ (৩১শে ডিসেম্বর) খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কলের জলের ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় ও পুত্র জীবানন্দের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাগারাগি হওয়ায় বন্ধু বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয়। অবসরগ্রহণ করিয়া পরিণত বয়সে তৃতীয় পত্নী সহ কাশীবাসী হন এবং সেখানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন মারা যান। গ্রন্থসমূহের মধ্যে শব্দার্থরত্ন, বাক্যমঞ্জরী, শব্দভোমমহানিধি (পাঁচ খণ্ডে), বাচস্পত্য অভিধান (বাইশ খণ্ডে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬৭। **ভারতবর্ষের তর্করত্ন (চট্টোপাধ্যায়) :** (মৃত্যু : ১৮৫৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়ার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে উক্ত কলেজের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। পরে বিদ্যাসাগরের অধীনে নদীয়ার শাব-ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অপরিশ্রুত বয়সে মারা যান। ‘কাদম্বরী’ ও ‘রাসেলাস’ (Rasselas)-এর অনুবাদ করেন।

৬৮। **ভাসো, তর্রকাতো (Tasso, Torquato—১৫৮৪-১৬২৫) :** ইতালির অন্যতম কবি। ‘Jerusalem Delivered’ কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য রচনা।

৬৯। **দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা (১৮১৪-১৮৭৮) :** পাণ্ডুরিয়াবাটার স্বর্ধকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ‘ইয়ং বেঙ্গল’-এর অন্যতম স্তম্ভ এবং হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ‘জানাবেদ’ নামে এক পত্রিকা বাহির করেন। বর্তমান বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে একখণ্ড জমি দান করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর বিরুদ্ধে ঘটায় বর্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা বিধবা রানীকে বিবাহ করেন। লিপাহী বিদ্রোহের পর অযোধ্যায় জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই লক্ষৌ নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন।

৭০। **দালব্রি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) :** খ্যাতনামা পাঁচালী রচয়িতা। কাটোয়া

মহকুমার বাধমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও কালনার নিকটবর্তী পীলা গ্রামে মাতুলগরে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। প্রথম জীবনে কবি দলে যোগ দেন। পরে স্বাধীনভাবে পাচালী রচনায় মন দেন। কবিরাজী জানিতেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে গদ্যবাদের চিকিৎসা করিতেন। একাদশ বৎসর বয়সে যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

৭১। দান্তে, আলিগিয়ান্নি (Dante, Alighieri—১২৬৫-১৩২১) : ইতালির অমর কবি। ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ‘Vita Nouva’ ও ‘Divina Commedia’ নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের স্রষ্টা।

৭২। দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮৩০-১৮৭৩ ) : হেয়ার সাহেবের কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ( বর্তমান হেয়ার স্কুল ) ও হিন্দু কলেজ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ডাক বিভাগে চাকুরী করা কালীন নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইত এবং সেই সময় নীলকরদের দৌরাঙ্গা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর পরলোক গমন করেন। নবান তপস্বিনী, জামাই বারিক, সধবার একাদশী প্রভৃতি অনেক নাটক ও গ্রন্থন লিখিলেও ‘নীল দর্পণ নাটক’ ( ১৮৬০ )-এর জগৎ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ (অনুবাদক : মধুসূদন দত্ত ) প্রকাশের জগৎ রেভারেণ্ড লঙ-এর অর্থদণ্ড ও কারাবাস হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লঙন হইতে ইহার ইংরেজী সংস্করণ বাহির হয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের ইহাই সর্বপ্রথম বিদেশী সংস্করণ।

৭৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( বঙ্গোপাধ্যায়-কুশারী ), মহর্ষি ( ১৮১৭-১২০৫ ) : প্রিন্স হারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। অত্যন্ত ধার্মিকপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ( আদি ) ব্রাহ্ম সমাজকে পুনর্জীবিত করেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন ( ১৮৪৩ )। ধর্ম আলোচনার জগৎ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই সভা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করিত। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

৭৪। হারকানাথ অধিকারী : নদীয়া জেলার গোখামী দুর্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রের দ্বায় ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ কবিতা লিখিতেন। ‘বুনো কবি’-র ছদ্মনামে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুকে কটাক্ষ করিয়া সংবাদ প্রভাকরে ‘সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ’ কবিতা প্রকাশ করিলে এই তিনজনের মধ্যে যে কবিতা যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। ‘স্বধীরজন’ কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য রচনা। হারকানাথ দীর্ঘায়ু ছিলেন না।

৭৫। হারকানাথ ঠাকুর ( বঙ্গোপাধ্যায়-কুশারী ) ( ১৭২৪-১৮৪৩ ) : জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের যশোভাগ্য তাঁহার সময় হইতেই আরম্ভ হয়। প্রথম জীবনে বহু কু-সম্পত্তির মালিক হইয়াও নিমক মহলে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তথায় দেওয়ান হন। পরে ‘কার ঠাকুর কোম্পানি’ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থের



অধিকারী হন। জমিদার সত্তা (বর্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-র অত্যন্তম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৮)। রামমোহনের প্রধান সহযোগী ছিলেন। দুইবার (১৮৪২ ও ১৮৪৫) ইংলণ্ড গমন করেন এবং তথায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৭৬। **দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ (ভট্টাচার্য)** (১৮১২-১৮৮৬) : দক্ষিণ ২৪-পরগনার চাংডিপোতা গ্রামে এক দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে উক্ত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা (১৮৫৮) তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি। শেষ জীবনে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য রেওয়ার রাজ্যের সাতানায় বসবাস করিতেন এবং সেখানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগষ্ট পরলোক গমন করেন। সোমপ্রকাশ ছাড়া 'কল্পক্রম' নামে আর একখানি পত্রিকাও (মাসিক) সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নীতিসার, রোমরাজ্যের ইতিহাস, গ্রীসদেশের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য।

৭৭। **দ্বারকানাথ মিত্র** (১৮৩৬-১৮৭৪) : হুগলী জেলায় আগুনলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন (১৮৫০)। পরে আইন পরীক্ষা পাস করিয়া আইন ব্যবসায় মগ্ন করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প কালের মধ্যে সরকারী উকিল হন। শত্ৰুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন (১৮৬৭) এবং সাত বৎসর ধরিয়া সুনামের সহিত এই কার্য করেন। এই সময়ে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭৮। **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪০-১৯২৬) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। সায়ক ও কবি হিসাবে যেমন খ্যাত, তেমনই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হিসাবেও বিশেষ পরিচিত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কাব্য-সাহিত্যের ধারা ও শিল্পচর্চা তাঁর থেকেই অন্যান্য অল্পবয়স্কদের মধ্যে সংক্রামিত বলে অনেকে মনে করিয়া থাকেন। মাত্র তুড়ি বৎসর বয়স্ককালে তিনি মেঘদূতের অমুবাদ করেন। অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা দর্শন-শাস্ত্রই তাঁহার অধিকতরভাবে অধিগত ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ আজীবন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় উক্ত সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত 'ভারতী' মাসিক পত্রিকাও তাঁহার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তিনি ১২৮৪ হইতে ১২৯০ সন পর্যন্ত 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১২১৪ খ্রীঃ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি এবং কিছুকালের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন (১৮৯৭-১৯০০)। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কাব্যমালা, ঞ্জপ্রয়াণ, মেঘদূত, নানানিষ্ঠা এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন বিখ্যাত।

৭২। নবীনচন্দ্র সেন ( ১৮৪৭-১৯০২ ) : ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত বায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বৃত্তি পাইয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করেন। ইহার পর বাংলা সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন উচ্চ পদে ছত্রিশ বৎসর কার্য করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কবিতা রচনা শুরু করেন ১০।১১ বৎসর বয়স হইতে এবং পরবর্তী জীবনে স্বকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মাসে দেহত্যাগ করেন। রচনাবলীর মধ্যে অবকাশরঞ্জিনী ১ম ও ২য়, পলাশির যুদ্ধ, বৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, আমার জীবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্বপুরুষেরা বাস ছিল হুগলী জেলার দিবেদীতে।

৮০। নীলমণি কুমার ( ১৮৩৮-১৯১৮ ) : স্মার্যকাল ( ১৮৫৮-১৮৯১ ) মিলিটারি অ্যাকাউন্টস বিভাগে কাজ করেন। বিভিন্ন কাগজে নিয়মিত লিখিতেন। দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অভ সায়েন্স-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

৮১। নীলানন্দ মুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই. : পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সংস্কৃততে এম. এ. পাস করেন। পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরে (১৮৬৯) কান্ট্রীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন (১৮৯৬)।

৮২। পিকক, সার বার্নস ( Peacock, Sir Barnes, ১৮১০-১৮৯০ ) : সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন এবং ১৮৫২-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত অবলুপ্ত হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের সৃষ্টি হইলে ইহার প্রথম প্রধান বিচারপতি ( ১৮৬২-৭০ ) হইবার গৌরব অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিন্সি কাউন্সিলের সভ্য হন।

৮৩। পেত্রার্চ ( Petrarch, Francesca, ১৩০৪-১৩৭০ ) : ইতালীর মানবতাবাদী কবি। লরার প্রতি প্রেম বিষয়ক কবিতাবলী বিখ্যাত।

৮৪। প্যারীচন্দ্র সন্ন্যাস ( ১৮২৩-১৮৮৩ ) : হেয়ার সাহেবের ইংলিশ ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলুটোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকি কালীন উক্ত স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া হেয়ার স্কুল করেন। তার পূর্বে বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এডুকেশন গেজেট, হিউসাধক, প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত 'ফার্স্ট বুক' রচয়িতা। স্বরাপান নিবারণ প্রচেষ্টাকল্পে Bengal Temperance Society প্রতিষ্ঠা করা জীবনের উল্লেখযোগ্য কাজ।

৮৫। **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩) : হুগলী জেলার অধিবাসী। কলিকাতায় নীমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষার পর কলিকাতা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাথমিক লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা সম্পন্ন করেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন এবং এ বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশ করেন। ডেভিড হেরারের জীবন চরিত, কৃষি পাঠ, অভ্যন্তরীণ প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য।

৮৬। **প্রমদানাথ রায়, রাজা** (১৮৭৬-১৯৩৩) : দ্বীপপতিয়ার জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৮৭। **প্রসন্নকুমার ঠাকুর** (১৮০১-১৮৬৮) : পাণ্ডুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপনান্তে জমিদারী দেখাশুনা করিতে থাকেন। পরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বহু অর্থ প্রদান করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাঁহাকে ত্যাগপুত্র করেন।

৮৮। **প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (বসু)** (১৮২৫-১৮৮৭) : হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয়ের চেটার ১৮৫৩ খ্রিঃ সংস্কৃত কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে এই কলেজে অধ্যাপকতা করার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজেও অধ্যাপনা করেন। বাংলা ভাষায় পাটগণিত ও বীজগণিত রচনা অত্যন্ত কাজ। ডাঃ সুরকুমার সর্বাধিকারী ইহার মধ্য ভ্রাতা। স্ত্রী স্বরসিনী দেবী লেখিকা ছিলেন; লেখিকার রচিত তারিখচিত্র (রাজস্থানীয় ইতিহাসমূলক আখ্যানিকা) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৮৯। **প্রমোদচন্দ্র (চাঁদ) উর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায়)** (১৮০৫-১৮৬৭) : বর্ধমান জেলার অধিবাসী। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে উক্ত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং স্বদীর্ঘকাল (১৮৩১-৬৩) এখানে অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পর কাশীবাসী হন এবং তথায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ইহলীলা সংবরণ করেন। যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন তন্মধ্যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৯০। **কুলকুমারী দেবী (গুপ্তা)** (১৮৬৯-১৯৩১) : গ্রামাচরণ সেনের কন্যা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান নিবাসী শ্রীচন্দ্র গুপ্তের সহিত বিবাহ হয়। 'সৃষ্টিরহস্ত' রচনা করিয়া তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের সম্মানস্বরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ইহা ছাড়া 'অধসর' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (১৯০৮)।

২রা মার্চ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

২১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৯৪ ) : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ( ১৮৫৮ ) এবং বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রের অমর স্রষ্টা ।

২২। বলবন্ত গঙ্গাধর ঠিলক ( ১৮৫৬-১৯২০ ) : ‘লাল-বাল-পাল’ জরীর অন্ততম রাজনীতিবিদ ও জননায়ক । তদানীন্তন কংগ্রেসের ‘চরমপন্থী’ দলভুক্ত ছিলেন । দেশের ক্ষয় বহবার কারাবরণ করেন । ‘গীতারহস্য’, ‘The Orion’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা । মহারাষ্ট্রে ‘শিবাজী-উৎসব’ প্রবর্তন করেন ।

২৩। বজ্জাল সেন : সেন বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি । খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন । বাংলা দেশে কোলিঙ্গ প্রথা প্রবর্তন করেন । ই‘হারাই পুত্র লক্ষ্মণ সেন । ই‘হারা ব্রহ্ম-কন্দিয় ছিলেন ।

২৪। বায়রন, লর্ড জর্জ গড্ড’ন (Byron, Lord George Gordon, ১৭৮৮-১৮২৪) : ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবি । ‘Child Harold’s Pilgrimage’ অন্ততম রচনা । পরে গ্রীক বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন এবং তথায় মারা যান ।

২৫। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ( ১৮৪১-১৮৯৯ ) : প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক । অঐত্যাচারের অধস্তন পুরুষ । সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন । যৌবনে দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন কিন্তু পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেন ( ১৮৮৬ ) ।

২৬। বিডন, সার সিঙ্গিল (Beaon Sir Cecil) : সিঙ্গিলিয়ন হিসাবে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন । স্বীয় ‘মধ্যবসায়ের পরে বাংলার শাসনকর্তা হন (১৮৬২-৬৭) । তাঁহার আমলে কলিকাতায় কলের জলের প্রচলন হয় । নীলকর সাহেবদের বিরোধিতা করায় তাহাদের বিরাগভাজন হন ।

২৭। বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা ( ১৮৬৬-১৯১২ ) : মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । ‘কলিকাতার ইতিহাস’ রচনা করেন ।

২৮। বিভারিজ, হেনরী (Beveridge, Henry ১৮৬৭-১৯২২) : ‘A Comprehensive History of India’ গ্রন্থের প্রণেতা বিভারিজের পুত্র এবং ‘বিভারিজ প্ল্যান’ খ্যাত গার উইলিয়ম বিভারিজের পিতা । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন । স্ত্রী অ্যান্‌-ও বিদুযী রমণী ছিলেন । রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে The Trial of Maharaja Nando Kumar আবুল ফজলের আকবরনামার অনুবাদ, Memoirs of Jehangir প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

২৯। বিহারীলাল চক্রবর্তী ( ১৮৩৫-১৮৯৪ ) : ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । অল্পবয়সে মাতৃহারা হন । বিদ্যালয়ে পড়াশুনা অধিক মূল্য অগ্রসর হয় নাই কিন্তু বাল্যকাল হইতে কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি অস্বাভাবিক ছিল ।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে বহুমুত্র রোগে মারা যান। স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীত শতক, সারদামঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

১০০। বিটন, ড্রিংকওয়াটার (Bethune, John Elliot Drinkwater, ১৮০১-৫১) : কেমব্রিজের প্রখ্যাত ছাত্র। আইন অধ্যয়নান্তে বিলাতে হোম অফিসে ওকালতি শুরু করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন (এপ্রিল ১৮৪৮)। আয়ত্বা পদাধিকারবলে Council of Education-এর সভাপতি ছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানাগর প্রভৃতির চেষ্ঠায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Female School (বর্তমান বেথুন স্কুল) স্থাপন করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট দেহত্যাগ করেন।

১০১। ব্রহ্মমোহন মল্লিক : ১৮৩২ সালে ৬ই জুন তারিখে হুগলী জুটিয়া বাজারে জন্ম। গণিত-শাস্ত্র এবং সাহিত্য—দু'দিকেই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৬০ সালে 'রঞ্জিত সিংহের জীবনী' রচনা করেন। ১৮৭১ সালে থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে পাঁচখানি গণিতের পুস্তকও তিনি রচনা করেন।

১০২। ভরতচন্দ্র শিরোমণি : দক্ষিণ ২৪-পরগনার লাকুলবেড়িয়া গ্রামে বৈদিক পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য্যকাল (১৮৪০-৭২) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানাগর, গির্গিশ বিজ্ঞানরত্ন প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের মধ্যে দায়ভাগ, মনুসাহিত্য, স্বভিচঞ্জিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০৩। ভরতচন্দ্র রায় (মুখোপাধ্যায়) (১১১২-১১৬৭) বঙ্গাব্দ : হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী পেডো-বসন্তপুর গ্রামে এক ধনী ভূ-স্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করেন (আনুমানিক ১৭১২ খ্রি:)। বাল্যে টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ভ্রাতাদের সহিত মনোমালিঙ্গ ঘটায় দেবানন্দপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এখানে ফারসি ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। পিতা ঠিকমত খাজনা দিতে না পারায় তাঁকে একবার কারাবাস করিতে হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় হয় এবং মহারাজার সভাসদ নিযুক্ত হন। তখন হইতে তাঁর যশ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বহুমুত্র রোগে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অন্নদামঙ্গল, বিজ্ঞানমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১০৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই. (১৮২৫-১৮৯৪) : কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। বহু স্থলে শিক্ষকতা করেন। পরে ইনস্পেক্টর অফ স্কুল হন। শিক্ষা বিভাগের জন্ত বহু টাকা দান করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

১০৫। বদনমোহন ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) (১৮১৭-১৮৫৮) : 'পাখি সব করে সব গাতি পোহাইল, কাননে কুহুর কলি লকলি ফুলি'—র কবি বদনমোহন নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে ঐ কলেজের অধ্যাপক

নিযুক্ত হন। পরে জল-পণ্ডিত (১৮৫০) ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫৫) হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ই মার্চ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাসবদত্তা শিশুশিক্ষা ১ম, ২য় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

১০৬। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : কপোতাক্ষ তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম (২৫.১. ১৮২৪)। বাল্যে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ব্যারিস্টারি পড়িবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবৎসর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষ জীবনে আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটাইতে হয় এবং জেনারেল হালপাতালে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রেণী, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি সুপরিচিত।

১০৭। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : প্রাথমিক যুগের নাট্যকার হিসাবে এবং নাট্য রচনার একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক রূপে ইনি স্মরণীয়। নক্সা জাতীয় সংলাপ রচনার ধারা অনেকে যে মধুসূদনের প্রবর্তনা মনে করেন সে কথা ঠিক নয়। ইহার 'চার ইয়ারে (২) তীর্থযাত্রা' নাটকটিই এ ধরনের প্রথম রচনা। ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। ইহাতে রচনার কৃতিত্ব যে খুব বেশী আছে তাহা নহে—তবে শহরের নেশাখোর যুবকদের প্রতি লেখকের প্রচণ্ড বাঙ্গ তাহাদের অতীব দুর্বস্থা হইতেই প্রমাণিত হয়। মৃত্যু : ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

১০৮। মহেশচন্দ্র জ্যাক্সরত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়-ভট্টাচার্য) (১৮৩৬-১৯০৬) : বিদ্যালগর, ই. বি. কাওয়েল ও সঙ্গরকুমার সর্বাধিকারীর পর মহেশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ অধ্যক্ষ হন (১৮৭৭-১৮৯৫)। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বদর্শন সংগ্রহ, কুহুমাজ্জলি তাৎপর্য বিবরণ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুত্র মন্থনাথ (১৮৬৩-১৯০৮) পঞ্জাবের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হন। বাঙালীদের মধ্যে মন্থনাথই প্রথম এ. জি.-র পদ অলংকৃত করেন।

১০৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪২-১৯০২) : শিদিরপুরের অধিবাসী। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রব-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় তাঁহার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পত্রালাপে প্রবৃত্ত হন। মৃত্যুর পর লণ্ডনের চার্ট অফ হিউম্যানিটি-তে তাঁহার স্মৃতিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ উৎকীর্ণ হয়।

১১০। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) : রাজা রামমোহন রায়ের অন্ততম প্রাথমিক শিষ্য ও একান্ত সচিব নন্দকিশোর বসুর পুত্র। কলিকাতার, দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁহাদের আধিবাস কলিকাতার গড় গোবিন্দপুরে। ছেয়ার সাহেবের স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন। দশপাঠীদের

মধ্যে মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি পরবর্তী জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লম্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ( ১৮৪৬ ) এবং ক্রমে আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা হন। শিক্ষকতা কার্কে মেদিনীপুরে বহু বৎসর কাটান ( ১৮৫১-৬২ ) এবং তথায় অনেক জনহিতকর কার্য করেন। ‘স্বরাপান-নিবারণী সভা’ স্থাপনা জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর দেওঘরে পরলোক প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মসাহস্রনাম, তাৎপলোপহার, আত্মচরিত, হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১১১। **রাজেন্দ্রলাল মিত্র**, সি. আই. ই. ( ১৮২২-১৮৯১ ) : প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রত্ন-তাত্ত্বিক। মেডিক্যাল কলেজের কৃত্তী ছাত্র এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর ছিলেন। বিদেশের বহু বিদ্বজ্জন-সভা কর্তৃক সম্মানিত হন। সচিত্র প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া বহু পুস্তক রচনা করেন।

১১২। **রাধাকান্ত দেব**, রাজা ( ১৭৮৪-১৮৬৭ ) : মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আশ্রয়িতা ইহার সভাপতি ছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম রচনা জীবনের অক্ষয় কীর্তি। রামমোহন রায়ের প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন।

১১৩। **রাধামাধব কর** : জন্ম : ১৮৫৩। সে যুগের বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাদাস করের মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ( আর. জি. কর ) বিখ্যাত টিকিৎসক ছিলেন। রাধামাধব কর এক খ্যাতিমান অভিনেতা এবং নাট্য উন্নয়ন প্রকল্পের একজন কর্ণধার ছিলেন। আদি জ্ঞানদাল থিয়েটার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে—গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রামুখ্যে গেলেন নব-গঠিত ‘স্টার’ থিয়েটারে; রাধামাধব কর কয়েকজনের সঙ্গে ‘এম্বালড থিয়েটার’-এ যোগ দেন। ইনি নাট্যকার হিসাবেও নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন না। ১৮৭২ সালে ‘বল্লভ কুমারী’ নামে একটি নাটক রচনা করেন। গল্প ও পট্টের সংমিশ্রণে ইহা একটি বিরোগান্ত নাটক।

১১৪। **রামকমল ভট্টাচার্য** ( ১৮৩৪-১৮৬০ ) : সংস্কৃত কলেজের কৃত্তী ছাত্র। নর্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাত্র ছাত্রীণ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। বেকনের সন্দর্ভ, জ্যামিতি, ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

১১৫। **রামচন্দ্র মিত্র** ( ১৮১৪-১৮৭৪ ) : হিন্দু কলেজের অধ্যয়নকালীন কৃত্তী ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। পরে হিন্দু ( ও পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্সি ) কলেজের

বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বেথুন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। পঞ্চাবলী, জ্ঞানাবেষণ প্রভৃতি পত্রিকা সাক্ষ্যের সহিত সম্পাদনা করেন। কয়েকটি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। বাংলায় প্রথম মানচিত্র প্রস্তুত করেন ( ১৮৫০ )।

১১৬। **রামভদ্রু লাহিড়ী** ( ১৮১৩-১৮৯৮ ) : ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনের পর হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বর্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সুনামের সহিত শিক্ষকতা করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অগস্ট ইহলীলা সংবরণ করেন।

১১৭। **রামনারায়ণ তর্করত্ন (ভট্টাচার্য)** ( ১৮২২-১৮৮৬ ) : ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত হরিনাথ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহারা হওয়ায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাভাগর মহাশয় ও তৎপত্নী কর্তৃক লালিত পালিত হন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও পরবর্তী কালে ইহার অধ্যাপকও ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ মাসে মারা যান। রচিত গ্রন্থের মধ্যে পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক, বেগীসংহার নাটক, নব নাটক, কল্লিগীহরণ নাটক, আর্থাশতকম্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'নাটকে রামনারায়ণ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

১১৮। **রামেন্দ্রসুন্দর জিবদী** ( ১৮৬৪-১৯১৯ ) : ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কান্দী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. দিয়া প্রথম হন এবং পরবৎসর প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিপন ( বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ ) কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে ইহার অধ্যক্ষও হন ( ১৯০৩-১৯ )। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিনের জন্য ইহার সভাপতি হন। রচনাবলীর মধ্যে প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, চরিত কথ', যজ্ঞ কথা প্রভৃতি সুপরিচিত।

১১৯। **রিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন ( Richardson, David Lester )** : ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীন চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিনের পার্শ্চর নিযুক্ত হন। মধ্যে কিছুকাল Calcutta Literary Gazette, Calcutta Magazine, Bengal Annual, Bengal Hurkaru প্রভৃতি পত্রিকা অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেন ( ১৮৩০-৩৬ )। পরে হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু চারিত্রিক অবনতির জন্য শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পদে বঞ্চিত হন ও চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বহু পরে কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তাঁহার শৈল্পীয় পাঠ্য সে যুগের বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক কবি-প্রতিভার উদয়েষণের জন্য তিনি



বহু অংশে দায়ী। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ভূবেন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত (গুপ্ত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর স্বদেশে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। *History of the Blackhole of Calcutta Literary Leaves, Literary Chitchat* প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচনা।

১২০। **শিল্পিকুমার ঘোষ** (১৮৪০-১৯১১) : যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কলুটোলা ব্রাহ্ম (বর্তমান হেয়ার) স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৫৭)। স্বগ্রামে ভ্রাতার সহিত ‘অমৃত প্রবাহিনী’ পত্রিকা বাহির করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজীতে ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ সম্পাদনা করিতে শুরু করেন (১৮৬৮)। মধ্যে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁর রচিত ত্রীঅমিয় নিমাই (১ম ভাগ) ও Lord Gourango (I & II) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১২১। **শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়** (১৮৩৮-১৯২৮) : হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাস করেন। বিভিন্ন সময়ে মালদা, আরো এবং ছাপরা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। শেষ জীবনে উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

১২২। **শ্যামাচরণ (শর্ম) সরকার, বিজ্ঞানভূষণ** (১৮১৪-১৮৮২) : নদীয়ার অধিবাসী। পিতা হরনারায়ণ সরকার পুণিয়ার দেওধান ছিলেন। ফার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি বহু ভাষায় দখল ছিল। কালকাতা মাদ্রাসা (১৮৩৭-৪২) ও সংস্কৃত কলেজে (১৮৪২-৪৮) বহুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে সুপ্রীম কোর্টের চাফ ইন্টারপ্রিটর নিযুক্ত হন (১৮৫৭)। প্রথম ঠাকুর আইন অধ্যাপক হার্বার্ট কাওয়েলের পর দ্বিতীয় ঠাকুর আইন অধ্যাপক রূপে পর পর দুই বৎসর (১৮৭৩ ও ৭৪) নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *Introduction to the Bengalee Language* (১৮৫০), বাংলা ব্যাকরণ (১২৫৯ সাল), *The Mahammadan Law*, পাঠ্যসার, নীতি-দর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১২৩। **সার্টক্লিফ, জেমস (Sutcliffe, James C.)** : প্রথমে হিন্দু কলেজের ও পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের (প্রথম) অধ্যক্ষ হন। গণিতের অধ্যাপনায় সুনাম অর্জন করে। বীজগণিত বিষয়ে গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় এক যুগ ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে বৃত্ত ছিলেন। পরে শিক্ষা অধিকর্তা (ডি. পি. আই.) হন। মৃত্যু : ২৯ জুলাই ১৮৭৮।

১২৪। **সারদাচরণ মিত্র** (১৮৪৮-১৯১৭) : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিদারী কৃতী ছাত্র ছিলেন। চার বৎসর হাইকোর্টের বিচারক

পদে আসীন ছিলেন ( ১২০৪-১২০৮ ) । প্রথম জীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন । সেনেটের সভ্য ছিলেন । টেম্পোর ল লেকচারার নিবৃত্ত হন ( ১২০৫ ) । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি । সারা দেশে নাগরীলিপি প্রচারকল্পে ‘একলিপি প্রচার সমিতি’ স্থাপন করেন । বিজ্ঞাপতির সটীক রচনাবলী, কায়স্থকারিকা, ল্যাণ্ড ল অভ বেঙ্গল প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখ্য রচনাবলী । কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং বর্তমানে উহা ‘সারদাচরণ এরিস্তান ইনস্টিটিউশন’ নামে খ্যাত ।

১২৫ । **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** ( ১৮৩৮-১২০৩ ) : ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল হুগলী জেলার রাজবল্লভহাটে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করেন । পরে আইন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬২ খ্রীঃ মুন্সেফ নিযুক্ত হন । কিছুকাল মুন্সেফী করিবার পর স্বাধীনভাবে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং ১৮৯০ খ্রীঃ প্রধান সরকারী উকিল হন । ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে ইহলীলা সংবরণ করেন । বীরবাছ কাব্য, বৃৎসংহার, নাকে খং ( ১৮৮৫ ) প্রভৃতি রচনা প্রসিদ্ধ ।

১২৬ । **হেয়ার, ডেভিড** (Hare, David—১৭৭৫-১৮৪২) : স্কটলণ্ডের অধিবাসী। পশ্চিম বংলার বয়সে ঘড়ি ব্যবসায়ী হিসাবে কলিকাতায় আসেন । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গুর হস্তে ব্যবসা অর্পণ করিয়া এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করেন । তাঁহারই পরামর্শ ও পরিকল্পনা মত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বৎসরে প্রধানত তাঁহারই প্রচেষ্টায় স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয় । হিন্দু কলেজের ভবন নির্মাণের জন্ত গোলদীঘির উত্তর দিকের ভূমিখণ্ডটি দান করেন ( বর্তমানে এখানে সংস্কৃত স্কুল ও কলেজ এবং হিন্দু স্কুল অবস্থিত ) । স্কুল বুক সোসাইটির অধীন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল তিনিই পরিচালনা করিতেন ( বর্তমানে ইহা ‘হেয়ার স্কুল’ নামে পরিচিত ) । এদেশে হুইতে মরিশাস প্রভৃতি স্থানে কুলি চালানোর বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপিত করেন এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করেন । চিরকুমার হেয়ার কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ইহলোক ত্যাগ করেন ।

দেখ মাতা গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,  
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর ।  
দীন ভুখী শিশুদের পরম আশ্রয়,  
বঙ্গের বদান্ত বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়,  
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্মল শিধান  
যার জন্য করেছেন সর্বশ্রম প্রধান । —দীনবন্ধু মিত্র ।

## রচনাপঞ্জী

কাভিকেশচন্দ্র রায়—আত্ম-জীবনচরিত

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—উমেশচন্দ্র দত্ত ( মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩ )

ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

গৌরীকৃষ্ণগোপাল সেনগুপ্ত—বিদেশীয় ভারত-বিজ্ঞা পঞ্চিক

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হান্তরস

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

তারানাথ তর্কভূষণ—তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিজ্ঞার উন্নতি (১৮৯৩)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—ভারত কোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড

—সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম-২য় খণ্ড

বিশ্বকোষ

বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম-৩য় খণ্ড

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গ সাহিত্যে নারী

—বঙ্গীয় নাট্যশালা

—বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস

—সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর

ময়ধনাথ ঘোষ—মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু ( মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩ )

—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ( মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩-২৪ )

—হেমচন্দ্র ( ১ম খণ্ড )

মহেন্দ্রনাথ দত্ত—কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা

মোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলার উচ্চশিক্ষা

—বাংলার জনশিক্ষা

—বেথুন সোসাইটি

যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত

রজনীকান্ত গুহ—সোক্রাটিস ( ১ম )

রজনীকান্ত মৈত্র—জীবন স্মৃতি

রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত

—সে কাল আর এ কাল

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনী কোষ, ১ম-৫ম খণ্ড

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতল্লাহ লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গ সমাজ

লঙ্গদ ঝাঙালী চরিতাভিধান

- সতীশ মুখোপাধ্যায়—ভারত প্রতিভা, ১ম খণ্ড  
 ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড  
 সুধীরকুমার মিত্র—হুগলী জেলার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড  
 হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—কালিদাসের কুমারসম্ভবম্  
 হরিহর শেঠ—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়  
 হেমেন্দ্রকুমার রায়—বাঁদের দেখেছি, ১ম খণ্ড  
 Banerjee, Hiranmay—The House of Tagores  
 Bethune College Centenary Volume, 1949  
 Ghosh, K. C.—The Roll of Honour  
 High Court Centenary Souvenir, 1962  
 Hundred Years of the University of Calcutta, 1957  
 Mittra, Peary Chand—David Hare  
 Nurullah and Naik—The Students' History of Education in India  
 Presidency College Centenary Volume, 1955  
 Presidency College Register (1927)  
 Oxford Illustrated Dictionary  
 Stache-Rosen, Valentina—German Indologists  
 Talukdar T. N.—History and Register of Krishnagar  
 College (1846-1945)

## নির্ঘণ্ট ব্যক্তি

অকল্যাণ্ড, লর্ড ১৭৪, জী ৩৩৫  
 অক্রুর দত্ত ১৮৫  
 অক্ষয়কুমার দত্ত ২৮, ৫৬, ১৮৭, ২৬২,  
 ৩২৫, ৩২৬, জী ৩৩৫  
 অক্ষয়কুমার মজুমদার ২২৪, ২২৭  
 অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ৩২, জী ৩৩৫  
 অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১০৬, ২০৬, ২০৭,  
 জী ৩৩৫  
 অখিলচন্দ্র চন্দ্র ১২৮, ২২৪, ২৪১  
 অগষ্টিন, সেন্ট ৩১১, ৩২১  
 অজিতনাথ স্মায়রজ, মহামহোপাধ্যায়  
 ১৮৬, জী ৩৩৬  
 অম্বকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৪২, জী ৩৩৬  
 অন্নদা মুখোপাধ্যায় ৮০  
 অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২, ৮০  
 অবিনাশ মুখোপাধ্যায় ২৫১  
 অবিনাশচন্দ্র কর ২০৫, ২০৯, ২১১  
 অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৫৩, ৮০, ২২২  
 অভয় দাস ২২৫  
 অভয়চন্দ্র মল্লিক ১২১, ১২২  
 অভিজার ঘোষ ৩২৪  
 অমর সিংহ ৩২৮  
 অমৃতলাল পাল ২১৫, ২৫৬  
 অমৃতলাল বসু (তুনি বোস) ১৮৩,  
 ১৮৪, ১৮৫, ১২৫, ১২৯, ২০২,  
 ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১২,  
 ২১৫, ২১৯, ২২২, ২৩১, ২৪৬,  
 ২৫৬, ২৫৭, ৩৩২, জী ৩৩৬  
 অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু  
 বা কাপ্তেন বেল) ২০৫  
 অম্বিকাচরণ ঘোষ ১৪৮, ১৫৫, ১৫৬,  
 ১৫৭, জী ৩৩৭

অরুণচন্দ্র হালদার ২৫০  
 অরুণেশ্বরের মুস্তফি ৮৪, ১৮৩, ১৯৯,  
 ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪,  
 ২০৫, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২,  
 ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২২৩, ২২৪,  
 ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩৩,  
 ২৪২, ২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫,  
 ২৫৬, ৩৩৪, জী ৩৩৭  
 অ্যাটকিন্সন ১৫৩, ১৮১  
 অ্যাডাম, উইলিয়াম ১৪৭, জী ৩৩৭  
 অ্যাডিসন, জোসেফ ৫৬, ১০৬, জী ৩৩৭  
 অ্যাবারক্রিফি ২৮৯  
 অ্যাভিনিয়ন ১৪  
 অ্যারাগো ১১, ১২  
 অ্যালেন ৩৮  
 আদিশুর ৭৮, ৭৯, জী ৩৩৭  
 আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ১৪৯, জী ৩৩৮  
 আনন্দমোহন বসু ২৮৯, ২৯০  
 আপালচন্দ্র বিশ্বাস ২৫০  
 আব্দুল মিস্ত্রী ২০৮  
 আব্দুল লতিফ, নবাব বাহাদুর ১৭১,  
 জী ৩৩৮  
 আয়রণসাইড, ব্যাক্স ১৮৯  
 আরিয়টো, লোভোভিকো ৩১১, ৩২১  
 আরিষ্টফেনিস ৩১১, ৩২০  
 আরিষ্টটল ৩০৯  
 আকিমিডিস ৩১০  
 আর্চার, চার্লস ১৪৮, ১৫৬  
 আর্থার, ম্যাক ১৭০, ১৭১  
 আর্নট, স্টিফোর্ড ২২৮  
 আলফ্রেড ৩১১, ৩২১  
 আলিবর্দী খাঁ ৩২৫  
 আলেকজান্ডার ৩১১, ৩২০

আন্ততোধ দেব ( ছাতুবাৰু ) ২, ৪, ৫,  
৭২, ৮০, ৮৪, ২২৬, ২২৭, ২৪৫,  
২৬২, জী ৩৩৮

ইউক্লিড্ ১৪৮

ইডন, সার 'অ্যাশলি / অ্যাশলী ১৮১,  
১৮২, জী ৩৩৮

ইনোসেণ্ট, তৃতীয় ৩১১, ৩২১

ইয়ং, গৰ্ডন ২২, ১৬২, ১৬৬, ১৭৮,  
জী ৩৩৮

ইয়েটল ১৪২

ঈশানচন্দ্ৰ নিয়োগী ২৫০

ঈশানচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮

ঈশানচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ২৩৩

ঈশানচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত ২৩৫

ঈশ্বৰ ঘোষ ১৫৭

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ গুপ্ত ৪১, ৪৭, ৫৫, ৫৬, ৫৭,  
৫৮, ৮৮, ১১৩, ২৩২, ২৬২, ২৭৩,  
৩২৬, ৩৩২, জী ৩৩৮

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ নন্দী ১৮৭

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিজ্ঞানাগৰ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ৬,  
৭, ৮, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৫,  
২৬, ২৭, ২৮, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫,  
৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৬,  
৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮২,  
৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০৪, ১০৭,  
১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫,  
১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০,  
১২১, ১৪৫, ১৪৯, ১৬৫, ১৭৮,  
১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০,  
২৪২, ২৪৭, ২৫৪, ২৬৫, ২৬৯,  
২৭৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮৫, ২৮৬,  
২৮৭, ২৮৮, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪,  
৩০১, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, জী ৩৩৯

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ মিত্ৰ ১৫৮, ২৩৩

ঈশ্বৰচন্দ্ৰ সিংহ, ৰাজা ৭৯, জী ৩৩৯

উইলসন, হৰেস হেম্যান ৬৫, ১১৮,  
২৪৮, ২৯৮, ৩৩০, জী ৩৩৯

উইলিয়ম, তৃতীয় ৩১১, ৩২২

উইলিয়ামস, সার মনিয়ৰ / মনিয়ৰ  
৮৮, জী ৩৪০

উড, সার চাৰ্ল'স ১৭৮

উড্ৰো, এইচ ২২, ১১০, ১৬১, ১৭৯,  
১৮১, ১৮৮

উদয়চাঁদ বসাক ২৮৪

উদয়নাচাৰ্য্য ১২১, ২৮৮, জী ৩৪০

উপেন্দ্ৰ মিত্ৰ ১৬১

উপেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ২১৭

উপেন্দ্ৰনাথ দাস ১৯৩, ২৪৯, জী ৩৪০

উপেন্দ্ৰমোহন ঠাকুৰ ২১৩

উমাকান্ত ৱায় ১৬৭

উমাকালী মুখোপাধ্যায় ৬২, ১২৭

উমাচৰণ ঘোষ ১৫৭

উমাচৰণ মিত্ৰ ১৭৪

উমেশ দে ২৪১

উমেশচন্দ্ৰ গুপ্ত ১১৫

উমেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী ২৪৯

উমেশচন্দ্ৰ দত্ত ( O. C. Dutt. ).  
৮০, ১৬৮, ২২৮, ২২৯

উমেশচন্দ্ৰ দত্ত ( গুপ্ত ) ১৪৩, ১৫১,  
১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০,  
১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ২২৭,  
৩২৮, জী ৩৪০

উমেশচন্দ্ৰ বটব্যাল ২৪৯

উমেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ডব্লিউ. সি.  
ব্যানাৰ্জি ) ৯৩, ৯৪, ১৮৫, ২২৮,  
২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, জী ৩৪১

উমেশচন্দ্ৰ মিত্ৰ ৮১, ২৪৭

ঋষিবৰ মুখোপাধ্যায় ২৮২

একুইনিল, সেন্ট টমাস ৩১১, ৩২১

এডিনবরা, ডিউক ১২০

এডওয়ার্ড, সপ্তম ৪০

এণ্ডরুজ, হীনবন্ধু চার্লস ক্রীয়ার ২৫৮,  
২৫৯, জী ৩৪১

এন. সরকার ২৩৩

এলিয়ট, অগষ্টস ১৪৭, ১৫২

এলোকেশী ২২৭

এসকাইলস ৩১১, ৩২০

ওয়ার্ট, জেমস ৩১১, ৩২১

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ৪১

ওয়ার্ডারল ২২৫, ২২৬

ওয়ারেলস, অার মর্ডেন্ট ১০২

কঙ্কলীন্ত ১১

কটন, লার হেনরী জন স্টেভমান ২৩

২৪, ২২১, জী ৩৪১

কডি ভট্টাচার্য্য ২৪১

কণাদ ৩১৩

কণিক ৬১

কর্নিয়ে (Corneille), পিয়ের ৩১১,  
৩২১

কনফুলিয়স / কনফিউসিয়াস ৩১১,  
৩১৩, ৩২০

কপিল ৩১৩

কবিচন্দ্র ৪, ৮০

কমলাকান্ত ২

কলম্বস, ক্রিস্টোফার ৩১১, ৩২১

কাউচ, লার রিচার্ড ১৩

কাউপার ৮৮, ১৭২

কাউয়েল / কাওয়েল এডওয়ার্ড বাইলস  
২২, ২৩, ১২১, ২৮৮, জী ৩৪১

কাকিলাল, কবি ৭২

কাণ্ট, ইমানুয়েল ২৭০, ৩০৪

কাদম্বরী দেবী ৩২৮

কানাইলাল দে ২৫৬

কানাইলাল পাইন ১৭২, জী ৩৪২

কাহ্ন রায় ৩২৪

কামাখ্যাচরণ ঘোষ ১০৬

কাম্পবেল ১৬৬

কার্তিকচন্দ্র পাল ২০৬

কার্তিকচন্দ্র মিত্র ৪১

কার্তিকেশ্বর চন্দ্র রায় (চক্রবর্তী), দেওয়ান  
১৬৭, জী ৩৪২

কার্ণি, এম' সি ১৫৮

কারলাইল / কারলাইল, টমাস ১৫,  
২২৬, জী ৩৪২

কালিকাদাস দত্ত ১৬২, ২৮৮

কালিদাস, মহাকবি ২১, ২৬, ৬১, ৮৮,  
৩১৩, ৩১৬

কালিদাস সান্ন্যাল ১২৬, ১২৭, ২১৫

কালীকঙ্কর পালিত ১০১

কালীকুমার দাস ৪২, ১৮১

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৮৫, জী ৩৪২

কালীকৃষ্ণ পণ্ডিত ১৮

কালীচরণ ঘোষ ১৪৫, ১৫৭

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৫৭, ২২৫, জী  
৩৪২

কালীপ্রসন্ন বিহারী ১৮১

কালীপ্রসন্ন সিংহ ২, ৫, ৮, ৯, ৪৪,  
৪৫, ৪৬, ৮০, ৮১, ১৮১, ২১৭,  
২১৮, ২২৫, ২৫০, ৩০০, ৩২৪,  
৩২৬, জী ৩৪২

কালীদয় বেদান্তবাসীশ ২৬৬, ২৭১

কালোমতী ২২২

কান্নি ঘোষ ২২২

কান্নিয়ার দাস ২৩, ১১২, ২৪৩, ২৮২

কান্নিধর মিত্র ১৬৫

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫, ২১১,  
২১২, ২২৫, ২২৬

- কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ ৰায়, মহাৰাজা ১১৮, জী  
৩৪৩
- কুন্দমালা দেবী ৪৪
- কুন্তিৰাস ২৩, ২৪৩, ২৮২
- কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য ১০, ১৬, ১৭, ৩৬,  
৫২, ৮৪, ৯৩, ৯৯, ১০৬, ১০৭,  
১১৫, ১২২, ১২৫, ১৭২, ১৪৩,  
১৪৯, ১৬৫, ১৭৯, ১৮১, ২৬১,  
২৭৩, ২৭৬, ২৮২, ২৯২, ৩০২,  
৩২৫, ৩২৬, জী ৩৪৩
- কৃষ্ণকিষ্কর ভট্টাচাৰ্য্য ২৮৩
- কৃষ্ণচন্দ্ৰ ৰায়, মহাৰাজা ১৪৩, ১৬৯,  
২৭৬, ২৭৮, জী ৩৭৩
- কৃষ্ণদাস পাল ৮, ৪৪, ৫৪, ১৮৫,  
জী ৩৪৪
- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ১২৪
- কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় ৮০
- কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৩, ৩২৮
- কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রেভাৰেণ্ড  
২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ১৪৬, ১৬৩,  
১৬৪, ১৮১, ২৭৯, ২৮০, ২৯৪,  
২৯৮, জী ৩৪৪
- কে. এম. চাট্টাৰ্জী, জজ ৯৩, ৯৪
- কেদারনাথ ঘোষ ২২৫
- কেদারনাথ বসু ২৪৩
- কেম্প ৩৩, ১৬৬, ২২৬
- কেম্পিস, টমাস আ ৭৭, জী ৩৪৮
- কেল, ইনস্পেকটর ২৪১
- কেশব লাহিড়ী ১৪৬, ১৬৭
- কেশবচন্দ্ৰ গাঙ্গুলী ৮২
- কেশবচন্দ্ৰ সেন ৪৮, ৮১, ১০২, ১০৫,  
১৬৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২১৯,  
২৪৯, ২৭২, ৩২৬, জী ৩৪৪
- কৈলাচচন্দ্ৰ বসু ১৮৪, ১৮৬, ২০২
- কোং / কোমত, অগষ্ট / অক্টোব ১০,  
১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ৩০, ৩১,
- ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৮, ৬৭,  
৬৮, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৯১, ৯৩,  
৯৪, ৯৫, ১৮০, ৩০০, ৩০২, ৩০৩,  
৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮,  
৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪,  
৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯,  
৩২৪, জী ৩৪৪
- কোবৰ্ণ (Cockburn) ১৫০
- কোর্টেন, এফ. এফ. ১৭২
- ক্যানিং, লৰ্ড ৬৩
- কামাৰণ ১৭৮
- ক্যাম্পবেল, লায় জৰ্জ ১৮১, ১৯৮
- ক্যাম্বেল ২২৪
- ক্যালিয়ন, পেড্রো ৩১১, ৩২১
- ক্ৰফট, আলফ্ৰেড ১৬১, ২৮৯, ২৯০
- ক্ৰমওয়েল, আলভায় ৩১১, ৩২২
- ক্ৰস, মেৰী আন ( ইলিয়ট, জৰ্জ /  
কুকাৰী ইভাং ) ৩০২
- ক্ৰাউন ১৬৩
- ক্ৰোম্ব, লৰ্ড ২১৩
- ক্ৰাব ৮৮
- ক্ৰাফট ১৫৯
- ক্ৰিষ্ট ২৮৯
- ক্ৰেটিনড ১২, ১৩, ১৪
- ক্ৰেব্র সেন ৮২, ৮৩
- ক্ৰেব্রচন্দ্ৰ ঘোষ ২৯৯, ৩০০, ৩৩১
- ক্ৰেব্রমোহন গাঙ্গুলী ২০৫, ২১০, ২১১  
২১২, ২২৫, ২২৭
- ক্ৰেব্রমোহন সিংহ ৮০
- খয়েকদি ১৬৭
- গঙ্গাপ্ৰসাদ সেন, কবিরাজ ২০২
- গটেনবাৰ্গ ৩১০
- গণেশ পণ্ডিত ১৮৭
- গদা-গোপাল ('গোপাল বজ্জবদাৰ' হুটবা)  
গদাই চক্ৰবৰ্ত্তী ১৫৪



গফ ২৮৮

গাঙ্গী, মহাশ্বে ২৬০, ২৭৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার) ২০১, ২০২

২০৩, ২০৪, ২০৮, ২১০, ২১১,

২১২, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২১৯,

২২০, ২২২, ২২৩, ২২৮, ২৪৩,

২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২ ২৫৩,

২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, জী ৩৪৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্বাদাঙ্ক) ২২৭

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক) ৫৩,

২২৯, ৩০০, ৩০১, ৩৩১, জী ৩৪৫

গিরিশচন্দ্র বিহার্য (ভট্টাচার্য) ১০৫,

জী ৩৪৫

গিরিশ মিত্র ২২৬

গিরীন্দ্র চক্রবর্তী ২১৬

গিরীশ মিত্র ২০১, ২৪৮

গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৫৭

গিরীশচন্দ্র দাস ২২২

গিরীশচন্দ্র দে ১৮৮, ২০০, ২৪১

গিরীশচন্দ্র রায়, মহারাজা ১৬৭, ১৬৮,

জী ৩৪৫

গুড্ ১৮৭

গুড্‌গুড্‌ ভট্টাচার্য ( 'গৌরীশঙ্কর

ভট্টাচার্য' জটব্য )

গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৫৪

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪, ৩৭, ১৮৫,

২৮৯, ২৯১, ৩২৫

গুরুপ্রসাদ সেন ১২২

গেডিজ ২৩

গোপাল ( 'সুকুমারী দত্ত' জটব্য )

গোপাল মজুমদার ( গদা-গোপাল )

২৪৬, ২৪৭

গোপাল মল্লিক ৬৪

গোপালচন্দ্র দাস ২০৫, ২১২, ২২৪,

২২৬, ২৫৬

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য ১০৪

গোপীমোহন ঠাকুর ( বন্দ্যোপাধ্যায়,

কুমারী ) ৮১, জী ৩৪৬

গোবিন্দ অধিকারী ২৩৪, ২৩৫

গোবিন্দ কোজার ১৫৪

গোবিন্দ গান্ধুলী ২০৩, ২৫৩

গোবিন্দ শিরোমণি ১৮, ৩২৪

গোবিন্দরাম উপাধ্যায় ৩২৯

গোলভার ( বিচারক ) ৩৩

গোলোক চট্টোপাধ্যায় ২০৫

গোল্ডস্ট্রাকার, থিওডর ২৭৯, জী ৩৪৬

গোল্ডস্মিথ ৩৫

গৌরদাস বসাক ৩৩৪

গৌরমোহন আচা ১৮৪, জী ৩৪৬

গৌরমোহন ধর ২০৯

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( ভট্টাচার্য )

৪৭, ৫৫, ১১৩, ১৮৬, ৩৩২,

জী ৩৪৬

গ্যালিলিও ২২৬, ৩১১, ৩২২

গ্রান্ট, সার জন পাটর ১৬৯, ১৭১,

১৭২, ১৭৩, জী ৩৪৬

গ্রিফিন্স ২৯১

গ্রো ৩০

গ্রোপেল, ভল্লিউ ২২০

গ্রোট ১১

গ্রাডটোন / গ্র্যাডটোন, উইলিয়াম

ইউজার্ট ১৫, জী ৩৪৭

ঘনশ্রাম ভট্টাচার্য ২৮৩

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৬১

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৫

চন্দন দাস ৪৪

চন্দ্রকুমার দে ৩৫

চন্দ্রশঙ্কর বিক্রমসিদ্ধি ৬১, জী ৩৪৭

চন্দ্রনাথ বসু ১৮৫, ১৮৭, ৩০১, জী ৩৪৭

চন্দ্রনাথ রায়, রাজা ২১৪, ২১৬, ২১৭

চন্দ্ৰমুখী বসু ১৯৫, জী ৩৪৭  
 চন্দ্ৰমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৬৯  
 চন্দ্ৰশেখর গুপ্ত ১৫৮  
 চাণক্য ৭২  
 চার্লস, দ্বিতীয় ৫৬  
 চার্লস নবম ৩০৮  
 চাক মুখ্যো ২৩৩  
 চিন্তামাণ সরকার ১০৫  
 চুণীলাল গুপ্ত ১৫৮  
 চুণীলাল / চুনীলাল বসু ৭৪, ২০২, জী ৩৪৭  
 চাপম্যান ১৭৯  
 জগদ্ধারিণী ২২৭  
 জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩০, ৪০, ২৪৯  
 জগদীশনাথ রায়, মহারাজা ২১৪, জী ৩৪৭  
 জগদ্বল্লভ বসাক ৭৮  
 জগন্নাথ পণ্ডিত ৪১  
 জগমোহন তর্কালঙ্কার ১০২  
 জনসন, স্যামুয়েল ২৫, ১৭৬, ৩২৫  
 জনার্দন সা ২৪৭  
 জয়কৃষ্ণ বসাক ২৮৪  
 জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ( ভট্টাচার্য ) ১১৮, ১১৯, জী ৩৪৮  
 জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ( ভট্টাচার্য ) ১০৪, ১০৫, ১১০, ২৮৫, জী ৩৪৮  
 জাইলস ২১৪  
 জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, ৩২৪  
 জীবন বোষ ২৯৯  
 জীবানন্দ তর্কবাচস্পতি ২৯৩, ২৯৪  
 জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১১১  
 জীমূতবাহন ২৮৬  
 জোন অব্ আৰ্ক, সাধনী ২৫, জী ৩৪৮  
 জোনস, রিচার্ড ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮  
 পুৰা. ২৪

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৬৫, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬  
 জ্যাকসন, স্যার লুইস ৩১, ৬১, ৬২  
 জ্যোতিৰঞ্জন ঠাকুর ২১, ২৭৩, ৩২৮  
 টান (Tawney, C. H.) ২৯০, ২৯৩  
 টমাস আ' কেম্পিস ( দ্রষ্টব্য 'কেম্পিস, টমাস আ' )  
 টাউয়াল ১৬৫  
 টেম্পল, স্যার রিচার্ড ১৬২, ১৬৩, ১৬৯, জী ৩৪৮  
 টেলর, মিষ্টার ১৪  
 টেলর, মিসেস ১৩, ১৪  
 টেলর, হেলেন ১৪  
 ট্ৰেভর, ই. টি. ১৪৮, ১৪৯  
 ট্ৰেভর, চার্লস বিনি ১৪৮  
 ডাফ, ডঃ আলেকজাণ্ডার ৪৯, ৬৪, জী ৩৪৮  
 ডাবউইন / ডার্কইন ৩০২, ৩১৭  
 ডালহৌসি, লর্ড ১৫০, ১৭১, ১৭২  
 ডি. ফো. ( ইংরেজ গ্ৰন্থকার ) ৫৮  
 ডিয়ার ১৪৬  
 ডিরোজিও, হেনরি লুইস ভিজিগান ১২১, ১৪৬, ২৬০ জী ৩৪৯  
 ডিসেন্ট ২৪৮  
 ডেকার্ট ৩০৯, ৩১০  
 ড্রাইডেন ৩৯, ১৫৪, ১৭৮  
 টিপলে ( দ্বন্দ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর ) ৭২-৮০, ১২১  
 তারকনাথ বোষ ২৩২  
 তারকনাথ পালিত, স্যার ২৯, ১০০, ১০১, ১০২, ২৯৬, ৩২৫, ৩২৮, জী ৩৪৯  
 তারাকান্ত রায় ১৬৭  
 তারাকান্ত গুহ ৮০

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ( ভট্টাচার্য্য )	দীনবন্ধু মিত্র ১৬০, ১৬২, ১৮০, ১৮৭,
৮, ২৪, ৫২, ৫৪, ৭৩, ১০৪, ১০৬,	১৮৮, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৪,
১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২,	২১৭, ২৩২, ২৫১, ২৫৩, ২৫৬,
১১৮, ২৮২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৭,	৩০১, ৩২৪, ৩৩১, জী ৩৫১
জী ৩৪২	দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২, ১০১, ১৭৪
তারানাথ ভট্টাচার্য্য ( তর্কভূষণ ) ১০৬	৩২৪
তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৭২	দুর্গাচরণ লাহা ১০১
তারাবিলাস লাহিড়ী ১৪৬	দুর্গাদাস কর ১৯৮, ২৩১
তারাকর তর্করত্ন ( চট্টোপাধ্যায় ) ২৬,	দুর্গাদাস চৌধুরী ১৫৮
২৯, ২৭, ১৮৭, জী ৩৫০	দুর্গাদাস পালিত ১০৮
তালো / টালো, তরকাতো ৫২, ৩১১,	দুর্গাদাস মুখুয্যে ২৫০
৩২১, জী ৩৫০	দুর্গানন্দ রায় ১৪৪
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯, ১৬৫	দেবনাথ মুখোপাধ্যায় ২৮২, ২৮৩,
তারিণীচরণ বসু ১৮৮	৩২৮
তারিণীচরণ মিত্র ২৬৪	দেবশঙ্কর দে ২৯০
তারিণীচাঁদ বসাক ২৮৪	দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর ২৩৪
তারিণীপ্রসাদ ঘোষ ১৫৭, ১৬২	দেবেন্দ্র ঘোষ ২৮২
তিনকড়ি মাল্লা ২১৫	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি (বন্দ্যোপাধ্যায়-
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ২০৫, ২১৫,	কুশারী) ৮, ৯১, ১৬৯, ২১৯, ২২৪,
২২৬	২৪৯, ২৯৪, ২৯৫, ৩২৫, ৩৩৩,
জৈলোক্যনাথ মিত্র ২৮২	জী ৩৫১
থওয়াটে (Thwayte) ১৫৮	দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৮, ২২৮
থালো ১৮৬	দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ২২৭
থেলিস ৩১১, ৩২০	দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৫৭
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা ৮,	দেলওয়ার থা ১৬৭
জী ৩৫০	দারকনাথ অধিকারী ১৫৭, জী ৩৫১
দয়াল রায় ১৫৩, ১৫৪	দারকানাথ ঠাকুর ( বন্দ্যোপাধ্যায়-
দাস্তে / দাঁতে / ডাণ্টে, আলসিয়ানি	কুশারী ) ৮, ২২৫, জী ৩৫১
১২, ৩৫, ৫২, ৩১০, জী ৩৫১	দারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ ( ভট্টাচার্য্য ) ১৮,
দাশরথি রায় ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৮৮, ২৪৩,	২৬, ২৯, ৪৮, ৪৯, ৯৬, ৯৭,
জী ৩৫০	১০৯, ১২১, ৩২৬, জী ৩৫২
দ্বিগধর দে ২০০	দারকানাথ মিত্র ১৭, ৩০, ৩১, ৩২,
দীননাথ ঘোষ ৮২	১৫৮, জী ৩৫২
দীননাথ বসু ২৫০	বিজ্ঞেননাথ ঠাকুর ১০, ১৬, ৩৯, ৪০,
	৯১, ১২২, ২৪৯, ২৫৮, ২৬১, ২৬৬
	২৬৭, ২৮১, জী ৩৫২

বিজ্ঞাননাথ মৈত্ৰ ১৮২

বিজ্ঞানলাল ৩২৮

ধৰ্মদাস হুৱ ১৯২, ২০২, ২০৬, ২০৮,  
২০৯, ২১১, ২২৬, ২২৭, ২২৮,  
২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ৩৩৪

ধীৰাজ ৪৭, ৫০, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৩২৭

ধুৱন্ধৰ মুখোটি ৭২

নগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ ৫৪

নগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৫৩

নগেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ২৬-

নগেন্দ্ৰনাথ পাল ২৫০

নগেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২, ২০৪,  
২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১০,  
২১১, ২১২, ২১৩, ২২৪, ২২৫,  
২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৪৭, ২৪৮,  
২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫,  
২৫৬, ২৫৭

নটেশ্বৰ চৌধুৰী ১৯৯, ২০১, ২৫৫

নন্দ ঘোষ ২৫১

নন্দকিশোৰ বহু ২৬১

নন্দকুমাৰ ৭২, ৩২৩

নবকৃষ্ণ ঘোষ ১৯৫

নবকৃষ্ণ দেৱ ৩২৬

নবগোপাল মিত্ৰ ১৯৮, ২০৮, ২৪২,  
২৫৫, ২৭৭, ২৭৫

নবীনচন্দ্ৰ বহু ৭৮

নবীনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ২৩৩

নবীনচন্দ্ৰ সরকার ২০০, ২৫০

নবীনচন্দ্ৰ সেন ৪০, ১২০, ১২১,  
জী ৩৫৩

নৰ্টন ৩৮

নৰ্থকক, লৰ্ড ৮৩, ১৮৫, ২১৪

নৱেন্দ্ৰনাথ ২৩১

নাথুয়াৰ শাস্ত্ৰী, পণ্ডিত ১০৪, ৩২৩

নিউটন, মাৰ আইজাক ৭৫, ২১, ৩১১,  
৩২২

নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫১

নিমাইচৰণ সাম্বাল ২০৮

নিৰ্মলচাঁদ বলাক ২৮৪

নীলকমল ঘোষ ২০০

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২২২

নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলী ২৫০

নীলকণ্ঠ মজুমদাৰ ২৩

নীলমণি কুমাৰ ২৩

নীলমণি চক্ৰবৰ্তী ২৪১

নীলমণি জ্ঞানালঙ্কাৰ ৫৩

নীলমণি মিত্ৰ ২৪৭

নীলমাধৱ, ডাক্তাৰ ৮৪

নীলমাধৱ ভট্টাচাৰ্য্য ৩২৪

নীলাক্ষয় মুখোপাধ্যায় ২৬, ৮৭, ১০৬,  
১৮৬, ২৮২, ৩২৮, জী ৩৫৩

নেপিয়ৰ, মাৰ চাৰ্লস ৬৫, ৬৬

নেপোলিয়ান ৩২, ২৫, ১০৬, ১৭৮,  
৩১৩

নেলাৰ ২২৪

নেগিষ্ট ১৫৮

নম্পিলিয়ান, নিউমা ৩১১, ৩২০

প্ৰশাসন ১২৭

পল, এডভোকেট জেনাৰেল ২২৫

পল, সেন্ট ২৫, ৩০৬, ৩১০

পাইথাগোৰাস ৩১১, ৩২০

পায়াম, ডাঃ ১৫২

পীকক / পিকক, মাৰ বাৰ্ণস ৩০, ৩১,  
২২৪, ২২৭, জী ৩৫৩

পীটৰ ১৯৮, ২৪৮

পুণ্ডৰীক ৭৫

পুণ্ডৰীকাক ২৩৩

পূৰ্ব মুখো ২৪৭

পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ ২০৫, ২১১

গুণচন্দ্র সোম ১৫৮  
 পেট্রীক / পেডার্ক ৫২, জী ৩৫৩  
 পেথেরাম, মার কোমার ২২১  
 পেন, জর্জ ৬৩, ২৮২  
 পেনি, ফ্রেড্রিক ১৮৭  
 পোপ, 'আলেকজাণ্ডার ৭২, ৮৮, ১৫৪  
 প্যারিমোহন রায় ২০৬, ২২৪  
 প্যারী, ক্যাপ্টেন ১৪৮  
 প্যারীচরণ সরকার ৬, ৫০, ১৬১, ১৭২, জী ৩৫৩  
 প্যারীচাঁদ মিত্র ৪৬, জী ৩৫৩  
 প্যারীমোহন কবিরত্ন ৮৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৭, ৩২৭  
 প্যারীমোহন বসু ১২৫, ১২৬, ১২৭  
 প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ২৬৫  
 প্রতাপনারায়ণ সিংহ, রাজা ৭২, ৮২  
 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮৭  
 প্রমদানাথ রায়, রাজা ২২৫, জী ৩৫৪  
 প্রসন্ন গাঙ্গুলী ২৪১  
 প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫  
 প্রসন্ন মিত্র ৫  
 প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৫, ১৬৫, ২২৪, ২২৫, ২২৭, জী ৩১৪  
 প্রসন্নকুমার বসু ১৫৫  
 প্রসন্নকুমার রায় ১১৬  
 প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (বসু) ১২, ২৮, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১১৬, ১৫৮, ১৮১, ২৮১, ২৮৮, ২২১, জী ৩৫৪  
 প্রসাদ / শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী (রায়গঙ্গা) ১৪৬, ১৪৭, ১৫৩, ১৬৭  
 প্রাট, হজ্জল ১৭২  
 প্রাণকৃষ্ণ বসাক ২৮৪  
 প্রাণকৃষ্ণ দ্বিজাঙ্গণ ১৮, ৪২, ১০২, ১১৫, ৬৩১

প্রাণকৃষ্ণ হালদার ২৫০  
 প্রিয়নাথ ঘোষ ২২২  
 প্রিয়নাথ বসু ২২৭  
 প্রিয়নাথ বহুমল্লিক ২৪২  
 প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ১০৪  
 প্রিয়নাথ সেন ২০২  
 প্রিয়নাথ ঘোষ ২৪২  
 প্রিয়নাথ মল্লিক ৭২  
 প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায়) ২৮, ৫৩, ৫৪, ২৬, ১১০, ১১৮, ১১২, ২৮৫, ৩৮২, জী ৩৫৪  
 প্রেসকট ১৪৮  
 প্লিনি ৩১১, ৩২০  
 প্লেটো ১০২, ৩১১, ৩২০  
 গলস্টাফ ২৮, ১৫৩  
 গার্ডিন, ডব্লিউ. এফ. ১৬২, ১৭০  
 ফিডিয়স ৩১১, ৩২০  
 ফিল্ড ৩৫  
 ফুলকুমারী দেবী (গুপ্তা) ৫১  
 জী ৩৫৪  
 ফুলার, ডাঃ ১৬৭  
 ফেন্নার, কর্নেল ১৮৫, ৩৩১  
 ফেলু বোস ২৫১  
 ফোগো, ডি. ১৭৬  
 ফ্রুড ১৫  
 ফ্রেড্রিক ৩১১  
 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮, ২, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৫৬, ৬১, ১০৬, ১৬২, ১৮০, ১৮৭, ২৬৬, ২৬৭, ২৬২, ২৭৩, ২৭৬, ২৭২, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৮, জী ৩৫৪  
 বটুবাবু ২২৮  
 বদন অধিকারী ২৩৫  
 বরাহমিহির ১২৩, ৩২২

বলাই সিংহ ২২৫  
 বলাইচাঁদ মল্লিক ২১৩  
 বল্লাল সেন ১৬৫, জী ৩৫৫  
 বলগুয়েল, জেমস ৩২৫  
 বসন্ত দত্ত, ডাঃ ১২২  
 বসন্ত বৰ্মণ ২৪১  
 বসুয়ে (Bossuet), জ্যাকুইস  
 বেনিগনে ৩১১, ৩২১  
 বামাচরণ ঘোষ ১৫৩  
 বামাতুন্দরী ১৬৮  
 বায়রণ, লর্ড জর্জ গর্ডন ২০, ২১, ২৩,  
 ৩৫, ৩৯, ৮২, ৮৮, ১০৬, ১১২,  
 জী ৩৫৫  
 বার্গাড, সেন্ট ৩১১ ৩২১  
 বার্নস, রবার্ট ৩২৭  
 বাল ( বলবন্ত ) গঙ্গাৱ তিলক / টিলক  
 ১২৪, জী ৩৫৪  
 বাল্মীকি ২১, ৩০৯, ৩১৩  
 নিক্রমাদিত্য, মহারাজ ৩২৮, ৩২৯  
 বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ২১৯, জী ৩৫৫  
 বিজয়দাস ভাত্তাভী ৩২৪  
 বিভগুয়েল ১৭২  
 বিধুমুখী বহু ১২৫  
 বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা ১৮৪, জী ৩৫৫  
 বিনোদ দাস ২৫১  
 বিনোদ হালদার ২৪১  
 বিনোদিনী ২৪৪  
 বিয়াট্টিচি ১২  
 বিশা (Bichat) ৩১১  
 বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ১৭৯  
 বিশ্বস্তর মৈত্র ১৮৬  
 বিহারীলাল গুপ্ত ১৫৮  
 বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৩, ৮৭, ৮৮,  
 ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ১০৬, ১০৭,  
 ১২১, ৩২৫, ৩২৮, জী ৩৫৫  
 বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৮১, ২২৭

বিহারীলাল বহু ( জ্যাঠা ) ২২০,  
 ২২৫  
 বীটন/বিতন, ড্রিন্‌কওয়াটার (Bethune,  
 Drinkwater) ১৮, ২৮, ৬৪,  
 ৬৬, ৯৭, ৯৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৩,  
 ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৮১,  
 ২২৬, ৩২৫, ৩৩৪, জী ৩৫৬  
 বীটসন ১৫৩, ১৫৯, ১৬০, ৩৩১  
 বীডন / বিডন, স্যার সেসিল / সিসিল  
 ২৩, ১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৭১,  
 ২৮৮, জী ৩৫৫  
 বীনল্যাণ্ড ১৫৩, ১৫৪  
 বাবি, অধ্যাপক ২৮৯, ২৯০  
 বীরব্রত গাঙ্গুলী ৭৯  
 বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৪  
 বীরেশ্বর মিত্র ১৬৩  
 বুদ্ধ ( দেব ) ৩৪, ২৬৯, ৩১৩  
 বৃন্দাবন পাল ২২২, ২৫৫  
 বেকন, ফ্রান্সিস ২৩, ১৭৭, ৩১১, ৩২০,  
 ৩২১  
 বেণী বোস ১৫৪  
 বেণীমাধব দে ১৮৭  
 বেণীমাধব মিত্র ২০৬, ২১১  
 বেদব্যাস ১২৪  
 বেনব্রিজ ১৭০, ১৭১  
 বেষ্টিক, লর্ড উইলিয়াম ৬৫, ৬৬, ৩২৫,  
 ৩৩০  
 বেছাম ১৪  
 বেজলি ১৬৬  
 বেভরিজ / বিভারিজ, হেনরী ৯৩,  
 জী ৩৫৫  
 বেরিদি, ডাঃ ১৮৮  
 বেলবাবু ২১২, ২২৪, ২২৫, ২৫৬  
 বেলেট, জর্জ ১৬১  
 বেসাণ্ট, অ্যানী ৪৫  
 ব্যালিস ১৮৪

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪৫, ১৬২, ২০০,  
২৫৪, ২৫৫

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, ২২,  
৩৮, ৭২, ৮১, ৮৩, ১০৪, ১০৭,  
২০৭, ২১২, ২১৪, ২৬২, ২৬৪,  
২৬৬, ২৬৭, ৩৩৪

ব্রহ্মমোহন মল্লিক ১৭৪, জী ৩৫৬

ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১২৫, ১২৬

ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় ২২২

ব্রাউটন, লর্ড ১৪৭

ব্রাউটন, লর্ড ইউলিক, ১৬১, ১৬৫

ব্রাডবেলি, এফ. ডব্লিউ ১৫১, ১৫৩

ব্রাডল ১৫

ব্রেক্সাণ্ড ১৬০

ব্রমহার্ড, পাদরী ১০০

ব্রামহার্ড, অধ্যক্ষ সি. এইচ. ১৪৫

ব্র্যাকি ১

ব্র্যাণ্ডফোর্ড ১৮৮

ভগীরথ ৭৫

ভন (Vaughan) ১৭৬

ভবভূতি ৩১৩

ভবানীচরণ দত্ত ১৮৬

ভর্জুরি ১০৮, ১২৩

ভরত মল্লিক ৩২৮

ভরতচন্দ্র শিরোমণি ২৭, ২৮৫, জী ৩৫৬

ভলটেরার ২২৩

ভাইনিং (Vining) ১৭৬

ভাগ্যবতী দাসী (বসাক) ২৮৩, ২৮৪

ভাহুয়তী ৮০

ভার্জিল / বার্জিল ৩৫, ৩১১, ৩২০

ভারতচন্দ্র রায় (মুখোপাধ্যায়) ৫৬,  
৭১, ২৪৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৬,  
২৮৭, জী ৩৫৬

ভারবি ৮৮, ২৮৫

ভিক্টোরিয়া, মহারাজী ৪৮

ভুবন ছুতোর ২৪১

ভুবন মিত্র - ৪১

ভুবনমোহন ঘোষ ৮০

ভুবনমোহন চতুর্ধরীণ ২৩৩

ভুবনমোহন নিয়োগী ১২২, ২০৩, ২০৪,  
২০৬, ২১১, ২২৭, ২২৮

ভুবনেশ্বরী ১৬৮

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৫৮, ১৬৬, ১০২  
১৮১, ১৮২, ৩২৫, জী ৩৫৬

ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২২২

ভূপেন্দ্রনাথ বসু ২০২

ভৃগু ২৬৮

ভৃগুমণি ২৩৭

ভোলানাথ পাল ২৩২, ২৪২

ভোলানাথ বসু ২৫৪

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩, ১২২,  
২১২, ২৪২, ৩৩৩

মংগলফিয়ে, জোসেফ মাইকেল ৩১১,  
৩২১

মণিমোহন সরস্বার (মণিলাডু) ৮০

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ৩২৫

মতিলাল শীল ৬৪

মতিলাল সুর ২০৫, ২১১, ২১৪, ২২২,  
২২৪, ২২৬, ২৫২, ২৫৪

মথুরানাথ ভট্টাচার্য ২৮৩

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৪২

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (চট্টোপাধ্যায়)  
২৬, ২৮, ২২, ৪৪, ৭১, ৯৬, ৯৭,  
১০৭, ১৪২, ১৮১, ১৮৭, ২৮০,  
২৮৪, ৩২৫, জী ৩৫৬

মদনমোহন বর্ষণ ৮২

মধুসূদন দত্ত ২, ৮, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৫,  
৭২, ৮০, ৮২, ৮৩, ১৫৭, ১৮০,  
১৮৭, ১৯৫, ১৯৬, ২১৭, ২২৩,  
২২৬, ২২৭, ২৭৩, ৩২৪, ৩২৬,  
৩৩৪, জী ৩৫৭

মধুসূদন লাহিড়ী ১৯০  
 মধুসূদন সানাল ৮৪  
 মনট্রিও / মন্টি ( ব্যারিষ্টার ) ২৯৭  
 মনোমোহন ঘোষ ১৬৬, ৩২৪  
 মনোমোহন বসু ২০৮, ২১২, ২২৪,  
 ২২৯, ২৪৬  
 মন্মথনাথ ঘোষ ২৯৯  
 মন্মথনাথ মিত্র ২৯৯  
 ময়রা, লর্ড ৩৩০  
 ময়েট ৩২৪  
 মলহার ( বা মাধব ) রাও গাইকবাড /  
 গায়কোয়াড ১৮৫, ৩৩১, ৩৩২  
 মল্লিনাথ টীকাকার ( কোলাচল মাল্লনাথ  
 বা পেড্ড ভট্ট ) ৯৯, ১০৪, ১০৫,  
 ৩২৮, ৩২৯  
 মহতাপচন্দ্র, মহারাজা ৩২৭  
 মহম্মদ ৭৪, ৩১১, ৩১৩, ৩২০  
 মহাশ্বেতা ৮০  
 মহেন্দ্র গুপ্ত ২৩৩  
 মহেন্দ্র চাট্টিয়ো ২০১  
 মহেন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৮  
 মহেন্দ্র সরকার ১৮০  
 মহেন্দ্র সিংহ ২২৫  
 মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮  
 মহেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩৬, ৩৩২, ৩৩৪  
 মহেন্দ্রনাথ দাস ২২৭, ২৫০  
 মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০, ২৫১,  
 ২৫২, ২৫৩, ২৫৪  
 মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৮, ৮২, ৮৪,  
 ১৮৩, জী ৩৫৭  
 মহেন্দ্রলাল বসু ২০৫, ২১০, ২১২,  
 ২২৬  
 মহেন্দ্রলাল সরকার ২৫৬  
 মহেশ চক্রবর্তী ২৩৭  
 মহেশচন্দ্র ভায়রব ( বন্দ্যোপাধ্যায়,  
 ভট্টাচার্য ) ২৪, ৫৩, ১১০, ১৬২,  
 ২৫১, জী ৩৫৭

মাঘ ৪৯, ১০২, ২৮৫  
 মাছাতা ৭৫, ৮৫  
 মামুদ ( বিচারক ) ২৯৫  
 মার্টিনেউ, ডাঃ ( Martineau ) ১৫  
 মার্টিনো, জেমস ৩০২  
 মার্টিনো, হারিয়েত ৩০২  
 মার্শাল, মেজর জি. টি. ১৫০  
 মিচেল ২৩  
 মিল, জন টুয়াট ১০, ১১, ১৩, ১৪,  
 ১৫, ১৬, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৬৭, ৭৫,  
 ৭৬, ৯৪, ৯৭, ১০০, ১৭৭, ৩০৩  
 ৩০৮, ৩০৯, ৩১২ ৩২৪  
 মিল, জেমস ৩২৪  
 মিন্টন, জন ৬৪, ৬৯, ৯১, ২৯০, ৩১১,  
 ৩২১  
 মুর, সার জন ১১১  
 মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৯৬  
 মেকলে, লর্ড টমাস বেবিংটন ২৫, ৫৬,  
 ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৯৮, ১৪৯, ১৫১,  
 ৩২৬, ৩৩০, ৩৩১  
 মেঘনাদ ৩৮  
 মেটকাফ ১৫৫  
 মেডলিকট ১৮১  
 মেয়ো, মিস ক্যাথারিন ২৯২  
 মেয়ো, লর্ড ১৯০, ২০৩  
 মোলসওয়ার্থ ১১  
 মোলিয়ের ৩১১, ৩২১  
 মোসেস ৩০৯  
 মোহনচাঁদ বসু ২৪৪  
 মোহিনীমোহন দাস ২২৫, ২২৬  
 মোহিনীমোহন রায় ৬১, ৬২, ৬৩  
 মোয়াট, ডাঃ ১৫১, ১৫২, ১৬৪, ১৭৭,  
 ১৭৯  
 মৌলাবক্স, গুস্তাফ ৮২  
 ম্যাকডনেল, লর্ড ৩১৬  
 ম্যাকডোনাড ২৯১  
 ম্যাকনটন, লর্ড ১৬৯



ম্যাকনামারা, ডা: ১৮৮, ২২২, ২২৩,  
ম্যাক্লিন ২৫৫  
ম্যাকফার্সন ৬৩  
ম্যাক্সমুলার ৫৮  
ম্যালথস ৭৬

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা ২, ৮,  
৮১, ৮৪, ১৯৯, ২৩৫, ২৪১, ২৪৫,  
২৪৯, ২৯৫

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮০, ৮২, ১৬২

যদুনাথ বোস ২৮৮

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ২০৫

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭৬

যদুনাথ সরকার ২৯১

যীতুখুই / যিতুখুই ৭৫, ৯৩, ৯৪, ৯৫,  
২৯৬, ৩০৬

যোগেশ্বান মিত্র, পণ্ডিত ১ ৪, ৩১৯

যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১-৬

যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৫৭

যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৫১

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ৩০, ৩৭, ৩৮, ৯৩,  
৯৪, ১২৭, ৩১৫, ৩২৫

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ২০৬, ২১৯, ২৩৩,  
২৩৪, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৪,  
২৫৬, ২৫৭

যোগেশচন্দ্র বাগল ১৫০, ১৭৪

রঘুনাথ রায় ১৪৪

রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৪

রচফোর্ট ১৫৩, ১৬৪

রকিসন ১৭৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬, ৪৬, ৯০, ৯১,  
২৭৪, ২৮০, ৩২৩, ৩২৮, ৩২৯

রমাশ্রীলাল রায় ৩৮, ২৯৪, ৩২৬

রমেশচন্দ্র দত্ত ৬৫

রমেশচন্দ্র মিত্র ২৮৮

রসময় দত্ত ১৭, ১৮, ৭১, ৯৭, ১৫১

রসিক নিয়োগী ২০৪, ২০৬, ২৫৭

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৪৬

রসিকলাল সেন ২৭

রাখালচন্দ্র মিত্র ২৩৪

রাজকুমার সর্বাধিকারী ৬৪, ১১৬

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, ২৩, ১১৬,  
১১৯, ১২০, ২৪১, ২৮৮, ২৯২,  
৩২৪

রাজকৃষ্ণ মিত্র ২৫৬

রাজচন্দ্র সাম্রাণ ১৯৩, ১৯৪

রাজনারায়ণ বসু ৮, ১০, ৩৮, ৯৮, ২৬০,  
২৬১, ২৭৩, ২৭৪, ৩২৫, ৩৩১,  
জী ৩৫৭

রাজারাম রায় ২৯৮

রাজেন সেনগুপ্ত ৩২৪

রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮

রাজেন্দ্রনাথ পাল ২২২, ২২৬, ২৫৩,  
২৫৫, ২৫৬

রাজেন্দ্রলাল (নাথ) দত্ত ৬৪, ১৮৯, ৩২৬

রাজেন্দ্রলাল মল্লিক ২৪৯

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২০, ২৬, ২৭, ১৮,  
১৯৮, ২৭৯, ২৮০, ২৯৭, ৩৩২,  
জী ৩৫৮

রাণী ভবানী ২১৬

রাধাকান্ত দেব, রাজা ৪৬, ১৯৬, ২৩৪,  
২৫৩, ২৬২, ২৬৪, ৩২৬, জী ৩৫৮

রাধাকৃষ্ণ ঘোষ ১৫৭

রাধাকৃষ্ণ বসাক ২৮৩, ২৮৪

রাধাগোবিন্দ কর (গোবি) ১৮৮, ২২৩,  
২২৪, ২৩১, ২৪৯

রাধাগোবিন্দ দাস ১৭৮

রাধানাথ সিকদার ৪৬

রাধানাথ রায় ১২১

রাধানাথব কন্দ (মাধু) ২২৩, ২৩১,  
২৩৫, ২৪৩, ২৪৮, ২৫০, ২৫১,  
২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, জী ৩৫৮

বাধামাধব দে ১৭৪  
 বাধিকামোহন দাস ২২৬  
 বাফেল, লাটি ৩১১, ৩২১  
 বাম তৰ্কবাগীশ ১০৮  
 বামকমল ভট্টাচাৰ্য্য ১৭, ১৯, ২২, ৫৩,  
 ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১৬, ১২১,  
 ১৮১, ২৮৫, ৩০০, জী ৩৫৮  
 বামকমল সেন ৪৮, ৯৬, ১৫১, ২৬৪,  
 ২৯৮  
 বামকৃষ্ণ পৰমহংস ১৯২, ২১৯, ২৭৩  
 বামকৃষ্ণ লাহিড়ী ১৪৬, ১৬৭  
 বামগতি শ্ৰায়বত্ত ১৮০, ১৮১, ৩৩১  
 বামগোপাল ঘোষ ৬, ৮, ১৪৬, ১৬৪  
 বামগোপাল ভট্টাচাৰ্য্য ১৮৬  
 বামগোবিন্দ গোস্বামী ( তৰ্কবত্ত )  
 (প্ৰকৃত নাম 'গোবিন্দ শিৰোমণি')  
 ১০৯, ৩২৪  
 বামচন্দ্ৰ বিজ্ঞাবাগীশ, পণ্ডিত ১৭৪  
 বামচন্দ্ৰ মিত্ৰ ২৩, ১৭৬, ২০০, ২৬৫,  
 ২৮৮, ২৯৬, জী ৩৫৮  
 বামজয় বসাক ৪৯, ৭৮, ৩৩৩  
 বামজয় ভট্টাচাৰ্য্য ২৮৩  
 বামতন্ত্ৰ লাহিড়ী ৮, ১৪৬, ১৪৭, ১৫০,  
 ১৫৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭,  
 ১৬৯, জী ৩৫৮  
 বামদুলাল মৰকাত ২৯৯  
 বামনাৰায়ণ তৰ্কবত্ত ( ভট্টাচাৰ্য্য ) ২, ৩,  
 ৪, ৯, ৪৯, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২,  
 ৮৩, ১৮৩, ২১২, ৩২৩, ৩৩১,  
 জী ৩৫৯  
 বামগ্ৰন্থাদ মিত্ৰ ২৫১  
 বামমোহন বসু ৪৩, ১২১, ১৪৭, ১৭৪,  
 ২৬১, ২৭১, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭,  
 ২৯৮, ৩২৬, ৩৩০  
 বামশৰ্মা ১২৫  
 বামলকৰ্ম ভট্টাচাৰ্য্য ১৮৬

বাম্পীনি ২২৫, ২২৬  
 বামেজ্জম্বলৰ জিবেদী ১০, ১৭, ৪৩,  
 ১২৩, ১২৫, জী ৩৫৯  
 বাসবিহাৰী ঘোষ ২৩, ২৪, ২৮২, ২৮৯,  
 ৩২৫, ৩২৮  
 বাসবিহাৰী বসু ১৫৫  
 ব্ৰিচাৰ্ডসন, কাপ্টেন ডি. এল. ৬৪, ৯৮,  
 ১৫১, ৩০০, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮,  
 জী ৩৫৯  
 ব্ৰিচাৰ্ডসন ( জজ ) ১৬৬  
 ব্ৰিচি ২৮৯  
 ব্ৰিপণ, লৰ্ড ৫৭, ৩২৩  
 ব্ৰিসলু ( Richelieu ) ৩১১, ৩২২  
 বাস, ভিজেণ্ট ১৭৮  
 ব্ৰজভেণ্ট, প্ৰোমিডেণ্ট খিণ্ডৰ ৭  
 ব্ৰটলেজ ২৪৮  
 ব্ৰপটাদ পক্ষী ( ব্ৰপটাদ দাস মহাপাণ্ড )  
 ৩৩৩, ৩৩৩  
 ব্ৰপলাল মিশ ২৫৩  
 ব্ৰেসিডেণ্ট ১৮৫  
 ব্ৰোহিণা ১১৮  
  
 নং / লঙ, ব্ৰেভাৰেণ্ড ৯, ৭৬, ২০৭,  
 ৩২৪  
 লজ, এডমণ্ড ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৭৬,  
 ১৭৭, ১৮০  
 লব ৯৩, ১৬৩, ৩০০  
 লয়েল, লৰ্ড ৪৮  
 ললিত চাটুঘো ১২১  
 লক্ষ্মীনাৰায়ণ দত্ত ২৫৭  
 লাইবনিটজ ( Leibnitz ), গটফ্ৰেড  
 উইলহেম ৩১১, ৩২১  
 লাটুবাৰু ২  
 লাভুসিয়ৰ/লাভোয়াজিয়ে (Lavoisier),  
 অ্যান্টনি লয়েণ্ট ৩১১, ৩২২

লালবিহারী দে, রেভারেন্ড ১৬১, ১৬২,  
১৬৫, ১৮৭

লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২

লালমোহন ভট্টাচার্য্য ( বিদ্যানিধি )  
২৩, ২৮২, ৩২৫

লিটন, লর্ড ১, ৭২

লিটলার, সার জন ৯৮

লেথব্রিজ, এবেনেজার ১৬৩

লেথব্রিজ, রোপার ১৬১, ১৬২, ১৬৩

লুই, একাদশ ৩১১, ৩২২

লুইস ৩০২, ৩০৩

লোকনাথ মৈত্র ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১  
১৯২, ১৯৩, ১৯৭, ২০৩, ২১৬,  
৩৩২

ল্যাজারাস, ডাঃ ২১৬

শঙ্করাচার্য্য ৫১, ২৭০, ২৭১

শক্তি / শক্তিদ্র ১২৪, ৩৩০

শঙ্কুনাথ পণ্ডিত ১৮৮, ১৮৪

শরৎ দেব ৭২

শরৎকুমার মল্লিক ১৯২

শরৎচন্দ্র ঘোষ ২, ৮২, ২২৬, ২২৭

শশিভূষণ দাস (শশা বিশাডা / বিসাডি)  
২০৩, ২০৫, ২১১, ২৫৫

শার্লটি কর্দ্দে ৯৫

শার্লম্যান্ ৩১০

শিবকান্ত রায় ১৬৭

শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৪১

শিবচন্দ্র গুহ ৮০

শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০৫

শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২২৬, ২৫১

শিবদাস ভাতুড়ী ৩২৪

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৭, ১৬৪

শিশিরকুমার ঘোষ ১৯৭, ২০৬, ২০৭,  
২০৮, ২১২, ২১৩, ২১৭, ২২৪, জী  
৩৫২

শীতল দাস ২৫১

শেলী ৩৯

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ২৯২

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩৩৪

শ্রাম বিশ্বাস ২৪১, ২৪২

শ্রাম মল্লিক ২৪৭

শ্রাম সিং ২৪২

শ্রামলাল মিত্র ২৩৪

শ্রামা ২২৭

শ্রামাচরণ গাঙ্গুলী ২৮২, ২৮৮

শ্রামাচরণ ঘোষ ( যশোহর ) ১৫৭,  
১৯৮, ২৪৮, ২৪৯

শ্রামাচরণ ( দে ) বিশ্বাস ৫২, ২৯৩

শ্রামাচরণ মুস্তফী ২১৯

শ্রামাচরণ ( শর্ম ) সরকার, বিজ্ঞানভূষণ  
২৮০, জী ৩৬০

শ্রামাচরণ সরকার ২৬, ২৭, ১৪৬

শ্রীনাথ ঘোষ ২৯৯, ৩০০, ৩৩১

শ্রীনাথ দাস ১৯, ১০৪, ১৫৮, ১৯৩

শ্রীশচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্ব ২৯২

শ্রীশচন্দ্র রায় মহারাজা ১৫০, ১৫২,  
১৬৮, ১৬৯

ফ্রান্স ১৯১

ফ্রাঙ্কেনস ১৬৬, ১৬৮

ফ্রেন্টিস ৩১১, ৩২০

ফগাস ১৭২, ২৯০

ফটক্লিফ ২৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২,  
১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ২৮৮, ২৮৯

ফতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩২৮

ফতীশচন্দ্র রায়, মহারাজা ১৬৮

ফতোম্মোনাথ ঠাকুর ৪৮, ৭০, ২৭২

ফররুজী, পণ্ডিত ১৮৭

ফাইনন, লেট ৩১৮, ৩১৯

ফাতকড়ি অধিকারী ১২৩, ১৩৩

সামুয়েল ১৫০

সারদা দাস ২৫১

সারদাচরণ মিত্র ( বিচারক ) ২৪, ৪০,  
২৫১, জী ৩৬০

সারদাচরণ মিত্র ( হেডমাস্টার ) ১৫৮,  
২৮২

সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৩

সারদাসুন্দরী ১৮৮

সার্ভান্টিস ৩১৭

সিঙ্গার ৩১০

সিম্পসন, এ. ২৩২

স্ব, অঞ্জন ৩১২

সুইডেনবর্গ ৭৭

সুকুমার সেন ২১৮

সুকুমারী দত্ত ( গোলাপ ) ২২৭

সুকুলবাবু ৩২৪

সুধীর কুল ৭২

সুধীর চ্যাটার্জী, রেভারেণ্ড ৩২৪

সুব্রতি ঘোষাল ৭২

সুব্রত মৈত্র ১৮২

সুব্রতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০, ১৭৪,  
২৮২, ২৯০, ২৯১, ৩০০, ৩২৪

সুব্রতচন্দ্র মিত্র ২৫৬

সুলোচন ভট্ট ৭২

সুধাকুমার সর্বাধিকারী ১১৬, ২৫৭

সেল, রেভারেণ্ড জে. ১৬২

সেক্সপীয়র / সেক্সপীয়র, উইলিয়ম ২৬,  
৩৫, ৬৪, ৭২, ৮৮, ৯৯, ১০৩,  
১৫৩, ১৬১, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৬,  
১৭৭, ১৮৬, ১৮৯, ২০০, ২০২,  
৩১০, ৩২৬, ৩২৮

সৈয়দ আমেদ ২৯৫

সোদামিনী দেবী ২৭৩

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ৮২, ২৪৯,  
২৭৩

স্ট ৩৫

স্কল, আর্চিবল্ড ১৫০, ১৫৮, ১৭১

স্বক, কুহন গিভিয়ন ১৫০

স্বামী বিবেকানন্দ ২৩৬

স্বিথ, অ্যাডাম ৩০৫

স্বিথ, ও'ব্রায়ান ১৭২

স্বিথ, জর্জ ৬৩-৬৪, ১৮৪

স্পেন্সার, হার্বার্ট ১৫, ৯৪, ১০০, ২৯১,  
৩০২, ৩০৩, ৩১৭

স্ট দত্ত ১৪৩, ১৪৪

স্টার, সার উইলিয়ম ২১৩

হবস ১২১

হবহাউস, চার্লস প্যারি ১৪৬, ১৪৭

হরনাথ মিত্র ১৫৪

হরপঞ্চানন ২৮৩

হরপ্রসাদ রায় ৯৬

হরিন্দাস দাস ( হরিবৈষ্ণব ) ২২৭

হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১১২

হারিনাথ শর্মা ২৬, ২৯

হরিশোহন কর্ণকার ২৪৭

হরিশোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩, ২১৬

হরিশোহন রায় ২৯৪

হরিশ বিজ্ঞানতত্ত্ব ২৮৯

হরিশচন্দ্র ত্রৈলোক্য ৫২

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩২, ৩০০, ৩৩১

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত ১৭৪

হাইড, হেনরি ১৮৬, ১৯৯

হাইয়ার্ড, জন ৩০৫

হাক্সলি, টমাস, হেনরী ৩০২

হাটখোলার দত্তবাবু ২

হানিবল ৯৫

হাবুল সরকার ৩২৪

হার্ডিঞ্জ, লর্ড ১৫১, ১৭৮

হার্শেল ১৭০

হিউম, ডেভিড ৭৫, ৩১১, ৩২১

হিঙ্গুল থা ২৫১, ২৫২, ২৫৫, ২৫৬

হিপক্রেটিস ৩১১, ৩২০

হিলডাব্রাণ্ড, সপ্তম গ্রেগরী ৩১১,  
৩২১

হীরালাল মুখার্জী ৩২৪

হেনরী, অষ্টম ১৭৭

হেবার্লিন ৪৩

হেমচন্দ্র কব ২৪২

হেমচন্দ্র দত্ত ১৪৩

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩, ২৬, ১৮০,  
২৮৮, ২৯৪, জী ৩৬০

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২, ৪৫

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২১২, ৩৩৩

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৫৭

হেয়ার, ডেভিড ১২১, ১৭৪, ৩২২,  
জী ৩৬০

হেস, ক্যাপ্টেন ১৫১, ১৫৮

হোমার ৩৫, ১৭৫, ৩০২

হোসেন খাঁ ১১৬, ৩৩২

হাগার্ড ২৩

হার্মিটন, সার উইলিয়ম ৬৩, ২২

হারিসন, ফ্রেডরিক ১৫৩, ১৫৫, ২৯১,  
৩০৩

হার্লিডে, সার ফ্রেড্রিক ১৫১, ১৭১,  
১৭২, ১৭৩

## বিবিধ

অক্সফোর্ড ১৪

অক্সফোর্ড-কোঙ্গ্রুজ ৫

অক্স ৩১, ১৮৭, ২৬৪

অক্সশাস্ত্র ৩১, ৬১, ১৭৬

অক্সক্রাডা ১২৬

‘অক্ষবলচরিত’ ১২৬

অক্ষয়ভূতীয়া ৮৪

অগ্রদীপ ১৬৮

অবোরশ্চটযোগী ৮৩

অজ্ঞেয়বাদী ৩২, ২৭০, ৩০২

অজ্ঞেয় ব্রহ্ম ৩০৩

অতীন্দ্র জ্ঞানশক্তি ২৮৩

অধ্যাত্মবিহার প্রথম প্রস্তাব ২৬৭

অনাথবাবুর বাজার ২, ৩২৩, ৩৩৪

অল্ললোম-রীতি ১১১

‘অন্নদামঙ্গল ৭১’

অপেরা ২৪৭

অপেরা হাউস ২২৩

অবষ্টক ৭৩

অবিজ্ঞা ২১৭

অবোধবন্ধু ২২, ৩২, ১০৬, ৩০৫, ৩২২

অভিধান ২৮৪, ২৯৪

অমরকোষ ৪৩, ৬১, ২৩, ৩২৮, ৩২৯

অমরপুর ১০১

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ২১৮, ২৫৬, ২৭৩

অমৃতবাজার পত্রিকা ১৯৭, ২০৮, ২১১,  
২২৪, ২৪৬

অম্বিকা-কালনা ১১১, ২২৩

অলঙ্কার ( কাব্য ) নির্ণয় ২৩, ৩২৫

আলম্পিক খিয়ারেট ২৫৩

অম্ববেতক ১১৫

অম্বিনী ১২৩, ১২৪

অষ্টাদশভাবাবারবিলাসিনী ভূজঙ্গ ২৭

অষ্টাঙ্গিটুজ ১৭৮

অ্যালোপ্যাথি ৩৬, ১৮৮

আই. এফ. এ শীল্ড ৩২৩

অ্যান্ডিনিয়ন ১৪

আইন শংকর কাঞ্চিনী নাটক ১৮৭

আইতানহো ৬২

আইরিল ১৬৫

- আগরপাড়া ২৪৭  
 আঙুনসি ৩৬  
 আদালত ৩১, ৬২, ২২৪  
 আন্দামান দ্বীপ ১২০, ২০৩  
 আত্মীয় গোপ ২৬৮  
 আমড়াতলার ছাপা ১৪৪  
 আমতা ৩৬  
 আমাদের বিজ্ঞা ফলবতী হয় না  
 কেন? ২৬১  
 আমাশয় ১৮২  
 আমেরিকা ৭, ৭৫  
 আরপুলি লেন ২৪৬  
 আর্ধ্যগাথা ( ২য় ) ৩২৮  
 আলালের ঘরের ছুলাল ৪৬, ১৬০  
 আলিপুর ৩৭, ৩৯, ২৮২,  
 আলেকজান্দ্রিয়া ৩৫  
 আন্তবোধ ব্যাকরণ ২৪, ২৮২, ২৯৩  
 আহিরীটোলা ৮৭, ১২২, ২৪৭
- ইউরোপ ২২৩  
 ইউক্লিড ১৪৮, ২৭০  
 ইংরাজি শিক্ষা ১৫১  
 ইংরাজি সাহিত্য ২৭, ৩১, ১০৩, ১৭৪,  
 ১৭৫, ১৭৬, ১৮৭, ২৮৫, ২৯০,  
 ২৯৬  
 ইংরাজী বিদ্যালয় ২৮  
 ইংলও ১৫, ৬৬, ১২৪, ২২৮  
 ইংলণ্ডের ইতিহাস ১০৭  
 ইংলিশম্যান ১৭২, ২১১, ২১২  
 ইটালির ভাষা ৫২  
 ইন্ডেন উদ্ভান ৫  
 ইণ্ডিয়া হাউস ১৪, ১৫  
 ইণ্ডিয়ান মিরর ২১১  
 ইতালী ৩১০  
 ইতিহাস ১৭৪, ১৭৬, ১৮৭, ১২৪,  
 ২৬৪, ২৮৫
- ইমিটেশন অন্ত ক্রাইট' ৭৭  
 ইয়ংবেঙ্গল ২৬০, ২৬১  
 ইয়ুরেশিয়ান ২৪২  
 ইলছোবা মণ্ডলাই স্থল ৩৩১  
 ইলবার্ট বিল ২, ৩৩৩  
 ইলিয়াড ১৭৫  
 ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৪, ১৫, ১৬৩,  
 ১৮৪  
 ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানি ৭৮, ১৯১,  
 ১৯২  
 ইস্কুলে ইস্কুলে দাঙ্গা ২৪১-২৪২  
 ঈডেন হিল্লু হোষ্টেল ২২৫  
 'উঃ মোহান্তের এই কি রাজা।' ২২৭  
 উজ্জল ( গল্প ) ১০৭  
 উড়িয়া ১৬০  
 উড়ের মন্তব্য ১৭৮  
 উত্তরচরিত ২৬, ৮৮, ৯৫  
 উত্তরপাড়া ১৫০, ২৬৫  
 উত্তরাধিকার আইন ৩৩  
 উপক্রমণিকা ১৮  
 উপনিষদ ২৭১, ২৭২  
 উপন্যাস ১২৪  
 উপাধি বিতরণ ২২৪  
 উভয় সঙ্কট ৮৩  
 উমেশ মিত্রের দল ('গোপাল উড়ের দল'  
 নামে প্রসিদ্ধ) ২৩৪  
 উবা-অনিরুদ্ধ ২৫২, ২৫৩, ২৫৬
- ঋগ্বেদ সংহিতা ১২৪  
 ঋজুপাঠ ১২, ২৪, ২৬
- একতাপাদন ৩০৭  
 একারবর্তী পরিবার ২৫৮, ২৬২  
 এক্স ( X ) ক্লাব ৩০২

‘একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা

সাহিত্যের উন্নতি করা’ ১২৭

‘একেই কি বলে সত্যতা?’ ১২৭, ২১২

এজু ৬২

এড্‌গারহ ৫

এডুকেশন কাউন্সিল ১৫৬, ১৮১

এডুকেশন গেজেট ১৭২, ১৮০

এনসাইক্লোপিডিয়া ২২৩, ২২৬

‘এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনাসিস’ ২৭,  
১৮১

এনট্রাল পরীক্ষা ২০, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৯  
২০০

এম্পায়ার ৭

এলবার্ট কলেজ ৪৮

এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল ২২৩

এলবার্ট হল ২৮৮, ২৯০

এলাহাবাদ ২২৫

এশিয়াটিক সোসাইটি ২২৭

‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ ১২৩

ওকালতি ৩০, ৩৭, ৩৮, ৬১, ২২৪

‘ওথেলো’ ৮৮, ১৭৮

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন ১৯৮, ৩৩২

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট ৩৩২

ওরিয়ন ১২৪

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ১৮৪-১৮৮, ১৯৯,  
৩০০

ওহাবী ১৯০

কঙ্কু কী ৮২

কড়ির কথা ৩৩২

‘কথাসরিৎসাগর’ ১১৫

কনিক ১২৩

কবির লড়াই ৫৫, ২৩৭-২৪০

কবিরাজি ৩৬, ১৪৫

কবিরাজি চিকিৎসা ১৬০

কমলাকান্ত ৯

‘কমলে কামিনী’ ২৩৬

কম্বুলিয়াটোলা ১৮৬, ১৯৯, ২০০, ২০২,  
২০৮, ২৪৮

কর্ড লাইন ১৯১

কর্ষটোড ১১৭

‘কর্মবীর কিশোরীচাঁদ’ ২৯৯

কলিকাতা ২, ৫, ৬, ৮, ৩২, ৩৮, ৪০,  
৬২, ৭৩, ৭৮, ৭৯, ১০১, ১০৩,

১১৬, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৪,

১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২,

১৬৪, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৮, ১৯১,

১৯৭, ২০২, ২০৩, ২১৭, ২২২,

২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩১, ২৩২,

২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪৬, ২৫৩,

২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬২,

২৮৩, ২৮৬, ২৮৮, ২৯২, ৩৩২

কলিকাতা কর্পোরেশন ২৯৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৯৯, ১২০, ১২৭,  
২৮৮, ২৯০, ৩২৫, ৩২৮

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ৩২৮

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ২৬৪

‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’  
২৩৬, ৩৩২, ৩৩৪

কলুটোলা ২৪২

‘কল্যাণিত তাইপোলা’ ১১৩

কঁসারিপাড়া ২৪৬

কঁসারিপাড়ার দল ২৪৭

কাউন্সিল অব এডুকেশন ১৬২, ১৭৭,  
১৭৯

কাদম্বরী ২৩, ২৯, ৩৫, ৭৫, ৯৭, ২৪৭,  
২৮৮

কান্নার জোলাপ ৪১

কান্যকুজ ৭৯

‘কাব্যনির্ণয়’ ২৮২, ৩২৫  
 ‘কাব্যপ্রকাশ’ ২৮৫  
 ‘কাম্যকানন’ ২২৮, ২৩০  
 কাম্যবিবাহ ১১১, ১১২  
 কালা আইন ২৬২  
 কালিন্দী ৪৩  
 কালীঘাট ২৪৩  
 কাশী ১০৮, ১১০, ১৬৪, ১৮৮, ১৯০,  
 ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ২০২, ২০৩,  
 ২১৬, ২২৩, ২৪৬, ২৮৩  
 ( কাশীর ) হিন্দু কলেজ ৪৫  
 কাশীরামদাসের মহাভারত ১১৯  
 কাশ্মীর ১১৬  
 কায়স্থ ৫২, ১০২, ২২৩  
 কিং কোম্পানি (হোমিওপ্যাথিক ঔষধের  
 দোকান) ২৯২  
 কিং জ্ঞান ১৭৬  
 ‘কিছু কিছু বুঝি’ ৮৩, ১৯৯, ২১৯,  
 ২৪৯, ৩৩৩, ৩৩৪  
 কীর্তন ২৭২  
 কুইন্স কলেজ ১৯৩  
 ‘কুলমালা’ ৪৩  
 কুমারসম্ভব ৮৮, ১১৯, ১৮৬, ২৬৪,  
 ২৮৪  
 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১২৩  
 কুলরহস্য ৩৩১  
 ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ ৩, ৪, ৪৯, ৭৮, ৮৪,  
 ১৮৩, ৩২৩  
 কুন্তলাঞ্জলি ১২১, ২৮৮  
 কৃত্তিকা ১২৩, ১২৪  
 ‘কৃষ্ণকুমারী’ ২১২, ২১৭, ২১৮,  
 ২৩৪  
 কৃষ্ণচরিত্র ২৬৭  
 কৃষ্ণতত্ত্ব ২৫

কৃষ্ণনগর ১০২, ১২০, ১৪৩, ১৪৭,  
 ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৭, ১৬১,  
 ১৭২, ১৭৩, ২৮৮  
 কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল ১৪৫  
 কৃষ্ণনগর কলেজ ৯৩, ৯৭, ১০৩, ১৪৩,  
 ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৬,  
 ১৫৮, ১৬২  
 কৃষ্ণনগরের ইতিহাস ১৬৯  
 কোন্নগর ২৪৭  
 কোম্বু ও ঔষধদর্শন ৩০৮, ৩০৯  
 কোম্পানীর বাগান ৩২৩  
 কোলীয়া প্রথা ৪৯  
 ক্যাথলিক ৩৩, ৬৬  
 ক্যালকাটা স্ত্রাশনাল থিয়েটার ২৫৫  
 ক্রুসেড যুদ্ধ (Crusade) ৬৬, ৩০৬  
 খড়্‌কো ১৬৮  
 খনার বচন ২৮২  
 খানাকুল ১০২  
 খিদিরপুর ৩৮  
 গণিত ১৯, ১৫০, ১৭৪, ১৭৬, ২৮৫,  
 ২৮৯  
 গণিতশাস্ত্র ১০৩, ১০৪, ১৫৫, ২৬৪  
 গণেশ টকীজ ৩৩৪  
 গয়াশ্রদ্ধ পদ্ধতি ১১০  
 গাইন্ডা জীবন ৬৯  
 গিল্যাণ্ডস হোর্স ৭৮, ৮৩  
 গীতগোবিন্দ ২৫৩  
 গৈরিশ ছন্দ ২১৭  
 গোবরভাঙ্গা ১৫৭  
 গোবিন্দ অধিকারী দল ২৩৪  
 গোলকীষি ১৭৫  
 গৌড়ভূমি ৭৯



গৌরীকাননিকাতন্ত্র ১১৫

গ্রীক ১৪, ২৭, ১২৫, ২ ২, ৩০৮, ৩১৩

গ্রীক দর্শনশাস্ত্র ৩৮

গ্রীক পুরাণ ৭

গ্রীক ভাষা ৫২

গ্রীসের ইতিহাস ২২

গ্রেট ব্রিট ৮০, ১৮৪

গ্রোট গ্রাশানাল থিয়েটার ২, ২২৭, ২২৮, ৩২৩

ঘড়িওয়াল বাড়ী ৮৪, ২০৮

‘ঘরে তোর গ্রাংটা দিগম্বর’ ২৫২

চট্টগ্রাম ১৫০, ১৫৭, ১৫৮

চডকডাক্সা রোড (জষ্টব্য ‘টেগোর কামল রোড’)

চণ্ডী ২৮৫

চণ্ডীপাঠ ২৮৫

চলন (দই) ৩২৩

‘চাইল্ড হারল্ড’ ১১২

চাণক্যের শ্লোক ১৪৪

চাপরাস ১২২, ১২৩

‘চার এয়ারের তার্থযাত্রা’ ৮৪

চাক্রপাঠ ২৬২

চিংপুৰ ৮৪

চিন্তাতত্ত্বদ্বিনী ২৩, ৩৮

চিরচিরা ২৬

চিরবেগা ২৬

চুঁচুড়া ২০৬, ২২৭, ২৬৭

চেষ্টারের জীবনী ১২

চেস্ট ম্যারেজ ৩২

চোরবাগান ২৫৭

চৌগাছা ১৫৭

চৌরঙ্গী ১৭৬

‘ছন্দকুহন’ ২৬৩

‘ছন্দপ্রকাশ’ ১২৬

‘ছন্দবোধ’ ১২৬

ছাগশিশু ৪

ছাত্তাবুর দল ২৬৩

ছাত্তাবুর বাজার ৩২৩

‘ছান্দোগ্য উপনিষদ’ ২৬৭

জগৎ তত্ত্ব ২৭১

জগদ্ধাত্রী পূজা ২০৩, ২৫৭

জবাকুম্ভমসকাশং ২৪

জামিদার সভা ২

জানবাজার ২০২

‘জামাই বারিক’ ২১২

‘জামাই বগী’ ১২১

জামানো ২২৬, ৩১০

‘জুইফুলের গাছ’ ১০৬

জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ১৭৬

জেনারেল আসেবলি ২৪১

জোড়াসাঁকোর ঘড়িওয়াল বাড়ী ৮৪, ২০৮

জামিনতি ১১২, ১৪৮, ১৮১

জ্যামিতিক অমূল্যলীনা ১৮১

জ্যোতিষ ২৪, ১১২, ১৮০, ১২৫

ঝামাপুকুর ২০০

ঝামাপুকুরের দল ২৪৬

ঝোড়োর দল ২৩৪, ২৩৫

টডের রাজস্থান ২৪৬

টাইন হল ২৭, ১৭৮, ১২২, ২২২, ২২৩

টিকিহাস ৭২

টিচারশিপ পরীক্ষা ১৫৮

টেগোর কামল রোড ৭৮

টেগোর লেকচার ২২৪, ২২৭

‘টেন্সেট’ ১০৩, ১৭৮

ঠাকুর আইন অধ্যাপক ২২৪, ২২৭

ঠাকুরবাড়ী ৮১, ৮২, ৮৩

- ডন জুয়ান ২৩, ৩২  
 ডন সোলাইটি ৩২৮  
 ডক কলেজ ১৫৪  
 ডক সাহেবের স্কুল ২৪২  
 ডফের জীবনচরিত ৬৩  
 ডডটন কলেজ ৬৩  
 ডেকু জর ১২২  
 ঢাকা ১৫২, ১৬০, ১৬১, ২২৫, ২২৬, ২৩১, ২৩২  
 ঢাকা কলেজ ২৭, ১০৩, ১৫০, ১৫১, ১৬০, ২৩২  
 ঢেক ফাজিল ৩২৮  
 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক?' ২৬৬  
 'তত্ত্ববিজ্ঞা' ২৬৫, ২৬৬  
 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ২৬৭, ২৬৯, ২৭৩  
 তরঙ্গা/তরঙ্গাগান ২৪০, ৩৩২  
 'তীতিয়াটোপি' ১০৬  
 ভারামুন্দরী পার্ক ৩৩৪  
 ভালতলা ২৩, ২৪  
 তিব্বত ২২৪, ২২৭  
 তুলাদানপত্র ১১০  
 ত্রিকোণমিতি ১৭৬, ১৮১  
 হক্ষযজ্ঞ ২৩৭  
 হক্ষিণেশ্বর ২১২  
 হমদমা ১৮৬  
 হর্জিপাড়া ৩৩৪  
 হর্শন ২২, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৫৪, ৬৩, ৬৭, ১০০, ১৫৫, ১৮০, ২৮৫, ২৮৯, ২৯১  
 হারভাগসম্মত উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা ৩৩  
 হারভাগের পাঁচালী ১২৭, ২৪৩  
 হার্পনিক প্রস্থান ৩০২  
 হিরাপতিয়ার রাজকুমার ২২৬  
 হীরাফি ২২৭  
 দুর্গাপুজা ১৬৭, ২৪৮  
 'দুরাকাজ্জের বুধা ভ্রমণ' ২০, ১০৬  
 দেশীয় সশস্ত্র সেনা ২৪২  
 দৈতবাদ ও অদৈতবাদ ২৬৭  
 দৌরাশলা ভাষা ৫৮, ৫৯  
 দোলপূর্ণিমা ২৫৮  
 দ্রম্য ৬১  
 দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ২৫০  
 দ্বাধশ গোপাল ৪৬, ১৬৮  
 ধরতা ১৮০  
 ধর্মদাসবাবুর মল ২২৬  
 ধর্মযাজক ৩০৫  
 'ধর্মাসভা বিলাস' ৩৩১  
 ধর্মীয় বিবাহ ৩২, ৬৮  
 ধলচিতা ১৮৪  
 ধাত্রীশিক্ষা ১৮৭  
 ধ্রুবচরিত্র ২৩৬  
 'ধ্রুবদর্শন' ১০, ১১, ৩০০, ৩০২  
 ধ্রুবদর্শনবাদী ২৮৫, ৩০০, ৩০২  
 ধ্রুবধর্মের প্রস্তোত্তর ৩০৭  
 ধ্রুব রাজনীতি ১২  
 'ন-অক' হুর্ভিক ১৬০  
 'নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর' ২১২  
 নতুন বাজার ৩২৩  
 নবনাটক ২১২, ২২৪  
 নববিধান ২৭২  
 নবরত্ন / নবরত্নসভা ১২, ১৬০, ৩২৮, ৩২৯  
 'নবীন তপস্বিনী' ২১২, ২৪৭, ৩৩১,  
 'নরশো রূপেরা' ২১২, ২১৩, ২২৪  
 নরক ৩২  
 নর্মাল স্কুল ১০৪, ১৫৮, ১৮১  
 নলদয়রত্নী ১২৬, ২৪৬  
 নাকাশিপাড়া ১৬০,

‘নাকে থৎ’ ৬২, ১২৭, ১২২  
 নটিক ১২৪  
 নাটোর ২১৪, ২১৬  
 নারায়ণী ৯৩  
 নারিকেলডাঙ্গা ২৮৫  
 নাস্তিক ৩১, ১২১, ১২২, ২৬৯, ২৭০,  
 ২৭৯, ৩০৭  
 নিখুঁতি ৩২৩  
 নিক ১২৩, ৩২৬  
 নিকৃতিলাভের প্রস্থান ৯৬  
 নাতিকথা ২৬৪  
 নীলকর ১৬৯, ১৭২, ১৯৮  
 ‘নীলদর্পণ’ ৮৪, ১৬০, ১৬৯, ২০৪-২১২,  
 ২১৪, ২১৭, ২১৯, ২২২, ২২৩,  
 ২২৫, ২২৬ ২৩০, ২৩২, ২৩৩,  
 ৩২৪  
 ন্যাশনাল ২১২  
 জ্ঞানাল থিয়েটার ২০৭, ২১৭, ২১৮,  
 ২১৯, ২২২, ২২৬, ২৪৭, ২৫৫,  
 ২৫৭  
 ‘জ্ঞানাল পেপার’ ১৯৮, ২৭৫  
 জ্ঞানাল মেলা ২৭৪  
 জ্ঞানাল সঙ্গীত ২৭৫  
 পংক্ষীর দল ৩৩২  
 পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বো...৭২  
 পত্রিকা ২৬৭  
 পদার্থবিজ্ঞা ১১২, ৩১০  
 পদ্মাবতী ২১৮, ২৪৭, ২৫০  
 পঞ্চপাঠ ৩৯  
 পদ্মার ছন্দ ৭০  
 পরকাল ১২১  
 পরলোক ৩৬  
 পরাশর সংহিতা ২৯৭  
 ‘পল-বর্জিনিয়া’ ১৩, ১০৬, ৩২৪,  
 ৩২৯

পলিটিক্স ২৯  
 পাইকপাড়া ৪৫, ৭৯, ৮০, ৮২, ১৯৯,  
 ২১৮, ৩২৬  
 পাইকপাড়ার রাজা ৪৫, ৭৯, ২১৮  
 পাটীগণিত ১৯, ১০৩, ১০৪, ১৮১  
 পানিনি ৫৮, ১০৮, ১০৯, ২৮৬,  
 ২৮৮  
 পাথুরিয়াঘাটা ৪৬, ২৩৩, ২৪১, ২৪৫,  
 ২৪৯  
 পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী ১৯৯, ২১৬,  
 ২১৯, ২৩৩, ৩৩০  
 পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ী ২১৯, ২৫৪,  
 ৩৩৪  
 পানিহাটি ৮৪  
 পান্নালা ১৪৪  
 পাবলিক থিয়েটার ১৮৩, ২০৮, ২৫৭  
 পাবলিক স্টেজ ২০৯, ২১৩, ২১৭  
 ২৩১  
 পার্লামেন্ট ১৫  
 পাষণ্ডপীড়ন ৩৩২  
 পিনাল কোড ১৮৭  
 পুরাণ ৭৫, ১০৯  
 পুরানো কলেজের হাটা ১৪৭  
 পুরাতন গ্রন্থ ৭৯, ১১৭, ১২২, ১৮৩,  
 ২৩১  
 পুরাতন গ্রন্থে বিভাগসমূহ ২৭৬  
 ‘পুরুষ পরীক্ষা’ ৯৬  
 পুলিশ পেটানো ২৪২, ২৫৯  
 প্যুরিটান ২৩৭  
 ‘পূর্ণিমা’ ১০৬  
 পেনেটির বাগানবাড়ী ৪, ৫  
 পোডোপাটী ১৪৫  
 পোলবা খানা ১০১  
 পৌত্তলিকতা ৪৩  
 ‘পৌলবর্জিনী’ ৩২৯

প্যারিস ১৩, ২৫  
 'প্যারীভাইস লস্ট' ২২০  
 প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনী ২২৮  
 প্রচার ২৬৭  
 প্রটেস্ট্যান্ট ৬৬  
 'প্রণয় পরীক্ষা' ২১২, ২২৪, ২৪৬  
 প্রতিলোম-বিবাহ ১১১  
 প্রবেশিকা পরীক্ষা ৬১, ১৮৬  
 'প্রবোধচক্রিকা' ২৬  
 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' ১৭৫  
 'প্রমোদ-কানন' ৮৪  
 প্রহার  
 ছাত্র ২৪১  
 পুলিশ ২৪১, ২৫২  
 শিক্ষক ২৮১  
 প্রহ্লাদচরিত্র ১৪৪  
 প্রিন্সি কাউন্সিল ২৮৪  
 প্রেসিডেন্সী কলেজ ২০, ২৩, ২৪, ৩০, ৪০, ৪৮, ৫৪, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৯৩, ১০৭, ১১৭, ১২০, ১৬১, ১৬২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৮, ২৬৪, ২৮৭, ২৮৮, ২২০, ২২৩, ২২৬, ২২৭, ৩০০, ৩০১, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০  
 প্লেফোয়ের জ্যামিতি ১৮১  
 ফরাসি / ফরাসী ১৫, ৩০৫, ৩১২  
 ফরাসি বিপ্লব ৪২, ১২১, ২৬৮, ২৯৩  
 ফলস্টাফ ৯৮  
 ফলোয়ে নাটক ১৮৭  
 ফার্সী ১৬৭, ১৬৮  
 ফিল্ট অফ বার্থলোমিউ ৩০৮  
 'ফেন্সারী কুইন' ২২১  
 কোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮, ৭১, ২৫, ১৪২, ১৫০, ৩২৪  
 কোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ২৬৪  
 ক্রাফো-প্রাণিয়ান যুদ্ধ ১৫, ৩২

ফ্রান্স ১২৪, ৩০৮, ৩১০  
 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ৬৩, ১৭২  
 বাকিম চ্যাটার্জী স্ক্রিপ্ট ৪৮, ২৪১  
 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭, ১৬৬, ২৭৩, ২৭৭, ২৮৬, ২৮৭  
 বঙ্গসুন্দরী ২০, ২১  
 বঙ্গীয় বায়েন্স ব্রাহ্মণ সমাজ ২১৬  
 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ৮, ৬১, ৩৩১  
 বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস ৭২, ৮১, ৮৩, ২০৭, ২১১, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২৪, ২৪৭, ২৫১, ৩৩৪  
 বটতলা ১৮৭  
 বটতলার ছাপাখানা ১৮৩  
 বড়বাজার ৮৪, ৯২  
 বঙ্গন অধিকারীর দল ২৩৩  
 বর্দ্ধমান ১২  
 বর্দ্ধমান রাজবাটী ১২৬  
 বরিশাল ৩৮, ১৬৬, ২৩১, ২৩২  
 বরোদা ৮২, ৩৩১  
 বহরমপুর ৩৭  
 বহুবিবাহ ৫২, ৭৩ ১০৮, ১১১, ১১২, ১১৩, ২২৩  
 বাইবেল ১৬৩, ২৭২, ৩২২  
 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ৩৩১  
 বাংলা সাহিত্য ২৭, ২৮, ২৯, ৪১, ৫৪, ৫৮, ৭১, ৮৮, ১৪২, ২২৬  
 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' ৩২৫  
 বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৭৪, ২৮০  
 বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২১৮  
 বাংলার/বাঙ্গালার ইতিহাস ১২, ১৮১, ৩২৫  
 বাংলার উচ্চশিক্ষা ১৫০  
 বাংলার জনশিক্ষা ১৭৪

- বাঁকিপুৰ ১২২, ১২৩, ২০৩  
 বাঁশভলা গলি ২২  
 বাক্যমঞ্জরী ৫৪, ১১০  
 বাগবাজার ৮০, ১২১, ২০৩, ২৪১, ২৪৪, ২৪৬, ২৫০  
 বাগবাজার অ্যামেচার কনসার্ন ২৪৮  
 বাচখোলা ৫, ৩২৩  
 'বাচস্পত্য অভিধান' (এনসাই-ক্লোপিডিয়া) ১১০, ২২৩  
 বাজিকর ৩০৫  
 বাকুইছা ১৬৭  
 'বাসবদত্তা' ২৮, ২২, ৭১  
 বাহুবল্ল ৫৬  
 'বাহুবল্লর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ৩২৬  
 বাকমোক্ষী ৪৩  
 বিচারপতি ৩০, ৩১, ৬৩, ১০৬  
 'বিচারক' ১০৬  
 'বিচিত্রাবীর্ঘ্য' ২০, ১০৭, ২৭২, ৩০১  
 বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা ৪৩  
 বিজ্ঞান রাশি ২৮৫  
 বিডন প্লীট ৩২৩, ৩৩৪  
 বিডন প্লীট ডাকঘর ২২৬, ৩২৩, ৩৩৪  
 বিদ্যুৎ ৮২  
 বিজ্ঞানমন্দির ২৭  
 বিজ্ঞানবুধি ২২৭  
 বিজ্ঞানমন্দির ৭১, ৭৮, ৮২, ৯৬, ২৩৭, ২৫৪  
 বিজ্ঞানসাহিনী সভা ৮, ৪৪, ৩২৪  
 বিধবাবিবাহ ৪২, ৫৪, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৮১, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১৬২, ২২২, ২২৩  
 'বিবিধ' (প্রসঙ্গ) ১২৭  
 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ২২, ২৭  
 'বিদ্যে পাগলা বুড়ো' ২৫৭  
 বিলাতীবাবু ২২৪  
 বিশ্বগ্রাম ১৪২  
 বিশপ কটনের জীবনচরিত ৬৩  
 বিত্তল বিবাহ ৬৭, ৬৮  
 বিশ্বকোষ ২১৫, ২২৬, ২৩১, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭  
 বিশ্ববিদ্যালয় ৫৩, ৬১, ৬৩  
 বিশ্ববৃক্ষ ১৮৭, ২৬৬  
 বিশ্ব সংক্রমণ ১২৪  
 বিশ্বপুরাণ ১২৩  
 বীজগণিত ১২, ১০৩, ১০৪, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১  
 বীটন কলেজ ১১৩  
 বীটন মেমোরিয়াল ২৭  
 বীটন / বেথুন সোসাইটি ২৬১  
 বীটন উদ্ভান ১, ১০, ১৬, ১৭২, ৩২৩  
 বীণাপাণি পর্দা গার্লস স্কুল ৩৩৪  
 বীরসিংহ ৭৩  
 বুঝলে কি না ৮৩, ১২২, ২৪২, ৩৩৩  
 'বুদ্ধায়ামল' ১২০, ১২১  
 'বুদ্ধোশালিকের ঘাড়ে রেণী' ৮৩, ২১২, ২৪৬  
 বুথোলা কাব্য ২৩৩  
 বুলবুলির লড়াই ২  
 'বুদ্ধসংহার' ৩২  
 বুদ্ধাবন ২৬৭, ২৬৯  
 বুদ্ধসংহিতা ১২৩  
 বুদ্ধদেবতা ১২৪  
 বেকনের সম্ভর্ষ / রচনা ১৫৪, ১৭৭, ২৮২  
 বেগটিয়া ২৬  
 বেগবেগী ২৬  
 বেঙ্গল টাইমস ২২৬  
 বেঙ্গল থিয়েটার ৭২, ৮১, ২২৬, ২২৭  
 'বেঙ্গলী' ৭, ৫৩, ৩০০  
 'বেণীসংহার' ২, ২৪, ৮০, ২৫১

‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ ১৮, ২৬, ১৪২  
 বেধুন কলেজ ২৮, ৬৬, ২৭  
 বেদান্ত ৫১  
 বেনেটোলা ২৪৩  
 বেলভেভিয়ার ২৩০  
 বেলুড ৩০১  
 বৈজ্ঞ ১৪৫, ১৬৫  
 বোধোদয় ১২  
 বোনাপার্টের জীবনচরিত ১৩  
 বো/বউ বাজার ১২০, ২০৭, ২৪৬, ২২২  
 বোঁ মাষ্টারের দল ২৩৪, ২৩৬  
 বৌদ্ধ ৩০৬, ৩০৭  
 ব্যাকরণ ২৭, ১৫০, ১৮৬  
 ব্যাকরণ কোমুদী ১২  
 ব্যক্তিমূলক পঞ্জিকা ৩১৩  
 ব্যবস্থামূলক পঞ্জিকা ৩১৩  
 ব্রজ অধিকারীর দল ২৩৪  
 ব্রজবাবুর স্থল ১৪৫  
 ‘ব্রজবিলাস’ ১১৩  
 ব্রাহ্মবিবাহ ২৪২  
 ব্রাহ্মমন্দির ১৪৭  
 ব্রাহ্মসমাজ ১৪৭, ১৬২, ১৭৪, ২৬২, ২৬৬  
 ব্রাহ্মণ যুগ ৩৩০  
 ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা ১১৪  
 ‘ভট্টিকাব্য’ ৬৫, ২৮৪  
 ভট্টের শ্লোক ২৭  
 ভদ্র সাহেব ১৭৬  
 ভবানীপুর ৪০, ১৪৭, ২৪৭  
 ভবানীপুরের দল ২৪৭  
 ভাগবত ১২৩  
 ‘ভামিনীবিলাস’ ৪১  
 ভারত সঙ্গীত সমাজ ২৩১  
 ভারতবর্ষ ১৪৫, ৩৩১

ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৪  
 ভার্জিন মাদার ৭৫  
 ‘ভারতী’ ১০, ৭০, ১০৭, ২৬৭, ২৭৩  
 ‘ভারতী ও বালক’ ২৬৭  
 ভারতের কালিদাস জগতের তুমি ২৬  
 ‘ভিত্তিহীন’ ( শব্দ ) ৫৮  
 ভুবনমোহন নিরোগীর বৈঠকখানা ২১১  
 ভূগোল ১২, ১৫০, ১৭৪  
 ভৃগুপদচিহ্ন ২৪০  
 ‘ভৈষজ্য রত্নাবলী’ ২৩২  
 ‘ব্রমভঞ্জিনী’ ১০২

‘মডার্ণ রিভিউ’ ১৭  
 মডেল স্থল ১৭২, ২২৪  
 মতিচূর ৩২৩  
 মথুরা ২৬৮  
 মদন মাষ্টারের দল ২৩৪  
 মছোৎসাহিনী সভা ৪৪  
 মন্ত্রযুগ ( বৈদিক যুগ ) ৩৩০  
 ‘মনীষী জোলানাথ চন্দ্র’ ২২২  
 মন্সো ১৭৮  
 মহাত্মারত ২, ২৭, ৪১, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৮৮, ২২, ১২৩, ১২৪, ১৮১, ২৬৭, ২৬৮

মহাভারতের উপক্রমণিকা ১২  
 মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ২২২  
 মহাশেতা ৮০  
 মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট ২২২  
 মহেশ চক্রবর্তীর দল ২৩৪  
 মাধাঘষা গলি ৩০২, ৩৩৪  
 ‘মাদার ইন্ডিয়া’ ২২২  
 ‘মানসমুদ্র’ ৩২৩  
 ‘মানসী’ ২২২, ২২৪  
 ‘মানসী ও মর্মবাণী’ ২১৪  
 ‘মায়াকানন’ ২২৭, ২২৮  
 মার্কিন ২২৩

‘মার্চেন্ট/মার্চ্যান্ট অফ স্টেনিস’ ১৫৩,

১৭৮

‘মালতীমাধব’ ৮২, ৮৩

‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ ৮২

মালার বাগান ২২২, ৩৩৪

মাহেশ ১০২

মিনার্ভা থিয়েটার ২২৮

মিশনারী বিদ্যালয় ১৪৫, ১৪৬

মিশনারী সোলাইটি ১৪৫

‘মুকুন্দমালা’ ৪৩

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ১৭, ১৮, ৮৭, ৮৮,

১০৮, ১০৯, ১১০, ১৮০, ২৬৪,

২৮৪, ২৮৬

মুজাযন্ত্র ৩১০

মুজাযন্ত্রের আইন ৫৩

‘মুদ্রারাক্ষস’ ২২, ৪৪, ৮৮, ২৮৫

মর্শিদাবাদ ২৬

মুনিপিপালিটি ১৮৮, ২৪৮

‘মেঘদূত’ ২৬৫, ২৭০

‘মেঘনাদবধ’ ২৩, ২৪, ৩৮, ২৩৩, ২৮২

মেছোবাজার ৭, ১১৭, ১১৯, ১২০

মেটকাফ হল ৪২, ১৮৬, ২৬৫

মেটিরিয়া মেডিকা ২৩২

মেটেব্লজ ২০৬

মেট্রোপলিটান কলেজ ১৮, ৬৪, ৮১,

১১৬, ১৫২, ১৮৪

মেট্রোপলিটান থিয়েটার ৮১

মেট্রোপলিটান স্কুল ৩৮

মেডিক্যাল কলেজ ২০, ১৮৮, ১৯০,

২০০, ৩২৬

মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমান ‘ম্মার. জি.

কর মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড

হসপিটাল) ২২৩

মেম্বিনীপুর ১৯, ২৫৬

মেয়ো/মেও হালপাতাল ১৮২

মৈথিলীমিলন ২৪৭

মোহনবাগান ক্লাব ৩২৩

মোহান্ত-এলোকেশী ২২৭

মোহান্তের এই কি কাজ ২২৭

ম্যাকবেথ ৮৮, ১৭৭

ম্যাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানী ১৮৮

ম্যাডোনা ২৩

ম্যালেরিয়া ১০২, ১৬০

ম্লেচ্ছমুখ ৬১

যাত্রা ২১৩

যাত্রাগান ২৩৪-২৪১, ২৫২, ২৯২

যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত ২৩৪

যুধিষ্ঠিরাক্ষ ১২৩

যেনা ১৭৮

যোড়াসাঁকো/জোড়াসাঁকো ২৪৩, ২৪৭,

২৫৪, ৩২৪

যোড়াসাঁকোর/জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়া

২১, ১২৮, ২২৪, ২২৬

যুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল ২০৭

যুরোপের ইতিহাস ৬৬, ৩১৬

‘রঘুবংশ’ ৩৫, ৮৮, ১৮৬, ২৬৪, ২৮৫

রঙ্গমঞ্চ ৮২, ৮৩, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৯,

২০১, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২২,

২২৪, ২৩১

রঙ্গলাল ২৯৯

রঙ্গালয় ২১৫, ২৫৪, ২৫৬

রঙ্গালয়ের ইতিহাস ২৩১

রঞ্জিত সিংহের জীবনবৃত্তান্ত ১৭২

রত্ন-পরীক্ষা ১১৩

রত্নসভা ১২৮, ১২৯

রত্নসার ১০৬

রত্নাবলী ৪৯, ৭৯, ৮০, ৮১, ২৪৯, ২৫৪

রবীন্দ্রকানন ৩২৩

রসতরঙ্গিনী ৭১

রসায়ন ১৮৮  
 রসিক নিয়োগীর ঘাট ২০৪, ২০৬  
 'রসেন্দ্র চিন্তামণি' ১১৫  
 রাইয়ৎ ৩০  
 রাজা দক্ষিণায়জন মুখোপাধ্যায় ২২২  
 রাজা নরসিংহের বাগান ২  
 রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল ২৩৪  
 রাধানগর ১০২  
 রাবণবধ ২১৮  
 রামকান্ত বোস স্ট্রীট ২৪৮  
 'রামতত্ত্ব নাহিডৌ ও তৎকালীন বঙ্গ  
 সমাজ' ১৬৪  
 রামাভ্যুবেক ২৪৬  
 রামায়ণ ২১, ৪১, ৮৮, ১২৩  
 রিপণ কলেক্স ১০, ১৬, ৪১, ১০১,  
 ১৮৬, ২২০, ২২১, ৩২৪  
 রিলিজিয়াস ম্যারেজ ৩২, ৬৮  
 রুশিয়া হরণ ৮২  
 রূপচাঁদ পক্ষীর দল ২৪১  
 রোমক ৩০৮, ৩১০  
 রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ৩৩, ৬৮, ৭৫  
 রোমের ইতিহাস ২২, ৪২  
 র্যাংগার ২৮২  
 রক্ষাপাশা ১৭০  
 লা মার্টিনীয়র কলেজ ১৭২  
 লাইব্রেরিয়ান ১১৫, ১২৩  
 লাইব্রেরী ২২, ১৬১, ১৭৬  
 লাইব্রেরী পরীক্ষা ৩১, ১৫১  
 লিউইস থিয়েটার ২০২, ২২৮  
 লিওনে স্ট্রীট ২২৩, ২২৪  
 লায়র ৮৮  
 'লীলাবতী' ১০৪, ১৮৭, ১৮৮, ২০২,  
 ২০৩, ২০৭, ২২২, ২২৩, ২৫৩,  
 ২৫৪, ২৫৬

লুপ্তবেণী ২৫৫  
 লোকা ধোপার দল ২৩৪  
 লোডির বৃক্ষ ১৩, ১০৭  
 ল্যাটিন ২৭, ১২৫  
 শকুন্তলা ২৬, ৭২, ৮০, ৮৮, ২৫, ২০০,  
 ২৪৬, ৩১৬  
 শঙ্কর ঘোষ লেন ১২৮  
 'শব্দকল্পদ্রুম' ৪৬, ৩২৬  
 'শব্দস্তোম মহানিধি' ৫৩  
 শব্দার্থরত্ন ১০৮  
 শরণা/শারণ্য সম্প্রদায় ৩১৬ ৩১২  
 'শর্মিস্তা' ৪৫, ৭২, ৮০, ৮২, ২১৭, ২১৮,  
 ২২৩, ২২৭, ২৪২, ২৫০, ২৫১,  
 ৩২৬  
 শাস্ত্রপুর ১৬০, ১৬৮, ৩২৬  
 শারদাষ পূজা ৩  
 শাস্ত্রালিপিভিত্তিত ছন্দ ২৭  
 শাস্ত্রক পেটানো ২৮২  
 শিক্ষা সমিতি ২৭, ১৫১, ১৫৫, ১৭৮  
 শিবপুর ১০২, ২৪৬, ২৫১  
 শিশুশিক্ষা ২৮, ১৮১  
 শুভিপাড়া ২৪৭  
 শেমুদা ২২  
 শেরিক ২২২  
 শোভাবাজার ১৮৪, ২৩৪, ২৫১, ৩২৬  
 শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল  
 সোসাইটি ২১৮  
 শোভাবাজার রাজবাড়ী ১২৮, ২১৮,  
 ২৪৮  
 শ্রামপুত্র ২৪৩, ২৫০  
 শ্রামবাজার ৭৮, ২২২, ২৪৮  
 শ্রামবাজার ইন্সল ১৮৮  
 শ্রামপূজা ১৬৭  
 শ্রীকৃষ্ণ ১৬৭, ২২৪  
 শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ২৬৭, ২৬২



শ্রীকৃষ্ণদণ্ডিহ ২৪০

শ্রীমদভাগবত ৩২২

শ্রীরামপুর ৬৩, ১৮৪

শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন ৩৩১

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা শতকং ৩৩১

ষড়দর্শন ২৩

ষ্ট্যানহোপ প্রেস ২০২

সংবাদ রসরাজ ৪৭, ১৮৬, ৩৩২

সংস্কৃত ১২, ২৩, ২৪, ১৮০, ১৮৬, ২৮৮, ২৯১

সংস্কৃত কলেজ ৬, ৭, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৮, ৫৩, ৬১, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮৭, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১১২, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১৮৬, ২২৫, ২৮০, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৬, ৩০১, ৩২৪, ৩২৯, ৩৩১

সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস .০৪

সংস্কৃত পুঁথি ২৭, ২৯৩, ২৯৭

সংস্কৃত প্রবেশিকা গ্রন্থ ৫৩

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী ১৪৫

সংস্কৃত ব্যাকরণ ৮৮

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র

বিষয়ক প্রস্তাব ২৮১

সংস্কৃত শাস্ত্র ২৭, ৫৩, ১০২, ১১৩

সংস্কৃত সাহিত্য ৯৯, ২৮৮, ২৯৬

সকর জাতি ৫২

সখা ৯৯

সখেরবাজার ২৩০

সদীত শতক ৮২

সতীদাহ ৬৫, ৬৬, ৩০৬

সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান ২৭১

সত্যবতী-অম্বালিকা ২৩৮-২৩৯

‘সত্তাবশতক’ ২৮২

সধবার একাদশী ১৬৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২২৩, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৭

সমাজতত্ত্ব ২৯

সম্বাদ প্রভাকর ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৩৩২

সম্বাদ ভাস্কর ৪৭, ৫৫, ১৮৬, ১৯৫, ৩৩২

সরস্বতী ৩৯

সরস্বতী পূজা ২০৩

সর্বভূক্তকরী ২৮, ২৯, ১০৭, ৩২৫

সর্বস্বত্বকরী ১০৭

সর্বসাধিকারী ১০২

সাঁওতাল ১১৭

সাঁতরাগাছি ২৩১

সাঁতরাগাছি/সাঁতরাগাছি স্কুল ৩০১

সাধনা ৯০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৬৬

সাধের আসন ৯০, ৯১, ৩২৮

সাবিত্রী সত্যবান ২৪৬

সায়াল কলেজ ( কলিকাতা ) ৩২৫

‘সারদামঙ্গল’ ৯০, ৯১, ৩২৮

সাহারা মরুভূমি ৭৬

সাহিত্যাদর্পণ ২৭, ৪৩, ৪৪, ২৮৫

সাহিত্য পরিষদ ( ব্রহ্মবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ )

সিংহবাহিনী ঠাকুর ২৮৩, ২৮৪

সিঁদুরিয়াপটি ৮১

সিকদারপাড়া লেন ২৭৬

‘সিন্দুর কোঁটা’ ২৮৭

সিদ্ধেশ ৬৫

সিপাহী বিদ্রোহ ৬৩, ১০৬, ১১৩, ১৫১, ২৬৫, ২৯২

সিডিল ম্যানেজ ৩২

সিডিল সার্ভিস/সার্ভিস পরীক্ষা ২, ২৩, ২৯৬

সিমলা ২৪৩, ২৮৩

‘শীতায় বনবাস’ ২৫, ৪১, ২৪৭  
 শীনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ১৫৪, ১৫৫,  
 ১৭৮  
 স্ট্রিটলাল ১৭৮  
 স্ট্রিটলেনবার্গ ৭৭  
 স্কিয়া স্ট্রিট ২৭, ১১২, ১২০, ২২২,  
 ৩২৪  
 সুধীরঞ্জন ১৫৭  
 সুপ্রভাত ১০  
 সুপ্রায় কোর্ট ১০২  
 সুবর্ণবর্ষিক ৮৮, ১৬৫  
 সুবর্ষিক কল ১১১, ২২৩  
 ‘সুবাবালা কাবা’ ২০, ২১  
 সুরাপান ৭৪  
 সুলতানা ২২৮  
 ‘সুষ্টি রহস্য’ ৫১  
 ‘সেকাল আর একাল’ ৩৩১  
 স্টোনকার ১০৪, ১৬২  
 সেনেট ১২০, ১২১, ২২০, ২২১  
 সেন্ট পলস্ স্কুল ২৭৪  
 সেন্ট্রাল হিন্দু হোটেল ( কাশী ) ৩২৬  
 ‘সোনার তরী’ ৩২৩  
 সোভিয়েট রুশিয়া ২২৬  
 ‘সোমপ্রকাশ’ ১৮, ২২, ৪৮, ৩২৬  
 স্টল্যাণ্ড ৮৬  
 স্টলারশিপ/স্টলারশিপ পরীক্ষা ২৬৪  
 স্কুল বুক সোসাইটি ১৪২  
 স্ত্রীশিক্ষা ৩২৫  
 ‘স্পেক্টেটর’ ১০৬, ১৭৬, ২১১, ২৮২  
 স্টার্ক ৩২  
 স্ট্রেশী ২৭৩, ২৭৪  
 ‘সুপ্রপ্রয়াণ’ ৩২, ৪০, ২৬৬  
 ‘সুপ্রশ্রুত নাটক’ ২৩২, ২৩৩  
 স্কল কল কোর্ট ১৭  
 স্মৃতি ৫৪, ২৮৫  
 স্মৃতিশাস্ত্র ৭৩, ২৮৫, ২৮৬

হরিকারিকা ১০৮, ১০৯  
 হরিশ্চন্দ্র ২৪৬  
 হাইকোর্ট ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬,  
 ৩৮, ৪০, ৬২, ৬৩, ৮০, ২৩, ১২৭,  
 ১৮৪, ২০৩, ২৭৩, ২৮২, ২২০,  
 ২২৪, ২২৭  
 হাওড়া ১৪৮, ৩০১  
 হাকিম ১২১, ১২৩  
 হানিবল ২৫  
 হাবড়া ( বর্তমান হাওড়া ) ৩৭, ১০২,  
 ১৫০  
 হার্মোনিয়ম ২৭২  
 ‘হালিসহর পত্রিকা’ ২৭৬, ২৮৬  
 হিউগেনো সম্প্রদায় ৩০৮  
 ‘হিতকারী পত্রিকা’ ২৩  
 ‘হিতবাদী’ ৩২, ৪০, ২৭৬, ২৮১,  
 ২৮৬  
 হিদারাম ব্যানার্জি লেন ২০৭  
 হিন্দু কলেজ ৩১, ৪৮, ৬৪, ২৭, ২৮,  
 ২২, ১০৩, ১৪৬, ১৫০, ১৫১,  
 ১৬২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮,  
 ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ২৬০, ২৬৪,  
 ২২৪, ৩২২, ৩৩০  
 হিন্দু কলেজ ( কাশী ) ৪৫  
 হিন্দু দর্শন ২৩  
 হিন্দু গ্রামিনাল থিয়েটার ২২৬  
 ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ ৩২, ১৬২, ১৮৫, ৩০০,  
 ৩৩১  
 হিন্দু ল’ ২২৭  
 হিন্দু সমাজ ২, ৩৪, ৬৬, ২৫৮, ২৬০,  
 ২৮৩  
 হিন্দু স্কুল ১৮৭, ২৪১, ২৪২, ২৬৪  
 হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন ৬২  
 ‘হিন্দু’ ২৭২  
 ‘হীরকচূর্ণ’ ১৮৫  
 হাঁকাপটি ১৭২

হুগলি নর্মাল স্কুল ১৭২  
 হুগলী ১২, ১৫৮, ১৫৯, ২৮২, ৩২৬  
 হুগলী মহম্মদ মহসীন কলেজ ৩১, ২৭,  
 ১৫০, ১৫৪, ১৫৮, ১২৮, ২২১  
 'হুতোম পাঁচার নক্সা' ৫, ৪৬, ৪৭,  
 ১২২, ২১৮, ২৭৮  
 হেহুয়া ১৬৪  
 হেমচন্দ্র ২২২

হেয়ার স্কুল ১৪৭, ১৭৫, ১৭৬, ২৩৩,  
 ২৪১, ২৪২, ২৪৮  
 হোমিওপ্যাথি ৩৬, ১৮৮, ১৮৯  
 হোমিওপ্যাথির প্রথম সাক্ষিকাল  
 কেস ১৮৮  
 হোর্লি ১২০  
 হ্যামলেট ২১, ৬২, ১৭৭  
 হ্যারিসন রোড ৬৬

### ইংরেজী

A distinguished amateur ২১২,  
 ২১৮  
 Abstract calendar ৫১৩  
 Adam Bede ৩০২  
 Agonistic ৩২  
 Alexandria ৩৫  
 Alison's Europe ৩১  
 All-merciful ১৬  
 Amputation ১৮৮  
 Analytical Geometry ৩৫, ৩১০  
 ৩১১  
 Anachronism ১৫৮  
 Aperçu ৬৭  
 Applause ৮১  
 Arry ৪৭  
 Auld Lang Syne ৮৬, ৩২৭  
 Austerlitz ১৭৮  
 Autobiographic ২৮২  
 Avignon ১৪  
 Bagbazar Amateur Concert  
 ২৪৮

Beauty and the Beast ২৩৪  
 Bible ১৮২  
 Bigotry ২৫২  
 Black Act ১৬৪, ২৬২  
 Blank Verse ৪১  
 Boden Professor ২২৮  
 Book-keeping ২০০  
 Boomerang ২৪১  
 Calcutta National Theater  
 ২০৭, ২৫৫  
 Cambridge man ১৬৩  
 Captive Lady ৩৩৪  
 Cato of Utica ১৬৬  
 Chaste Marriage ৩২, ৬৭, ৬৮  
 Civil Marriage ৩২  
 Childe Harold ৮৮  
 Comic titbits ১২৭  
 Communism ৩১৫  
 Concrete Calendar ৩১৩  
 Council of Education ১৭, ১৮,  
 ১৫৮, ১৬২, ১৭৭, ১৭৯

Court of Wards ৬৮  
Court Fees Act ১৪৭  
Conservation of Energy ১৫  
Crimean War ১৫০

Dace ২২

Dialogues on Hindu Philoso-  
phy ২৩

Divorce Law ৭

Don Juan ২৩

Don Quixote ৩১৭

Drachma ৬১

Eccentric ২৮২

Ecstasies Philanthropy ৩০২,  
৩০৩

Edinburgh Review ৪১

Education Despatch (of 1854)  
১২, ১৭৮, ১৮০, ৩২৫

Emerald Bower ৮৪

Encyclopaedia ১৭

Encyclopaedia Bengalensis  
২৭, ১৮১

Enfranchisement of Woman  
১১

English Bards and Scotch  
Reviewer ২০, ১০৭

Englishman ১৭২

Epicurean ১০৫

Epistle to Dr Arbuthnot ২৭২

Essay on Criticism ১৭৫

Euclid ১৭৫, ১৭৬

Falstaff ২৮

Fairy Tale ২২৮

Fancy Fair ২৩০

Fighting Charlies ২৪১

First Junior Scholarship  
Examination ১৫০

First Reader ১৪৬

Fitness per se ২৫

Franco-Prussian War ১৫, ৩২

French Revolution ১৫

Friend of Education ১৫০

Friend of India ৬৩, ১৭৩

Gentle Knight ২২১

Geometrical conic sections  
১৭৭

Geometrical Problems ১৮১

Goldsmith's ome ১৭৫

Grand Man ২৬৭

Great Rent Case ৩০

Great Unknown ৩০৩

Guizot's History of the  
English Revolution ১৭৭

Hamlet ১৭৭

Hind's Algebra ১৭৬

Hindu Law ২৭, ২৮, ৩৩

Hoary Headed Libertine ২৮,  
১৫৩

Home ২৭৪

Humanity ৩৩

Hume's History of England  
১৭৬

Illusion ২৭০

Idolatry ২৫২

In sooth ১৫৩

Imitation of Christ ৭৭

Indian Empire ১৮১  
 Indigo Commission ১৬২  
  
 January and May ৭২  
 Jena ১৭৮  
 Johnsonese ২৫  
 Joint Family System ১৬১  
  
 Keightley's India ১৭৫  
 King John ১৭৬  
  
 Latinisms ২৫  
 Law of Evidence ৩৮  
 Law of In eritance and  
     Succession ৩৩  
 Law Officer ২৮  
 Law Member ২৭, ২৮  
 Law Relating to the Joint  
     Hindu Family (1882/  
     Tagore Lecture) ২২৪  
 Leben Jesu ২৪  
 Lecky's History of Rationalism  
     ৬৬  
 Lecroix Algebra ১৭৮  
 Ligo to bind ৩০৭  
 Lionise ২২৫  
 Literary Jealousy ২৬, ৪৫  
 Literary Leaves ৬৪, ৩২৭  
 Literary Sindbad ১৪৮  
 Lucie ১৩  
  
 Madonna ২৩  
 Mannual Exercise ২৪৮  
 Martyrdom ১৮৪  
 Mass Education ১৪৫

Massacre of St. Bartholmew  
     ৩০৮  
 Master mistress of my  
     passion ৬৪  
 Materialism ২৭০  
 Men I have Seen ১৭  
 Mensuration ২৬৫  
 Merry Wives of Windsor ৩২৮  
 Meteorological Reporter ১৭৮  
 Model School ১৭২  
 Modern Review ১৭  
 Mongrel ৫২  
 Moral Atmosphere ১০৫  
 Moral Sentiments ৩০৫  
 Moscow ১৭৮  
 Mother India ২২২  
 Murray's Grammar ১৭৫  
 Mysteries of Paris ৩১২  
  
 Native wit ১২৬  
 Natural Philosophy ১৪৮  
 Natural Selection ২৮০, ৩১৭  
 Network of Graded  
     School ১৭৮  
 New Dispensation ২৭২  
 Nihilism ৩১৫  
 Novum Organum ১৫৪  
  
 Occult Knowledge ২৮৩  
 Omnipotent ১৬  
 Omniscient ১৬  
 Ophthalmic Surgery ১৪৮  
 Oriental Seminary ১৮৪-১৮৭,  
     ১২২, ৩০০  
 Orion ১২৪  
 Orthodox ২৬২

Otway-Venice Preserved ১৭৫  
Oxford University ২৩৮

Paradise Lost ৯১, ১৫৩, ১৭৭,  
২২০

Parody ১২৫

Patriot ২৭৪, ২৭৫

Patriotism ২৬৩, ২৬৪, ২৭৪

Penal Code ৩১৮

Physical Geography ১৭৭

Platonic ১৩

Playfair's Geometry ১৭৫

Pleasure of Hope ১৬৬

Poetry of Motion ২১৩

Polite Education ১৪

Polytechnic School ১১

Positivist Chivalry ৩১৬, ৩১৭,  
৩১৮

Positive Library ৩৪

Positive Philosophy ৩৫

Positive Politics ১২

Positive Religion ২৬৭, ২৬৮

Positivism ১০, ৩৪, ৫১, ৯৩, ৯৪,  
৯৫, ৩০০, ৩০২

Positivist ৯৩, ৯৪, ১২২, ১৬৩,  
২৬৭, ২৮৫, ৩০০, ৩০২

Positivist Calendar ৩৪, ৩০৮

Positivist Club ৯৩

Positivist Religion ২৬৭, ২৬৮

Potter's Mechanics ১৭৭

Prime Minister ১০২

Public Service Resolution ১৭৮

Purist ২৩৭

Psychological Analysis ২০১

Queen's Proclamation ১৬৬

Race Course ২

Rape of Lucrece ৭২

Reform Movement ২৭১, ২৭২

Relativity ১৫

Religious Marriage ৩২, ৬৮

Representative Government  
১১

Religion of Humanity ৩১৮,  
৩১৯

Richardson's Selections ১৭৫

Roach ২২

Rochfort Medal ১৫১

Schmitz ৪২

School of Philosophy ৩০২

Scott's Lay of the Last  
Minstrel ১৭৭

Selections from English Poets  
৬৪

Senior Scholarship Examination  
১৫২

Sentient Being ২৭০

Sermon ১৬৪

Silas Marner ৩০২

Small Cause Court ১৭

Socialism ৩১৫

Spectator ১০৬

Stewart's Geography ১৭৫

Stewart's Mental Philosophy.  
১৭৬, ১৭৭

Strauss ২৪

Superstition ২৫২

Surgical Case ১৮৮

Surveyor General ১৭৮	Universal Postulate ১৫
Survival of the fittest ৩১৭	University College of Science and Technology ৩২৮
Synthetic Philosophy ১১, ৩২৪	
Teachership ( Examination ) ১৫৮	Vague religiousness ৩১৯
Temperance Movement ৫০	Vanity of Human Wishes ১৭৬
Terminology ১৯	Vaughan ১৭৬
Text-book Committee ২৩	Venus and Adonis ৭২
Theology ১৬	Vicious Circle ২৭০
Trigonometry ১৮১, ২৬৫	Virgin Mother ৭৫
Turgid ৩০১	Ward's Institution ১৯৮, ৩৩২
Unborn Generations ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭	Wood's Algebra ১৭৬
	Wood's Education Despatch ১৯, ১৭৮, ১৮০, ৩২৫

---

